সৈয়দ আমীর আলী প্রণীত

দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম

হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর জীবনী এবং ইসলামের ক্রমবিকাশ ও আদর্শের ইতিহাস

অনুবাদক

ডঃ রশীদুল আলম, এম. এ. (দর্শন, বাংলা ও ইংরেজি),
পি. এইচ. ডি. (ক্যাল.)

প্রার্থনা তোর ঝরে পড়ুক সিরীয় বা হিব্রু ভাষায়
শিরটি তোর হোক না নত 'জবালকা' বা 'জবালসা'য়।
তাতে কিবা যায় রে আসে
খোদার প্রেমের জোয়ারে তোর হৃদয় যদি নাহি ভাসে।
—সানায়ী

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক : আবুল কালাম মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৭০

মুদ্রক : শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

আল্লাহ্ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরন্তন। তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তাঁর অনুমতি ছাড়া কে-ই বা তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তাদের ভূতভবিষ্যৎ সম্পর্কে সব তিনি জানেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর অসীম জ্ঞানের কণামাত্রও তারা জানতে পারে না। আসমান ও জমিন জুড়ে তাঁর সিংহাসন পরিব্যাপ্ত। তাদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি গরীয়ান ও মহীয়ান।

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিনীকে

গ্রন্থকারের ভূমিকা

বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামের বিবর্তনের ইতিহাস, এর দ্রুত বিস্তৃতি, এবং স্বল্পকালের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মন-মগজ-বিবেকের উপর এর যে অসাধারণ প্রভাব পড়েছিল, আমি এই গ্রন্থে সে সব বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। মানবজাতির বুদ্ধিগত বিকাশের ক্ষেত্রে এ যে-প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তা সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মনুষ্যত্বের উন্নয়নে এর মহান ভূমিকার কথা, হয় উপেক্ষা করা হয়েছে নয় সম্যক্‌ভাবে মূল্যায়ন করা হয় নি। বর্তমান গবেষণাধর্মী গ্রন্থে আমি ধর্মসমূহের ইতিহাসে ইসলামের যথার্থ স্থান নির্দেশের চেষ্টা করেছি। মূলনীতি ও আদর্শের এই পর্যালোচনা যতই ক্ষীণ হোক না কেন, সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর মানবচিন্তাকে অবিচল রাখার জন্য যে সন্ধানীরা একটা গঠনমূলক ধর্মের অনুসন্ধান করেছেন তাদের কাছে এ প্রয়াস উপকারে আসবে। আমি আরও আশা রাখি যে, ইসলামের অনুসারিগণ এতে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিসমূহের বোধ ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাহায্য পাবেন।

হযরত মুহম্মদ (দঃ)-র জীবন ও নবুয়্যতের কার্যকালের যে রূপরেখা অঙ্কিত করেছি তার উৎস ইবনে হিশামের 'সিরাতুর রাসুল'। ইবনে হিশাম হযরতের ইন্‌তিকালের মাত্র দু'শো বছর পরে ২১৩ হিযরীতে (৮৮৯ খ্রী.) মৃত্যুবরণ করেন। এই উৎসের সম্পূরক হিসেবে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ইবনুল আসিরের অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দলিল, তাবারীর কালানুক্রমিক ধারাবিবরণী ও আল্‌ হালাবির 'ইন্‌সানুল্‌ উয়ুন্‌' (সাধারণভাবে 'সিরাতুল হালাবিয়া' নামে পরিচিত)। এই সংস্করণে দু'টি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে;

একটি হল 'ইমামত' বা খিলাফতের উত্তরাধিকার এবং অপরটি 'ইসলামের ভাববাদী ও মরমীবাদী মর্মবাণী'। গ্রন্থের অবতরণিকায় ও দ্বিতীয় পর্বের দশম অধ্যায়ে প্রভৃত নতুন উপাদান সংযোজিত হয়েছে। আমি শেষ অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য গঠনমূলক সমালোচনার জন্য আমার সম্মানিত বন্ধু অন্যতম প্রধান প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউনকে এবং সযত্ন প্রুফ-সংশোধন ও গ্রন্থসূচী প্রণয়নের জন্য কেম্ব্রিজে ভারত সরকারের রিসার্চস্কলার জনাব মুহম্মদ ইকবালকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মুদ্রাকরের জন্য নতুন অধ্যায়গুলির আরবী উদ্ধৃতিসমূহের প্রতিলিপি তৈরী করা ও কোরআনের নির্দেশিকাগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য জনাব আব্দুল মালিক কাইউম মালিককে এবং এ ধরনের একটি কঠিন প্রকাশনার ব্যাপারে অবিচলিত সৌজন্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের জন্য গ্রন্থের প্রকাশককে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যখন জনসাধারণের কাজের চাপে খুবই ব্যস্ত ছিলাম, তখন গ্রন্থের মুদ্রণ চলছিল; ফলে অনভিপ্রেত মুদ্রণ ত্রুটির জন্য পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর বিবেচনা লাভের দাবী রাখি।

* মূল গ্রন্থে 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' উপধায় গ্রন্থকার আরবী ও ফার্সী শব্দের ইংরেজি অক্ষরান্তরীকরণ সম্পর্কে বেশ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে সেটা নিষ্প্রয়োজন হওয়ায় বর্জিত হল। আমরা আরবী ও ফার্সী শব্দের অক্ষরান্তরীকরণে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচলিত ধারা অনুসরণ করেছি।

অনুবাদক : ডঃ রশীদুল আলম

সূচীপত্র

অবতরণিকা

পৃষ্ঠা

প্রথম পর্ব

হযরতের জীবন ও নবুয়্যতের কার্যকাল

প্রথম অধ্যায়

রাসুল (প্রেরিত পুরুষ) মুহম্মদ (দঃ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিযরত বা স্বদেশত্যাগ

দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম

অবতরণিকা

অবতরণিকা

ওগো তোমার ঠাঁই নাহি যে কোনখানে
সবিস্ময়ে দেখি তুমি বিশ্বজুড়ি সবখানে।
—বোছালী

তোমার খোঁজে 'কুফর' ও 'দীন' দোঁহে মিলে পথ যে চলে
'তুমি এক, নাই যে শরীক,—সেই কথাটি চেঁচিয়ে বলে।
—সানায়ী

মানবজাতির মধ্যে ধর্মীয় অগ্রগতির নিরবচ্ছিন্নতা মানবিক বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এক মনোমুগ্ধকর কৌতূহলের বস্তু। বিশ্বপ্লাবী যে পরমপুরুষের, যে সুমহান ইচ্ছাশক্তির উপলব্ধিতে মানবমনের ক্রমাগত জাগরণ সাধিত হয়েছে; সমগ্র অস্তিত্ব পরিব্যাপ্ত, নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত ক'রে যে পরমাত্মা বিরাজিত আছেন তাঁর ধারণায় উপনীত হওয়ার পূর্বে ব্যক্তি ও জাতি যে দুর্গম ক্লেশকর পথের চড়াই-উৎরাই পার হয়েছে—সেসবের মধ্যে সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় মনুষ্যজাতি জড়বস্তুর উপাসনা থেকে আল্লাহর উপাসনায় উন্নীত হয়েছে তার গতিবেগ বারংবার মন্দীভূত হয়েছে ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত, উভয় দিক দিয়েই মানুষ অগ্রগতির প্রবাহ থেকে ছিটকে পড়েছে, নিজেদের কামনার নির্দেশে চলেছে, হৃদয়ের মিনতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে; এভাবে তারা তাদের শৈশবের কল্পনার প্রতিমূর্তিতে বিধৃত প্রবৃত্তির পূজায় ফিরে গেছে। অশ্রুত থাকলেও আল্লাহর বাণী সত্যের আহ্বানে নিরন্তর ঝঙ্কৃত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে তাঁর মনোনীত বান্দা এসেছেন, নিজের প্রতি ও তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা শুনিয়েছেন। এসব মানুষই প্রকৃতপক্ষে পয়গম্বর বা সত্যের বাণীবাহক। তাঁরা তাঁদের জাতির ভেতর থেকেই তাঁদের কালের সন্ততি-রূপে উদ্ভূত হয়েছেন—তাঁরা সত্য, অকৃত্রিমতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি মানবাত্মার প্রদীপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষই তাঁর কালের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের মূর্ত-প্রকাশ; প্রত্যেকেই অধঃপতিত মানবগোষ্ঠী, পঙ্কিল জনসাধারণকে শুচিশুদ্ধ, সংস্কৃত ও উন্নত করতে এসেছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ এসেছিলেন ক্ষুদ্রতর সংস্কৃতির শিক্ষক হিসেবে ক্ষুদ্রতর পরিমণ্ডলকে প্রভাবিত করতে; আবার কেউ কেউ এসেছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সুসংবাদ নিয়ে—এমন পয়গাম নিয়ে যা এক বংশ কিংবা

এক-জাতির মধ্যে সীমিত নয়—সমগ্র বিশ্বমানবের উদ্দেশে পরিকল্পিত। এমন একজন প্রেরিতপুরুষ ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (দঃ)।* একমাত্র আরবজাতির মধ্যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত হননি। তিনি কোন বিশেষ যুগ বা বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য প্রেরিত হননি; বরং তিনি "কিয়ামত অবধি বিশ্বের সকল মানুষের জন্য" প্রেরিত হয়েছিলেন। এই মহান শিক্ষকের আবির্ভাব, নবুয়াতের কার্যকালের মুহূর্ত থেকেই যাঁর জীবন পরীক্ষিত দলিল, শুধুমাত্র আকস্মিক ঘটনা নয়, বিশ্ব-ইতিহাসের কোন বিচ্ছিন্ন কাহিনী নয়। সে কারণসমূহ, যে উচ্চনাদী অশুভ শক্তিগুলি, এক সর্বব্যাপী মহাশক্তিতে "নিশ্চিত বিশ্বাসে"র নিমিত্ত যে ঐকান্তিক দাবী, যা গ্যালিলী নদীর তীরে আগাস্তাস সিজারের রাজত্বকালে একজন প্রেরিত-পুরুষের আবির্ভাবকে সম্ভব করেছিল, যাঁর জীবন ছিল একটা ট্র্যাজিডি, সে সমুদয় কারণই খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল। যথার্থভাবেই বলা হয়েছে যে, সপ্তম শতাব্দীর সূচনা ছিল বিচ্ছিন্নতার যুগ। এই বিচ্ছিন্নতা ছিল জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয়। তার অভিব্যক্তিগুলি এমনি ছিল যে তা "ব্যক্তিগত উপাসনার বিশুদ্ধিকরণের দিকে" আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের অনিবার্য পথে সমগ্র বিক্ষিপ্ত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য গঠনমূলক ধর্মের অভিনব রূপ অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এসব ইহুদী ধর্ম বা খ্রীষ্টধর্ম কর্তৃক অধিগত ঐশী নিয়ন্ত্রণের অধিকতর আঙ্গিক প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তার দিকে নির্দেশ করেছিল। জরথুস্ত্র, মুসা ও ঈসা কর্তৃক প্রজ্বলিত পবিত্র অগ্নিশিখার উত্তাপ মানুষের শোণিতে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কলুষিত জরথুস্ত্রবাদ অধিকতর কলুষিত খ্রীষ্টধর্ম কয়েক শতাব্দী ধরে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল, মনুষ্যত্বের শ্বাসরোধ করেছিল এবং বিশ্বের কতকগুলি সুখী জনপদকে যথার্থ বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বিরামবিহীন যুদ্ধ, চিরস্থায়ী আত্মঘাতী বিবাদ এবং তার সঙ্গে যুক্ত বিশ্বাস ও গোষ্ঠীর বিরামহীন বাগবিতণ্ডা বিশ্বের জাতিপুঞ্জের হৃৎপিণ্ড থেকে জীবন-শোণিত শুষে নিয়েছিল; আর নির্জীব যাজকতন্ত্রের লৌহ-নিগড়ে নিষ্পিষ্ট হয়ে দুনিয়ার মানুষ তাদের প্রভুদের অপকর্মের থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আল্লাহর কাছে আকুল ফরিয়াদ জানিয়েছিল। জগতের ইতিহাসে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের জন্য এর পূর্বে এত অধিক প্রয়োজন আর কখনও অনুভূত হয়নি, সময়ও এত উপযুক্ত হয়নি। সুতরাং নৈতিক জগতে হযরত মুহম্মদ (দঃ)-র সফলতা সম্যকরূপে অনুধাবন করতে হলে ইসলামী বিধান ঘোষিত হওয়ার পূর্বে এবং তৎকালে বিশ্বের জাতিসমূহের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ হওয়া আবশ্যক।

---

* বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের নাম উচ্চারিত হলে দরুদ পড়া মুসলমানদের কর্তব্য। অন্যান্য নবীদের বেলায় একই নির্দেশ প্রযোজ্য। অনুবাদে 'দঃ' কিংবা "সাঃ" থাক বা না থাক, পাঠকগণ এ বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।—অনুবাদক

ব্যাক্‌টিরিয়ার সমতল মালভূমি যাকে আরব ভৌগোলিকরা যথার্থই উম্মুল বিলাদ' বা দেশসমূহের জননী বলে অভিহিত করতেন তা মানবজাতির সূতিকাগার —সব ধর্ম ও জাতির মূল আবাসভূমি বলে অনুমিত হয়ে থাকে। তুলনামূলক জাতিতত্ত্ব মানবজাতির শৈশব অবস্থার উপর যে ক্ষীণ, আবছায়া আলোকসম্পাত করেছে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, বিভিন্ন বংশোদ্ভূত দল মানবজাতির এই আদিম আবাসভূমিতে সমবেত হয়ে ক্রমশ পরিবার ও গোত্রে সম্মিলিত হয়েছিল। অতঃপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপনের জন্য তারা বাধ্য হয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল। হেমিটিক শাখার লোকেরাই আপাতদৃষ্টিতে সর্বপ্রথম তাদের প্রাচীন আবাসভূমি ত্যাগ করেছিল। তাদের পথ অনুসরণ করেছিল তুরাণীয়রা—তাদের উগ্রো-ফিনিসীয় গোত্রও বলা হত। তাদেরকে জাফেটিক বংশের একটি শাখা অনুমান করা হত। তাদের কিছু কিছু লোক উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার পর পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা মানবজাতির বর্তমান মঙ্গোলীয় শাখার প্রতিষ্ঠাতা, তাদের অপর একদল পশ্চিম-দিকে অগ্রসর হয়ে আজারবাইজান, হামদান, ঘিনান—কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের দেশগুলিতে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রাচীন ইতিহাসে তারা 'মিডিয়া' নামে সর্বাধিক পরিবিদিত। এই দলের একটি অংশ ব্যাবিলনের উর্বর সমভূমিতে বসবাস শুরু করল এবং পূর্বের হেমিটিক উপনিবেশগুলিকে দাসত্বের নিগড়ে বেঁধে ফেলল। কালক্রমে তারা হেমিটিকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে যে আক্কাডিয়ান জাতি গঠন করেছিল তারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত কুশাইজাতি। এই মিশ্রজাতি ব্যাবিলনের প্রতিষ্ঠাতা। তারা এমন একটি ধর্মের জন্ম দিয়েছিল যা উচ্চতর পর্যায়ে সর্বখোদাবাদের সমগোত্রীয়। এই ধর্মের নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে সর্বদৈত্যবাদ, সূর্যদেবতা ও চন্দ্রদেবতাদের পূজা, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত রয়েছে লিঙ্গপূজা ও যৌনপ্রবৃত্তি, বল ও মলচের প্রতি সন্তান বলিদান এবং বেলটিস ও অ্যাশ্‌টোরেথের নিকট কুমারী বলিদান, এ এমন একযুগের নির্দেশ করে যখন উচ্চ জড়সভ্যতা স্থূল ইন্দ্রিয় পরায়ণতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল এবং নিষ্ঠুরতা ধর্মের অনুমোদন লাভ করেছিল।

অতঃপর সেমিটিক জাতি তাদের আদি আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল। তারাও তুরাণীয়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পশ্চিম অভিমুখে স্বদেশ ত্যাগ করেছিল এবং মেসোপটেমিয়ার ব-দ্বীপের উত্তরদিকে বাহুত বসতি স্থাপন করেছিল। সংখ্যা ও শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা সত্বর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য দখল করে নিয়েছিল এবং সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। পশ্চিম এশিয়ার দু'টি বড় নদীর মধ্যে অবস্থিত তাদের শক্তি-কেন্দ্রে। অ্যাসিরীয়গণ একসময়ে গঠনমূলক একেশ্বরবাদের ধারণায় উন্নীত হয়েছিল।

তাদের অপার্থিব পুরোহিততন্ত্রের রীতি এক সার্বভৌম ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বীকৃতির পরিচয় বহন করে।

যখন ব-দ্বীপটির উপরিভাগে সেমিটিক ঔপনিবেশিকদের প্রধান দল সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছিল, তখন তাদের একটি ছোট দল চ্যাল্ডিয়ান রাজ্যের[১] সীমানার মধ্যে, উর নামক একটি জেলার অত্যন্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। এই গোষ্ঠীর অধিপতি, যার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নির্বাসন ও পর্যটন একাধিক ধর্মের পৌরাণিক কাহিনীতে স্থান পেয়েছিল, তিনিই ইতিহাসের ভাবী নির্মাতাদের জনকের আসন লাভ করেছিলেন।[২]

জাফেটিক বংশই তাদের প্রাচীন বাসভূমিতে দীর্ঘতম সময় অবস্থান করেছিল বলে মনে হয়। যখন অন্যান্য বংশের লোকেরা মূল বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাম্রাজ্যের পত্তন ও ধর্মমতের উদ্ভব ঘটাচ্ছিল তখন জাফেটিক বংশ নিজস্ব বিশেষ ধারায় বিকাশ লাভ করছিল। একবার জাতির জীবন সক্রিয় হলে তা কখনও থেমে যায় না। যে প্রাণশক্তি বর্বর জাতিসমূহের মধ্যে সক্রিয়তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অথবা লোকসংখ্যার চাপে এবং তাদের প্রাচীন আবাসভূমিতে পশুচারণের ক্ষেত্রের অভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একের পর এক গোত্র পশ্চিম-দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রাথমিক দলসমূহের মধ্যে ছিল পেলাজিনীয় ও কেল্ট। তাদের অনুসরণ করেছিল অন্যান্য গোত্রের লোকেরা। তখন পর্যন্ত আর্যগণ তাদের প্রাচীন আবাসভূমিতেই অধিষ্ঠিত ছিল। এদের একদলের আবাস ছিল বদখশানে, অন্যরা বাস করত বলখের কাছাকাছি। তারা সেখানে বহু শতাব্দী ধরে প্রতিবেশী জাতিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাদের যুদ্ধবিগ্রহ বা আন্দোলন দ্বারা অবিচলিত ছিল। ইতিহাসের যে আলোক পাশ্চাত্য জাতিসমূহ, রাজত্ব ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতাদের উপর নিপতিত হয়েছে সেই আলোকই জগতের এইসব প্রাচীন অধিবাসীদের উপর পতিত হয়েছে এবং অস্পষ্টভাবে ও কুজ্ঝটিকার ভেতর দিয়ে হলেও প্রকাশ করেছে যে অনেকগুলি গোত্র এই অধিত্যকায় সমবেত হয়েছিল; নিষ্ঠুর বর্বর স্তর থেকে বর্বরতার স্তরে উন্নীত হয়ে তারা সার্বজনীন আদর্শের তাৎপর্যে সচেতন হচ্ছিল। অদ্যাবধি ভীতি ও বিভীষিকার সঙ্গে যেসব প্রাকৃতিক বস্তু পূজিত হত তার জায়গায় অগণিত আদর্শ স্থান করে নিচ্ছিল। এদের কিছু কিছু আদর্শের সঙ্গে অনেক নৈর্ব্যক্তিক ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহে আরোপিত ব্যক্তিত্ব—আলোক ও অন্ধকার—এই দুটি সার্বিক নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়।

১. ব. শিলগন—এনসিয়েন্ট মনার্কী, পৃ ৯৩।

২. আরব্য শ্রুতি অনুযায়ী ইবরাহিমের পিতা আজর। 'আজর' স্পষ্টতই 'আশুর' শব্দের সঙ্গে একার্থক: মুসলমানদের সাহিত্যে আজরের তৈরী সুন্দর সুন্দর মূর্তির কথা প্রায়ই উল্লিখিত হয়। ইবরাহিম যে আসিরীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন, এসব শ্রুতিপরম্পরা এই বিশ্বাস সপ্রমাণিত করে।

জীবন ও আলোকের উজ্জ্বল অগ্রদূত সূর্য কারুণিক ঐশী সত্তার প্রতীকে পরিণত হয়, যার শক্তি ব্যাহত হলেও পরিশেষে অনিষ্ট ও অন্ধকারের বিরোধী নীতিকে জয় করে। অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর ক্ষেত্রে পূর্বে তারা অন্ধভাবে যেসব বস্তুর পূজা করত তার সঙ্গে এখন যেসব আদর্শের যোগসাধন করছিল তা পরস্পর মিশে যাচ্ছিল—কখনও সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত সত্তা হিসেবে, আবার কখনও সকল বস্তুতে বর্তমান প্রাণসত্তার সমগ্র হিসেবে। ধীরে ধীরে ঘন অন্ধকার অপসৃত হল। আমরা দেখলাম গোত্র ও গোষ্ঠীর গঠনতন্ত্র রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হচ্ছিল, পশুচারণ বৃত্তি ধীর ক্রমগতিতে কৃষিকার্যে রূপলাভ করছিল; আদিম শিল্পকলা কর্ষিত হচ্ছিল, ধাতুর ব্যবহার জায়গা করে নিচ্ছিল—সর্বোপরি সার্বভৌম ব্যক্তিত্বে উচ্চতর ধারণা অদ্যাবধি অনাবৃত মনের উপর জোর করে চেপে বসছিল। কাইউমুর, হোশাং ও অন্যান্য প্রাচীন নৃপতি যাদের সম্পর্কে ফেরদৌসী তাঁর অপূর্ব লেখনীতে গুণকীর্তন করেছেন তারা এক ক্রমবর্ধমান সভ্যতার নমুনা। প্রকৃত আর্যদের মধ্যে যে রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত তা আর্যগোষ্ঠীর দুটি শাখার মধ্যে ধর্মীয় বিরোধের সমকালীন। এই বিরোধ তাদের পূর্ব শাখাকে ব্যাকটরীয় আবাসভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল। পাশ্চাত্য আর্যদের মধ্যে একটা প্রবল ধর্মীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন একজন ধর্মগুরু—তাঁর ধর্মের সংরক্ষিত সাহিত্যে তিনি সিতমা জরথুস্ত্র নামে পরিবিদিত। এই আন্দোলনের পরিণতি হিসেবে যে ধর্মীয় বিরোধ রূপ লাভ করেছিল তা গোষ্ঠী ও ধর্মের দুশমন, বেদের জবরদস্তির প্রতি বৈদিক স্তোত্র গায়কদের পুঞ্জীভূত অভিসম্পাতের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। রূপান্তরিত ধর্মের প্রতি বৈদিক স্তোত্রগায়কদের দৃষ্টিভঙ্গী নামের ক্ষেত্রে শুধু অসাধারণ সমাপতন নয়; এ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রমাণ হাজির করে যে ধর্মীয় পার্থক্য প্রকৃত আর্যদের দু' শাখায় বিভক্ত হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ। এই বিরোধে সম্ভবত মানবজাতির মধ্যে প্রথম ধর্মীয় বিরোধে পাশ্চাত্য দ্বৈতবাদী গোত্রসমূহ তাদের অর্ধ-বহু ঈশ্বরবাদী, অর্ধ-সর্বেশ্বরবাদী ভ্রাতাদেরকে প্যারোপেমিসেডের ওপারে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। প্রাচ্য আর্যগণ ভারতে বলপূর্বক প্রবেশ করেছিল, আদিম কৃষ্ণবর্ণ জাতিসমূহকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, হত্যা করেছিল এবং দাসত্বে আবদ্ধ করেছিল, তাদেরকে নিকৃষ্ট জীব, দাস্য ও শূদ্র—গোলাম ও ভৃত্য হিসেবে মনে করত। বৈদিক ধর্ম ও জরথুস্ত্র ধর্ম নিছক আপেক্ষিক। জরথুস্ত্রবাদ প্রাকৃতিক ঘটনার উপাসনাকে কারণের আরাধনায় রূপান্তরিত করেছিল। এ বেদের দেবদেবীকে দৈত্যদানবে এবং দেবদেবীর উপাসকদেরকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করেছিল। অপরপক্ষে বৈদিক স্তোত্রগায়করা 'আহুরা'কে অনিষ্টের দেবতা ও 'আশুরা'কে দেবতাদের বিরোধী শক্তি বলে অভিহিত করত এবং জবরদস্তির উদ্দেশে অনলবর্ষী অভিসম্পাত স্তূপীকৃত করত। প্রথম জরথুস্ত্রের জন্মকাল ও

জন্মস্থান রহস্যাবৃত। দরিউস হিসটাস্পের রাজত্বকালে অন্য একজন শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি একই নামে প্রাচীন শিক্ষার ভিত্তিকে পুনরুজ্জীবিত, সংহত ও সম্প্রসারিত করেছিলেন।

পূর্বালোচিত ধর্মবিবর্তনের স্তরগুলি পুনরালোচনা করলে দেখতে পাই যে, ভারতে আর্যদের অভিযান কয়েক শতাব্দী ধরে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়েছিল। যে প্রাচীন আর্যধর্ম অভিযানকারীরা তাদের প্রাচীন আবাসভূমি থেকে সঙ্গে এনেছিল তা ছিল পূর্বপুরুষদের আত্মাসমূহের পূজা এবং দৃশ্যমান নৈসর্গিক ঘটনাবলীর মধ্যে প্রতীকৃত প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের অর্চনা। পাঞ্জাবে বসবাসকালে তাদের অধ্যাত্ম ধারণার উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বেদ অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারি যে, এই অধ্যাত্ম অগ্রগতি ক্রমশ অগ্রসর হতে হতে উপনিষদে এসে হিন্দুদের ধর্মীয় ধারণার উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, যা আধ্যাত্মিক কৌতূহলের তীব্রতায় সর্বোচ্চ একেশ্বরবাদে উপনীত হয়। উপনিষদ শুধু খোদার অন্তর্ব্যাপিতাই আলোচনা করেনি, যে ধারণা পরবর্তীকালে ভারতে জড়াত্মক সর্বেশ্বরবাদের জন্ম দিয়েছিল; অধিকন্তু এই শিক্ষাও দিয়েছিল যে, পরমাত্মা সব জীবের সংরক্ষক এবং সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর। মানুষের হৃদয়ে তাঁর অধিষ্ঠান। পরিশেষে তিনি ব্যক্তির আত্মাকে অনন্তের মধ্যে বিলোপ সাধন করেন "যেমন সমুদ্র নদীকে নিজের মধ্যে বিলোপ সাধন করে"। যখন এই বিলুপ্তি সাধিত হয় তখন মানবাত্মা তার পার্থিব কাঠামোতে সকল অভিজ্ঞতার চেতনা হারায়। কিন্তু মানুষের অগ্রগতির এই নথিসমূহে আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের প্রশ্নাতীত বীজ নিহীত রয়েছে যা সত্বর ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াকে উল্টে দিয়েছিল। কাজেই অধিকতর অগ্রগতির পরিবর্তে আমরা ক্রমবর্ধমান অবনতি দেখতে পাই। উপনিষদ পৌরাণিক উপাসনার পথ প্রশস্ত করেছিল, আর পৌরাণিক উপাসনা, তান্ত্রিক উপাসনার শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিল।

যে ধারণাটি উপনিষদে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় তা হল: পরমাত্মা বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ধারণা অবতার সম্পর্কীয় ধারণার জন্ম দিয়েছিল। পাশ্চাত্য পৌত্তলিক জগতের দর্শন যেমন ব্যক্তিগত খোদার ধারণার প্রতি লৌকিক মনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যে ধারণা অনুযায়ী খোদা মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন ও মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেন, উপনিষদের আস্তিক আকাঙ্ক্ষাও তেমনি হৃদয়ের কাছে আবেদন রাখতে সমর্থ হয়নি কিংবা ভারতের জনগণের আবেগকে স্পর্শ করতে পারেনি। যোদ্ধগোষ্ঠীর একজন সদস্যের মধ্যে বীর-দেবতা সত্বর আবিষ্কৃত হল যিনি বহুপূর্ব থেকেই পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং পার্থিব জীবনে অবতার হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

প্রতিপক্ষ 'করালী কালীমাতা'র উপাসনার মতো বৈষ্ণবধর্মের সাধনপদ্ধতির বিবর্তনও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে বিরাজমান ধর্মীয় বিশৃঙ্খলারই নির্দেশক নয়, বরং যেসব দার্শনিক 'উপনিষদসমূহ' ও 'ভাগবত গীতা' রচনা করেছিলেন তাদের মানসিকতার পার্থক্যেরও নির্দেশক। ভাগবত গীতা মানে ধর্মীয় সংগীত।[১] জনসাধারণের চিন্তা ও অনুভূতি থেকেও সে বিষয়ের দৃষ্টান্ত মেলে। এটা যথেষ্ট সুস্পষ্ট যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়বার বহুপূর্বে পাঞ্জাবের আর্য ঔপনিবেশিকগণ বা তাদের পুরোহিত ও ধর্মীয় শিক্ষকগণ এমন সব বিধান প্রণয়ন করেছিলেন যাতে বিজেতা ও বংশধরগণ পূর্বদিকে অগ্রসরমান দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী অভিযানে বিজিত ও দাসত্বে রূপান্তরিত জাতিসমূহের সঙ্গে সংমিশ্রিত না হয়ে পড়ে। এসব নিম্নশ্রেণী ও দাসদের সংস্পর্শে আসা অপবিত্রতার মধ্যে গণ্য ছিল। তিনটি উচ্চবর্ণের লোকদের জন্য যেসব রীতিনীতি প্রচলিত ছিল তা নিম্নবর্ণের লোকদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

সর্বখোদাবাদের ক্ষেত্রে আর্য-হিন্দুদের চিন্তার জোয়ার-ভাটার মধ্যে মৃত পূর্ব-পুরুষদের আত্মাকে দেবতারূপে পূজার বিষয়টি ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় অন্যতম অপরিহার্য অংশ হিসেবে হিন্দু-মননে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। শূদ্রগণ তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে নৈবেদ্য অর্পণ করতে অনুমতি পেত; কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ বড় ধরনের দক্ষিণা ছাড়া এ ধরনের অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করত না। যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণের বেদপাঠ লুকিয়ে শুনত, তবে তার কানে উত্তপ্ত গলিত সীসা ঢেলে দিয়ে সাজা দেওয়া হত। যদি কোন শূদ্র দৈবাৎ ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই আসনে বসত, তবে লৌহ-শলাকা তাতিয়ে তার গায়ে দাগ দেওয়া হত। যদি 'দ্বিজ' শ্রেণী—তিনটি উচ্চবর্ণের লোক এবং শূদ্র শ্রেণীর মধ্যে বৈধ কিংবা অবৈধ মিলন ঘটত, তবে তার জন্য নির্মম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত—সংশ্লিষ্ট লোকদের সমাজচ্যুত করা হত। কোন আইনই তাদেরকে তাদের আদিম বিশ্বাস প্রভাবিত চিন্তা ও রীতিনীতি থেকে বিরত করতে পারত না। কালক্রমে আর্যপূর্ব গোত্র ও বংশ-সমূহের দেবদেবা হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং তাদের উপাসনা ও হিন্দুদের প্রাত্যাহিক উপাসনার অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। অসম বিকাশসম্পন্ন বিচিত্র বিশ্বাস ও পরস্পর বিরোধী প্রবণতাসমূহের সংমিশ্রণের ফলে দার্শনিকগণ যুগ যুগ ধরে যে জটিল ও দুর্বোধ্য সর্বখোদাবাদের উদ্ভবের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে কলুষিত করে তুলেছিল।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ যে রহস্য-যবনিকার অন্তরালে আবৃত ছিল ইসলামের অনুসারীরা তা উন্মোচিত করার পূর্বে তার কোন ইতিহাস ছিল না।

---

১. একজন সমকালীন গ্রন্থক এ মন্তব্য করেন যে ভাগবত গীতা নিঃসন্দেহে খোদাবাদের নির্দেশক; কিন্তু এই খোদাবাদ অন্যান্য ও অ-খোদাবাদ উপাদানের সঙ্গে সংমিশ্রিত।

বাস্থদেব কৃষ্ণ কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন কিংবা তার ব্যক্তিত্ব কেমন ছিল তা অবহিত হওয়া অসম্ভব। এমন সব অগণিত পৌরাণিক কাহিনীর জন্ম দিয়েছিলেন পুরোহিতরা—যাঁরা দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ না হলেও সমকক্ষ হিসেবে বিবেচিত হতেন। আর এসব আখ্যানগুলো উদ্ভট ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে পর্যবসিত হত। অশিক্ষিত জনগণের মনমগজ বিমোহিত ও উদ্দীপিত করে রাখাই এসব অলীক উপাখ্যান রচনার উদ্দেশ্য ছিল। বাস্থদেব কৃষ্ণ হিন্দুধর্ম-ব্যবস্থায় যে স্থান অধিকার করে আছেন তা হল এই যে, তিনি বিষ্ণুর অবতার। তাই তিনি ভাগবত গীতার ভক্তিমূলক অংশে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে পরিগণিত। তিনি স্পষ্টত সংমিশ্র দেবতা। তিনি অন্যতম নরনারায়ণ যিনি আনন্দের প্রতীক—যিনি গোকুলে রাখালদের সঙ্গে বাস করতেন এবং বৃন্দাবনের বিখ্যাত কুঞ্জবনে আনন্দ-সঙ্গিনী গোপীদের নিয়ে রসলীলা করতেন।[১]

বাস্থদেব কৃষ্ণের ধর্মমতে পরম বিশ্বাস মুক্তির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ভক্তের আচরণ যাই হোক না কেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস তাকে চিরন্তন স্বর্গীয় শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে।

এই সনাতন ধর্মমত যে রীতিনীতি ও বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল তা এখনও ভারতে প্রচলিত রয়েছে। যেহেতু ধর্মপ্রাণতা ব্যক্তির আত্মায় মনঃসংযোগ—সে আত্মা শ্রীকৃষ্ণরূপী পরমাত্মার সঙ্গে অভেদাত্মক, কাজেই নিরাভরণ যোগী দার্শনিকদের কৃচ্ছ্রসাধন প্রণালী সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ধর্ম-সাধনা বলে বিবেচিত হয়েছে। মানবদেহের একটি বিশেষ স্থানে দৃষ্টি নবদ্ধ ক'রে এবং মন শ্রীকৃষ্ণের উপর নিবিষ্ট ক'রে নির্জন কাননে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করা, এক পায়ে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকা এবং বঁড়শিবিদ্ধ হয়ে চড়কে দোল খাওয়া ধর্মীয় ক্রিয়া বলে বিবেচিত হয়েছে, যা সকল পাপ স্খালন করে। প্রায়শ্চিত্তকারীর আবাস ও দেবতার মন্দিরের মধ্যে যে দূরত্ব তা কোন ব্যক্তির দেহের দৈর্ঘ্য দিয়েই পরিমাপ করা হত পাপ-স্খালন ও ব্রতপালনের ক্ষেত্রে। নিষ্ঠাসহকারে 'ভাগবত গীতা' পাঠ কিংবা গঙ্গা বা কোন পুণ্যসলিলে অবগাহন প্রত্যেক নরনারীকে নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধ থেকে মুক্ত করত।

'শাক্তধর্ম মতবাদ' আজ হিন্দুজাতির বৃহত্তর অংশের উপর যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে তা কবে অর্জিত হয়েছিল, সে কথা বলা কঠিন। 'শক্তি' প্রত্যেক

শ্রীকৃষ্ণ সাধারণত 'গোপাল কৃষ্ণ'—রাখাল কৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়ে থাকেন ; তার সঙ্গিনীরা 'গোপী' বা গোয়ালিনী নামে খ্যাত। উত্তর ভারতের গোপালন-গোত্র, 'আহীর'দের বীরদেবতাকে কেন্দ্র করে বহু সুন্দর পাখ্যান গড়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকে অনেকটা অসঙ্গতভাবেই হিন্দু জাতির 'এপোলো' বলে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা যে কল্পনা গ্রীক দেবতা এপোলোকে চিত্রিত করা হয়েছে তাঁকে সেভাবে চিত্রিত করা কঠিন।

হিন্দু-ঈশ্বরের 'প্রকৃতি'—সৃজনধর্মী নারী শক্তির দিক। 'শক্তি' শিবের স্ত্রী; তিনি ভয়ঙ্করী দেবী—পার্বতী, ভবানী, কালী, মহাকালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, বিভিন্ন নামে অভিহিত। সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ভবভূতির নাটকে যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, এই দেবীর পূজা নরবলি ও অন্যান্য বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিপালিত হত। যে নামে অভিহিত হন বা যে ভাবে পূজিত হন না কেন 'শিবানী'র মধ্যে দুঃখিনী মাতৃত্বের কোন ভাব নেই; আলেকজান্দ্রিয়ার উপাসকগণ বহু নামবিশিষ্ট 'আইসিস্' দেবীর সঙ্গে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি যে করুণা বা সহানুভূতি আরোপ করত তা শিবানীর মধ্যে নেই। ক্ষীয়মাণ ধর্মীয় মনের এই বিস্ময়-উৎপাদনকারী (ভয়ানক নয়) ধারণা স্পষ্টত আর্য-পূর্ব বংশ সমূহের কাছ থেকে ধার করা হয়েছে। এই আর্য-পূর্ব বংশগুলো মানুষের শোণিতপাতে আনন্দবোধ করত এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় উল্লাস অনুভব করত। পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মমতসমূহের মধ্যে এমন নির্মমতার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল কিংবা নেই বললেই চলে। এমন কি রোমানদের মহাদেবী 'সিবেলী' ও সংহারিণী কালীমাতার মতো এত নির্মম নন কিংবা যন্ত্রণা প্রদানে এত অধিক আনন্দও উপভোগ করেন না। 'শাক্তধর্মে'র নিয়মপ্রণালী 'তন্ত্র', যাকে এই ধর্মের বাইবেল বলা যেতে পারে তার আচার ও নিয়মানুসারে এই দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 'তন্ত্রে'র অনেক স্তোত্র ভক্তিরসে আপ্লুত এবং দেবীর উদ্দেশে রচিত প্রার্থনাসমূহও অনেক সময় তার করুণার প্রতি নিবেদিত। দার্শনিকদের জন্য 'তন্ত্রে'র মরমী অর্থ যাই থাকুক না কেন, সাধারণ মানুষ কিন্তু এই উপাসনা পদ্ধতিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করেছে।[১]

দু'টি প্রধান মহাকাব্য, যার একটির বিষয়বস্তু পাণ্ডব ও কৌরবের যুদ্ধ এবং অপরটির বিষয়বস্তু লঙ্কার রাজা কর্তৃক সীতা-হরণ—এ থেকে আমরা তখনকার

তান্ত্রিকদের মধ্যে দু'টি প্রধান শ্রেণী রয়েছে—'দক্ষিণাচারী ও বামাচারী'—দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী তন্ত্র-উপাসক। দক্ষিণপন্থী তান্ত্রিকদের উপাসনা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, এবং বিষ্ণুর 'শক্তি'—'লক্ষ্মী' বা 'মঙ্গললক্ষ্মী'র উদ্দেশে নিবেদিত। পক্ষান্তরে বামপন্থী তান্ত্রিকদের উপাসনা 'তান্ত্রিকা' নামে পরিচিত এবং একমাত্র উপাস্য 'কালী'। এই উপাসনা গোপনীয়, এবং অবিশুদ্ধ আচারের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই ধর্মমতের অনুসারীদের সংখ্যা ভারতে বিপুল এবং তারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। 'দুর্গাপূজা'র উৎসব সাধারণত আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এই পূজায় দুর্গা-প্রতিমা একটি সিংহাসনের উপর স্থাপিত হয়। উত্তর ভারতে এই মূর্তিকে হলুদ বর্ণে রঞ্জিত করা হয়, কিন্তু বাঙলায় এই মূর্তি চারখানা হস্তবিশিষ্ট এবং ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে সমাসীন এবং কালো বর্ণে রঞ্জিত। কালীঘাটের (যা থেকে কলকাতার নামকরণ করা হয়েছে) মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালী প্রতিমায় নরমুণ্ড স্কন্ধদেশে শোভিত দেখা যায়। জয়পুরের মন্দিরের কালী-প্রতিমা দেবীর মস্তক পিছনদিকে ঘোরানো: লোক-মুখে প্রচলিত আছে যে এই দেবীর যখন নরবলির পরিবর্তে পাঠাবলি দেওয়া হয়েছিল তখন দেবী ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যসহকারে তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন।

জনসাধারণের ধর্মমত সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক ধারণায় পৌছতে পারি। দু'টি মহাকাব্যেই এমন একটি বিকাশপ্রাপ্ত সমাজের চিত্র পাওয়া যায় যেখানে প্রভূত পার্থিব উন্নতির সঙ্গে বিপুল নৈতিক অবক্ষয়ের নিদর্শন মেলে। কাজেই বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতমের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভারতের জনগণের ধর্মীয় উপাসনা উৎসর্গ ও আহুতির যান্ত্রিক কার্যক্রমে পরিণত হয়—পুরোহিতদের পরিচালনা ব্যতীত এই উপাসনা অনুষ্ঠিত হতে পারত না আর এই উপাসনা—কার্যক্রমে উপাসনাকারীর আচরণ বা ধর্মভীরুতার পরিবর্তে উপাসনা—পরিচালকের হৃদয়স্পর্শী ভাষায় ইষ্ট-দেবতা-তুষ্টকারী ধর্মীয় আচার পালনের শক্তিই ধর্মীয় উপাসনার উৎকর্ষের মাপকাঠি ছিল। গৌতম ও মহাবীরের বিদ্রোহ স্বার্থপর যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে হিন্দু-মননের স্বাভাবিক অভ্যুত্থান। এই দুই মহাপুরুষ বিশ্বজগতের নিয়ন্তা হিসেবে কোন সৃজনধর্মী নীতি ও সর্বদর্শী প্রজ্ঞাকে স্বীকার করেননি, তাঁরা ব্যক্তি-জীবনের চূড়ান্ত বিলুপ্তির উপর জোর দিয়েছেন—উভয়েই মানবজীবনের শান্তিপূর্ণ পরি-সমাপ্তির জন্য কর্মফলের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে জৈনধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং বর্তমানে তা বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদের এক উপগোষ্ঠী, পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম সাহসিকতার সঙ্গে একটি নতুন পথের উদ্ভাবন করেছিল। বৌদ্ধধর্ম মোক্ষলাভের পরিকল্পনায় 'কর্ম'কে সর্বোচ্চস্থান দিয়েছিল এবং এই ধর্মের মহান শিক্ষক বুদ্ধদেব তদীয় জীবনে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এই ধর্মে মৃত্যুর পর মানবজীবনের শেষ পরিণতির ধারণা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মমতবাদসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত; এই ধর্মের রহস্যময় মরমীবাদ সত্বর অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে গৌরবময় অস্তিত্ব লাভের পর স্বীয় জন্মভূমিতে বৌদ্ধধর্ম নিয়তির শিকার হয়েছিল; এবং বিজয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদ যে নিগ্রহ ও দুর্ভোগ এ ধর্মের ভাগ্যে চাপিয়ে দিয়েছিল তা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগাত্রে খোদিত আছে। যাহোক, একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই ধর্মের আদিম পরিকল্পনায় হিন্দুধর্ম তার অনুসারীদের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তা ছিল না। এই ধর্ম কখনও গঠনমূলক ধর্ম হিসেবে দাবী করত না; এবং এর 'পুরস্কার' ও 'নিয়ন্ত্রণ' সমূহ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে শান্তিময় অবস্থানের প্রতিজ্ঞা, এই জীবনে কর্তব্যপালনের ব্যর্থতার শাস্তি ইত্যাদি এতই অস্পষ্ট ছিল যে, তা জনসাধারণের হৃদয় উদ্দীপিত করতে পারেনি। ফলে সত্বর এই ধর্মকে বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতার মনোভঙ্গী কিংবা যে ধর্মকে স্থানচ্যুত করার জন্য চেষ্টা নিবদ্ধ হয়েছিল তার সঙ্গে একটা আপোষমীমাংসার মনোভাব বর্জন করতে হয়েছিল। আর অনতিকালের মধ্যেই বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মে পুণ্য কর্মের জন্য অপেশাদার অনুসারীদেরকে প্রার্থনা-চক্র উদ্ভাবিত করতে হয়েছিল—এই ধর্মের অনুর্বর প্রয়াসকে তন্ত্রবাদের দ্বারা পরিপূর্ণতা দান করতে হয়েছিল। স্বীয় জন্ম-ভূমিতে

সর্বাপেক্ষা অনুকূল পরিস্থিতিতে এর ব্যর্থতা উদ্দীপনাময় ধর্মমত হিসেবে এর ভাগ্যকে চিরতরে শিলমোহর মেরে দিয়েছিল। যদিও কতিপয় মরমীয় দিক থেকে এই ধর্ম পশ্চিম এসিয়া ও মিশরের দার্শনিকদের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের নির্বাসনের পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় প্রভুত্ব অধিকার করেছিল। যখন বুদ্ধদেবের ধর্মমত এদেশে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তখন যে অস্পষ্টতার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কাল অতিবাহিত করছিল তার আধ্যাত্মিক ধারণা-সমূহের মধ্যে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি, এবং বুদ্ধদেব যে জীবনহীন বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নরনারীর জীবন পুনঃ প্রবর্তিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের অধীনস্থ হল এবং পূর্বের চেয়ে ঘনিষ্ঠতরভাবে বলি-প্রথার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এই যজ্ঞীয় ধর্মমত নরনারীর ইন্দ্রিয়ের কাছে অধিকতর আবেদন সৃষ্টি করেছিল—এই আবেদন ছিল সম্ভবত তাদের আবেগের নিকট, তাদের আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির নিকট নয়। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় উপাসনা কতকগুলো অর্থহীন প্রাত্যহিক আচারে পর্যবসিত হয়েছিল। তাদের "উপাসনার প্রধান বস্তু ছিল পুরোহিত, পিতৃপুরুষের আত্মাসমূহ এবং বিগ্রহের জন্য বৈদিক দেবতাগণ"। আদিম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে বস্তু-পূজাকে দার্শনিক হিন্দুধর্ম কিংবা ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম কখনও ভারত উপমহাদেশ থেকে উৎপাটিত করতে পারেনি। এখন তা সকল শ্রেণীর অন্তর্জীবনে শিকড় গেড়ে বসল; বংশদেবতা, গৃহদেবতা ও প্রাচীন দেবদেবীদের প্রতীক প্রতিমাসমূহের সঙ্গে বৃক্ষ, প্রস্তর ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু জনগণের উপাস্য দেবতায় পর্যবসিত হল। মনুর সংহিতার জন্য হিন্দুধর্ম সঙ্গতভাবেই গর্ব অনুভব করে, এবং যা পরবর্তী শতাব্দীসমূহে অন্যান্য পূর্বাঞ্চলের জাতিসমূহের আইন-সংক্রান্ত মতবাদসমূহের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল তা এমন একটি সমাজের আইনব্যবস্থার প্রতিবেদন, যে সমাজে পার্থিব সভ্যতায় প্রভূত অগ্রগতির সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং জনগণের বিস্ময়কর নৈতিক অধঃপতন বিজড়িত। এ সময়ে পুরোহিতের মতো রাজাও দেবত্বে পর্যবসিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে, যখন মনুর সংহিতা সশ্রদ্ধ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং চূড়ান্ত মীমাংসা হিসেবে বিবেচিত হত, তখন "ধেয়ানী শিক্ষক", যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষ্য মনুর সংহিতার স্থান দখল করেছিল। মনুর মতো তাঁর মতেও বর্ণাশ্রম ছিল লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ এবং শূদ্ররা পূর্বের মতো অপবিত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীন আরবদের মতো ভারতেও নারী-শিশু হত্যা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ প্রথা কখন প্রথম প্রচলিত হয়েছিল তার কোন ঐতিহাসিক নথি নেই, তবে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। মৃত্যু যতই ভয়ানক হোক না কেন

তা বিধবার নিকট অভিনন্দনযোগ্য মুক্তি হিসেবে সমাদৃত হত, কেননা বিধবা যদি সন্তানের জননী না হত তবে তার দুর্দশার সীমা থাকত না।

নারীজাতিকে বেদ-অধ্যয়ন কিংবা পূর্বপুরুষের আত্মাসমূহের উদ্দেশে বা দেবদেবীদের উদ্দেশে আয়োজিত নৈবেদ্য-অনুষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত বা বঞ্চিত করা হত। স্বামী-সেবাই ছিল স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম আর এই কর্তব্য পালনের নিষ্ঠার উপরই তার চিরন্তন শান্তি নির্ভর করত। যে সাধ্বী-স্ত্রী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতেন তিনি হিন্দুধর্মের অনুসারীদের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ সতীর আসনে অধিষ্ঠিত হতেন ও প্রায়ই উপাসনার বিষয়বস্তুতে পর্যবসিত হতেন।

ধর্মের এই বালসুলভ আচারের মধ্যে চিন্তাশীল মন খুঁজে পেয়েছিল এক গভীরতর অর্থ; ধর্মের যে অনুষ্ঠানের কথা চিন্তাবিদগণ প্রচার করতেন তার অনেক উর্ধ্বে উঠে যেত তাদের আত্মা, একজন দার্শনিক কিংবা পুরোহিত সাধারণত একটি শিশুর চেয়ে অধিক পরিমাণে অসহায়, বিধবার নির্মম বলির দৃশ্যটিকে বিভীষিকার সঙ্গে অবলোকন করতেন না। ধর্মীয় সংঘ সাধারণত গড়ে উঠত নরনারীর সমন্বয়ে—তারা সবসময়ে যে কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য বিশিষ্ট ছিলেন এমন নয়। বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকগণ কর্তৃক অগণিত সন্যাস-আশ্রম গড়ে উঠেছিল। তারা নিয়মিতভাবে আশ্রমে সমবেত হতেন যেখানে মহিলাগণও সাধারণ সদস্য হিসেবে প্রবেশাধিকার পেতেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু-ভ্রাতৃসংঘের মতো এইসব আশ্রমের লোকদের মধ্যেও স্বীকৃত কৌমার্য ছিল নামমাত্র, বাস্তব নয়, এই কৌমার্য পালনের চেয়ে লঙ্ঘনেই সম্মান মিলত অধিক। অসংখ্য ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা মন্দির ও মঠে আরাম-আয়াসে দিনযাপন করতেন। মধ্যযুগের মঠবাসী ভিক্ষু ও ফ্লেভীয় যুগের অমার্জিত সংসারবিবাগীদের মতো অন্যান্যরা ধার্মিক ব্যক্তিদের দান থেকে পুরস্কারলাভের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতেন। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বদান্যতার কাছে তাদের একমাত্র সুপারিশের বস্তু ছিল জটধারণ, অকর্তিত দাড়ি, গৈরিক বসন, ভস্মমাখা নগ্ন দেহ এবং ভিক্ষুদের লাউ ও অন্যান্য সামগ্রী।

দেবতারা সংগীত ও নৃত্য ভালবাসতেন, তাই বহু সংখ্যক নর্তকী বালিকা মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। তারা কোনভাবেই সন্ন্যাসিনী ছিল না, তাদের সেবা ধর্মশালার ব্যবস্থাপকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। আদি হিন্দু-আইনব্যবস্থায় নারীজাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং মনুর নারীজাতিকে চরম প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি একমাত্র খ্রীষ্টান সেন্ট টারটুলিয়ানের ধর্মোন্মত্ত ঘোষণার সঙ্গেই তুলিত হতে পারে। মনু বলেন, "নারীজাতির রয়েছে অপবিত্র ক্ষুধা; তারা দুর্বল নমনীয়তা ও মন্দ আচরণের অধিকারিণী। দিবারাত্র তাদেরকে অধীন করে রাখতে হবে।"

শূদ্র সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি প্রায় রোমান প্যাণ্ডেক্টের ভাষায় ঘোষণা

করেছিলেন যে স্রষ্টা তাদের দাস করে সৃষ্টি করেছেন এবং এই সম্প্রদায়ভুক্ত কোন লোককে তার প্রভু মুক্তি দিলেও সে স্বাধীন হতে পারে না ; কেননা দাসত্ব তার স্বভাবদত্ত, কে তাকে তা থেকে মুক্ত করতে পারে ?

যখন ইসলামের নবী বিশ্বমানবের কাছে তাঁর পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন তখন আর্যজাতির সর্বাপেক্ষা মেধাবিশিষ্ট একটি অংশের জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সংক্ষেপে ছিল এরূপ।

এবার আমরা পারস্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। এই দেশটি ইসলামের জন্মভূমির সন্নিকটবর্তী এবং মুসলমানদের চিন্তাধারার উপর এই দেশ এত অধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল যে তা আমাদের আন্তরিক পর্যালোচনার দাবী রাখে। যদিও আমরা ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টানধর্মকে এই দেশ তার চরিত্রগত স্বকীয় চিন্তাধারা কতখানি প্রভাবিত করেছিল সে-কথা নাও বলি।

একটি জাতিতে সংহত হয়ে ও নূতন আধ্যাত্মিক বিকাশ সহকারে পশ্চিমের আর্যগণ অনতিবিলম্বে তাদের জন্মভূমির সীমা অতিক্রম করে আধুনিক পারস্য ও আফ-গানিস্থানের ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। মনে হয়, তারা সেখানকার অধিবাসী হেমিটিক ও কুশাইট বংশসমূহের অধিকাংশকে বিজিত বা পর্যুদস্ত করেছিল এবং ক্রমশ কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে উপনীত হয়েছিল সেখানে তারা একগুঁয়ে ও কষ্টসহিষ্ণু তুরাণীদের মিডিয়া ও সুসিয়ানায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছিল। পূর্বে যদিও তারা তুরাণীদের পরাভূত ও নিয়ন্ত্রণাধীন করতে সমর্থ হয়েছিল, তথাপি তারা কুশাইট কিংবা অ্যাসিরায়, সম্ভবত অ্যাসিরীয় বংশের একজন অভিযানকারীর শাসনাধীন হয়ে পড়ে এবং বেশ কিছুকাল তার ইস্পাত-কঠিন শাসনে কালাতিপাত করে।[১] আগন্তুকদের বিতাড়নের পর শুরু হল ইরাণ ও তুরাণের মধ্যে বিরোধ যা শতাব্দী ধরে উভয়পক্ষের পরিবর্তিত ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল এবং মেডিয়া ও সুসিয়ানায় তুরানীয়দের আংশিক পরাভবের মধ্য দিয়ে তা শেষ হয়েছিল।[২] আফ্রাসিয়াব ও কায়কাউসের অনুসারীদের কার্যক্ষেত্র ও দরবারে নিয়মিত যাতায়াত পারসিক ধর্মমতের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। তুরাণীদের চরম জড়বাদ তাদের বিরোধী ও প্রতিবেশী ইরাণীদের অদ্যাবধি অবিকশিত ভাববাদকে কলঙ্কিত করতে ছাড়েনি। ইরাণীগণ যখন মিডিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের উপর তাদের ভাবধারা চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল তখন তারা তুরাণীদের উপাসনা পদ্ধতির কিছু কিছু নিজেদের উপাসনা পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

১. পারস্যের ঐতিহ্য অনুসারে জাহাক হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে ইরান শাসন করেছিলেন এবং অ্যাসিরীয় শাসনকাল সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য কিছু সংখ্যক পণ্ডিত এটা অনুমান করেন। এই মতানুসারে ফরিদুনের অভ্যুত্থান নিনেভার পতন সমকালীন।

২. লিনোরম্যাণ্ট, অ্যানসিয়াণ্ট হিস্ট্রী অব দি ইস্ট, পৃ. ৫৪।

এইভাবে পারস্যে একমাত্র অরমুজদের উপাসনা হত এবং আহরিমান নির্বাসিত হয়েছিল, মিডিয়ায় সুনীতি ও কুনীতি উভয়ের অর্চনা অনুষ্ঠিত হত। স্বাভাবিক-ভাবেই তুররাণীগণ বিজেতা আর্যদের দেবতার চেয়ে তাদের প্রাচীন জাতীয় দেবতার উপাসনার প্রতি অধিকতর আগ্রহী ছিল। আর জনসাধারণের উপাসনার ক্ষেত্রে আহরিমান বা আফ্রাসিয়াব অরমুজদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল।

অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য মিডিয় ও ব্যাবিলনের অধিবাসীদের রাজনৈতিক আঁতাতের সম্মুখীন হয়েছিল এবং এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে এই প্রথম। আর্য-অধিকৃত অনেক এলাকায় আসুরের ধর্মের সুদীর্ঘ প্রভুত্ব জরথুস্ত্র-অনুসারীদের ধারণাসমূহের উপর অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। স্বর্গীয় সমন্বয়-সাধনের জটিল ব্যবস্থা ও ঐশীতন্ত্র সম্পর্কে অ্যাসিরীয়দের মধ্যে প্রচলিত ধারণা জরথুস্ত্রবাদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছিল। এই সময় থেকে অরমুজদ দ্বিতীয় আসুর হিসেবে পূজিত হতে লাগলেন; পারসিকদের আলোকের দেবতা—সর্বকল্যাণের শক্তির প্রতীক হল বিশ্ব-চক্রের মধ্যে আবদ্ধ পক্ষবিশিষ্ট যোদ্ধা, যার সঙ্গে ধনুক ও হস্ত উত্তোলিত। তাদের বিকাশের প্রতীক—দীপাধারের মতো ডালপালাবিশিষ্ট বৃক্ষ ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়ে দেবদারু বৃক্ষের মোচাকৃতি ফলে এসে শেষ হয়েছে—এই প্রতীক পারসিক ফারগাছের মোচাকৃতি ফলে রূপান্তরিত হয়েছিল। ফারিস্তানে সাইরাসের অভ্যুত্থান ও তার সুপ্রতিষ্ঠিত বিজয় অভিযানসমূহের পূর্বে আদিম প্রবাসী ও বসবাস-স্থাপনাকারীদের মধ্যে প্রচলিত প্রতীকধর্মী উপাসনা জনসাধারণের মধ্যে এসে অগ্নিপূজায় অবনমিত হয়েছিল কিংবা চ্যালডীয় অ্যাসিরীয় সাবাইজমে রূপ লাভ করেছিল।

আসুর শহর প্রায় এক হাজার বছর ধরে ভারতের প্রান্ত পর্যন্ত মধ্য এসিয়া শাসন করেছিল এবং ফেরাউন সম্রাটদের থেকে বলপূর্বক মিশর সাম্রাজ্য অধিকার করেছিল—শক্তিশালী সার্গন ও বৃহৎ সেনাচেরিবের শহর ব্যাবিলন ও মিডের[১] সম্মিলিত বাহিনীর কাছে এমন ভাবে পরাভূত হয়েছিল যে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। ব্যাবিলন নিনেভার সঙ্গে প্রাথমিক বিরোধের পর অ্যাসিরিয়ার আশ্রিত রাজ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। ইহা আবার এসিয়ার সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এক হাজার বছর ধরে বিকাশপ্রাপ্ত শিল্পকলা ও বিজ্ঞান এবং "সংমিশ্রিত জাতি ও ধর্মসমূহ, মন্দির ও পুরোহিত তন্ত্রে"র পরিণতি একত্রিত করেছিল এবং প্রাচীন-কালের অজৈব ধর্মসমূহ ও আধুনিক বিশ্বাস সমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। আদি অ্যাক্কা-ডিয়ানদের সভ্যতা ও সাহিত্যসহ তাদের ধর্মের অনেক কিছুই অ্যাসিরিয়া ধার করেছিল। নিনেভার ধ্বংসাবশেষের উপর ব্যাবিলন আড়ম্বরপূর্ণ ঐশ্বর্যে উন্নীত

---

১. ৬০৬ খ্রীষ্ট-পূর্ব।

হয়েছিল এবং অ্যাসিরীয় ও চ্যাল্ডীয় ধর্মমতের সার গ্রহণ করেছিল। নেবুচাঁদ-নেজ্জারের অধীনে ব্যাবিলনের সাম্রাজ্য ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেছিল; জুডিয়ার পতন ঘটল এবং জিহোভার সাম্রাজ্যের পতনকে ব্যাবিলনের অশ্রু-বিসর্জনের মাধ্যমে অভিষিক্ত করার জন্য জাতির কুসুমকে বন্দীত্বে আনয়ন করেছিল। শক্তিশালী বিজেতা আরবে অভিযান চালিয়েছিল এবং ইসমাইলীয়দেরকে পরাভূত ও প্রায় ধ্বংস করেছিল। সে তাইরিয়ানদের পর্যুদস্ত করেছিল এবং মিশরের ফেরাউনের শক্তি ধ্বংস করেছিল। হিব্রু প্রেমিকগণ কর্তৃক অভিশাপ স্তূপীকৃত করা সত্ত্বেও ব্যাবিলন মিশরের মতো অত কঠিন তত্ত্বাবধায়ক ছিল না।[১] স্বয়ং ইসরাইলীরা ব্যাবিলিনীয়দের আচরণের উদারতা সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করছে। যতদিন না যিশুখ্রীষ্ট তাঁর শক্তিশালী অতিথি-সেবকদের নিয়ে বিধ্বস্ত শহর জয়ের জন্য সমীপবর্তী হয়েছিলেন তার পূর্বে ইসরাইল সন্তানগণ ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ তোলেনি। অতঃপর অভিশাপের ঝড়—দুর্দশার ভবিষ্যদ্বাণীর তুফান ফেটে পড়ল—এর ভেতর দিয়ে প্রদর্শিত হল প্রাচীন নির্মমতার মধ্য দিয়ে জাতির বৈশিষ্ট্য। "ব্যাবিলনের নদীসমূহের তীরে আমরা বসতাম, হা, আমরা যখন জিউনকে স্মরণ করতাম তখন অশ্রু বিসর্জন করতাম, ওহে ব্যাবিলনের কন্যা, যে তোমার ছোট ছোট সন্তানদেরকে পাথরে আছড়ে মারে সে সুখী হবে।"[২]

নেবুচাঁদনেজ্জারের অধীনে ব্যাবিলন সমুদয় অস্তিত্বশীল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এই দেশের পুরোহিতদের প্রভাব শুধু সাম্রাজ্যের কাজেই নিঃশেষ হয়নি। ব্যাবিলনীয় ধারণাসমূহের বৈশিষ্ট্য ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মীয় ব্যবস্থার অভ্রান্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। চ্যাল্ডীয় পুরোহিতদের মধ্যে ইহুদীদের দীর্ঘ নির্বাসন, হিব্রু ভাষাভাষীর কেউ কেউ ব্যাবিলনের রাজদরবারে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং দুটি জাতির অবশ্যম্ভাবী সংমিশ্রণ পরবর্তী ইহুদী ধর্মের নব চরিত্র-রূপায়ণের দিকে শক্তি জুগিয়েছিল। অর্ধ-সভ্য জাতিরূপে ইহুদীরা ব্যাবিলনে এসেছিল; নির্বাসিত দেশে দীর্ঘকাল নবিশি করবার পর যখন তারা জেরুজালেমের পার্বত্য এলাকায় ফিরে গিয়েছিল তখন তারা ধর্ম ও মতবাদের দিক দিয়ে অগ্রসর একটি নূতন জাতি। তখন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল ব্যাপক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

ব্যাবিলন-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ধর্মীয় বিকাশের নববর্ষ। এই সময় থেকে দ্বৈতবাদের ধর্ম এশিয়ার সাম্রাজ্যকে অধিকার করে। যে মহৎ সহনশীলতা সাইরাস ইহুদীদের প্রতি দেখিয়েছিলেন তা স্বাভাবিকভাবে তাকে 'মসিহ' বা পবিত্র ত্রাণকর্তার মর্যাদায় উন্নীত করেছিল। হিব্রু-গোত্র সমূহের বন্দীদশা, পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর কাছাকাছি তাদের বাধ্যতামূলক বসবাস এবং সাইরাসের

---

১. জেট ৪৯, ২৭—২৯। ২. সমি. ১৩৭।

অধীনে পারসিকদের সঙ্গে তাদের পরবর্তী সংমিশ্রণ দরিউসের হিসটাসাপিসের রাজত্বকালে জরথুস্ত্র-অনুসারীদের মধ্যে যে ধর্মীয় সংস্কার সাধিত হয়েছিল সম্ভবত তাতে অনুপ্রেরণা জা গিয়ে ছিল। এখানে পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। ইসরাইলীগণ উজ্জীবিত জরথুস্ত্রবাদকে এক ঐশীসত্তার সর্বপ্লাবী ক্ষমতার গভীর ও স্থায়ী ধারণার সাহায্যে প্রভাবিত করেছিল। তারা ইরাণীদের নিকট থেকে আকাশ সম্পর্কীয় পারম্পর্য ও সৃষ্টিতে ভাল ও মন্দের দ্বৈতনীতি সম্পর্কীয় ধারণা লাভ করেছিল। এই সময় থেকে তাদের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয় যে, স্রষ্টা অনিষ্টকারীদের রসনার মধ্যে মিথ্যাভাষী শক্তি প্রেরণ করেন না; আহরিমানের মতো শয়তান হিব্রুদের ধর্ম ও নৈতিকতার ইতিহাসে এই সময় থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে।

সাইরাসের রাজত্বকাল যুদ্ধজয়ের দ্বারা চিহ্নিত, গঠনমূলক কাজের দ্বারা আদৌ বিশিষ্ট নয়। দরিউসের রাজত্বকাল সংহতির দ্বারা চিহ্নিত; অরমুজদের কঠোর উপাসক হিসেবে তিনি তার সব বিজয় অরমুজদের কৃপা বলে মনে করতেন। তিনি জরথুস্ত্রের ধর্মমতকে সর্ববিধ বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত করা, মিডিয়দের মাজীবাদের সুরক্ষিত দুর্গ ধ্বংস করা এবং আর্য-অধ্যুষিত পারস্যকে সভ্য-জগতের নিয়ামক শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। যাহোক, কিছুই অবক্ষয়ের প্রক্রিয়াকে রোধ করতে পারেনি। শতবর্ষ পার হতে না হতেই জরথুস্ত্রবাদ শৈশবে যেসব অনিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল সেগুলি পুরামাত্রায় অধিগত করে নিয়েছিল। পৌত্তলিকতার কশাঘাতকারী, আপোষহীন প্রতিমা-ভঙ্গকারীগণ তাদের অগ্নিময় উদ্দীপনায় মিশরীয় এপিসে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল এবং তার ধর্মমন্দির ধ্বংস করেছিল। অতঃপর তারা অরমুজদের উপাসনার মধ্যে তাদের অধীনস্থ রাজাসমূহের দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। পুরাতন মাজীবাদী উপাদান-পূজা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল-এবং দরিউসের অব্যবহিত অন্যতম সহগামী আর্টাজারজেস মিনিমন জরথুস্ত্র অনুসারীদের মধ্যে মিশ্র-নারীপুরুষধর্মী মিথ্যা উপাসনা—চ্যান্ডীয় মাইলিটা বা অ্যানাইটিসের পারসিক পরিপূরক, যার সহগামী লিঙ্গপূজা। এই মিথ্যা ধর্মমতের সুন্দর সূর্যদেবতার আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনায় রূপান্তর ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়। ফাটলবিশিষ্ট পর্বতের উপরে সমুজ্জ্বল সূর্য উঠছে, ষাঁড়কে তাড়া করছে তার বিবরে এবং মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে তার রক্ত —এই ধারণা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্মের উপর অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই মিথ্যা উপাসনাকে রোমান সেনাদল ইউফ্রেটিসের উপত্যকা থেকে ইউরোপের সুদূর প্রান্তে বহন করে নিয়েছিল এবং ডায়োক্লিশিয়ানের রাজত্বকালে তা রোমের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পর্যবসিত হয়েছিল।

মাজো-জরথুস্ত্র অনুসারীদের শাসনাধীনে নারীজাতির অবস্থা যতদূর খারাপ

ছিল—তারা যতদূর পরাধীনতার লৌহ-নিগড়ে বাঁধা ছিল—পুরুষজাতির যতটা খেয়ালখুশীর দাসত্বে পরিণত হয়েছিল ততটা কখনও কোথাও হতে দেখা যায়নি। মনু-সংহিতায় সতীত্বের কতকগুলো নিয়ম প্রবর্তন করেছিল এবং আদিম অসমবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি, মানব প্রবৃত্তির উপর দমনমূলক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারসিকগণ স্বেচ্ছাচার ব্যতীত কোন আইনের স্বীকৃতি দেয়নি। একজন পারসিক তার অত্যন্ত নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করতে পারত এবং তার খেয়ালখুশী অনুসারে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত। নারীর অবরোধ ব্যবস্থা শুধু পারসিক জাতির মধ্যেই সীমিত ছিল না। আয়োনিয়ার গ্রীকদের মধ্যে নারীদেরকে নির্জন প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হত, প্রায়ই তালাচাবি দিয়ে ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হত এবং কখনও সাধারণ্যে বের হতে দেওয়া হত না। কিন্তু গ্রীক অবরোধ প্রথা অনেক পরে মনুষ্যত্বের অঙ্গচ্ছেদন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পারস্যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নপুংসকদের দিয়ে মহিলাদের প্রহরা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রীসদেশে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের যৌন মিলন একটি স্বীকৃত সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়েছিল এবং সমাজের ভিত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। পারসিকরা কিন্তু জাতীয় উপাসনার সঙ্গে লাম্পট্যকে সংযুক্ত হতে দেয়নি। তারা প্রেমের দেবতার পূজা করত না, জরথুস্ত্র অনুসারীদের সমাজেও এ ধরনের "নৈতিক মহামারী"[১] কবলিত ছিল না, যে নিকৃষ্টতম দুষ্কৃতি বা পাপ গ্রীসে ছিল সার্বজনীন—যা পরবর্তীকালে রোমে বিস্তার লাভ করেছিল এবং যা খ্রীষ্টধর্মও উপড়ে ফেলতে পারেনি।

অ্যাকেমেনীয় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের ক্রমবিকাশের সঞ্চালক শক্তি হিসেবে জরথুস্ত্রের অনুসারীদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। বিজেতাদের দল ঘূর্ণি হাওয়ার মতো পারস্যের উপর দিয়ে দলন ক্রিয়া চালিয়ে গিয়েছিল এবং সর্ববিধ সামাজিক ও নৈতিক জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল। ম্যাসিডনীয় অভি-জেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল বিচিত্র বাহিনী, লেসার এশিয়ার সব নীচ-শ্রেণী, সিলিসীয়, টায়ারীয়, প্যামফিলীয়, ফ্রাইজীয় এবং অর্ধ-গ্রীক ও অর্ধ-এসীয় আরও অনেক জাতি, যারা কোন নৈতিক নিয়ম পালন করত না, অভিজেতার অবিবেচক ও স্বেচ্ছাচারী মেজাজ—সব মিলে জরথুস্ত্র ধর্মকে নিম্নস্তরে টেনে নামিয়ে-ছিল। জাতীয় জীবনের প্রতিনিধিত্বকারী, মোবেডদেরকে বিদেশীদের নিষেধাজ্ঞার অধীনে রাখা হয়েছিল, এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এসিয়াকে হেলেনীয় কৃষ্টি-দ্বারা প্রভাবিত করা।

আলেকজাণ্ডারের জীবন প্রবাহ ছিল উল্কার মতো ক্ষণস্থায়ী। যেসব অলীক কাহিনী তাঁর জীবনকে পরিবেষ্টন করে মহাকাব্যের সৃষ্টি করেছে তা ছেঁটে

ডলিঞ্জার, 'দি জেনটাইল এণ্ড দি জু', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

ফেললে তিনি এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হন, যিনি বিশাল ধারণা ও প্রভুত্বব্যঞ্জক উদ্দেশ্য, হিমাদ্রির মতো সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষার অধিকারী ; যিনি প্রতিভাবলে সব প্রতিবন্ধকতা চুরমার করে দিয়েছিলেন এবং যিনি ব্যক্তিত্বের বলে চার পাশের সকলের মননকে নিজের মতে আনয়ন করতে সমর্থ ছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল স্ব-বিরোধী। এ্যরিস্টটলের অন্যতম শিষ্য আলেকজাণ্ডার বিশ্ববাসীর সম্মানের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে চেয়েছিলেন সমগ্র এসিয়াকে হেলেনীয় কৃষ্টিদ্বারা প্রভাবান্বিত করতে। দার্শনিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহী চরিত্রের আতিশয্য তার জীবনকে হীনবল করেছে। আলেকজাণ্ডারের একজন ক্ষমাপ্রার্থী ও প্রশংসাকারী বলেন, "টায়ার অধিকার ও তাব অধিবাসীদের দাসত্বে পরিণত করা, ভারত ও ব্যাক্‌টিরিয়ায় ধ্বংস ও নিধন, ক্লাইটাসের গণহত্যা, ফিলোটাস ও বিশ্বাসী পারমেনিয়োর মৃত্যু-পরোয়ানা, পারসি-পোলিসে অগ্নিসংযোগ ও একজন দেহোপজীবিনীর প্ররোচনায় সেখানকার জমকাল গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য ঐতিহাসিকগণ দোষক্ষালনের কোন অজুহাত খুঁজে পান না।" আলেকজাণ্ডারের বিজয় ও অ্যাকেমেনীয় বংশের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে জরথুস্ত্রবাদ হেলেনীয় মতবাদ ও চ্যাল্ডীয় সভ্যতার দুষ্টতম প্রথার কাছে নতি স্বীকার করেছিল। বহু অলীক কাহিনীর নায়কের ব্যাবিলনের প্রতি চরম পক্ষপাতিত্ব, এই নগরীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও একে অধিকতর শক্তিশালী ও পূর্ণতর সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্বেগ ও ইচ্ছা সর্ববিধ ধর্মমত ও বিশ্বাস এবং সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন যা তাঁর বৃহৎ অভিলাষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল তা তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে বাধ্য করেছিল। সেলুসিডার অধীনে নাগরিক অধিকার-হরণের প্রক্রিয়া দ্রুত চলতে লাগল। জিহোভার উপাসকদের নির্মম পীড়নকারী এন্টিওকাম এপিফেন্‌ম তাদের ও জরথুস্ত্র-অনুসারীদের নিকট থেকে অলোভনীয় আহরিমান খেতাব লাভ করেছিলেন। এমন কি পার্থিয়ান শক্তির অভ্যুত্থান জরথুস্ত্রবাদের অবনতি ও ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল। সেলুসিডা টাইগ্রিস ও অরোণ্টাস অঞ্চল শাসন করছিল ; পার্থিয়ান-গণ অ্যাকেমেনীয় সাম্রাজ্যের মধ্যাংশে তাদের রাজত্ব কায়েম করেছিল ; গ্রীকো-ব্যাক্‌টিরীয় বংশ পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ব্যাক্‌টিরিয়া ও আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চল তাদের শাসনাধীনে রেখেছিল। সেলুসিডার রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল চ্যাল্ডীয় ও হেলেনীয়বাদের সংমিশ্রণ। ইহুদী ও জরথুস্ত্র-অনুসারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হত এবং তাদেরকে সমাজচ্যুত করা হত। পার্থিয়ান শাসনাধীনে মাজদীবাদ যদিও বাস্তবে নিশ্চিহ্ন হয়নি তথাপি শাসকদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে বাধ্য হত। যেসব অঞ্চলে জরথুস্ত্রবাদ নির্বিবাদে ও প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় বিরাজমান ছিল সেখানে তা মিডিয় ও চ্যাল্ডীয়দের প্রাচীন সেবীবাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল ; কিংবা যেখানে এই

মতবাদ তার আদিম বিশুদ্ধতায় সঞ্জীবিত ছিল সেখানে তা কতিপয় পুরোহিতের হৃদয়ের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। এইসব পুরোহিত দেশের দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু পার্থিয়া সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে এবং পার্থিয়ান নৃপতিগণ রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করবার পর অত্যাচার সহনশীলতার স্থান দখল করেছিল এবং বিশ্বের ধর্মসমূহের মধ্যে মাজো-জরথুস্ত্রবাদ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আর সাসানীয় রাজবংশের অভ্যুত্থান তাকে শক্তির আরেক জাদুমন্ত্রে মোহাবিষ্ট করেছিল; নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোবেডদেরকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে সমাসীন করেছিল। হায়, একটি মরণোন্মুখ ধর্মবিশ্বাসের শেষ বিষণ্ণ প্রতিনিধিগণ! সাসানীয় রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি পুনরুজ্জীবিত ধর্মের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের চারপাশে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আরদেশির বাবেকান (আর্টাজারজেস)-এর সমুজ্জ্বল অভিলাষ কতখানি কার্যকর হয়েছিল তা ইতিহাসের ব্যাপার। পারস্যের রাজনৈতিক স্বাধীনতা—তার জাতীয় জীবন পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু তার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন এত বেশী অধঃপতিত হয়েছিল যে তা পুনরুজ্জীবিত করা শাসকদের শক্তির অতীত ছিল। প্রাচীনকালে শিক্ষাসমূহ সম্ভবত পুস্তকেই সীমিত ছিল, সেগুলি জনগণের হৃদয়ে বিগতকালের গাশটাস্প বা রুস্তমের মতো প্রাণহীন অবস্থায় বিরাজিত ছিল।

সাসানীয় রাজবংশের শাসনাধীনে জরথুস্ত্র-অনুসারীগণ তাদের ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে তারা এসিয়ার সাম্রাজ্যের জন্য রোমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিল। বারংবার তারা রোমের সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল, তার নগরীসমূহ লুঠ করেছিল, তার সেনাধ্যক্ষদের বন্দী ক'রে নিয়ে এসেছিল এবং তার প্রজাদের সঞ্চিত সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল, কিন্তু নৈতিক শক্তি হিসেবে জরথুস্ত্রবাদের অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল। মন্দিরসমূহের উচ্চবেদী-সমূহে তা শুধু প্রজ্বলিত হত, জাতির হৃদয়ে তার কোন উত্তাপ ছিল না। প্রকৃত খোদার উপাসনার স্থান দখল করেছিল চ্যাল্ডীয়ো-মাজিয়ান ধর্মমত। আর্দেশির ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ যে প্রবল অসহিষ্ণুতার সঙ্গে প্রতিপক্ষ ধর্মমতের উপর জুলুম করেছিল তাতে তারা উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়নি। পরবর্তী সাসানীয় নৃপতিদের অধীনে পারস্য সাম্রাজ্য বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত কিন্তু তা শুধু বিভিন্ন গোত্রকলহ ও বাদশাহদের স্বেচ্ছাচারিতা, আভিজাত্যের অধো-গতি ও পুরোহিততন্ত্রের দাম্ভিকতার জন্য সম্ভব হয়নি। নৃপতিগণ ছিলেন দেবতা; প্রজাদের জীবন ও সম্পদের উপর ছিল তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব—প্রজাদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না—তারা প্রকৃতপক্ষে দাসে পরিণত হয়েছিল। নীতিভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছেছিল যখন মাজদাক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাম্যবাদ বা কমিউনিজম প্রচার করেছিলেন যার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপ এখন বিশেষভাবে পরিচিত, এবং "আদেশ

দিয়েছিলেন সকল মানুষকে ঐশ্বর্য ও নারীর সহচর হতে, ঠিক যেমন অগ্নি, জল ও তৃণের মধ্যে সম্পর্কে বিদ্যমান ; ব্যক্তিগত মালিকানা টিকৃতে পারবে না ; পৃথিবীর ভাল ও মন্দ সবকিছুই সে ভোগ করবে বা সহ্য করবে।"[১] ভগিনী ও অন্যান্য রক্তের সম্পর্কযুক্ত নারীদের সঙ্গে বিবাহের আইনগত বৈধতা মাজো-জরথুস্ত্রবাদে পূর্বেই স্বীকৃত হয়েছিল। এই চরম সাম্যবাদের ঘোষণা পারসিকদের মধ্যে উত্তম চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও প্রতিবাদমুখর করেছিল। জরথুস্ত্রের উত্তরাধিকারী হিসেবে স্ব-কথিত মাজদাককে হত্যা করা হয়েছিল ; কিন্তু তার মতবাদসমূহ শিকড় গেড়ে বসেছিল এবং পারস্য থেকে পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

এই সমুদয় অনিষ্ট নৈতিক জীবনের সর্বাত্মক অধঃপতনের পূর্বসূচনা করেছিল এবং নিজ পাপাচারে জাতির দ্রুত বিলুপ্তির পূর্বাভাষ দিয়েছিল। যদিও কেস্‌রা আনুশিরওয়ানের ব্যক্তিগত চরিত্রের ফলে কিছুকালের জন্য এই নিয়তি বিলম্বিত হয়েছিল, তথাপি তাঁর মৃত্যুতে তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিশ্বের একজন শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটছে যিনি বিশ্বের সর্বাত্মক পরিবর্তন সাধনের জন্য নির্ধারিত।

ইহুদীগণ ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে নিষ্কৃতি লাভের পর এগার শতাব্দী অতি-বাহিত হয়েছে ; তারা তাদের ভাগ্যের অনেক সুদিন দুর্দিন প্রত্যক্ষ করেছেন। যে সকল বিপদসমূহ একের পর এক মূসার অধঃপতিত জাতির উপর আপতিত হয়েছে তা টিটাস ও হাড্রিয়ানের যুদ্ধসমূহে পর্যবসিত হয়েছে। প্রাচীন রোম তাদের মন্দির ধ্বংস করেছে এবং অগ্নিসংযোগে ও রক্তের বন্যায় একটি জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করেছে। খ্রীষ্ট ধর্মাধ্যুষিত কনস্তান্তিনোপল সমান নির্মম আক্রোশে তাদেরকে নিগৃহীত করেছে, কিন্তু অতীতের দুর্দশা ও দুর্গতি থেকে তারা ভবিষ্যতের কোন শিক্ষাগ্রহণ করেনি। নির্মম নির্যাতনকারীদের হাতে নিষ্পেষিত হয়েও তারা মানবতা ও শান্তির মূল্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়নি। মিশর, সাইপ্রাস ও সিরিনের শহরগুলোতে তারা যে বর্বর নির্মমতার পরিচয় দিয়েছিল, সেখানে তারা বিশ্বস্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার নজির দেখিয়েছিল তা তাদের ভাবী দুর্ভাগ্যজনক নিয়তির জন্য কারও মনে বিন্দুমাত্র করুণার সঞ্চার করে নি। ইসরাইলদের আবাসভূমির সম্পূর্ণ ভরাডুবি হয়েছিল ; তারা পৃথিবীর বুকে পলাতক-এর ন্যায় সর্বত্র আশ্রয় সন্ধান করে ফিরেছে, কিন্তু সবখানে তারা তাদের অদম্য অহঙ্কার ও হৃদয়ের বিদ্রোহী অনমনীয়তা বহন করে চলেছে, অগণিত প্রেরিতপুরুষদের প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা করেছে। প্রবাসে নিরাপদ আশ্রয়ে ইহুদীরা তাদের অতীত অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি করেছে। এই জাতি আশায় বুক বেঁধে পথ চলেছে, কিন্তু সে

---

১. মোহসিনী ফানী—'দাবিস্তানে মাযাহিব': শেখ মুহম্মদ ইকবালকৃত 'ডেভালাপমেণ্ট অব মেটাফিজিকস ইন্ পারসিয়া', পৃ. ১৮, দেখুন।

আশা একদিকে শক্ত আপোষহীন ধর্মান্ধতা ও অন্যদিকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগেচ্ছার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। যিশুর আগমন ও তিরোভাব তাদের উপর কোন আপাত-দৃষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। যুগের সন্তান হিসেবে তিনি উদ্দীপিত হয়েছিলেন ত্রাণকারীর ধারণার দ্বারা, যা তাঁর যুগে সঞ্চরণশীল ছিল। জাতির এক চরম ক্লেশকর শ্রম-সাধনাকালে প্রণীত জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবেদক ড্যানিয়েলের গ্রন্থ যন্ত্রণা-পীড়িত জাতির জন্য শোকাভিভূত শিক্ষকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারেনি। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী চরম গোঁড়া মনোভাবাপন্ন অধিবাসীদের প্রবল অসহিষ্ণুতা, ইহুদীদের নিষ্প্রাণ আচারনিষ্ঠা, ফ্যারিসী সম্প্রদায়ের উদীমন উদারনীতি, এসেনি গোষ্ঠীর স্বপ্নিল আশাবাদ যা একদিকে আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যদিকে বৌদ্ধ-ভারতের দিকে বিস্তৃত ছিল, ভ্রমণশীল দরবেশের প্রচার ও প্রকাশ্য দোষারোপ যার জীবন হিরোডিয়ান কোর্টের নৈতিক অধঃপতনের কাছে বলি স্বরূপ—এসব যিশুর হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ঈগল চঞ্চু ইহুদীদের হৃদয় দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিল এবং তার প্রাবল্য আকস্মিক পরিবর্তনের সব আশা বানচাল করে দিয়েছিল। যিশুর বৈরাগ্য এবং খোদার সাক্ষাৎ কর্তৃত্বের মাধ্যমে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার একাগ্র প্রত্যাশা তাঁর যুগের ফলশ্রুতি। এক উন্মত্ত ও দুর্বিনীত ধর্মান্ধ জাতির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের বাণীবাহক হিসেবে যিশু প্রেরিত হয়েছিলেন। এক দাম্ভিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতির মধ্যে তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের পথ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর সাক্ষাৎ অনুসারীদের প্রতি ছিলেন দয়ার্দ্র ও কোমলহৃদয়, তিনি সকলের প্রতি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ—তিনি রেখে গিয়েছিলেন এক সুউচ্চ আত্মত্যাগী মহামানবের আদর্শ। শক্তিমান, সম্পদশালী ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে তিনি বিদ্বেষ, ভীতি ও বিরোধ উদ্দীপিত করেছিলেন; অবজ্ঞাত, মূর্খ ও অত্যাচারিত দরিদ্রদের মধ্যে তিনি একজন সুমহান অনুকম্পাপ্রবণ জগৎ-গুরুর কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের আবেগ জাগরিত করেছিলেন। এক সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে তিনি ধর্মান্ধ ইহুদীদের শক্তিশালী আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করেছিলেন সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের আশা নিয়ে; কিন্তু একপক্ষকাল অতিবাহিত না হতেই তাঁকে তাঁর কালের কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থের বেদীমূলে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল।

তাঁর মহাজীবনকে কেন্দ্র করে যেসব আখ্যান রচিত হয়েছে তা থেকে অন্ততঃ এতটুকু সুস্পষ্ট, তিনি জন্মেছিলেন দরিদ্রদের মধ্যে, আর তাদের মধ্যেই তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন; তিনি হিব্রুদের ধর্মমত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন; তাঁর স্বল্পকালের নবুয়্যত গ্রাম্য এলাকার সরল সহজ অধিবাসী—গ্যালিলির দারিদ্র্যপীড়িত কৃষককুল ও মৎস্যজীবীদের প্রতি বহুলাংশে নিয়োজিত হয়েছিল। তাঁর শিষ্যগণ দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোক ছিলেন। তাদের বিশ্বাসপ্রবণতা এবং শিক্ষাগুরুর অন্তিম অন্তর্ধান যা তাদের মনের উপর সুস্পষ্ট—অলৌকিক নয়—এমন যে কল্পনা বিস্তার

করেছিল তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই মনে করতেন না। যতদিন না পল তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন, যিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণের দৃশ্য, তার পূর্বে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে খোদা বা ফিরেশতার অবতারতত্ত্ব প্রবেশ লাভ করেনি। যাজকতন্ত্রের একজন ঐতিহাসিক বলেন, "পবিত্র আত্মার ধারণা প্রবেশের" অঙ্গীকার সম্বলিত থাকা সত্ত্বেও এটা অপরিহার্য বলে প্রতীত হয়েছিল যে অধীত কলাসমূহে এমন পারদর্শী ব্যক্তি থাকবেন যিনি সুসমাচারের সংরক্ষক হবেন, যিনি স্বীয় দক্ষতার বলে ইহুদী পণ্ডিত ও প্রাচীন বিধর্মী দার্শনিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। এই উদ্দেশ্যে যিশু নিজেই, স্বর্গলোক থেকে অলৌকিক বাণী সহযোগে তাঁর ধর্মের সেবায় ত্রয়োদশতম ধর্মপ্রচারক নিয়োগ করেন, যার নাম সল (পরে পল বলে কথিত), এবং যিনি ইহুদী ও গ্রীক বিদ্যা সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।"[১]

মাজো-জরথুস্ত্রবাদীগণ এমন একজন দেবদূত ত্রাণকর্তা, স্রুশ-এর প্রতি বিশ্বাস করতেন যাঁর পূর্বদেশ থেকে আবির্ভূত হওয়ার কথা ছিল ; বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করতেন কুমারীর গর্ভজাত ঈশ্বর-অবতারে, আলেকজান্দ্রিয়ার মরমীবাদীরা পবিত্রাত্মা এবং মানুষ ও খোদার মধ্যবর্তী সত্তার প্রচার করতেন। ওসিরিসের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কীয় গুহ্য ধারণা, আইসিস-সিরিসের ধারণা—কুমারীমাতা "তাঁর হস্তে সদ্যোজাত সূর্যদেবতা হোরাসকে ধারণ করে আছেন"[২]—মিশর ও সিরিয়া উভয় দেশে এই ধারণাসমূহ প্রচলিত ছিল। ফ্যারিসি ও পণ্ডিত পল তাঁর কালের অর্ধ-মরমী ও অর্ধ-দার্শনিক মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্ট্রম্ বলেছেন যে স্বভাবগতভাবে পল একজন স্বপ্নবিলাসী ও গভীরভাবে আগ্রহশীল ছিলেন এবং দৈহিকব্যাধি থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন না ; তিনি কখনও যিশুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেননি, এবং তিনি যিশুর প্রতি সহজে ঐশী অবতারত্ব—ফিরেশতা অবতারত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তিনি যিশুর সহজ শিক্ষার মধ্যে প্রজ্ঞাবিষয়ক মতবাদ এবং দূর পূর্বদেশ থেকে অনুকৃত ত্রিত্ববাদের ধারণাসমূহ নব্য-পিথাগোরীয় মতবাদের অধিকাংশ প্রহেলিকাময় নীতিসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন।

স্বদেশে ও বিদেশে, ইহুদী ও ইহুদী-বিরোধী দলের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষ দু'জন ধর্ম-প্রচারক পিটার ও পলের[৩] সুবিদিত অথচ অদ্ভুত বিতৃষ্ণার মধ্যে পরিদৃষ্ট। এবিওনিটগণ সম্ভবত নাজারাথের প্রেরিত পুরুষের আসল সহচরদের ধর্মবিশ্বাসসমূহের প্রতিবেদন করত। তিনি তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আলাপ আলোচনা

১. মোশেম, 'একলেসিয়াসটিক্যাল হিস্ট্রি', ২য় খণ্ড, পৃ ৬৩।

২. তুঃ মি.অর্নস্ট ডি. বুনসেনের প্রবন্ধ : 'মুহম্মদ'স প্লেস ইন দি চার্চ', এশিয়াটিক কোয়াটারলি রিভিউ, এপ্রিল, ১৮৮৯।

৩. মিলনার, 'হিস্ট্রি অব্ দি চার্চ অব্ ক্রাইষ্ট' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭।

করতেন এবং "বৌদ্ধিক ও জৈবিক জীবনের সব ক্রিয়াই" তাদের নিকট একই ধরনের বলে মনে হত। তারা তাঁকে শৈশব থেকে কৈশোরে এবং কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করতে দেখেছেন—অবয়ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকশিত হতে দেখেছেন। তাদের বিশ্বাস তাঁকে তারা একজন মানুষ হিসেবে দেখেছেন এই মৌলিক বিশ্বাস থেকে ধারণার অধঃপতন ঘটেছে বিভিন্ন মধ্যবর্তী পর্যায়ে—ডোসেট, মারশেসিট, পেট্রিপেশিয়েন[১] এবং ৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে নাইসের কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অন্যান্য মতগোষ্ঠীর প্রভাবে—এসব মত নিরবচ্ছিন্ন এক অধঃপতন-শৃঙ্খল সৃষ্টি করেছিল। সকল শ্রেণীর লোকদের পক্ষে, বিশেষ করে পয়গাম্বরকে যারা দেখেননি, তাঁর বিনয়, তাঁর দৈনন্দিন জীবন প্রত্যক্ষ করেননি এমন লোকদের পক্ষে বিনা প্রশ্নে তাঁর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসপ্রবণ হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

যখন যিশু তাঁর ধর্মমত প্রচার শুরু করেছিলেন তখন ইউরোপের অর্ধেকের বেশী, উত্তর আফ্রিকার প্রায় সমগ্র এবং পশ্চিম এসিয়ার এক বৃহত্তর অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে এই বিশাল এলাকা দৈবক্রমে খ্রীষ্টধর্মের শস্যক্ষেত্র এবং বিরোধী গোত্রসমূহের সমরক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।

ফ্রাইজীয় সীবিল[২] রোমে আনীত হওয়ার ঠিক এক শতাব্দী পূর্বে আলেকজাণ্ডারের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান ও সম্ভবত সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেনাধ্যক্ষ টলেমি সটার মিশরের প্রভু হয়ে বসলেন। একটি সাধারণ ধর্মের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ক'রে মিশরী ও গ্রীকদের একটি সমন্বিত জাতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে তিনি এমন একটি উপাসনা-ব্যবস্থার প্রচলন করেন যার অনুশীলনের মাধ্যমে দুইটি জাতি হাত ধরাধরি ক'রে চলে। একই ধারণা সম্রাট আকবরের মনে উদিত হয়েছিল দুই হাজার বছর পরে; যেখানে মহান আকবর ব্যর্থ হয়েছিলেন, সেখানে টলেমি সফল হয়েছিলেন। কারণ অবস্থা তাঁর অনুকূলে ছিল। গ্রীকরা জিউস, ডিমিটার এবং এপোলো বা ডায়োনিসাসের উপাসনা করত; আর মিশরীরা উপাসনা করত ওসেরিস, আইসিস ও হোরাসের; উভয়ের ক্ষেত্রে ত্রিত্ববাদ ছিল সাধারণ যোগসূত্র। মিশরীধর্ম পুত্র হোরাসের প্রবৃত্তি ও পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত, আর গ্রীকধর্ম ডায়ানোসিসের প্রবত্তি ও পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। যাবতীয় দীক্ষা ও যোগমূলক মরমী আচারব্যবস্থায় গ্রীকরা ইলিউসিয়ান রহস্যবাদ গ্রহণ করেছিল,

[১] ডোসেটগণ যিশুকে নির্ভেজাল খোদা হিসেবে বিশ্বাস করত। "খোদার পুত্র যিশুখ্রীষ্ট একটি দেহের ছায়ায় আবরিত থাকলেও এবং মরণশীল মানুষের দৃষ্টিতে অনুরূপ প্রতীত হলেও" মারশেনিটগণ যিশুকে "প্রায় খোদার সদৃশ" সত্তা হিসেবে বিবেচনা করত। পেট্রিপেশিয়েনগণ বিশ্বাস করত যে ক্রুশে পিতা খোদা পুত্র খোদার সঙ্গে নিগ্রহ ভোগ করেছেন। মোশেস এণ্ড গিবন, প্রাগুক্ত; নিয়েণ্ডার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০, ৩০১ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে।

[২] সিবিলের উপাসনা বিখ্যাত হিন্দু দেবী দুর্গা বা কালী-ধর্মমতের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যে যুক্ত।

আর মিশরীয় পুরোহিতগণ আইসিসের অনুরূপ তাৎপর্যপূর্ণ আচার পালন করত। তাদের কারও কাছেই এটা বড় ব্যাপার ছিল না যে দেবতাগণ কি নামে বা কোন্ ধর্মীয় পদ্ধতিতে পূজিত হচ্ছেন। যতক্ষণ প্রধান ধারণাগত কোনরূপ গরমিল দেখা দিত না, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নামের প্রতি উদাসীন থাকত। এইভাবেই মহান ফ্রানসিস্কান ধর্মমতের উদ্ভব ঘটেছিল। সিরাপিস, গ্রীকদের মধ্যে জিউসের স্থান এবং মিশরীদের মধ্যে ওসেরিসের স্থান দখল করেছিলেন। আইসিস আলেকজান্দ্রিয়ান ধর্মমতের অনুসারাদের "দুঃখিনী মাতা" হয়েছিলেন এবং ডিমিটারকে স্থানচ্যুত করেছিলেন হোরাস হেপোক্রেট্স ডায়োনিসাসের প্রতি অদ্যাবধি নিবেদিত ভক্তি ও পূজা গ্রাস করেছিলেন। এই দেবতা এসিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তার প্রভাব হারান নি বলে মনে হয়। একজন দেবতা মানুষের মধ্যে বাস করেছিলেন, ক্লেশ ভোগ করেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন—এই প্রচলিত ধারণা পরবর্তী শতাব্দীসমূহে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তারকে সহজ করে তুলেছিল।

যার মহিমা তার সঙ্গীর ব্যক্তিত্বকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল সেই আইসিসের উপাসনা, কথিত আছে যে, যিশুখ্রীষ্টের জন্মের আশি বছর পূর্বে রোমে আনীত হয়েছিল। ইহা অনতিবিলম্বে জনসাধারণ ও কৃষক জনতার কল্পনাকে অধিকার করেছিল। এর আড়ম্বরপূর্ণ আচার, মস্তকের উপরিভাগ ও দাড়িমুণ্ডিত পুরোহিত, শ্বেতবস্ত্রপরিহিত তরুণ ক্ষুদ্রদীপবহনকারী পুরোহিতের সহকারী, আবেগ জাগরিত করে এমন আয়োজনের অভাবশূন্য ভাবগম্ভীর মিছিল, ওসেরিস-হোরাস ক্লেশভোগ ও মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ শোক প্রকাশ, তার পুনরুজ্জীবনে উন্মাদের মতো আনন্দ প্রকাশ, মরমী তাৎপর্যসহ রহস্য, দীক্ষা. সর্বোপরি অবিনশ্বরতার প্রতিজ্ঞা—সব মিলে এমন একটি জগতের প্রতি তীব্রভাবে আবেদনশীল হয়েছিল, যার প্রাচীন দেবতাগণ ছিলেন মূক এবং যে জগৎ বিশ্বের শাশ্বত সমস্যার কাছাকাছি আসার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। আইসিস রোমকদের হৃদয়ে শক্তিশালী আসন গেড়ে বসেছিলেন, এতে বিস্ময় অনুভব করার কিছুই নেই।[১]

যদিও ভাগ্যহীনদের উপর মায়ের মধুর স্নেহবর্ষণকারী, আইসিসের উপাসনা কখনও তার অনুসারীদের উপর প্রতিপত্তিহীন হয়ে পড়েনি, তথাপি মিথ্রার অধিকতর বীর্যবান ধর্মমত তার মরমী আচার, প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ, মানবতাসহ তার দেবতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের উপর সবিশেষ গুরুত্ব, প্রদানসহ মনোহর সূর্যদেবতা রোমানসৈনিকদের মধ্যে অনুকূল আসন লাভ করেছিলেন। যেখানে রোমক সৈনিকেরা ছাউনি গেড়েছে, সেখানেই তারা তাদের উপাস্য দেবতার স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছে।

স্বীয় পতাকাতলে সমবেত করা ও সমগ্র মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার যে

১. ডিলের "রোমান সোসাইটি ফ্রম নিরো টু মার্কাস অবেলিয়াস", ৫ম অধ্যায়; লেগির "ফোররানার্স এণ্ড রাইভাল্স অব্ ক্রিশ্চিয়ানিটি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭।

সর্বোত্তম ও নিরঙ্কুশ দাবী খ্রীষ্টধর্ম উপস্থাপিত করেছে সে সম্পর্কে যথার্থ মুল্যায়ন করতে হলে কনস্ট্যানটাইনের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের কারণ-সমূহ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। যিশুর দ্বিতীয়বার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে "খোদার রাজত্বে"র পত্তন, যখন দীনদরিদ্র লোকেরা উন্নীত হবে এবং স্বর্গীয় সুখ-শান্তির অনুভূতিতে দীনহীন বিত্তশালীর স্থান অধিকার করবে—এই আশ্বাসবাক্য অবনত লোকদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল। যিশুখ্রীষ্টের সাক্ষাৎ শিষ্য ও অনুসারীদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা স্বভাবত প্রতিবেশী জাতিসমূহকে পরিজ্ঞাত করানো হয়েছিল, এবং ধর্মপ্রচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এসব জীবন্ত বিশ্বাসসমূহ সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। যে ধর্মমত অসাম্যের দূরীকরণ ও অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে ধর্মমত জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছিল। যিশুর দ্বিতীয় আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে—এই বিশ্বাস জনগণের মধ্যে এত শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, যদিও এই প্রতিশ্রুতি তাঁর প্রাথমিক শিষ্যদের জীবদ্দশায় সংঘটিত হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যুগের পর যুগ অতিবাহিত হওয়ায় এই সম্ভাবনা অস্পষ্টতর হওয়া সত্ত্বেও যে প্রত্যাশা ও আশ্বাস এই প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছিল, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের পতনের পূর্ব পর্যন্ত তার শক্তি হ্রাস হয়নি। প্রথমে দুঃখ-দুর্দশার পরে সফলতার এক হাজার বছর পরে খ্রীষ্টধর্মের যোদ্ধারা অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতদের ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়েছিল এই বিশ্বাসে যে, প্রভু যিশুর আগমন সন্নিকটবর্তী।

এছাড়া অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য কারণ ছিল, যা পয়গম্বরের মৃত্যু কিংবা প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টান, এবং মুসলমানদের বিশ্বাস অনুসারে তাঁর অন্তর্ধানের পর খ্রীষ্টধর্মের বিস্তারে সাহায্য করেছিল।

পূর্বেই মন্তব্য করা হয়েছে যে, ইহুদী ছাড়া এসিয়া মাইনর, সিরিয়া ও ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের জাতিসমূহের মধ্যে ঈশ্বর মৃত্যুবরণ ক'রে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন এবং ঈশ্বরের ত্রিত্বের ধারণা ছিল সার্বজনীন। সেরাপিয়ান ধর্মমতের এ একটি অপরিহার্য অংশ এবং আইসিসের উপাসনা বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে রোমান জগতের প্রত্যেকটি অংশে ত্রিত্ববাদ প্রবেশ লাভ করেছিল। যিশু-পরবর্তী খ্রীষ্টধর্মের প্রধান মতবাদসমূহ গ্রহণের আবেগ বা ধর্মীয় পূর্বানুরাগের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি।

একই সময়ে দার্শনিকগণ নিজেদের অজ্ঞাতে ও খ্রীষ্টধর্মকে সহায়তা করার কোন অভিপ্রায় ছাড়া, এমন কি তার প্রধান মৌল নীতিসমূহের জ্ঞান ব্যাতিরেকেই এই ধর্মের অগ্রগতির কারণ হয়েছিলেন। খোদার স্বরূপ ও মৃত্যু-পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের অনুধ্যান আইসিস ও মিথ্রার রহস্যাবলী সম্পর্কে অনেক প্যাগান চিন্তাবিদ্‌দের বিশ্বাস এবং প্রাচীন ধর্মমতসমূহের আচার-অনুষ্ঠানে আস্থা মূলোচ্ছেদ করেছিল।

এতদসত্ত্বেও আলেকজান্দ্রিয়ার দেবদেবীসমূহ ও সূর্যদেবতার প্রভাব কৃষকশ্রেণীর অন্তরে সুদৃঢ় ছিল, তারা নূতন ধর্মমতের বৈপ্লবিক মতবাদসমূহ সন্দেহের চোখে দেখত ; ফলে প্রায় তিন শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই সীমিত ছিল। যতদিন পর্যন্ত খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায় তাদের ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের প্রধান ও চিত্তাকর্ষক প্রতিপক্ষের অনেক মতবাদ অধিকাংশ আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি সংমিশ্রিত করেনি, ততদিন পর্যন্ত কৃষ্টিবান লোকদের মধ্যে এই ধর্মের কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ধর্মীয় উৎপীড়ন বা রাজকীয় চাপ প্রয়োগের ফলে যখন এই রূপান্তরসমূহ আরম্ভ হয়েছিল, তখন নবাগত দল এমন সব উপাদান এই ধর্মের মধ্যে নিয়ে এসেছিল যা আধুনিক খ্রীষ্টধর্মকে অগণিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছিল।[১] শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে স্থায়ী প্রবল নিপীড়ন এই ধর্মের প্রাথমিক বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মমত ও মতবাদসমূহের কিছুটা ঐক্য কার্যকরী করেছিল।

জনসাধারণের মধ্যে আইসিস-উপাসনা কুমারী মেরীমাতার উপাসনায় রূপান্তরিত হয়েছিল ; যিশুর মাতা মেরী মিশরীয় দেবীর পরিবর্তে "শান্তির আশ্রয়স্থল" ও "করুণার বেদী"তে পরিণত হয়েছিলেন। এখনও লাতিন ভাষাভাষী জাতিসমূহের মধ্যে যেমন পূজিত হচ্ছেন তেমনি তখন থেকে তিনি 'জিউসের মাতা' হয়ে পূজিত হয়ে আসছিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মমতসমূহের অনুসারীদের মধ্যে কৃচ্ছ্রতা ছিল একটি সমাদৃত অনুষ্ঠান ; পিথাগোরীয় ও আফ্রিকগণ তার অনুশীলন করত, তারা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার পুরোহিতদের নিকট থেকে এ বিষয়ে প্রভূত উদ্দীপনা লাভ করেছিলেন। এই অঞ্চলে এটা ছিল সাধারণ রেওয়াজ। খ্রীষ্টান ধর্ম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য এই অনুষ্ঠানটি পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিল। দীক্ষাদাতা জন কর্তৃক সহজ তন্ময়তার শিক্ষা থেকে শুরু করে আইসিস ধর্মমতের অধীনে দীক্ষা মরমী ও কঠিন আচারে পরিণত হয়েছিল। পারস্পরিক কথোপকথন দীক্ষার স্থান দখল করেছিল ; এমন কি সুরার শোকার্ত দেবতার শোণিতে রূপান্তর হওয়া সম্পর্কে আইসিসের রহস্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মমতগুলি খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। মস্তক ও দাড়িমুণ্ডিত অনুজ্জ্বল পোশাক পরিহিত পুরোহিত, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত তাদের তরুণ সাহায্যকারী খ্রীষ্টধর্মের "উপবাস ও ধর্মোৎসবের সময়ে ভাবগম্ভীর" জমকাল আচার-অনুষ্ঠান যার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন যুগের দৃশ্য প্রতিবিম্বিত তা জোর করে আমাদেরকে প্রাচীন ধর্মমত-সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ; খ্রীষ্টধর্ম যেসব ধর্মকে স্থানচ্যুত করেছিল সেগুলি আমাদের সম্মুখে জাকজমক আড়ম্বর নিয়ে দেখা দেয়। চার্চের ধর্মসংগীতের মধ্যে আবার আমরা শুনতে পাই হাজার হাজার শ্বেতবস্ত্র পরিহিত বালক-বালিকাদের কণ্ঠে (পাশ্চাত্ত্য প্যাগান জগতের দুঃখিনী মাতা) আলেকজান্দ্রিয়ার দেবীর উদ্দেশে

১. ডিলের "রোমান সোসাইটি ফ্রম নিরো টু মার্কাস অরেলিয়াস", ৫ম অধ্যায়।

নিবেদিত সুন্দর সুন্দর হৃদয়স্পর্শী স্তবগান। সেণ্ট পিটার বা সেণ্ট পল থেকে পশ্চাদমুখে সিরাপিয়ামে উত্তরণ করতে আমাদের সামান্য কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় মাত্র।

যিশুর প্রধান শিষ্যগণ কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম এসব ঋণকৃত ও আগন্তুক প্রশংসাপত্র বা অনুমোদন ছাড়াও সেইসব লোকের সশ্রদ্ধ প্রশংসার সুস্পষ্ট ও নিরপেক্ষ দাবীদার ছিল। যারা আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার ফলে একটি আশ্রয়স্থলের জন্য আধা-অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল যেখানে উচ্চনীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একই আসনে সমাসীন হতে পারে। তার উচ্চতর পর্যায়ে তা মানবজাতির উচ্চতর প্রবৃত্তির প্রতি আবেদন সৃষ্টি করেছিল, আইসীক বা মিথ্রাইক ধর্মমতের চেয়ে অধিকতর গায়ের জোরে না হলেও নিশ্চিতভাবে অধিকতর আশ্বাস সহকারে। পরজীবন সম্পর্কে এর প্রতিশ্রুতি অপেক্ষাকৃত কম রহস্যাবৃত; এর মতবাদসমূহ দার্শনিকদের বিমূর্ত অনুধ্যানের চেয়ে অধিকতর সদর্থক ও বাস্তবধর্মী। এ নিপীড়িত জনগণের নিকট স্বস্তি ও সান্ত্বনা বহন করে এনেছিল এবং মানবজাতির মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার প্রদান করেছিল —যা এখনও পরিপূর্ণতা পায়নি, এবং এই নিশ্চয়তাও দিয়েছিল যে এই মতবাদ যারা গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে ধনী দরিদ্র সকলেই ভবিষ্যতে মুক্তি লাভ করবে। প্রায়শ পার্থিব শক্তির সহায়তায় প্রচারকদের নির্বিচারবাদ জিজ্ঞাসু মনকে নিস্তব্ধ করে দিত; তবে যারা প্রাচীনতর ধর্মমতের মরমীবাদ থেকে বিরত থাকত কিংবা প্রকৃতি-পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুপ্ত অশ্লীলতা থেকে পলায়ন করত, আর এ জগৎ শুধু বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ—এই নিশ্চয়তার জন্য যারা লালায়িত ছিল, তাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করত। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য পৌত্তলিক জগৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি সদর্থক ও অপরোক্ষ প্রত্যাদেশের জন্য অপেক্ষমান ছিল এবং অতীতের সামগ্রিক শিক্ষা তাদেরকে এমন একটি আহ্বানের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। খ্রীষ্টধর্ম সুযোগটি গ্রহণ করেছিল, তার পূর্ববর্তী ও বিরোধী অনুষ্ঠানগত ও মতবাদবিষয়ক উত্তরাধিকারকে অধিগত ও আত্মস্থ করে ধীরে ধীরে রোমকদের দ্বারা নির্যাতীত জনগণের সশ্রদ্ধ প্রশংসা একচেটিয়াভাবে অধিকার করে নিয়েছিল। অন্যের নিকট স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য যিশুর সরল শিক্ষার এই উপযোজন বিবর্তন কিংবা অধঃগতি হিসেবে বিবেচ্য তা বর্তমান মুহূর্তে নিরুত্তর রইল। কিন্তু মুসলমানেরা যিশুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে যে তারা তাঁর ধর্মকে কলুষিত করেছে এবং এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অসমর্থিত বলে আদৌ উক্তি করা চলে না।

যিশুর কার্যকালের দ্রুত পরিসমাপ্তি এবং কোন সংহত শিক্ষার অনুপস্থিতি কল্পনার অধিকতর সুযোগ করে দিয়েছিল, প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টানদের জীবনে সম্ভবত "বিশ্বাস ও অনুশীলনের অধিকতর অবাধ স্বাধীনতা"[১] শুধু মতবাদ ও

১. মোশায়েম, পৃ. ১২১।

অনুশীলনের ক্ষেত্রেই নয়। তাদের প্রেরিত পুরুষের স্বভাব সম্পর্কেও বিরোধী দল-সমূহকে বিবাদ-বিসম্বাদ করবার অমীমাংসিত ভিত্তি প্রদান করেছিল। জেরুজালেম থেকে ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের বিতাড়ন যে জেরুজালেমে মানুষ যিশু সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল, চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত অ-ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের সংমিশ্রণ, যাদের মধ্যে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কমবেশী নব্য-পিথাগোরীয় বা প্লেটোনিক মতবাদ প্রচলিত ছিল, যিশুর ব্যক্তি-সত্তা সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যে অস্পষ্ট ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল—সব মিলে অনতিবিলম্বে বহু মতবাদ ও গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল। যুগের পর যুগ যা কিছু মানবিক, "যা নিছক আদর্শ নয়, তা অবতার ঈশ্বরের পূজিত প্রতিবিম্ব থেকে ধীরে ধীরে মোলায়েম হয়ে গিয়েছিল, যিশুর মূল করুণ ইতিহাস "অলীক কাহিনী"-তে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং বানোয়াট কাহিনী দ্বারা তাঁর জীবন এমনভাবে পরিবেষ্টিত হয়েছিল যে আজ আমাদের পক্ষে একথা জানা অসম্ভব যে "তিনি বাস্তবিক কি ছিলেন এবং কি করেছিলেন।"

হযরত মুহম্মদ (দঃ)-র আগমনের পূর্বে বহু শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টধর্ম যে কাল্পনিক আকার ধারণ করেছিল তা কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষণীয়।

যে নষ্টিক মতবাদসমূহ ইহুদী খ্রীষ্টানদের মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী সেগুলি সম্ভবত প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে বিঘোষিত হয়েছিল, হাড্রিয়ান কর্তৃক জেরুজালেম অবরোধ ও ধ্বংসের প্রায় সমসাময়িক কালে। এই শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নষ্টিক শিক্ষক সেরিনথাস তার শিষ্যদের মধ্যে পিতা ও পুত্রের দ্বৈত উপাসনা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন, যিনি "জগতের স্রষ্টা" মানুষ যিশু থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হিসেবে অনুমিত।

পল-প্রচারিত খ্রীষ্টধর্মের সংকীর্ণতা এবং আলেকজান্দ্রিয়া-গোষ্ঠীর দর্শনের সঙ্গে এর মতবাদসমূহের সমন্বয় সাধনের নিষ্ফল প্রয়াস, অ্যামোনিয়াস সাক্কাসের নব্য-প্লেটোবাদী সারসংগ্রহের জন্ম দিয়েছিল; পরে অরিজেন ও অন্যান্য নেতৃত্বস্থানীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণ তা গ্রহণ করেছিলেন। এই বহুমুখী লেখকের প্রভাব প্রাথমিক শতাব্দীসমূহে খ্রীষ্টান-জগতের অধিকাংশ বিখ্যাত চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে দৃশ্যমান। তিনি তৎকালীন অস্তিত্বশীল মতবাদ ও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে সাধারণ সামঞ্জস্য আনয়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কোন কোন দিক দিয়ে অ্যামোনিয়াস, মানী বা মৃতাত্মাপূজারীদের আদর্শ এবং নিঃসন্দেহে তাঁর সমসাময়িকদের উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি একটি সম্প্রদায় তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষা কখনো সমাজের নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি কিংবা তার ধর্মকে প্রভাবিত করেনি।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। খ্রীষ্টান গির্জায় বিভেদ ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। নষ্টিক মতবাদ প্রবল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং খ্রীষ্টধর্মের উপর তার অনপনেয় চারিত্রিক

প্রভাব এঁকে দিয়েছিল। এই শতাব্দীতে যে কয়টি গোষ্ঠী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তা ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কেন না এই সব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে গির্জার শিক্ষা থেকে উৎসারিত অনিষ্টই অভিব্যক্ত হয়নি, অধিকন্তু খ্রীষ্টধর্মের উপর জরথুস্ত্র-বাদ, নব্য-পিথাগোরীয়বাদ এবং চ্যাল্ডীয়দের প্রাচীন সেবীয়বাদের প্রভাবও প্রকট ছিল।

মারশেন্টিগণ সম্ভবত প্রাথমিক নষ্টিকদের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গোষ্ঠী ছিল এবং একটি সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর ও একটি সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টকর—এই দুইটি মূলনীতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সত্তা জগৎ ও মানবের অধীশ্বর—মধ্যবর্তী জাতীয় ঈশ্বর—তিনি সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকরও নন, আবার সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টকরও নন, বরং মিশ্র প্রকৃতির—তিনি পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করে থাকেন। এই ঈশ্বর, মারশেন্টিদের মতবাদ অনুসারে এই নিকৃষ্ট জগতের স্রষ্টা, তিনি অনিষ্টের মূলনীতির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত—জরথুস্ত্রের ধারণার নির্দেশক। সার্বভৌম মূলনীতি এই বিরোধের অবসান ঘটিয়ে স্বর্গীয় ও ঐশী উৎসের অধিকারী আত্মাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য ইহুদীদের নিকট "নিজের অনেকটা অনুরূপ, এমন কি তাঁর পুত্র যিশুখ্রীষ্টের অনুরূপ সত্তা পাঠান" তাঁকে একটি দেহের কিছুটা ছায়া-সাদৃশ্য দিয়ে যাতে তিনি মানুষের কাছে দৃশ্যমান হতে পারেন। এই স্বর্গীয় পয়গম্বরের অর্পিত দায়িত্ব ছিল অনিষ্টের নীতি ও এই নিকৃষ্ট জগতের স্রষ্টা—এই দুইয়ের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা এবং বিভ্রান্ত আত্মা আল্লাহর সমীপে ফিরিয়ে আনা।" এই কারণে অনিষ্টে নীতি এবং এই নিকৃষ্ট জগতের স্রষ্টার অকথ্য নির্যাতন ও উন্মত্ততা দ্বারা তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন; কিন্তু সবই তাঁর পক্ষে নিষ্ফল হয়েছিল, কেন না শুধু দৃশ্যত তিনি দেহের অধিকারী ছিলেন; দুর্ভোগ বা নির্যাতন তাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

ভ্যালানটাইনপন্থীদের প্রভাব ছিল অধিকতর স্থায়ী। তারা শিক্ষা দিয়েছিল যে "মহাপ্রভু খোদা তদীয় পুত্র যিশুকে মানবজাতি যে নিম্নস্তরে নিপতিত হয়েছিল তা থেকে বিমুক্ত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে বাস্তব দেহের পরিবর্তে স্বর্গীয় ও সূক্ষ্ম দেহ দান করেছিলেন।" ভ্যালানটাইনপন্থীরা বিশ্বাস করত যে যিশুখ্রীষ্ট ঐশী সত্তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন, অন্ধকারের যুবরাজের রাজত্ব ধ্বংস করার জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন।

ওফাইটগণ মিশরে প্রতিপত্তিশালী হয়েছিল। অন্যান্য মিশরীয় নষ্টিকদের মতো তারা ঈয়ন জড়ের নিত্যতা, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতের সৃষ্টি, নিকৃষ্ট জগতের অধীশ্বরের অত্যাচার, "অন্যায়ভাবে বিজেতার সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য মানুষ যিশুর সঙ্গে ঐশী যিশুর মিলন" সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করত। অধিকন্তু তারা যুক্তির সাহায্যে সমর্থন করত যে সর্পের দ্বারা আদম (আঃ) ও

হাওয়া প্রতারিত হয়েছিলেন তা ছিল সর্পের ছদ্মবেশে হয় খ্রীষ্ট স্বয়ং বা সোফিয়া।

নষ্টিক ধর্মবিশ্বাস চ্যাল্ডীয় দর্শনের প্রভাবে অস্তিত্বশীল হচ্ছিল, গ্রীকগণ তাদের দিক থেকে "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এবং খ্রীষ্টের মধ্যে মিলিত দুইটি স্বভাব" সম্পর্কীয় পলের মতবাদ এবং জগতের শাসন বিষয়ক তাদের নিজস্ব মতবাদের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছিল। প্রাকসিয়াস খ্রীষ্টধর্মের এই তার্কিক প্রচারকদের প্রথম ; তিনি "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা" র মধ্যে কোন বাস্তব পার্থক্য অস্বীকার করে প্রথমে এই কাজের সূত্রপাত করেছিলেন এবং যুক্তির সাহায্যে সমর্থন করেছিলেন যে পিতা তাঁর পুত্র, মানুষ খ্রীষ্টের সঙ্গে এত বেশী অন্তরঙ্গ ভাবে মিলিত হয়েছিলেন যে তিনি তার সঙ্গে যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের মনস্তাপ ও অপবাদজনক মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

মোশেম বলেন, "এই সম্প্রদায়গুলি দর্শনের সন্ততি। ফ্রিজিয়ার অধিবাসী মনটেনাসের ব্যক্তি-সত্তার প্রভাবে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ভাগ্যে এক নিকৃষ্টতর অনিষ্ট নিপতিত হয়েছিল।" এই ব্যক্তিটি সব ধরনের জ্ঞান ও শিক্ষাকে অবজ্ঞা করেছিলেন, যিশুখ্রীষ্ট কর্তৃক অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মার প্রবক্তা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে-ছিলেন। তিনি শীঘ্রই বহু শিষ্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে প্রিস্‌সিলা ও ম্যাক্সিমিলা ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ—এই দুই ধর্মপ্রচারিকা, "মহিলাদ্বয় তাদের ধর্মনিষ্ঠার চেয়ে প্রাচুর্যের জন্য অধিকতর খ্যাত ছিলেন"। তারা উত্তর এসিয়াকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিলেন এবং তাদের নির্বিচার উন্মত্ততা মনুষ্যজাতির উপর ভয়াবহ দুর্দশা আনয়ন করেছিল।

মার্শেনিট, ভ্যালাণ্টাইনপন্থী, মণ্টেনিস্ট ও অন্যান্য নষ্টিক সম্প্রদায় সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য প্রয়াস চালাচ্ছিল। এই সময়ে পারস্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল যার ব্যক্তিত্ব দুই মহাদেশের দর্শনে অমোচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। সকল বর্ণনানুযায়ী মানি তাঁর যুগের সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা নিখুঁত অভিব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিদ, সংগীতবিশারদ ও প্রখ্যাত শিল্পী। তাঁর শিল্পশালা[১] সম্পর্কীয় আখ্যায়িকাসমূহ প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

ইহুদী ক্যাবেলা ও নষ্টিক শিক্ষকদের শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত, পাশ্চাত্যের প্রাচীন দর্শন ও মরমীবাদে উদ্বুদ্ধ, জন্মসূত্রে একজন মাজা এবং শিক্ষার দিক দিয়ে একজন খ্রীষ্টান, মানি চারিদিক থেকে তাঁর বিপক্ষে পুঞ্জীভূত মতভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং বিশ্বাসের বিশৃঙ্খলা থেকে এমন এক সারগ্রাহী ধর্ম সৃষ্টির জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন যা যাবতীয় প্রয়োজন ও হৃদয়ের

১. আর সঙ্গ-ই মানি।

সকল আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করবে। যে ঔদ্ধত্য সহকারে মানি বাহ্য ঘোষণার মাধ্যমে প্রচলিত ধর্মসমূহকে মূলোচ্ছেদ করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, সূক্ষ্ম সমালোচনার আশ্রয় নিয়েছিলেন যা নবদীক্ষিতদের ক্ষেত্রে ধর্মের সমুদয় ভিত্তি নস্যাৎ করে দিয়েছিল। সেই একই প্রক্রিয়া পরবর্তীকালে তাঁর সমগোত্রীয় ইসমাইলিয়াগণ[১] অনুকরণ করেছিলেন এবং বাতেনীদের মতো সব ধরনের ধর্মীয় মতবাদে গুহ্য অন্তঃদৃষ্টির নিশ্চিত স্বীকৃতি প্রত্যেক ধর্ম ও গোত্রকে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করেছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি বা তাঁর শিষ্যরা যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানেই তুলনাবিহীন হিংস্রতার সঙ্গে নিগৃহীত হয়েছিলেন।

মানির মতবাদ খ্রীষ্টধর্ম এবং পারসিক ও চ্যাল্ডীয়দের প্রাচীন দর্শনের এক উদ্ভট সংমিশ্রণ। তাঁর মতে, জড় ও মন পরস্পর এক চিরন্তন বিরোধে লিপ্ত। এই বিরোধকালে ঐশী ও জড়াত্মক এই দ্বিবিধ স্বভাব বিভূষিত জড়-নীতি কর্তৃক মানুষ সৃষ্ট হয়েছে—এই ঐশী স্বভাব স্বর্গ থেকে অপহৃত আলোক বা শক্তির অংশ। কারাগারে আবদ্ধ সংগ্রামরত ঐশী আত্মাকে মুক্ত করার জন্য সর্বশক্তিমান খোদা সৌর অঞ্চল থেকে নিজস্ব উপাদান থেকে সৃষ্ট এক সত্তা প্রেরণ করেছিলেন। এই সত্তা খ্রীষ্ট। সেই মোতাবেক যিশু মানবদেহের ছায়ামূর্তি ধারণ ক'রে ইহুদীদের নিকটে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর কার্যকালে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কীভাবে পঙ্কিল দেহ থেকে বুদ্ধিময় আত্মাকে পৃথক করতে হয়—কীভাবে ভয়ানক শত্রু জড়ের উন্মত্ততাকে জয় করতে হয়। অন্ধকারের যুবরাজ তাঁকে হত্যা করার জন্য ইহুদীদেরকে উত্তেজিত করেছিল। তিনি দৃশ্যত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, বাস্তবিক পক্ষে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর ব্রত সম্পাদন ক'রে সূর্যলোকে স্বীয় সিংহাসনে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

কাজেই ম্যানিকীয় খ্রীষ্ট পান, ভোজন, দুর্দশা ভোগ করতেও পারেন না, মরতেও পারেন না; এমন কি তিনি খোদার অবতারও নন। তিনি মায়াময় ছায়া মাত্র—"তিনি প্রকৃতিতে আবদ্ধ সর্বব্যাপী আলো-উপাদান, তিনি কোনরূপ ধারণ না করেই জড়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাপৃত।" এই সব মতবাদ যতই নিন্দনীয় ও অযৌক্তিক হোক না কেন, মুসলমানদের নিকট সেগুলি ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের পদার্থ-রূপান্তর মতবাদ—অর্থাৎ রুটি ও মাদিরার খ্রীষ্টের মাংস ও রক্তে রূপান্তর অপেক্ষা আদৌ অধিকতর নিন্দনীয় ও অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

মানি তাঁর শিষ্যদেরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—"নির্বাচিত" এবং "শ্রোতা"। 'নির্বাচিত' শ্রেণীর শিষ্যদেরকে সর্বাধিক প্রাণীজ খাদ্য ও উত্তেজক পানীয় গ্রহণ, বিবাহবন্ধন ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হত। "শ্রোতা" শ্রেণীর শিষ্যদের জন্য যে বিধিব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তা অনেকটা মোলায়েম

১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

ধরনের। তাদেরকে গৃহ, জমাজমি, ধনদৌলতের অধিকারী হতে মাংস ভক্ষণ করতে ও পাণিগ্রহণ গ্রহণ করতে অনুমতি প্রদান করা হত। কিন্তু বহু সীমাবদ্ধতা এবং সংযম-মিতাচারের কঠোর শর্ত সাপেক্ষে তাদেরকে এই স্বাধীনতা প্রদান করা হত।

মানি বাহ্‌রাম গর কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মতবাদসমূহ খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করেছিল এবং পরবর্তীকালে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যে ভাঙন ধরেছিল তার মূলীভূত সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এই মতবাদগুলির প্রভাব দৃষ্ট হয়।

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে স্যাবেলিয়াস সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে এবং এই সময় থেকে খ্রীষ্টধর্মে এক অভিনব ব্যতিক্রম গোচরীভূত হয়। তারা যিশুকে শুধু একজন মানুষ হিসেবেই মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে কিছুটা শক্তি সর্বশক্তিমান পিতা থেকে আগত হয়ে মানুষ যিশুতে মিলিত হয়েছে ও তাঁকে খোদার পুত্রে পরিণত করেছে। এই অদ্ভুত মতবাদ যাকে গিবন ত্রিমূর্তি বাদে অবিশ্বাসের একটি দৃষ্টিকোণ হিসেবে বিবেচনা করেন। তা খ্রীষ্টান ধর্মমতে মারাত্মক বিশৃঙ্খলার কারণ হয়েছিল এবং চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবিজেন কর্তৃক খোদার তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব মতবাদের ঘোষণার জন্ম দিয়েছিল। যে জনগণ যিশুর ধর্মমত গ্রহণ করেছিল তাদের চরিত্রের উপযোগী প্রাচীন পৌত্তলিকতার রূপান্তরই হল খোদার ত্রিত্ববাদ। তাদের প্রকৃতিতে পৌত্তলিকতা বদ্ধমূল হয়েছিল এবং খোদার ত্রিত্ববাদ ছিল যিশুর শিক্ষা ও বহু ব্যক্তিত্বের প্রাচীন উপাসনার মধ্যে এক আপোষ। কালক্রমে খোদার ত্রিত্ববাদ খ্রীষ্টান-ত্রিতত্ত্বে পর্যবসিত হয় এবং পরে উহা খ্রীষ্টধর্মের সর্বাপেক্ষা দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছিল।[১]

গির্জার অযৌক্তিক শিক্ষার বিরুদ্ধে মানব-প্রজ্ঞার বিদ্রোহ থেকেই মুখ্যত জন্ম নিয়েছিল অ্যারিয়াসের মতবাদ। তখন আলেকজান্দ্রিয়া ছিল সর্বাপেক্ষা ধর্মোন্মত্ত খ্রীষ্টান-অধ্যুষিত শহর। এখানেই অ্যারিয়াস তাঁর ধর্মযাজকের বিপক্ষেই এই মতবাদ প্রচার করার সাহসিকতা অর্জন করেছিলেন যে যিশু ও খোদার মূল সত্তা এক নয়। অ্যারিয়াসের মতবাদ সত্বর মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করেছিল। প্রচণ্ড ও পুনঃ পুনঃ নির্যাতন সত্ত্বেও তার শিষ্যদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলে ও স্পেনে এই মতবাদের প্রভাব সুদৃঢ় ছিল।[২]

অ্যারিয়াসের ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদের ফলে উপদিত বিরোধ কনস্ট্যানটাইনকে ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিথিনিয়ার নিসিয়ায় পরামর্শ সভা আহ্বান করতে উদ্বুদ্ধ

মোশেম, পৃ. ৪১১।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে (ইতালীর) সিয়েনার সেমিনাস অ্যারিয়াসের মতবাদ পুনরুজ্জীবিত ও ২.প্রসারিত করেছিল। বর্তমান কালের ইউনিট্যারিয়ানিজম সোসিয়ানদের প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী। তারা যিশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছিল। তারা মূল পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত মতবাদও বর্জন করেছিল। তাদের কাছে একমাত্র খোদাই উপাসনার যোগ্য।

করেছিল। এই সাধারণ সভায় উভয়পক্ষের প্রচণ্ড প্রয়াসের পর অ্যারিয়াসের মতবাদ অভিযুক্ত হল এবং "খ্রীষ্টকে পিতা খোদার একই প্রকৃতিবিশিষ্ট বলে বিবেচিত হল।"[১] খ্রীষ্টধর্ম সম্প্রদায়ের অবস্থা পূর্বে যাই থাক না কেন, এখন থেকে তার ইতিহাস গোলযোগ ও আক্রমণ, আত্মবিনাশী সংঘর্ষ ও বিসম্বাদ, বিভীষিকাপূর্ণ ও নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, তীব্র ঘৃণা ও মানুষের মন থেকে বিচারবুদ্ধি মুছে ফেলার নিরন্তর ও শোচনীয় প্রয়াসের ইতিহাস। নিয়মিত যাজকবর্গের অসদাচার বীভৎস আকার ধারণ করেছিল এবং যাজকীয় ব্যবস্থার বিলাসিতা, ঔদ্ধত্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সর্বসাধারণের অভিযোগের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বকালের কৃচ্ছ্রতার স্থানে সন্ন্যাস স্থান দখল করে নিয়েছিল এবং মঠবাসী সন্ন্যাসীদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তারা গির্জার অবাধ বল্লম—তারা সর্বদা গোলমাল ও রাজদ্রোহের সৃষ্টিতে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করত। আর কনস্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমের রাজপথ তাদের অবাধ্যতা ও দাঙ্গাবাজির ফলে প্রায়ই রক্তাপ্লুত হয়ে উঠত।

হাইপাটিয়ার হত্যাকারী সিরিলের সঙ্গে নেস্টোরিয়াসের বিরোধ খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গির্জার অভ্যন্তরে যেসব দলের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেই এফিসাসের দ্বিতীয় সম্মেলন আংশিকভাবে আহূত হয়েছিল; কিন্তু গিবন বলেন, "আলেকজান্দ্রিয়ার মহাযাজকের স্বেচ্ছাচারিতা পুনরায় বিতর্কের স্বাধীনতাকে দমিত করেছিল। দ্বৈত স্বভাবের বিরুদ্ধ-মত আনুষ্ঠানিকভাবে নিন্দিত হল। 'যারা খ্রীষ্টকে বিভক্ত করে তারা তরবারীর দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হোক।' 'তারা টুকরো টুকরো হয়ে যাক।' 'তারা জীবন্ত দগ্ধীভূত হোক!' —এসব ছিল একটি খ্রীষ্টীয় ধর্মসভার বদান্য ইচ্ছাসমূহ।"

রোমের বিশপের দৃষ্টান্তে আহূত চ্যাল্‌সেডনের সম্মেলনে দুই স্বভাবে একই ব্যক্তি-সত্তায় খ্রীষ্টের অবতারত্ব মতবাদ সুনির্দিষ্টরূপে নির্ধারিত হল। মনোফিজাইট ও নেস্টোরিয়াসপন্থীরা যিশুর অবতারত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে চ্যাল্‌সেডনের বিধানের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু তারা গোঁড়াপন্থীদের আক্রমণের সামনে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, আর গোঁড়াপন্থী খ্রীষ্টানরা তাদের প্রেরিত-পুরুষের স্বভাবের রহস্য-সমাধানে সফল হয়েছিল। একদল মঠবাসী সন্ন্যাসী খ্রীষ্টান সেনাদল জেরুজালেম অধিকার করেছিল; তারা এক অবতার-স্বভাবের নামে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল—যিশুর সমাধিস্থল রক্তাপ্লুত করেছিল। যে আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রীষ্টানগণ এক মহিলাকে হত্যা করেছিল তারা তাদের মহাযাজককে গির্জায় দীক্ষা স্থানে হত্যা করে, নিহত দেহকে ছিন্নভিন্ন করে অগ্নিদগ্ধ করে সেই ভস্মাবশেষকে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে ইতস্তত: করেনি।

প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে মনোফিজাইটদের ক্রমহ্রাসমান সৌভাগ্য এডেসার

১. গিবন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

বিশপ জ্যাকবের নেতৃত্বে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। তাঁর ও তাঁর উত্তরাধিকারীর অধীনে তারা পূর্ব সাম্রাজ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের অপ্রতিহত নেস্টোরিয়ান-উৎপীড়ন এবং গোঁড়া বা চ্যাল্‌সেডীয়দের সঙ্গে তীব্র বিসম্বাদ খ্রীষ্টান গির্জাতন্ত্রকে আত্মঘাতী সংঘর্ষ ও রক্তপাতের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। একজন অ-খ্রীষ্টানের কাছে, মনোফিজাইটদের মতবাদ—যারা শিখিয়েছিল যে "খ্রীষ্টের ঐশী ও মানবিক প্রকৃতি এমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে তা একটি প্রকৃতিতে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তথাপি দুই প্রকৃতির কোন পরিবর্তন, ভুল বুঝাবুঝি কিংবা মিশ্রণ ছাড়াই তা" কোন দিক দিয়েই চ্যাল্‌সেডনের সম্মেলনে গৃহীত মতবাদসমূহ থেকে স্বতন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয় না। তথাপি কোন পার্থক্য ছাড়াই এই স্বাতন্ত্র্য বহু মানবগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় দুর্দশার কারণ হয়েছিল। অবশেষে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিরাক্লাইটাস মনোথিলাইট নামক একটি নূতন সম্প্রদায়ের পত্তন করে বিশৃঙ্খলা দূর করবার চেষ্টা পেয়েছিলেন। অবশ্যি এই সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহ কম অদ্ভুত ও কম ধর্মান্ধতাপূর্ণ নয়। মনোথিলাইট সম্প্রদায় যুক্তির সাহায্যে সমর্থন করত যে "যিশু ছিলেন পূর্ণ খোদা ও পূর্ণ মানুষ এবং তাঁর মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতি এমনিভাবে মিলিত হয়েছিল যে তা কোন সংমিশ্রণ বা বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি, বরং তাদের মিলনে একটি ব্যক্তি-সত্তারই জন্ম হয়েছিল।" যা'হোক যিশুর গির্জার অভ্যন্তরে শান্তি আনয়নের পরিবর্তে, এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব অনিষ্টের তীব্রতা বৃদ্ধি করেছিল। পশ্চিম এসিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশে খ্রীষ্টের নামে ধ্বংস হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চলতে লাগল।

ইসলামের আগমনের পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে খ্রীষ্টান জগতের ধর্মীয় অবস্থা এমনি ছিল।

কনস্ট্যানটাইনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পর এই ধর্ম রোম সাম্রাজ্যের প্রবল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পৌত্তলিকতার ভাগ্য চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অকপট রোমক সম্রাটগণ যদিও কিছুকালের জন্য এর পতন স্থগিত রেখেছিলেন তখন তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। গিবন বলেন, "পৌত্তলিকতার অবলুপ্তির পর খ্রীষ্টানগণ শান্তি ও ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে হয়ত একক বিজয় উপভোগ ক'রে থাকবেন। কিন্তু তাদের অন্তরে মতভেদের নীতি জাগ্রত ছিল এবং তারা তাদের ধর্মপ্রবর্তকের নিয়মকানুন অনু-শীলনের পরিবর্তে তাঁর স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য অধিকতর উৎকণ্ঠিত ছিল।"[১] সমগ্র খ্রীষ্টান ইউরোপ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং যিশুর যাজকতন্ত্র বিভেদ ও দলাদলিতে বিদীর্ণ হয়েছিল। জনাসাধারণের ধর্মীয় ধারণা পৌত্তলিক স্তর অতিক্রম করেনি ; মৃত

সম্রাট জুলিয়ান (তথাকথিত স্বধর্মত্যাগী) বলেছেন বলে কথিত আছে: "সাধারণভাবে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলি পরস্পর যেভাবে শত্রুভাবাপন্ন ছিল কোন বন্য হিংস্রপ্রাণীও মানুষের প্রতি তদ্রূপ শত্রুভাবাপন্ন নয়।"

ব্যক্তির আত্মাসমূহ পূজিত হত এবং যেসব ব্যক্তি জীবদ্দশায় সম্মানিত ছিলেন তারা উপাস্যে পরিণত হতেন। পুণ্যাত্মার দেহাবশেষ ও স্মৃতিচিহ্ন সার্বজনীন উপাসনায় পরিগণিত হয়েছিল ; খ্রীষ্টধর্ম পৌত্তলিকতায় পুনরাবর্তিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টধর্মের কর্তৃত্বাধীন জাতিসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সমভাবে শোচনীয় ছিল। চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা মানবজাতির ভেতর থেকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়েছিল। যেসব খ্রীষ্টধর্মত্যাগী তৎকালীন শক্তিশালী ধারণার থেকে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করতে সাহসী হয়েছিল তাদের হত্যাযজ্ঞের উপর খ্রীষ্টের রাজত্বের আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথে সভ্যজগতের চোখের সামনে প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারিণী একজন মহাপ্রাণা মহিলা অবর্ণনীয় নৃশংসতা সহকারে একজন খ্রীষ্টান কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন, যিনি খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে একজন সেণ্ট হিসেবে পরিচিত এবং যিনি আধুনিক কালে একজন যুক্তিবাদী সমর্থকও লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ড্রেপারের বাগ্মিতাপূর্ণ পৃষ্ঠাগুলিতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের যে জীবন্ত ছবি ফুটে উঠেছে তা সর্বকালের জন্য খ্রীষ্টধর্মের অন্যতম নিকৃষ্টতম কলঙ্ক হিসেবে বিবেচিত হবে। একজন সুন্দরী, বিদুষী ও ধর্মপ্রাণা মহিলার বক্তৃতা-কক্ষ আলেকজান্দ্রিয়ার ঐশ্বর্য ও জাকজমক দ্বারা পরিশোভিত ছিল ; তিনি যখন তার একাডেমী থেকে বের হচ্ছিলেন তখন তিনি খ্রীষ্টধর্মের একদল অতি উৎসাহী অধ্যাপকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এইসব ধর্মসংরক্ষকদের ভয়ার্ত তীব্র চিৎকারের মধ্যে ভদ্রমহিলাকে তার শকট থেকে টেনে নামানো হল এবং তাকে প্রকাশ্য রাজপথে বিবস্ত্র করা হল। তিনি সন্ত্রাসবিহ্বল হয়ে কাছাকাছি একটি গির্জায় আশ্রয় নিলেন এবং সেখানে একজন "সেণ্টে"র সহচরগণ কর্তৃক নিহত হলেন। তারপর হতভাগ্য নগ্ন মৃতদেহের উপর চলল বলাৎকার এবং তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হল ; কিন্তু নারকীয় অপরাধ তখনও নিঃশেষ হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্তিত দেহের অস্থি থেকে মাংস ঝিনুকের খোলা দিয়ে বিচ্ছিন্ন ক'রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হল। এই বীভৎস ন্যক্কারজনক নৃশংসতা যে পাষণ্ড প্ররোচিত করেছিল তাকে খ্রীষ্টান জগৎ সাধুপুরুষের আসনে সমাসীন করেছিল এবং শহীদ হাইপাটিয়ার রক্তের প্রতিশোধ শুধু আমরের তরবারীর সাহায্যেই নেওয়া হয়েছিল।[১]

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মহান আইনপ্রণেতা জাষ্টিনিয়ানের অধীনে কনস্টাণ্টিনোপলের অবস্থা সমগ্র খ্রীষ্টান জাহানে নীতিবিগর্হিত ও অধঃপতিত সামাজিক অবস্থায় শ্রেষ্ঠ নির্দেশক। সামাজিক ধারণা সাধারণ বা ব্যক্তিগত নৈতিক উৎকর্ষের কোন স্বীকৃতি ছিল না ; একজন বেশ্যাও সিজারের সিংহাসনে বসে সম্রাটের সঙ্গে রাজকীয় সম্মানের দাবীদার হত। থিওডোরা কনস্ট্যানটাইনের নগরে

১. আমর ইবনুল্ আস্ কিংবা 'আরব-ইতিহাসে'র আস্।

সাধারণ্যে তার দেহব্যবসা চালাত এবং সেখানকার লম্পট বাসিন্দাদের মধ্যে তার নাম প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এখন সে একই নগরে রাজমহিষী হিসেবে 'স্থির প্রকৃতি ম্যাজিস্ট্রেট' গোঁড়া বিশপ, বিজয়ী সেনাধ্যক্ষ এবং বন্দী রাজন্যদের দ্বারা পূজিত হয়েছিল, সাম্রাজ্য তার নিষ্ঠুরতা দ্বারা অপদস্থ হয়েছিল এবং সে নিষ্ঠুরতার কোন ধর্মীয় বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছিল না। রাজদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় ধর্মযাজকগণ সর্বদা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করত এবং সেটাই ছিল তখনকার রেওয়াজ। এসব উপলক্ষে মানবিক বা ঐশী, সব আইনই পদদলিত হত; গির্জা ও ধর্মশালা নির্মম হত্যাকাণ্ড দ্বারা অ-পবিত্র হত; ধ্বংস বা লুঠতরাজ থেকে কোন স্থানই নিরাপদ বা পবিত্র ছিল না; সামাজিক বাঁধন সর্বত্র বিপর্যস্ত হয়েছিল; প্রকাশ্য দিবালোকে বীভৎস বলৎকার অনুষ্ঠিত হত। যাহোক, জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে নিকা দাঙ্গার সময় অনুষ্ঠিত বিভীষিকার সঙ্গে আর কিছুই তুলিত হতে পারে না। নিরবচ্ছিন্ন রক্তপাত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সহ সার্কাসের ভয়াবহ নৈরাজ্য গোঁড়ামির রাজকীয় সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রেরণায় চরম অধঃপতনে পৌঁছেছিল এবং বর্বরতম দলাদলিতে পর্যবসিত হয়েছিল। পৌত্তলিক জগতে এর কোন নজীর নেই।

এই যুগে কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গে তুলনায় পারস্য দেশে আইনশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল।

যে সব অপরাধের বিবরণ খ্রীষ্টান কনস্টানন্টিনোপলের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে তাতে মানবজাতি বিক্ষুব্ধ। যখন ইসলামের নবী মুহম্মদ (দঃ) শিশু তখন একজন সর্বাপেক্ষা পুণ্যাত্মা সম্রাট বাইজ্যানটাইনের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। একজন খ্রীষ্টান নৃপতির অনুরোধে স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ তাঁকে নির্মমভাবে নিধন করা হয়েছিল। সম্রাটকে তাঁর কক্ষ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করা হয়েছিল এবং তাঁর পাঁচটি পুত্রকে পর পর তাঁর চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছিল; সম্রাটের নিধনের মধ্য দিয়ে এই মর্মন্তুদ দৃশ্যের যবনিকা পতন হয়েছিল। রাজমহিষী ও তাঁর কন্যাগণের উপরও অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়েছিল এবং যে স্থান বেচারা সম্রাট মরিসের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেখানে তাদের শিরশ্ছেদন করা হয়েছিল। সম্রাটের বন্ধুবান্ধব, সহচর ও পারিষদবর্গের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছিল তা বাইজ্যানটাইন খ্রীষ্টানদের নৈতিকতার এক চরম নিদর্শন। তাঁদের চক্ষুদ্বয় ছিদ্র করা হয়েছিল, জিহ্বা মূল থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল, তাদের হস্তপদদ্বয় কেটে ফেলা হয়েছিল; তাদের কেউ কেউ বেত্রাঘাত চলাকালে মৃত্যুবরণ করেছিল, তাদের কাউকে কাউকে অগ্নিদগ্ধ করে নিহত করা হয়েছিল, আবার কাউকে হত্যা করা হয়েছিল তীরবিদ্ধ ক'রে। গিবন বলেন, "সহজ দ্রুত মৃত্যু ছিল নিহতদের জন্য করুণা যা তাদের ভাগ্যে প্রায়ই জুটত না।"

বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে নিঃশেষ হয়েছিল, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কোন্দলের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়েছিল ধর্মতাত্ত্বিক বিতণ্ডার ফলে উন্মত্ততার ঝড়ো হাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং "ধর্মীয় বিশ্বাসের একানুবর্তিতা চাপিয়ে দেওয়ার মত্ততায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল"—এসব হত্যা, লাম্পট্য ও নিষ্ঠুরতার ঘৃণ্য চিত্র হাজির করেছিল।[১]

ইফ্রেটিসের পশ্চিম তীরবর্তী এসিয়াটিক তুর্কীর দেশগুলি পর্যায়ক্রমে পার্থিয়ান ও রোমান এবং পরে পারসিক ও বাইজ্যানটাইনদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে এক চরম হতাশাব্যঞ্জক চিত্র উপস্থাপিত করেছিল। জনসাধারণের নৈতিক দুর্গতি তাদের পার্থিব ক্ষয়ক্ষতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যিশুর অনুসারীরা অনিষ্ট নিরসনের পরিবর্তে অনিষ্টের মাত্রা তীব্রতর করে তুলছিল। মাজো-জরথুস্ত্রবাদ মেসোপটেমিয়ায় অধঃপতিত খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত ছিল, নেস্তোরাসপন্থীরা গোঁড়াপন্থীদের সঙ্গে মারাত্মক বিরোধে ব্যাপৃত ছিল, মনটেনাস ও ধর্মপ্রচারিকাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের লড়াই—সব মিলে পশ্চিম এসিয়াকে হতাশা ও বিনাশের বিরাম-ভূমিতে পরিণত করেছিল।

রাজ্যজয়ের ঘূর্ণীহাওয়া আফ্রিকার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল। ধ্বংস, হত্যা-কাণ্ড, খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক ও শিক্ষকদের বিধিবিহীনতা মিশর ও ধ্বংসোন্মুখ আফ্রিকার প্রদেশগুলিতে নৈতিক জীবনের প্রতিটি শিখা ধ্বংস করে দিয়েছিল। ইউরোপে

১. মিলম্যান সে যুগের খ্রীষ্টধর্মের চিত্র এভাবে উপস্থাপন করেছেন: "কনস্টান্টিনোপলের বিশপ বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের নিষ্ক্রিয় বলি, বিনীত দাস ও রাজদ্রোহী প্রতিদ্বন্দ্বী; তিনি তার স্বেচ্ছাচারের উপর কোনরূপ উচ্চনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রায়শ বিস্তার করতে পারেননি। অধঃস্তন ধর্ম-যাজকেরা সমাজে গোপনীয় কল্যাণকর ও শুদ্ধি কাজ যাই করুন না কেন, তারা পর্যাপ্ত শক্তি, সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন যা উচ্চাভিলাষ উদ্বুদ্ধ করতে বা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে সমর্থ ছিল। কিন্তু তারা জনসাধারণের চিত্তকে কোন মহৎ প্রশংসনায় লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে, ক্ষীয়মাণ যুগের দৃঢ়মূল নীতিহীনতাকে দমন করতে, বিবাদমান স্বার্থের সমন্বয় সাধনে, যুযুধান বংশসমূহকে একত্র করতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। সাধারণভাবে যখন তারা শাসন কাজ চালাতেন, তখন তারা সংস্কারাচ্ছন্ন ভীতিসহকারে শাসন চালাতেন, একটি কৃতজ্ঞ জাতির প্রতি সম্মানবোধ ও আসক্তি নিয়ে কাজ করতেন না। তারা ইতরজনের মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং একটি ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার চরম বর্বরতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যে সব লোক শক্তিসম্পন্ন ও সমাজের কল্যাণকামী নাগরিক হতে পারত তাদের অনেককেই সন্ন্যাসধর্ম নিষ্ফল নির্জনতা ও ধর্মীয় আলস্যের মধ্যে টেনে এনেছিল। সন্ন্যাসীরা প্রায়ই প্রচণ্ড রাজনৈতিক কিংবা বিরোধী উপদল গঠন করত, তখন ছাড়া অন্য কোন সময়ে সমাজের অবস্থার উপর তাদের কোন প্রভাব থাকত না। তারা সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করত—তারা তাদের মরুর নির্জন নিবাসে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তারা তাদের সতর্কপ্রহরাধীন মঠে অধিষ্ঠিত থেকে মনে করত যে তারা নিশ্চিত পরিত্রাণ লাভ করেছে এবং বিশ্বের অবশিষ্ট লোক পরকালে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের অপেক্ষায় আছে।"

—মিলম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৪।

জনগণের অবস্থা অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে ধর্মের পুরোহিত ও জনগণের সম্মুখে দেশের কল্যাণকামী নার্সেসকে কনস্টান্টিনোপলের বাজারে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। রোমের রাজপথে গভর্ণরের চোখের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বী বিশপদের দলীয় লোকেরা যুদ্ধ বাঁধিয়ে খ্রীষ্টানদের রক্তে গির্জায় বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। স্পেনে নৈরাজ্য ও ধ্বংসের হৃদয়বিদারক দৃশ্য ফুটে উঠেছিল। যে সব ধনী ও সুবিধাবাদী ব্যক্তি সম্রাটের অধীনে প্রদেশের প্রধান প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল ছিল তারা সব ভারমুক্ত ছিল। তারা দাসদাসী পরিবৃত সুশোভিত ভিলায় চরম বিলাসিতার মধ্যে দিনযাপন করত; তারা তাদের সময় পাপাচারের প্রাণকেন্দ্র বিভিন্ন স্নানাগারে কিংবা খেলার টেবিলে অতিবাহিত করত। এই বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের দৃশ্য জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার পাশে এক ভয়াবহ বৈসাদৃশ্যের চিত্র উপস্থাপিত করেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী, গ্রাম ও শহরের স্বাধীন জনগণ রোমকদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়ে মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। ভূমিদাস প্রথা তিরোহিত হয়েছিল; ভূমিদাসের স্থলে ঔপনিবেশিকরা স্থান করে নিয়েছিল—তারা স্বাধীনতা ও দাসত্বের মাঝামাঝি অবস্থা দখল করেছিল। কোন কোন দিক দিয়ে তারা দাসদের চেয়ে সুখী ছিল। তারা বৈধ বিবাহের চুক্তি করতে পারত; তারা যে সব জমি চাষ করত তা থেকে উৎপাদিত ফসলেব একটা নির্দিষ্ট অংশ পেত; তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা তাদের জিনিসপত্র অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নিতে পারত না। কিন্তু অন্যান্য দিকে তারা ছিল দেশের দাস। তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল। বাড়ীর দাসদাসীদের মতো তারাও কায়িক শাস্তির অধীন ছিল[১]; কোন ব্যক্তির দাস নয়, তারা ছিল ভূমির দাস এবং সেই হিসেবে এক অবিচ্ছেদ্য ও উত্তরাধিকার সূত্রে যে জমি তারা চাষবাস করত তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকত। দাসগণ ছিল জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ এবং তাদের অবস্থা ছিল বর্ণনাতীত শোচনীয়। তারা পেত নির্দয় নির্মম আচরণ, ইতর প্রাণীর চেয়েও খারাপ ব্যবহার। অসভ্য জাতিসমূহের আক্রমণ এই দুর্ভাগা দেশের উপর এক ভয়াবহ শাস্তি নিয়ে আসল। তাদের আক্রমণের ফলে দেশ ভয়াবহ ও নিরতিশয় বিরানভূমিতে পরিণত হল; তারা দেশে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালালো, নারী, শিশু ও যাজক সম্প্রদায়কে দাসে পরিণত করল।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসংখ্য ইহুদী স্পেন ও পর্তুগালের উপদ্বীপে বসবাস করত। ৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভিসিগথ সিসবাটের রাজত্বকালে ধর্মযাজকদের হস্তে তারা যে নির্মম নিগ্রহ ভোগ করেছিল তা নিরক্ষরতা ও ধর্মান্ধতার হতভাগ্য বলিদেরকে ইসলাম উদ্ধার করার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। শুধু ইসলামের জন্যই ইহুদীদের পক্ষে মায়মোনাইডস বা ইবনে গেবরলের জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

১. তুচ্ছ দোষের জন্য তিনশত বেত্রদণ্ড প্রচলিত ছিল। ডোজির 'হিস্ট্রি দাস মুসলমানস দ্য এসপ্যাগন', ২য় খণ্ড পৃ. ৮৭ দেখুন।

এবার আরব দেশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। আরব ছিল রহস্য ও রোমান্সের দেশ। অদ্যাবধি এই দেশ নীরবতা ও নির্জনতায় আচ্ছাদিত ছিল, জগতের বৃহৎ জাতিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত ছিল। খসরু ও সিজারের সৈন্যবাহিনী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার সীমান্তে অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু তার নিদ্রাভঙ্গ হয়নি। যদিও বাইজ্যানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের উপর বারংবার আপতিত বজ্রপতনের দূর গুঞ্জনধ্বনি প্রায়ই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে, তথাপি তা তার নিদ্রা টুটাতে পারেনি। তবে তারও পালা আসল এবং সে তার মহানতম সন্তানের বাণীর মধ্যে তার বাণী খুঁজে পেল।

যে পর্বতমালা প্যালেস্টাইন থেকে সুয়েজ যোজকের দিকে নেমে গেছে তা আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তসীমা পর্যন্ত লোহিত সাগর ববাবর প্রায় সমান্তরালভাবে চলে গেছে। আরবী ভাষায় এই পর্বতমালা হিজাজ বা পর্বতপ্রাচীর নামে অভিহিত। ইয়েমেন প্রদেশের সীমারেখা পর্যন্ত ভূখণ্ড এই নামেই পরিচিত। কোথাও পর্বতমালা সাগরের খুব কাছাকাছি, কোথাও বা উপকূল ভাগ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। সাময়িক বৃষ্টিপাতের ফলে মাঝে মাঝে সবুজ উপত্যকা ও উর্বর মরুদ্যান ছাড়া এতে রয়েছে দীর্ঘ অনুর্বর, জনবসতিশূন্য নিম্নভূমি। এই সীমা অতিক্রম করে পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছে বৃক্ষবিহীন নজদ—আরবদেশের উচ্চভূমি—মরুভূমি, গিরিখাত ও স্থানে স্থানে নয়নাভিরাম আবাদী জমিসহ বিশাল মালভূমি। হিজাজের এই পার্বত্য অঞ্চলে ইসলামের জন্মস্থান ও লালনভূমি পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরী অবস্থিত।

এই বিশাল ভূখণ্ড মোটামুটি চারটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত। প্রথম, উত্তরে প্রাচীন ইডোমিট ও মিডিয়ানিটদের দেশসহ আরব পেট্রিয়া। তারপর হিজাজ প্রদেশ—এর মধ্যে অবস্থিত প্রসিদ্ধ শহর ইয়াসরিব—এই শহর পরবর্তীকালে নবীর শহর মদিনাতন্নবী বা মদিনা নামে পরিচিত হয়। হিজাজের দক্ষিণে তিহামা প্রদেশ—এখানে মক্কা এবং মুসলিম তীর্থযাত্রীদের অবতরণস্থল জেদ্দা বন্দর অবস্থিত। চতুর্থ ও সর্বদক্ষিণাংশ আছির, ইয়েমেনের প্রান্তসীমায় শেষ হয়েছে। ইয়েমেনের নামকরণ যথার্থই হয়েছে—এ আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমা, পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, উত্তরে হিজাজ ও পূর্বে হাদ্রামাউত দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইয়েমেন নামটি সাধারণভাবে দক্ষিণ আরবের ক্ষেত্রে প্রায়শ প্রযুজ্য হত। ফলে যথার্থ ইয়েমেন ছাড়া হাদ্রামাউত এবং হাদ্রামাউতের পূর্বে অবস্থিত মাহরা জেলা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাহরার পরে ওমান এবং তার উত্তরে পারস্য উপসাগরের উপর আল্ বাহরায়েন বা আল্ আহ্সা। তার প্রধান প্রদেশের নাম থেকে এই দেশ হিজ্‌র বলেও অভিহিত হয়।

উচ্চভূমি নজদ বৃহৎ মালভূমি। ইহা পূর্বদিকে হিজাজের পর্বতসমূহ থেকে আরম্ভ ক'রে পশ্চিম দিকে চলে গেছে এবং মধ্য আরবভূমি গঠন করেছে। নজদের

যে অংশ ইয়েমেনের সীমান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে তা ইয়েমেনের নজদ বলে অভিহিত, আর উত্তরাংশ শুধু নজদ হিসেবে পরিচিত। এই দু'টি বিভাগ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত একটি পার্বত্য প্রদেশ ইয়েমামা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। নজদের উত্তরাংশ সিরিয়ার মরুভূমিতে বিস্তৃত হয়েছে—যথার্থই তা আরবের অংশ নয়—কিন্তু এখানে আরবের বিভিন্ন গোত্র এখন স্বাধীন ও দুর্বারভাবে ঘোরাফেরা করে, তাদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন আরামীয়দের মতো যাযাবর জীবন যাপন করে। উত্তর-পূর্ব অংশ হল ইরাকের মরুভূমি—তা ইউফ্রেটিসের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত চ্যালডিয়ার উর্বর ভূখণ্ডে গিয়ে শেষ হয়েছে এবং আরবদেশের আবাদী অঞ্চলকে পৃথক করেছে। পূর্বদিকে নজদ আরবগণ যাকে নাফুদ অর্থাৎ মরুভূমির ফালি বলত তার দ্বারা আল্‌আহ্‌সা থেকে পৃথকীকৃত। দক্ষিণের দিকে দাহ্‌নার বিশাল মরুভূমি। তা হাদ্রামাউত ও মাহরা থেকে নজদকে পৃথক করেছে।

এই বিরাট ভূখণ্ড শক্তির শিখরে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আকারে ফ্রান্সের দ্বিগুণ এলাকা জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল, এবং তখনকার মতো এখনও "শহরবাসী" ও "মরুবাসী"—এই দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীর অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত। বেদুইনদের সদগুণ ও ত্রুটি, নিজ গোত্রের প্রতি অবিচল ভক্তি, অদ্ভুত আত্মসম্মানবোধ, হঠকারিতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং মনুষ্য জীবনের প্রতি অবজ্ঞা বার্টন ও পুলের মতো বিখ্যাত লেখকগণ জীবন্ত ও সহানুভূতিশীল লেখনীতে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু বেদুইন ও শহরবাসীদের মধ্যে পার্থক্য যাই থাক না কেন আরবগণ বিশেষভাবেই মরুভূমির সন্তান। স্বাধীনতার প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসা ও আধ্যাত্মিক সমুন্নতি যে মুক্ত বায়ু সে সেবন করে এবং যে ব্যাপক ভূখণ্ডে সে বিচরণ করে তারই ফলশ্রুতি। মক্কা ও ওকাজে বার্ষিক মেলা হওয়া সত্ত্বেও যে সব গোত্র ও জাতি আরবদেশে বসবাস করত তারা সমজাতীয় ছিল না। অগ্রগতি ও ধর্মের দিক দিয়ে প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্র থেকে কমবেশী স্বতন্ত্র ছিল। এই বিভিন্নতার প্রধান কারণ ছিল তাদের উৎপত্তির বিভিন্নতা। বিভিন্ন বংশের লোক বিভিন্ন সময়ে এই উপদ্বীপে বাস করেছে। অনেক বংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের দুষ্কৃতি বা তাদের পরাক্রম পরবর্তী বংশধরদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং এই ঐতিহ্যই জাতিসমূহের ইতিহাস গঠন করেছে। এই উপদ্বীপে যারা বাস করত তাদেরকে স্বয়ং আরবগণ তিনটি প্রধান উপদলে বিভক্ত করেছে (১) 'আরাবুল বায়দা', ধ্বংসপ্রাপ্ত আরবগণ, এদের অন্তর্ভুক্ত হল হেমিটিক উপনিবেশসমূহ (কুশাইটগণ)—তারা উপনিবেশিকতার ক্ষেত্রে সেমিটিকদের পূর্ববর্তী ছিল, এমন কি সিরিয়া, ফিনিসিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের আরামিয়ান জনগণের মতো। (২) 'আরাবুল আরিবা' বা 'মুত্তারিবা', মূল আরবগণ, প্রকৃত সেমিটিকগণ, যাদেরকে ঐতিহ্য 'খাতান' বা 'যোকতান' থেকে অবতরণ করেছে ব'লে চিহ্নিত করে এবং যারা দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার সময় আদিম

অধিবাসীদের ধ্বংস করেছিল। যোকতান বংশোদ্ভূত আরবগণ প্রকৃতিতে যাযাবর; তারা অধ্যুষিত দেশসমূহের আদিম অধিবাসীদের, হেমিটিক আকাশপূজারীগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। তাদের আদি বাসস্থান ছিল যেখান থেকে ইবরাহিম-বংশোদ্ভূত লোকেদের আগমন হয়েছিল। ইউফ্রেটিস নদী, দক্ষিণতীরবর্তী ব্যাবিলন বা ইরাক-আরাবী নামে বর্তমানে যে জেলা কথিত হয়ে থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে যোকতানের দুইজন প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষের দু'টি অর্থবহ নাম—আরফাজাদ, "চ্যাল্ডিয়ান-দের সামান্ত" এবং এবার, "(নদীর) অপরতীরবর্তী লোক"—দ্বারা সঠিকভাবে নির্দেশিত হয়ে থাকে।[১] (৩) 'আরাবুল্ মুস্তারিবা' "বা দেশীকৃত আরবগণ", ইবরাহিম-বংশোদ্ভূত সেমিটিক তারা শান্তিপূর্ণ আগন্তুক বা সামরিক ঔপনিবেশিক হিসেবে এই উপদ্বীপে প্রবেশ করেছিল এবং যোক্তান বংশোদ্ভূত আরবদের সঙ্গে পারস্পরিক বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে বসতি স্থাপন করেছিল।[২] 'আরিবা', 'মুত্তারিবা' ও 'মুস্তারিবা'—এই তিনটি নাম একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং শব্দগুলির বৈয়াকরণিক রূপান্তর বিভিন্ন সময়ে বংশগুলি যে এ-দেশীকৃত হয়েছিল তার নির্দেশ করে।[৩]

'আরাবুল আরিবা' শ্রেণীর মধ্যে যে বংশগুলি ইসলামের ইতিহাস প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্যের দাবী রাখে সেগুলি হল বণী আদ[৪], আমালিকা, বণী সামুদ[৫] এবং বণী যাদিস্ (ডায়ো ডোরাস সিসুলাস ও টলেমার সামুদিয়েন ও যডিসাইট)। বণী আদ উৎপত্তির দিক দিয়ে হেমিটিক বংশোদ্ভূত—তারা আরব উপদ্বীপের প্রথম আগন্তুক ও ঔপনিবেশিক—তারা মধ্য আরবে প্রধানভাবে বসতি স্থাপন করেছিল—আরব-ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ এই অঞ্চলকে 'আহ্‌সাফুর রামাল' বলে অভিহিত করেছেন, এ ইয়েমেন, হাদ্রামাউত ও ওমানের সন্নিকটবর্তী। তাদের অস্তিত্বের একটি যুগে তারা শক্তিশালী ও বিজেতা জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এই বংশের একজন নৃপতি ছিলেন শাদ্দাদ, তার নাম কোরআনে সংরক্ষিত হয়েছে। তিনি সম্ভবত আরবের বাইরে তার শক্তি ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি ইরাক জয় করেছিলেন এবং এমন কি ভারতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত এসে-

১, লিওনারম্যাণ্ট, অ্যানসিয়েণ্ট হিস্ট্রী অব দি ইস্ট, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

২. ইবনুস্ আসির, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৮।

৩. কাসিন দ্য পার্সিভ্যাল 'বায়দা' ও 'আরিবা' সমার্থক বলে মনে করেন এবং মুস্তারিবাকে দ্বিতীয় দলে গণ্য করেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমি তদীয় শ্রেণীবিন্যাস গ্রহণ করেছি।

৪. কথিত আছে যে আদ সম্প্রদায় যোকতান বংশোদ্ভূত আরবদের দ্বারা পরাভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল; "গুহাবাসী অদ্ভুত বংশ" সামুদগণ চেদরলেমাব (খোজার আল্ আহমার) অধীনে অ্যাসিরীয়দের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছিল।

৫. আরবি স্বা (. .) অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে।

ছিলেন। এই পরম্পরাগত জনশ্রুতি নির্দেশ করে যে, খ্রীষ্টধর্মের ২০০০ হাজার বছর পূর্বে আরবগণ ব্যাবিলনিয়া বা চ্যালডিয়া জয় করেছিলেন এবং পারস্যের লোক পরম্পরায় এই ঘটনা সম্ভবত যাহক-অভিযান বলে অভিহিত। একই শাদ্দাদ কিংবা একই নামযুক্ত তার উত্তরাধিকারী মিশর ও সুদূর পশ্চিমে অভিযান চালিয়ে ছিলেন। আরবগণ কর্তৃক এই মিশর অভিযান সেই দেশে হিকসসের অভিযানের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। যে পন্থায় যাযাবর অভিজেতাগণকে থেবাইড ও ইওথপিয়া বা কোসাইট প্রতিবেশীদের যুগ্ম সহযোগিতায় দক্ষিণ দিকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল—এই ঘটনা কিছুটা পরিমাণে মতবাদটি স্বপক্ষে পরিপোষকতা করে।

কথিত আছে যে, দেশে যে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল তার ফলেই আদদের একটা বৃহদাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই বংশের অল্পসংখ্যক লোক রক্ষা পেয়েছিল এবং তারাই দ্বিতীয় 'আদ' জাতি। তারা ইয়েমেনে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। এই পরবর্তী আদগণ যোকতান প্রবাহের মধ্যে মিশে গিয়েছিল।

বণী আমালিকা নিঃসন্দেহে ইহুদী ও ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বণী আমালিকা : লেনোরম্যাণ্ট তাদেরকে আরামীয় বংশোদ্ভূত বলে অনুমান করেছেন।

লেনোরম্যাণ্ট বণী আমালিকাকে আরামীয় বংশোদ্ভূত বলে অনুমান করেছেন। এই বংশ নিঃসন্দেহে ইহুদী ও ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আমালিকাইটস—মিশরীয় মনুমেণ্টের শাশু—যারা প্রাথমিক অ্যাসিরীয় নৃপতিদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আরবে প্রবেশ করেছিল এবং ক্রমশ ইয়েমেন ও হিজাজ, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় বিস্তৃত হয়েছিল। তারা মিশরে প্রবেশ করেছিল, এবং বেশ কয়েকজন ফেরাউন (মিশরের নৃপতিদের পদবী) তাদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। হিজাজের আমালিকাগণ বণী কাহতানদের একটি শাখা বণী যুরহুমদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত কিংবা বিতাড়িত হয়েছিল। এই বণী যুরহুম বংশ মূলত দক্ষিণ আরবে বসতি স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তীকালে উত্তরদিকে অগ্রসর হয়েছিল ও আমালিকাদের পর্যুদস্ত করেছিল।

'বণী আদদের মতো বণী সামুদগণও কুশাইট বা হিমিটিক বংশের অন্তর্ভুক্ত। তারা প্রথমে ইদম সীমান্ত এবং পরে আরব প্যাট্রিয়ার পূর্বে অবস্থিত, হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী হিজর নামক দেশে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা ছিল গুহাবাসী, তারা পাহাড়ের পার্শ্ব কেটে বাড়া তৈরী করত। স্যার হেনরী লেয়ার্ড তাঁর 'আর্লি ট্রাভেলস' গ্রন্থে এইসব পার্বত্য ঘরবাড়ার ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা করেছেন। আরবদের লোকপরম্পরায় আগত ঐতিহ্যকে আধুনিক পর্যটকদের বর্ণনা ও সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করলে সামুদদের সঠিক অবস্থানের ব্যাপারটি স্থির করতে পারা যায়। সিরিয়া এবং নজদ বা হিজাজের মধ্যে বাণিজ্যের "অপরিহার্য মধ্যস্থতাকারী" হিসেবে সামুদগণ সমৃদ্ধির এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। পরিশেষে তারা সিরিয়া ও আরবে বিজয় অভিযান চালানো কালে বিখ্যাত ইলামাইট অভিযেতা চেদরলাওমার

(খুজার আল্ আহ্মার) কর্তৃক বহুলাংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এই প্রাচীন গুহাবাসীগণ তাদের শক্ত বাসস্থানে নিজেদেরকে ঐশী গজব থেকে নিরাপদ মনে করত। কিন্তু এক ভয়াবহ পরিণতি তাদের ভাগ্যে নিপতিত হয়েছিল এবং কোরাইশদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ উপলক্ষে কোরআনে সে বিষয়ে বারংবার বলা হয়েছে।

এই বিপদপাতের পরে জীবিত বণী সামুদগণ ইলামাইটিক উপসাগরের উত্তরে সের পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং এখানে তারা ইসহাক ও ইয়াকুবের সময়ে বাস করত। কিন্তু তারা শীঘ্রই তিরোহিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে প্রতিবেশী বংশ-সমূহের মধ্যে মিশে গিয়েছিল এবং তাদের স্থান অধিকার করেছিল ইদমবাসীরা যারা কিছুকালের জন্য সের পর্বত অধিকার করেছিল।[১] এই ইদমবাসীদের উত্তরাধিকার লাভ করেছিল সেই আরবগণ যারা বণী কাহ্‌তান কর্তৃক ইয়েমেন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ডায়োডোরাস সিকুলাসের আমলে তাদের পূর্ববর্তীদের মতো একই নামে তারা রোমক বাহিনীতে সেনাদল পাঠাত।

তাসম, যাদিস ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোত্র যা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে না তাদের কথা বাদ দিয়ে আমরা বণী যুরহুমদের আলোচনায় আসছি। এই বংশ 'আরাবুল আরিবা' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং হিজাজে 'আমালিকা বংশকে পরাভূত পর্যুদস্ত ও স্থানচ্যুত করেছিল বলে মনে হয়। এই যুরহুম নামে দুইটি গোত্রের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান হয়—একটি অত্যন্ত সুপ্রাচীন এবং আদদের সমসাময়িক এবং তারা সম্ভবত কুশাইট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর অন্য গোত্রটি কাহ্‌তানের বংশধর—এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় তারা ইয়েমেনের উপত্যকা থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং হিজাজের আমালিকাদেরকে বিতাড়িত ক'রে সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। কাহ্‌নাইট বংশের বণী যুরহুম গোত্রের আক্রমণ এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যখন ইসমাইলীয় আরবগণ বণী আমালিকাদের মধ্যে প্রাধান্য অর্জন করছিল, যেখানে বহুদিন পূর্বে তারা বসতি স্থাপন করেছিল। ইসমাইলীয়গণ আক্রমণকারী দলগুলির সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছিল এবং এক সময় পাশাপাশি বাস করত। ইসমাইলের বংশধরদের অগ্রসরমান প্রবাহের সামনে যুরহুম গোত্রের লোকেরা উপত্যকায় তাদের শক্তি হারাচ্ছিল; এক শতাব্দী পার হতে না হতেই হিজাজ ও তিহামা ইবরাহিমীয় আরবদের করতলগত হল। 'মুস্তারিবা' আরবগণের ক্রমবিকাশ ব্যাবিলনীয় নৃপতির আক্রমণের ফলে সমসাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হলেও আমরা পরে দেখতে পাব যে, তারা সত্বর তাদের প্রাণশক্তি ফিরিয়ে এনেছিল এবং হিজাজ, নজদ, ইরাক ও মেসোপটেমিয়ার মরুভূমিতে বিস্তৃত হয়েছিল। সেখানে তারা তাদের পূর্বসূরী কাহ্‌তানদেরকে চূড়ান্তভাবে আত্মসাৎ করেছিল।

১. জেনেসিস, ১৪শ অধ্যায়, ৪, ৬।

'আরাবুল মুতারিবা', ইবারের পুত্র কাহ্‌তান থেকে উদ্ভূত গোত্রসমূহ। তারা প্রধানত ইয়েমেনে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। কাহ্‌তানের বংশধরেরা উত্তর-পূর্বদিক হতে আরবে প্রবেশ করেছিল এবং দক্ষিণদিক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এখানে তারা কিছুকালের জন্য কুশ বংশের আদ গোত্রের সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধীনে বাস করেছিল এবং পরিশেষে নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কাহ্‌তান বংশের লোকেরা শুধু দক্ষিণ আরবেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের আদিম আবাস ছিল মেসোপটোমিয়া। সেখান থেকে দক্ষিণাভিমুখে ইয়েমেন গমন কালে কাহ্‌তান বংশের লোকেরা সমগ্র আরব উপদ্বীপ পরিক্রমণ করেছিল এবং নিঃসন্দেহে তাদের যাত্রাপথের ধারে বসতির চিহ্ন রেখে গিয়েছিল।

আরব ঐতিহাসিকদের মতে এই সময়ে আরব উপদ্বীপে যে জনপ্রবাহ চলেছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইবার বা হেবারের পুত্র, কাহতান ও ইয়াকতান ভ্রাতৃদ্বয়। কাহতানের পুত্র ইয়ারেব যাকে ঐতিহাসিকগণ ইয়েমেনের প্রথম যুবরাজ বলে অভিহিত করেছেন তিনি তার নামানুসারে তার বংশধরদের এবং সমগ্র উপদ্বীপটির নামকরণ করেছিলেন। কথিত আছে যে, ইয়ারেবের পুত্র ইয়েশহাদ পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মারেবের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিখ্যাত আব্দুস শামস ওরফে 'সাবার পিতা। বিজয় অভিযানের সাফল্যের জন্য তিনি এই উপনাম লাভ করেছিলেন। সাবার পরবর্তী বংশধর বিভিন্ন কাহতান গোত্রের পূর্বপুরুষ এবং আরব ঐতিহ্য পরম্পরায় বিখ্যাত। সাবা দুই পুত্র রেখে গিয়েছিলেন—হিমার (মানে লাল)[১] ও কুহ্‌লান। হিমার তার পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন এবং তার নামানুসারেই সাবা-রাজবংশ 'হিমাইরী' বলে অভিহিত হত।[২] তার বংশধর এবং তার ভ্রাতা কুহ্‌লানের বংশধরেরা পর্যায়ক্রমে মুহম্মদের আগমনের পূর্ব শতাব্দী পর্যন্ত রাজ্যের শাসনকার্য চালিয়েছিল। এই বংশেই জন্মেছিলেন মহান যুলকারনায়েন, এবং বিখ্যাত রাণী বিলকিস যিনি সোলাইমান (আঃ)-এর সময়ে জেরুজালেমে গমন করেছিলেন।[৩]

১. ফেরাউনদের অনুকরণে তিনি কাল উষ্ণীষ পরিধান করতেন।

২. ইয়েমেনের হিমাইরী নৃপতিগণ যাদেরকে তোববাস বলা হত তারা প্রথম থেকেই পারস্য ও বাইজানটাইনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগে ছিল।

৩. যুলকারনায়েনের পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুসলীম ঐতিহাসিক মনে করেন যে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনায়েন ও ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডার একই ব্যক্তি। এই মত পশ্নবোধক। প্রাথমিক অর্থে যুলকারনায়েন মানে "দুই শৃঙ্গের অধিকারী"। যখন আমরা সেবীয় নৃপতি দের, দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকৃতি শিরস্ত্রাণ যা তারা পরিধান করতেন এবং যা সম্ভবত এই সময়ের মিশরের সম্রাটদের কাছ থেকে অনুকরণ করেছিলেন তা স্মরণ করি তখন সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, কোরআনে বর্ণিত যুলকারনায়েম কোন স্বদেশীয় নৃপতি যিনি শৌর্যবীর্য-পরাক্রমের জন্য তার পরবর্তী বংশধরদের কল্পনায় বিশ্ববিজয়ী হিসেবে অতিরঞ্জিত হয়েছেন।

প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী আরবে আদি ইসমাইলীয় বসতির শুরু যখন ইবরাহিম চ্যালেডিয়া থেকে নির্বাসিত হন এবং আরবে বসবাস আরম্ভ করেন। ব্যাবিলনের পরাক্রমশালী রাজা নেবুচাদনেজ্জার কর্তৃক পর্যুদস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মিত্রশক্তি যুরহুম গোত্রসমূহসহ ইসমাইলের বংশধরগণ হিজাজে বিস্তার লাভ করে-ছিল ও সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। যে সকল নৃপতি আরবদেশের হৃদপিণ্ডে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিল তাদের মধ্যে একমাত্র নেবুচাদনেজ্জারই সফল হয়েছিলেন। মক্কা নগরীর পত্তন আরব উপদ্বীপে ইবরাহিমের বংশধরদের প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক। কারণ আরবদের ঐতিহ্য অনুসারে যুরহুম বংশের প্রধান মেগহাস বিন আমরের কন্যাকে মুস্তারিবা আরব'দের প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল। ইসমাইল মক্কানগরীর প্রতিষ্ঠাতা। •প্রায় একই সময়ে মক্কার কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কাবাগৃহ আরবের অন্যান্য নগরীর উপর মক্কার বিপুল প্রাধান্য বিস্তার করে।

লেনোরম্যাণ্ট মনে করেন শাদ্দাদ, যুলকারনায়েন এবং বিলকিস কুশাইট।

হিমাইরী নৃপতিদের প্রজাবৃন্দের মধ্যে ইহুদীবাদ প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল, ৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কনস্ট্যানটাইন কর্তৃক ইয়েমেনে প্রেরিত দূতের অনুরোধে তাদের রাজ্যসমূহে অনেকগুলি গির্জা স্থাপন করেছিল। জনসাধারণের বেশীর ভাগ লোক আদিম সেমিটিক ধর্মমতের অনুসারী ছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বাইজানটাইনদের নিকট ডিমিয়ন নামে পরিচিত, যু-নওয়াজ, নৃশংস হরণকারী যু-শিনাতিরকে হত্যা করে ইয়েমেন ও তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ইহুদীদের ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের প্ররোচনায় খ্রীষ্টানদের উপর নির্মম অত্যাচার করেছিলেন, আর বাইজানটাইন আক্রমণকারীদের প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছিলেন। কনস্টান্টিনোপল কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে একদল আবিসিনীয় সেনাদল হারিস বা আরিয়েতের নেতৃত্বে ইয়েমেনের কূলে অবতরণ করে; যু-নওয়াজকে পরাজিত ও নিহত ক'রে তারা ইয়েমেনের অধিপতি হয়ে বসে। ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি এই অভিযান সংঘটিত হয়।

স্বল্পকাল পরে (৫৩৭ খ্রী.) আবরাহা আল্‌আশরাম আরিয়েতকে হত্যা করে, আবরাহা পরবর্তী কালে আবিসিনীয় রাজপ্রতিনিধিত্ব লাভ করে। আবরাহার অধীনেই খ্রীষ্টান আবিসিনীয়গণ হিজাজ অধিকার করার ধ্বংসাত্মক প্রয়াস পায়। ইয়েমেনে অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে আবিসিনীয় কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই সময়ে প্রখ্যাত সায়ফুল ইয়েজেনের পুত্র মা'দি কারিব যার বীরদৃপ্ত কার্যাবলীর জন্য অদ্যাবধি আরবগণ তার স্তবগান করে, তিনি কেসরা আনওশেরওয়ান—প্রেরিত সেনাদলের সাহায্যে হিমাটীয় বংশের প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (৫৭৩ খ্রী.)। ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টানদের দ্বারা মাদি কারিব নিহত হওয়ার পর ইয়েমেন সরাসরি পারস্যের অধীনে নিপতিত হয় এবং কেসিরুনের দরবার কর্তৃক নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়। ওয়াহ্‌রাজ ছিলেন প্রথম মার্জবান। তার শাসনাধীনে ইয়েমেন, হাদ্রামাউত, মাহরা ও ওমান পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শেষ রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন বাজান। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি খসরু পারভেজের আমলে মার্জবান হয়েছিলেন। বাজানের রাজ-প্রতিনিধিত্বের সময়েই ইসলাম ইয়েমেনে প্রবেশ লাভ করেছিল এবং তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইয়েমেনে পারসিক শাসন ছিল অত্যন্ত মোলায়েম। সব ধর্মই সমান স্বাধীনতা উপভোগ করত, মার্জবানের অধীনে বিভিন্ন গোত্রপতি নিজ নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করত।

গোত্রসমূহের বিশুদ্ধ পিতা ইবরাহিম কর্তৃক সুদূর অতীতে প্রতিষ্ঠিত কাবাগৃহ জাতির সর্বাপেক্ষা পবিত্র ইবাদতখানা হিসেবে সমাদৃত ছিল। এখানে প্রত্যেক দিনের জন্য দেবাদিদেব হোবলের চারিপার্শ্বে বিন্যস্ত আকিক পাথরে নির্মিত তিন-শত ষাটটি মূর্তি, দুইটি গজল, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী দ্রুতগামী মৃগ, ইবরাহিম ও তদায় পুত্রের প্রতিমূর্তি শোভিত ছিল। এখানে প্রত্যেক বছর "আদমের সময়ে স্বর্গ থেকে পতিত কালো পাথর (হজরে আসওয়াদ) চুম্বন করতে এবং নগ্ন অবস্থায় কাবাগৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করতে" বিভিন্ন গোত্রের লোক আসত। কাজেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই মক্কা শুধু আরবদের ধর্মীয় যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল না, বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডেরও কেন্দ্র ছিল। অতীতকালের বাণিজ্যের রাজপথে অধিষ্ঠিত থাকায় মক্কা প্রতিবেশী দেশসমূহ থেকে সম্পদ ও সংস্কৃতি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। এমন কি ব্যাবিলনের নৃপতিও তার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির উপর হাত দিতে পারেনি। কারণ অবস্থানের অপরিহার্যতার ফলে হিজাজের আরবগণ বিশ্বের জাতিসমূহের পরিবাহক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

মক্কা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল। ফলে প্রাচ্যের অন্যান্য জাতিসমূহ থেকে আরবগণ সবসময়ে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়েছিল। মক্কা থেকে কারাভাঁর যাত্রা শুরু হত। তারা ইয়েমেন ও ভারতের পণ্যসম্ভার বাইজানটাইন রাজ্যসমূহ ও পারস্যে নিয়ে যেত এবং সিরিয়া থেকে পারস্যের সিল্ক ও অন্যান্য দ্রব্য আনত। তারা বাণিজ্যিক দ্রব্য ছাড়াও অনেক কিছু আমদানী করত। এসব কারাভাঁর সঙ্গে এসে-ছিল বিলাসী জীবনের অভ্যাস ও পাপ যা প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের হৃদপিণ্ড কুরে কুরে খাচ্ছিল। সিরিয়া ও ইরাক থেকে আমদানীকৃত গ্রীক ও পারসিক দাসীরা তাদের নৃত্যগীতের মাধ্যমে ধনীদের অলস মুহূর্তগুলিকে আনন্দে ভরে দিত কিংবা তাদের পাপের ইন্ধন জোগাত। যে সব কবির কবিতা জাতির গর্বের বিষয় ছিল তারা শুধু ঐহিক জীবনের বন্দনা গান গাইতেন এবং জাতির ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে উদ্দীপিত করতেন। কেউই আগামী দিনের কথা ভাবত না।

আরবগণ, বিশেষতঃ মক্কাবাসীগণ গভীরভাবে মদ্যপান, জুয়া ও সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত ছিল। অন্যান্য প্রাচ্য দেশের মতো নৃত্য ও গীত একশ্রেণীর দাসী রমণীরা অনুশীলন করত; তাদেরকে 'কীয়ান', একবচনে 'কায়না' বলা হত এবং তাদের নীতিহীনতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তথাপি তারা সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত ছিল এবং বড়বড় দলপতিগণ তাদের প্রতি প্রণয় নিবেদন করত।[১] হিন্দুদের

১, যে সব নাগরিক সম্বর্ধনায় শহরের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যোগদান করতেন তাতে এ সব রমণী আপ্যায়নের কাজ করত—এ থেকেই জাতির নৈতিক অধঃপতনের সাক্ষ্য মেলে।

শহুরে আরবগণ দাবা খেলায় এত বেশী আসক্ত ছিল যে তারা প্রায়ই টেসিটাসের জার্মানদের মতো তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাজি রাখত। এ সব অনিষ্টকর অনুশীলনের জন্য এবং তার সঙ্গে

মতো বহুবিবাহ অবাধে অনুশীলিত হত। (মাতা ছাড়া) অন্য বিধবা মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত এবং পুত্রের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হত। নারী-শিশু বিক্রয়ের মতো নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবসা ছিল সার্বজনীন।

পর পর অ্যাসিরীয়, গ্রীক ও রোমকদের দ্বারা জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদীরা আরবদের মধ্যেই তাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের ধর্মের সঙ্গে সংঘাতের সেই সুতীব্র মনোভাব বহন করে এনেছিল যা তাদের অধিকাংশ দুর্গতির মূলে ছিল। যাহোক তারা আরবে পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছিল, আর মুহম্মদ (দঃ) যখন নবুয়ত প্রাপ্তির ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন তখন ইয়েমেনে কুহ্‌লানের পুত্র, হিমইয়ার ও কিন্দার বংশধরদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদী ধর্ম পালন করত; খায়বর ও ইয়াসরেবে ইসমাইলী বংশোদ্ভূত বণী কুরাইজা ও বণী নাজির গোত্র ও ইহুদীধর্ম পালন করত, কিন্তু অতি প্রাচীনকাল থেকেই তারা আরবদের মতো স্বদেশী হয়ে গিয়েছিল। নেস্তোরিয়ান ও জ্যাকোবাইট খ্রীষ্টানগণও আরবে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আরবে এই দুই ধর্মাবলম্বী লোকদের প্রভুত্ব বিস্তারের সর্বাপেক্ষা উর্বর প্রদেশসমূহে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পর্যবসিত হত।[১] খ্রীষ্টধর্ম মেসোপটেমিয়ায় প্রতিষ্ঠিত তাগলিবাইত ও বাহরায়েনে বসতি স্থাপনকারী বণী আব্দুল কায়েস গোত্রসমূহের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রবেশ লাভ করতে শুরু করেছিল। ইহা নযরানে বণী হারিস বিন কাব, ইরাকে বণী ইবাদ, সিরিয়ায় গাসানাইড ও কতিপয় খুজাইত পরিবারে এবং লুমাতুল জান্দালে সাকোনি বণী কাল্‌বদের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। সে সমস্ত গোত্র প্যালেস্টাইন ও মিশরের মধ্যবর্তী মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত তাদের কিছু কিছু ছিল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। আরবদের মধ্যে, বিশেষ করে হিমইয়ার বংশোদ্ভূতদের মধ্যেও মাজ্জীবাদ এবং সেবীয় ধর্মের প্রতিনিধি ছিল! বণী আসাম, বুধের, জোধাম, বৃহস্পতির, বণী তাঈ ক্যানোপাসের; কায়েস আইলানের বংশধরগণ, লব্ধক নক্ষত্রের[২]; এবং কোরাইশদের একটি অংশ তিন চন্দ্রদেবীর আল্‌লাত—দীপ্তিমান চন্দ্র, আল্‌মানাত-অন্ধকারাচ্ছন্ন চন্দ্র এবং আল্‌উজ্জা—দীপ্তি-আঁধিয়ার সমন্বিত চন্দ্র—যাদেরকে আল্লাহর দুহিতা (বানাতুল্লাহ) মনে করা হত, তাদের উপাসনা করত। এই সময়ে মক্কা নগরী সুদূরপ্রসারী

সংশ্লিষ্ট অনৈতিক কার্যাবলীর জন্য মুহম্মদ (দঃ) তাঁর অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে জুয়া-খেলা নৃত্য ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছিলেন। উমাইয়া বংশের নৃপতিগণ তিনটি অনিষ্টই পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। প্রভূত পরিশ্রম ক'রে হযরত মুহম্মদ (দঃ) যে প্রাচীন পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন তারা প্রকৃতপক্ষে সেই উৎসাদিত অবস্থার পুনরুত্থান ঘটিয়েছিল।

১. ইবনুল আতাহার, ১ম খণ্ড, ৩০৮ পৃ.; 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব্ দি রোমান এম্পয়োর', ১ম খণ্ড পৃ. ১১৪-১১৫; কসিন দ্য পারসিভ্যাল হিস্ট্রীডাস্ এরাবস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮-১৩১।

২. আল্ কোরআন, সুরা ১২ আ-৩৭।

পৌত্তলিকতার কেন্দ্র ছিল এবং তার শাখা-প্রশাখা সমগ্র আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল। রাজনৈতিক ও বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে কোরাইশদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কিনান আলডোবারণ নক্ষত্র ছাড়াও মক্কা থেকে দেড় দিনের দূরবর্তী নাখলা নামক স্থানে অবস্থিত একটি বৃক্ষ দ্বারা প্রতিবেদিত, দেবী উজ্জার উপাসনা করত। হাওয়াজিম গোত্র মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিচরণ করত এবং তায়েফে অবস্থিত দেবী লাতের মূর্তিই ছিল তাদের প্রিয় উপাস্য। মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী পথের উপর অবস্থিত একটি পাহাড় মানাতের প্রতিবেদন করত। প্রাচীন সেমিটিক, ফিনিশীয় ও ব্যাবিলনীয় জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত উপাসনার প্রকৃতির মতো এই সব মূর্তির পূজা ছিল প্রধানত সৃষ্টিরূপিণী মাতৃপূজা। কিন্তু আরবজাতির অধিকাংশ গোত্র, বিশেষ করে মোজার বংশের অন্তর্গত গোত্রসমূহ এক অত্যন্ত নিম্নস্তরের জড়বাদের প্রতি আসক্ত ছিল। ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ, দ্রুত সঞ্চরণশীল মৃগ, অশ্ব, উষ্ট্র, খেজুর গাছ, পর্বত পাথর ইত্যাদির মতো অজৈব বস্তু প্রধান উপাস্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অবশ্য এক সার্বভৌম ঐশী সত্তার ধারণা অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তার প্রভাব অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমিত ছিল। এই লোকগুলি পৌত্তলিকতার মোহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিবেশী সেবীয়, ইহুদী কিংবা খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় ও পার্থিব পৌরাণিক ধারণা দ্বারা রঞ্জিত দার্শনিক সংশয়বাদের আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক সর্বশক্তিমান আল্লাহর ধারণা স্পষ্ট স্বীকার করত এবং যুগের অশ্লীলতা ও স্থূল জড়বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে একজন পরিত্রাণকারীর আবির্ভাবের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছিল। তারা তাদের অন্তরে অনুভব করত যে শীঘ্রই পরিত্রাণকারীর আবির্ভাব ঘটবে।

কোন কোন গোত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে কবরের উপর উট বলি দেওয়া হত কিংবা অনাহারে মরতে দেওয়া হত এই বিশ্বাসে যে, পরকালে জবেহকৃত পশু মৃতের বাহন হিসেবে কাজ করবে। কেউ কেউ বিশ্বাস করত যে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 'হামা' বা 'ছাদা' নামক পাখির আকৃতি ধারণ করে। যদি কোন ব্যক্তি নিহত হয় তবে পাখিটি কবরের উপর 'আমাকে পানি দাও' বলে আওয়াজ করতে থাকে যতক্ষণ না তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়। জিন, পিশাচ, এবং তাদের বিগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী যা 'আযলাম' বা 'কিদাহ' বলে অভিহিত অর্থহীন তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে প্রাপ্ত হত তাতে বিশ্বাস ছিল সার্বজনীন। প্রত্যেক গোত্রের ছিল বিশেষ বিগ্রহ ও বিশেষ মন্দির। এই সব মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত পুরোহিত ও প্রচারকগণ ভক্তদের নিকট থেকে মূল্যবান উপঢৌকন পেতেন। প্রায়ই বিরোধী মন্দিরের সমর্থক বা উপাসকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাধত।[১]

১. অন্যান্যের মধ্যে ইয়েমেনের জুল খুলাসা মন্দির বণী খাসামদের ; নজদেব রোধা মন্দির বণী খাবিয়াদের ;

কিন্তু ইবরাহিম ও ইসমাইলের প্রতিষ্ঠিত ভজনালয় কাবার খ্যাতি সকল মন্দিরের মধ্যে অমলিন রয়েছে। এমন কি ইহুদী এবং সেবিয়ানরা সেখানে তাদের নৈবেদ্য পাঠাত। এই ভজনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভীষণ ঈর্ষার বস্তু ছিল। কারণ কাবার হিফাজতকারীদেরকে আরবগণ সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক ভূমিকা ও সুযোগসুবিধায় অভিষিক্ত করত। হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর জন্মকালে তাঁর বংশের লোকেরা এই সম্মানের অধিকারী ছিল; তদীয় পিতামহ কাবাগৃহের সেবাইতদের সম্মানিত প্রধান ছিলেন। নরবলি প্রায় অনুষ্ঠিত হত। মন্দিরসমূহে বিশেষ মূর্তি ছাড়াও প্রত্যেক পরিবারের গৃহদেবতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এসব গৃহদেবতাদের প্রতি অনুষ্ঠানাদি অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রতিপালিত হত।

এমনি ছিল আরবদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা। খ্রীষ্টধর্ম কিংবা ইহুদীধর্ম কোনটাই তাদেরকে মানুষের স্তরে উন্নীত করতে সমর্থ হয়নি। মুয়ির বলেন, "খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পাঁচশত বছর পরে আমরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অল্প-সংখ্যক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোকের সন্ধান পেয়ে থাকি—নযরানের বণী হারিস, ইয়েমামার বণী হানিফা, তায়মার কিছু সংখ্যক বণী তাঈ এবং কদাচিৎ-এর বাইরে। ইহুদী ধর্ম তুলনামূলকভাবে বিপুল শক্তির অধিকারী ছিল এবং জু নওয়াজের নেতৃত্বে আকস্মিক ও প্রচণ্ডভাবে ধর্মান্তরিতকরণে মোড় নিয়েছিল। কিন্তু সক্রিয় ও ধর্মান্তকরণে সমর্থ শক্তি হিসেবে ইহুদীধর্ম আর ফলপ্রদ ছিল না। পরিশেষে, ধর্মীয় দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে আরব ভূখণ্ড মাঝে মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের হীনবল প্রয়াসে মৃদুভাবে উত্থান-পতনের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়েছে; ইহুদী ধর্মের তীব্রতর প্রভাব কোন কোন সময়ে গভীরতর ও অধিকতর অশান্তিময় ঘটনাপ্রবাহে দৃশ্যমান হয়েছে; কিন্তু দেশজ পৌত্তলিকতা ও ইসমাইলীয় কুসংস্কারের প্রবাহ, প্রত্যেক জায়গা থেকে কাবার প্রতি নিবদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন ও অক্ষয়িষ্ণু আবেগ প্রভূত সাক্ষ্য বহন করে যে মক্কার ধর্ম ও উপাসনা আরবমননশীলতাকে কঠিন ও বিরোধহীন দাসত্বের নিগড়ে বেঁধে ফেলেছিল।"[১]

ধর্মীয় ও বংশগত পার্থক্য থেকে যে বিরোধী অনুভূতি এক গোত্রকে অন্য গোত্রের সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করত তার সঙ্গে গোত্রসমূহের[২] বিভেদ ও ঈর্ষা অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক, পারসিক ও হাবসীদেরকে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমের বিভিন্ন প্রদেশের অধীশ্বর হতে সাহায্য করেছিল। আবিসিনিয়ার

ইরাকের জু সাবাত মন্দির; সমুদ্র থেকে বেশী দূরে নয় ফোজাইদে মানাতের মন্দির, ইয়াসরিবে বসতিস্থাপনকারী আস ও খাজরাজ গোত্রের এইগুলি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মন্দির।

১. মুয়ির, ১ম খণ্ড, ভূমিকা পৃ. CCXXXIV.

২. এসব গোত্রগত ঈর্ষা ও পারিবারিক কোন্দল যা আমাকে পরে বর্ণনা করতে হবে তা আরব সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

অধিবাসী হাবসীরা 'জাতীয়' ভজনালয় কাবাগৃহ ধ্বংস করার অভিপ্রায় নিয়ে হিজাজ আক্রমণ করেছিল। কিন্তু আব্দুল মুত্তালিবের সবল দেশপ্রেমের দ্বারা তাদের শক্তিমত্তা মক্কার সম্মুখে বিচূর্ণ হয়েছিল। বিশ বছর অত্যাচারের পর বিখ্যাত সায়েক জুল্ ইয়েজেনের পুত্র, একজন স্বদেশী যুবরাজ পারস্যের সাহায্যে তাদেরকে ইয়েমেন থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। খ্রীষ্টানদের দ্বারা নিহত হওয়ার পর মহান পারস্যসম্রাট নওশেরওয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি যে সার্বভৌমত্ব ভোগ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ-রূপে পারসিকদের করতলগত হয়েছিল এবং ইয়েমেন পারস্য সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।[১]

দুটি পরস্পরবিরোধী সাম্রাজ্য কনস্ট্যান্টিনোপল ও টেসিফোন আরবদেশের বিভিন্ন প্রদেশের উপর প্রত্যক্ষ প্রভুত্ব চালিয়েছিল। তা ছাড়াও ঘাসান ও হিরার নৃপতি—দুইজন শীষতম দলপতি সিজার ও খসরুর মধ্যে তাদের আনুগত্য ভাগ করে নিয়েছিল, এবং পারস্য ও বাইজানটাইন পরস্পরের বিরুদ্ধে যে নিষ্ফল ও উদ্দেশ্যবিহীন মারাত্মক যুদ্ধ বাধিয়েছিল তা শুধু ধ্বংস কামনা চরিতার্থের জন্যই জনগণের শোণিত শুষে নিচ্ছিল। যদিও খ্রীষ্টানদের চেয়ে জরথুস্ত্রবাদীদের পক্ষে প্রায়ই ন্যায়সঙ্গত দাবী থাকত, তথাপি ঘাসানবাসী ও হারাবাসীরা যুদ্ধসাজে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হত কিংবা মারাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত।[২]

যে সব মিশ্র উপাদানে আরব উপদ্বীপের জনগণ গঠিত তা দেশের লোকালয়ে নানা বৈচিত্র্য যোগ করেছে। সংস্কৃতিবর্জিত লোকদের প্রবণতা হল পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে ঘটনাকে সবসময়ে সজ্জিত করা। তাদের কল্পনার বস্তুকে শুধু রঙিন করে না, দূরবর্তী বস্তুকে অত্যন্ত বৃহদাকার ক'রে তোলে। সংস্কৃতির বিভিন্নতা কমবেশী বাস্তবনির্ভর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। ইয়েমেন ও দক্ষিণ-পশ্চিমের হেমিটিক উপনিবেশ, পূর্বে আর্যদের মতো প্রকৃত সেমিটিক তাদের অনুসরণ করেছিল, ইহুদী, খ্রীষ্টান—সকলেই তাদের ঐতিহ্য ও পৌরাণিক কাহিনী সঙ্গে করে এনেছিল। কালপ্রবাহে অতীতের এই ধ্বংসাবশেষ একটা স্থায়ী চরিত্র অর্জন করেছিল, আপাতদৃষ্টিতে যতই অসার বলে মনে হোক না কেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বাস্তব অবস্থার একটা স্তর সেখানে বিদ্যমান

১. ইবনুল আসির ১ম খণ্ড পৃ. ৩২৪, ৩২৭; 'কসিন দ্য পারসিভ্যাল' ১ম খণ্ড পৃ. ১৩৮; তাবারী (জোটেনবার্গের অনুবাদ) ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭-২১৮।

২. ইয়েমেন, বাহরায়েন ও ইরাকের আরব জনগণের অলম অংশটি পারসিকদের বশ্যতা স্বীকার করত। এসব প্রদেশের বেদুইনগণ সব বন্ধন থেকে মুক্ত ছিল। সিরিয়ার আরবগণ রোমানদের অধীন ছিল; মেসোপটেমিয়ার আরবগণ পর্যায়ক্রমে রোমক ও পারসিকদের শাসন মানত। মধ্য আরব ও হিজাজের বেদুইনগণ, যাদের উপর হিমাইয়ার বংশোদ্ভূত নৃপতিগণ কমবেশী কার্যকর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করত তারা নামমাত্র পারসিক শাসনের অধীনে এসেছিল, কিন্তু তারা যথার্থরূপে স্বাধীনতা ভোগ করত।

ছিল। শাদ্দাদ ও তার ইরেম স্বর্গের পৌরাণিক আখ্যানে ধূসর অতীতে এক পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের বিচিন্তা দেখতে পাই—চ্যাল্ডিয়ার সদৃশ এক অগ্রগামী সভ্যতা, ব্যাবিলনীয়দের আচরিত এক সদৃশ ধর্মসহ বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের নির্মাতা, একটি ঐশ্বর্যশালী জাতি, যে জাতি এমন কি মিশর জয় করেছিল : অল্পকথায় এমন এক জাতি যাদের ক্ষেত্রে পার্থিব উন্নতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চরম নৈতিক অধঃপতন ও অশ্লীল রীতিনীতি।[১] আদ ও সমুদ জাতির ঐতিহ্যগত, অর্ধ-পৌরাণিক উপাখ্যান গত, অর্ধ-ঐতিহাসিক ধ্বংসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে অ্যাসিরীয় ও আরব, সেমিটিক প্রবাহের পূর্বে ধ্বংসাত্মক নিয়তি হেমিটিকদের পর্যুদস্ত করেছিল।[২]

ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানেরা তাদের নির্মম দুশমনদের থেকে পলায়ন করেছিল এবং হেমিটিকদের সঙ্গে তাদের পৌরাণিক কাহিনী ও ঐতিহ্য একসূত্রে গেঁথে দিয়েছিল। এভাবে তারা আরব উপদ্বীপের লোক-লোরের ক্ষেত্রে তাদের অবদান রেখেছিল। সেমিটিকদের যে শেষ ঔপনিবেশিকগণ আরবে প্রবেশ করেছিল তারা এবং তাদের প্রতিবেশীরা স্বীকার করত যে তারা ইবরাহিমের বংশধর। ঐতিহ্য এই বিশ্বাস বহন করে এনেছিল এবং তাকে রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছিল।

পারস্য ও বাইজানটাইন রাজ্য থেকে উৎপাটিত হওয়ার পর ম্যানেকীয় মতবাদ আরবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[৩] আদি ডোসেট, মার্শিনাট, ভ্যালেনটিনদের সকলেরই প্রতিনিধি এই স্বাধীন দেশে বিদ্যমান ছিল। তারা সকলেই নিজেদের মতামত ও ঐতিহ্য প্রচার করত। কালক্রমে এসব দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এসব খ্রীষ্টান তাদের ধর্মান্ধ জুলুমকারীদের চেয়ে চিন্তার দিক দিয়ে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে খোদার অবতার কিংবা অন্ততঃ-পক্ষে খোদার পুত্র, তাঁর শব্দ অনন্তের কোলেই জন্মলাভ করেছিলেন—তিনি আলোকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত হয়েছিলেন। কাজেই তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেননি, করতে পারেন না। গোঁড়া খ্রীষ্টান ঐতিহ্য যিশুর মুখ দিয়ে যে বেদনার বাণী বের করিয়েছে তা তাঁর মুখনিঃসৃত নয়। সংক্ষেপে যে ব্যক্তি ক্রুশে মৃত্যু-বরণ করেছিল সে ঐশী যিশু থেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ঐশী যিশু তাঁর জুলুমকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই ফিরে গিয়েছিলেন।[৪] এই মতবাদ যতই কল্পনাপ্রসূত হোক না কেন যিশুর পুত্রত্বের ধারণার সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং তা কতিপয় শক্তিশালী সম্ভাব্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রতীয়মান হয়। টারটুলিয়ান যাকে অন্তরে একজন খ্রীষ্টান বলেন সেই পাইলেটের পক্ষে যিশুকে

১. লেনোরম্যান্ট, 'অ্যানসিমেন্ট হিস্ট্রী অব দি ইষ্ট', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬।
২. ইবনুল আসির, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৮।
৩. বিউসবা, 'হিস্ট্রী ডু ম্যানিকিজম', ১. ১. ২. অধ্যায় ৪
৪. মোশেম ও গিবন, প্রাগুক্ত।

বাঁচানোর জন্য সুতীব্র কামনা[১] ; নাজারাথের প্রেরিত পুরুষের হত্যায় অধিকতর ঘৃণা-বিদ্বেষ নিপাতিত হয় সেদিকে হেরোড়ের অনিচ্ছা ; সেই কয়েক ঘণ্টার অন্ধকার যখন মানবতার মহান কল্যাণকামীকে সেই বিভীষিকাপূর্ণ নাটকের চূড়ান্ত অংকের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে নাটক সারা রাত্রিব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল ; এই নাটকের সর্বাপেক্ষা ভীতি-বিহ্বল অংশে অতি প্রাকৃতিক আঁধিয়ার ধরণীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ;[২] এসব সমকালীন ঘটনা, নির্দোষ ব্যক্তি যে পরিত্রাণ লাভ করে-ছিলেন এবং দোষী ব্যক্তি সাজা পেয়েছিল, এই বিশ্বাসের সম্ভাব্যতাকে জোরদার করে তোলে।[৩]

হযরত মুহম্মদের (দঃ) আগমনের পূর্বে তথ্য-নির্ভর ও কল্পনার রংয়ে রঞ্জিত এই সব ঐতিহ্য জনগণের বিশ্বাসের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে বসেছিল এবং দেশের লোকালয়ের অপরিহার্য অংশ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। যখন মুহম্মদ (দঃ) ইসলামধর্ম ও শরীয়তী আইন প্রচার করছিলেন তখন তিনি এই সব ঐতিহ্যকে জনগণের মধ্যে প্রচলিত দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেসব আরবজাতি ও পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহকে সামাজিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে উন্নীত করার জন্য ভারোত্তলন দণ্ড হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন।

যে আলোক সিনাই পর্বতে প্রজ্বলিত হয়েছিল তা গ্যালিলির কৃষক ও মৎস্য-জীবীদের জীবন আলোকিত করেছিল ; সেই আলোক এখন ফারান পর্বতের শিখরে দেদীপ্যমান।[৪]

১. ব্লান্ট, 'হিস্ট্রী অব্ দি ক্রীশ্চান চার্চ, পৃ. ১৩৮।

২. তু মিলম্যান, 'হিস্ট্রী অব ক্রিশ্চিয়ানিটি ১ম খণ্ড পৃ. ৩৪৮-৩৬২।

৩. এই অদ্ভুত বিশ্বাসের স্বপক্ষে যদি কোন কিছু অধিক সম্ভাব্যতার সমর্থন জোগায় তা হল লূক, ২৪, ৩৬-এ প্রদত্ত যিশু সম্পর্কে পরিস্থিতি-সংক্রান্ত বিবরণ। (পুনরুজ্জীবনের পর) ভীতসন্ত্রস্ত শিষ্যদেরকে নিজের শরীর স্পর্শ ও অনুভব করতে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে শান্ত করার জন্য তিনি "মাংস" চেয়েছিলেন এবং একটি ভাজা মাছ ও একটি মৌচাক" থেকে আহারে অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন। কারণ তাঁর সন্ত্রস্ত শিষ্যগণ তাঁকে ভূত বা শক্তি বলেই বিশ্বাস করেছিল।

৪. যে লোক ঐতিহ্যটির ইংরেজি ভাষান্তর করা হয়েছে তা নিম্নরূপ : জায়াল্লাহো মেন্ সিনায়ে ওয়া আশরাকা মেন সায়িরে আও আসতা লানা মেন ফারান।

ইয়াকুত তাঁর ভৌগোলিক বিশ্বকোষে বলেন, "সা য়ির প্যালেস্টাইনের একটি পাহাড় এবং সঙ্গে মক্কার পাহাড়।"

—মুযামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৩৪।

দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের
জীবন ও নবুয়্যতের কার্যকাল

প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

রাসুল মুহম্মদ

সুখ্যাতির ওই শীর্ষশিরে উঠেছিলেন মোদের নবী
মানবগুণের পূর্ণতায় তিনি ধরার ধ্যানের ছবি।
চরিত্রের মাধুরিমায় জুড়ি তার নাইকো কোথাও
তাঁর নূরের রৌশনীতে জমাট আঁধার হল উধাও।
আসুন সেই নবীর 'পরে আমরা সবাই দরুদ পড়ি
তাঁর জীবনের আলোকেতে আমরা মোদের জীবন গড়ি।[১]

—শেখ সাদী।

মূল পঙ্‌তিগুলি সৌন্দর্যে ভাষান্তরের অতীত। আমরা যে মহাপুরুষের জীবন-কথা ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াসী হয়েছি তাঁর স্বভাবের কোমলতা ও চরিত্রের মাহাত্ম্য এই পঙ্‌তিগুলিতে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত হয়নি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ—মক্কার জনপথ—স্কন্ধদেশ পর্যন্ত বিন্যস্ত আরবীয় উষ্ণীষ পরিহিত, তদুপরি চিবুক পর্যন্ত প্রসারিত এক খণ্ড বস্ত্রাচ্ছাদিত,[২] জীবনের মধ্যাহ্ন-অতিক্রান্ত প্রশান্ত চিন্তাশীল জনৈক আরব—কোন কোন সময়ে তিনি ধীরগতিতে ভ্রমণ করছেন, কোন কোন সময়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলছেন, পথচারীদের প্রতি উদাসীন, চতুর্দিকের জমকালো দৃশ্যাবলীর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন। নিজের চিন্তায় গভীরভাবে তন্ময়—তথাপি দীনতম ব্যক্তির সালামের জবাব প্রদানে কুত্রাপি অমনোযোগী নন কিংবা যে সব শিশু তাঁর চারপাশে ভিড় জমাতে ভালবাসে তাদের প্রতি মিষ্টভাষণেও কখনও পরাঙ্মুখ নন। এই মহান ব্যক্তি 'আল্-আমীন্' বা বিশ্বাসী। তিনি এমনি সম্মানজনকভাবে বা

১. এই পঙতিগুলি পারস্যের অমর কবি মোসলেহ্ উদ্দীন শেখ সাদী (রঃ) রচিত বিখ্যাত বালাগাল্ উলা বেকামালিহি·· ওয়া আলিহি-র বাংলা ভাবানুবাদ।
—অনুবাদক

২. একখণ্ড শিরোপরি আচ্ছাদন বস্ত্র যা চিবুকের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম বগলের উপর দিয়ে বিস্তৃত থাকে।

অধ্যাবসায়ের সঙ্গে জীবন নির্বাহ করেছেন যার ফলে তাঁর স্বদেশবাসীর নিকট থেকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত—এই সম্ভ্রান্ত উপাধি পেয়েছেন। কিন্তু এখন তাঁর অদ্ভুত অপরিচিত প্রচারণার জন্য তাঁর শহরবাসীগণ সন্দেহের চোখে তাঁকে দেখতে শুরু করছে একজন বল্গাহীন কল্পনাবিলাসী, একজন উদভ্রান্ত বিপ্লবী হিসেবে যিনি সমাজের পুরাতন পরিচিত নিদর্শনগুলি নিশ্চিহ্ন করতে, প্রাচীন সুবিধাগুলি উঠিয়ে দিতে, পুরাতন ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি প্রত্যাহার করতে ইচ্ছুক।

এই সময়ে মক্কা নগরী যোগাযোগ ও অবস্থান উভয় দিক থেকে আরব জনপদসমূহের মধ্যে প্রভূত গুরুত্ব ও খ্যাতির অধিকারী ছিল। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ঢালু উপত্যকার উপর এই শহর অবস্থিত, পশ্চিমে পর্বতশ্রেণী ও পূর্বে উচ্চ গ্রানাইট পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত—এর কেন্দ্রস্থলে কাবাগৃহ, নিয়মিত ও পাকা রাস্তাসমূহ, সুরক্ষিত গৃহসমূহ, কাবাগৃহের প্রাঙ্গণমুখী গণমিলনায়তনসহ শহরটি সমৃদ্ধি ও শক্তির এক অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা করত। কাবাগৃহের তত্ত্বাবধানের ভার মূলত ইসমাইলের বংশধরদের উপর ন্যস্ত ছিল; ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের ফলে তা জুরহুম-বংশোদ্ভুত লোকদের হাতে চলে যায়। পার্থিব ও ধর্মীয় ক্ষমতার সমন্বয়ের ফলে জুরহুম গোত্রের প্রধানগণ 'মালিক' বা নৃপতি উপাধি ধারণ করে-ছিলেন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে জুরহুম বংশীয় লোকেরা বণী খোজা নামীয়, একটি কাহতান গোত্রের লোকদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়। তারা ইয়েমেন থেকে বহির্গত হয়ে মক্কা ও হিজাজের দক্ষিণ অঞ্চলসমূহ অধিকার করে-ছিল। ইতিমধ্যে ইসমাইলের বংশধরগণ যারা ব্যাবিলনের নৃপতিদের অধীনে ভয়ানকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল তারা ধীরে ধীরে তাদের পূর্বশক্তি ফিরিয়ে আনছিল। ইসমাইলের অন্যতম বংশধর আদনান, যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে জীবিত ছিলেন; তিনি তার এক পূর্বপুরুষের মতো জুরহুম বংশের এক প্রধানের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং মক্কায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তার পুত্র মা'আদ হিজাজ ও নজদের ইসমাইল বংশোদ্ভূতদের যথার্থ আদিপুরুষ। মা'আদের এক বংশধর ফিহ্‌র, গোত্রনাম কুরাইশ। তার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক। এই গোত্রই আরবকে দিয়েছিল তার প্রেরিতপুরুষ ও আইনবেত্তা।

বণী খোজা গোত্র দুই শতাব্দীর অধিক কাল ধরে কাবাগৃহের এবং কাবাগৃহ তাদেরকে যে প্রাধান্য দিয়েছিল তার অধিকার ভোগ করেছিল। শেষ খোজা গোত্র-প্রধান হোলাইলের মৃত্যুতে ফিহরের এক বংশধর

কোসাই[১] যিনি হোলাইলের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন তিনি খোজা-গণকে মক্কার বাইরে তাড়িয়ে দিলেন এবং নিজেই নগরের পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বময় ক্ষমতা দখল করলেন। এভাবে তিনি হিজাজের প্রকৃত শাসনকর্তা হলেন।[২] এখন আমরাও সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর এসে পড়েছি।

মনে হয় কোসাই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে মক্কা নগরীর অধিপতির আসনে সমাসীন হলে এবং অবিলম্বে সুগঠিত ভিত্তির উপর নগরীর শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কোসাইয়ের পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন কুরাইশ পরিবার কাবাগৃহ থেকে যথেষ্ট দূরে অবস্থিত বিক্ষিপ্ত এলাকায় বাস করত। কাবাগৃহের প্রতি তারা যে আত্যন্তিক পবিত্রতা আরোপ করত তাই তাদেরকে তার কাছাকাছি ঘরবাড়ি নির্মাণে বাধা দিত। অরক্ষিত অবস্থায় জাতীয় ভজনালয় যে বিপদের সম্মুখীন ছিল তা নিরীক্ষণ করে তিনি কাবাগৃহ তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ)-এর জন্য চারদিকে পর্যাপ্ত খালি জায়গা রেখে দিয়ে কোরাইশদেরকে ঘরবাড়ী নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেন। যে সব পরিবারের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়েছিল তারা সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করেছিল।

কোসাই নিজের জন্য একটা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদের দরওয়াজা কাবাগৃহের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। এই প্রাসাদে 'দারুন নাদওয়া'[৩] বা পরামর্শ সভা নামে অভিহিত হত। এখানে কোসাইয়ের সভাপতিত্বে সরকারী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। এই দরবারে কোসাইয়ের বংশধর না হলে চল্লিশ বছর বয়সের অনূর্ধ্ব কোন ব্যক্তি প্রবেশাধিকার পেত না। সর্ববিধ দেওয়ানী কাজকর্ম এখানেই সম্পাদিত হত। কোন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে কোরাইশগণ কোসাইয়ের হাত থেকে 'লিওয়া' বা পতাকা গ্রহণ করত। কোসাই নিজেই বল্লমের অগ্রভাগে একখণ্ড শ্বেত বস্ত্র সংযুক্ত করে তা কোরাইশ

---

১. কোসাই ফিহর থেকে পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ। তিনি ৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 'কারাশ' শব্দ থেকে 'কুরাইশ' শব্দের উৎপত্তি। 'কারাশ' অর্থ ব্যবসা করা। ফিহর ও তার বংশধররা ব্যবসায়-বাণিজ্যে আসক্ত ছিল।

২. অতঃপর আমরা খোজা গোত্র সম্পর্কে বলব যখন কুরাইশগণ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে।

৩. অনেকবার এই অট্টালিকা সংস্কার করা হয়েছিল, পরে উমাইয়া বাদশাহ দ্বিতীয় আব্দুল মালিকের শাসনামলে তা মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

দলপতিদের হাতে তুলে দিতেন কিংবা নিজের কোন পুত্রের দ্বারা পাঠিয়ে দিতেন। *'আকদ-উল্‌ লিওয়া' বলে অভিহিত এই অনুষ্ঠান কোসাই কর্তৃক* আরব্ধ হওয়ার পর থেকে আরব সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কোসাই-প্রবর্তিত অন্য একটি রেওয়াজ আরও দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল। যে সব দরিদ্র তীর্থযাত্রী প্রত্যেক বছর মক্কা দর্শন করতে আসত তাদের আহার্যবস্তু প্রদানের প্রয়োজনীয়তা এবং অতিথি সৎকারের কর্তব্য সম্পর্কে কুরাইশদেরকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করে কোসাই তাদেরকে বাৎসরিক দরিদ্র-কর 'রিফাদা' প্রদানে বাধ্য করেছিলেন। এই অর্থ তিনি আইইয়্যামুল্‌ মিনা—কোরবানীর দিন ও তার পরবর্তী যে দুই দিন তীর্থযাত্রীরা মীনায় অতিবাহিত করতেন—এই তিন দিনে দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের আহারের জন্য ব্যয় করতেন। এই প্রথা ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার পরও অব্যাহত ছিল এবং প্রতিবছর মিনাতে হজ চলাকালে খলিফাও তাদের স্থলাভিষিক্ত সুলতানগণের নামে যে খাদ্য বিতরণ করা হত তার উৎপত্তির কারণ। 'নাদওয়া', 'লিওয়া' ও 'রিফাদা' শব্দগুলি কোসাই কর্তৃক পরিচালিত অনুষ্ঠানগুলিকে বুঝায়—জাতীয় পরামর্শ সভা আহ্বান করা ও তাতে সভাপতিত্ব করার ক্ষমতা, পতাকা প্রদানের ক্ষমতা—সামরিক নেতৃত্বের প্রতীক, তীর্থযাত্রীদের আহার্য প্রদানের জন্য কর-আদায়ের ক্ষমতা। এই সব উচ্চ ক্ষমতাসহ কোসাই মক্কা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কূপসমূহ থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার ব্যবস্থাসহ কাবাগৃহের কুঞ্জি সংরক্ষণ করতেন।

এভাবে কোসাই নিজেই প্রধান প্রধান ধর্মীয়, বেসামরিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করতেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ, হাকিম ও প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ। তিনি প্রায় রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতিপত্তি কোরাইশ বংশের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছিল এবং তার সময় থেকে ইসমাইলের বংশধরদের মধ্যে কোরাইশগণ উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব অর্জন করেছিল।

কোসাই ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন।

তিনি জীবদ্দশায় তার জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুদ দারকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর নির্বিবাদে পুত্র পিতার উচ্চ আসনে সমাসীন হন। আব্দুদ দারের মৃত্যুতে তার পৌত্রদের এবং তার ভ্রাতা আব্দু মান্নাফের পুত্রের মধ্যে ভয়ানক বিরোধ শুরু হয়। বিভিন্ন গোত্র,

তাদের মিত্র ও প্রতিবেশীগণ বিবাদমান দুই দলে যোগদান করে। যা'হোক বিরোধের সাময়িক আপোষ হল। এই আপোষ মীমাংসার ফলে 'সিকায়া' ও 'রিফাদা' আব্দ্ মান্নাফের পুত্র আব্দ্ স্ শামসের উপর ন্যস্ত হয়, পক্ষান্তরে 'হিযাবা' 'নাদওয়া'ও 'লিওয়া' আব্দ্ দ দারের পৌত্রদের তত্ত্বাবধানে থেকে যায়। আব্দুস শামস তুলনামূলকভাবে দরিদ্র ছিলেন। তিনি তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কোরাইশদের মধ্যে প্রতিপত্তিশীল ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি তদীয় ভ্রাতা হাশিমের উপর ন্যস্ত করেন; তীর্থযাত্রীদের ভরণপোষণের জন্য কোসাই কর্তৃক কোরাইশদের উপর আরোপিত করের গ্রহীতা ছিলেন হাশিম। এই কর থেকে আহরিত আয় ও হাশিমের ধনসম্পদ হজের মৌসুমে মক্কায় আগন্তুক তীর্থযাত্রীদের আহার্য প্রদানে ব্যয়িত হত।

অধিকাংশ মক্কাবাসীদের মতো হাশিমও বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনিই কোরাইশদের মধ্যে নিয়মিতভাবে মক্কা থেকে দুটি বাণিজ্য যাত্রী-দল প্রেরণের প্রথা চালু করেছিলেন—একটি শীতকালে ইয়েমেনে ও অন্যটি গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায়। হাশিম সিরিয়ায় এক বাণিজ্য অভিযান কালে গাজ্জা শহরে ৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে তার ইয়াসরিব-বাসিনী মহিলা সালমার গর্ভজাত, একমাত্র পুত্র শায়বাকে রেখে যান। তার মৃত্যুর পর 'রিফাদা' ও 'মিকায়া'র দায়িত্ব তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুত্তালিবের উপর ন্যস্ত হয়। তিনি তার স্বদেশবাসীর দৃষ্টিতে উচ্চস্থান লাভ করেছিলেন এবং তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দানশীলতার জন্য মহান উপাধি 'আল্‌ফয়েজ' (দানবীর) পেয়েছিলেন। মুত্তালিব শ্বেতকেশবিশিষ্ট যুবক শায়বাকে ইয়াসরিব থেকে মক্কায় আনয়ন করেছিলেন। শায়বাকে মুত্তালিবের দাস মনে করে মক্কা-বাসীরা তাকে আব্দুল মুত্তালিব বলে অভিহিত করত। ইতিহাসে হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পিতামহ 'আব্দুল মুত্তালিব'—মুত্তালিবের দাস,[১] এই নাম ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত নন।

মুত্তালিব ৫২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ইয়েমেনের কাজওয়ানে মৃত্যু বরণ করেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল মুত্তালিব মক্কা নগরীর শাসন-ব্যবস্থার যথার্থ প্রধান হিসেবে তার উত্তরাধিকার লাভ করেন। এই সময়ে

১. আব্দ্ মান্নাফের পুত্রদের মধ্যে হাশিম প্রথমে মারা যান গাজ্জায়; তারপর আব্দ্ স্ শামস মক্কায়, অতঃপর মুত্তালিব কাজওয়ানে এবং সর্বশেষে নওফেল মুত্তালিবের কিছু পরে ইরাকের সিলমানে।

মক্কার শাসনভার কোসাই পরিবারের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সমবায়ে গঠিত একটি অভিজাততন্ত্রের উপর ন্যস্ত ছিল। আব্দুল মুত্তালিব কর্তৃক পবিত্র কূপ জমজম আবিষ্কার ও তার তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির পরে, দশ জন সিনেটর, যাদেরকে 'শরীফ' বলা হত, তাদের নিয়ে কার্য-নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই দশ জন সদস্য রাষ্ট্রব্যবস্থাপনায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন এবং প্রত্যেক পরিবারের অগ্রজতম সদস্য কিংবা প্রধান বংশানুক্রমিকভাবে তাদের স্থলাভিষিক্ত হতেন। এই পদগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) 'হিযাবা'—কাবাগৃহের চাবির তত্ত্বাবধান ; এটা যথেষ্ট উচ্চ-পর্যায়ের যাজকীয় কার্য। এটা আব্দুদ দারের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হত ; যখন মক্কায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল, তখন তালহার পুত্র ওসমানের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

(২) 'সিকায়া'—পবিত্র জমজম কূপ ও হজযাত্রীদের জন্য পানির তত্ত্বাবধান। এই পদটি হাশিম-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং মক্কা বিজয়ের সময় হযরতের চাচা আব্বাস এই পানি বিতরণের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

(৩) 'দিয়াত' বা দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন। এটা দীর্ঘদিন ধরে তায়েম ইবনে মূর্রা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং হযরতের আবির্ভাব কালে এই কার্যের তত্ত্বাবধানে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে কুহাফা, গোত্রনাম আবুবকর।

(৪) 'সিফারা' বা কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্ব। এই কাজ যে ব্যক্তির দায়িত্বে থাকত তিনি রাষ্ট্রের রাজদূতের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হতেন। তাকে কোরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের মধ্যে মতানৈক্য সম্পর্কে আলোচনা ও মীমাংসা, এমন কি আগন্তুকদের সঙ্গে আলোচনা ও মীমাংসার পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হত। এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন ওমর।

(৫) 'লিওয়া' বা পতাকার সংরক্ষক, যে পতাকার তলে জাতি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করত। এই পতাকার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাষ্ট্রের সকল বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। এই সামরিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল উমাইয়া পরিবারের উপর ; হার্বের পুত্র আবু সুফিয়ান, মুহম্মদের সর্বাপেক্ষা নির্মম শত্রু, এই ফৌজী তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

(৬) 'রিফাদা' বা দরিদ্র-কর পরিচালনা। জাতির দানখয়রাত নিয়ে এই তহবিল গঠিত হত, আর দরিদ্র তীর্থযাত্রী বহিরাগত কিংবা বাসিন্দা

যাই হোক না কেন রাষ্ট্র যাদেরকে আল্লাহর অতিথি হিসেবে বিবেচনা করত তাদের আহার্য প্রদানে এই অর্থ ব্যয় করা হত। আব্দুল মুত্তালিবের পর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল আবু তালিবের উপর ; তার মৃত্যুর পর এই বিভাগের দায়িত্ব আব্দু মান্নাফের পুত্র নওফেলের পরিবারে স্থানান্তরিত হয়। হযরতের সময় আমর বিন হারিস এই কার্যের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(৭) 'নাদওয়া'—জাতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব করা। এই বিভাগের কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রের প্রথম কাউন্সিলার এবং তার পরামর্শে যাবতীয় সরকারী কার্য সম্পাদিত হত। কোসাইয়ের পুত্র আব্দুল উজ্জা পরিবারের আসওয়াদ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর সময়ে এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।

(৮) 'খাইয়্যেমচ'—পরামর্শ কক্ষের তত্ত্বাবধান। এই বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল পরামর্শ সভার অধিবেশন ডাকা, এমন কি সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে আহ্বান করা। মার্রা পুত্র ইয়াখজুম পরিবারের খালিদ বিন ওয়ালিদ এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

(৯) 'খাজিনা' বা রাজস্ব পরিচালনা। এই বিভাগ কাবের পুত্র হাসান পরিবারের আওতাভুক্ত ছিল এবং হারিস বিন কায়েস এই বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

(১০) 'আযলাম'[১] বা তীরনিক্ষেপের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাত হওয়া বিভাগের তত্ত্বাবধান—তীরনিক্ষেপের মাধ্যমে কোন বিষয়ে দেবদেবীদের সিদ্ধান্ত পাওয়া যেত। আবু সুফিয়ানের ভ্রাতা সাফ্ওয়ান এই বিভাগ পরিচালনা করতেন। একই সঙ্গে প্রচলিত প্রথা এই ছিল যে সর্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি সর্বাধিক প্রভাব খাটাবেন এবং রইয়স বা সৈয়দ—সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করবেন। হযরতের সময় আব্বাস ছিলেন প্রথম সিনেটর।

সুবিধা ও ক্ষমতার বণ্টন সত্ত্বেও আব্দুল মুত্তালিবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও প্রভাব তার জন্য বয়ে এনেছিল সন্দেহাতীত প্রাধান্য। জাতীয় প্রথা অনুযায়ী এই সম্মানিত পরিবার—প্রধান কাবাগৃহের উপাস্য বিগ্রহদের কাছে একটি সন্তান উৎসর্গের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং বহুসংখ্যক সন্তান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[২] তিনি তার প্রতিজ্ঞা পালনার্থে

---

১. j (আঃ) যহ, যালামের বহুবচন।

২. আব্দুল মুত্তালিবের বারটি পুত্র ও ছয়টি কন্যা সন্তান ছিল। পুত্রদের মধ্যে হারিস ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কাবাগৃহের অপ্রতিরোধনীয় দেবদেবীর কাছে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহকে বলি দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কিন্তু তা হতে পারেনি। কাবাগৃহের অন্তর্ভুক্ত পিথিয়ার বাণী দ্বারা মনুষ্যজীবনে-বলি-দানের বিনিময়ে একশত উট উৎসর্গের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। তারপর থেকে এই ব্যবস্থাই নির্ধারিত হিসেবে চলে আসছিল।

জুহ্‌রী পরিবারের প্রধান ওয়াহাবের কন্যা আমিনার সঙ্গে আব্দুল্লাহর বিবাহ হয়েছিল। আব্দুল্লাহর বিবাহের পরবর্তী বছর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-সমূহের সমাবেশে পরিপূর্ণ। বছরের শুরুতেই এমন ঘটনা ঘটেছিল যা আরবদেশকে চমকিত করে দিয়েছিল এবং সমগ্র জাতির মধ্যে শিহরণ আনয়ন করেছিল। ইয়েমেনের ভাইসরয় বা বড়লাট, আবরাহা আল্ আশ্‌রাম্ সানাতে একটি ভজনালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কাবাগৃহের পবিত্রতা মক্কায় যে ধনসম্পদ আকর্ষণ করত তিনি তার নিজস্ব শহরে তা প্রবাহিত করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। একজন মক্কাবাসী কর্তৃক সেই ভজনালয় অপবিত্র হলে তিনি তার অভিপ্রায় প্রকাশের সুযোগ পেলেন এবং কাবাগৃহ ধ্বংস করার জন্য জাঁকজমকের সাথে একটি সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তিনি এক বিরাট বাহিনী পরিচালনা করে-ছিলেন। এক সুবৃহৎ বাহিনীর মাঝখানে গমনরত বিশাল প্রাণীটির দৃশ্য আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের এতই হতবাক করে দিয়েছিল যে এই ঘটনা থেকে তারা একটি বর্ষের নামকরণ করেছিল এবং এই বর্ষের নাম দিয়েছিল হস্তীর বছর (৫৭০ খ্রীঃ)। আবিসিনীয়গণ অগ্রসর হলে নারী ও শিশুসহ কুরাইশগণ নিকটবর্তী পাহাড় পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং

অন্যান্যদের মধ্যে আব্দুল উজা ওরফে আবু লাহাব—হযরতের জুলুমকারী, আব্দ্‌ মান্নাফ—তিনি আবু তালিব নামে সমধিক পরিচিত—৫৪০ খ্রীঃ জন্ম ৬২০ খ্রীঃ মৃত্যু ; জোবায়ের ও আব্দুল্লাহ (৫৪৫)—আমরের কন্যা ফাতিমার গর্ভজাত ; ধিরার ও আব্বাস (৫৬৬—৬৫২)—মুতাইলার গর্ভজাত, মুকাইম, জাহ্‌ম ওরফে গায়জাক (উদার হৃদয়) ও হামজ্জা—হালার গর্ভজাত। কন্যাগণ হল আত্তিকা, ওমায়মা, আরওয়া, বার্রা, উম্মী হাকিম ওরফে আল বায়জা (সুন্দরী)—ফাতিমার গর্ভজাত, এবং সাফিয়া—হালার গর্ভজাত। তিনি প্রখ্যাত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের-এর পিতামহ আয়ওয়ামকে বিবাহ করে-ছিলেন জোবায়ের ইসলামের ইতিহাসে বিরাট অবদান রেখেছিলেন। আবদুল মুত্তালিবের অপর দুই পুত্রের নাম অপরিজ্ঞাত—সম্ভবত তারা কোন সন্তান রেখে যাননি বলে।

সেখানে থেকে ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করছিল। তাদের সবসময়ে প্রত্যাশা ছিল যে দেবদেবীগণ তাদের আবাসগৃহ রক্ষা করবেন। যখন আবিসিনীয়গণ মক্কার সমীপবর্তী হল তখন প্রাতঃকাল—আকাশ নির্মেঘ। কিন্তু ঐতিহ্য-বাদীরা বলেন যে, দেখতে দেখতে ছোট ছোট আবাবিল পাখিতে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। এইসব পাখি হতভাগ্য সৈন্যদের উপর ছোট ছোট কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল। এইসব কঙ্কর মানুষ ও অশ্বের বর্ম ভেদ করে অভিযানকারীদের মধ্যে ভয়াবহ ভীতির সঞ্চার করেছিল। এ সময়ে আকাশের দ্বারও খুলে গিয়েছিল, মুষলধারায় বৃষ্টি নামছিল এবং বৃষ্টির পানির প্রবল স্রোতে মৃত ও মুমূর্ষুদের সাগরের অভিমুখে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

আবরাহা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় সানাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে পৌঁছার অল্পকাল পরেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা করার পর ইবনে হিশাম বলেন, "এই একই বছরে আরব-দেশে সর্বপ্রথম বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছিল।" কসিন দ্য পারসিভেল বলেন, "এই নিদর্শন ঘটনার অলৌকিক ব্যাখ্যার নির্দেশক।" যে কোন লোক পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে সেনাচেরিরের ভাগ্য যেভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিল তেমনিভাবে কোন ভয়াবহ মহামারী আবরাহার সৈন্য-দলকে ধ্বংস করেছিল ; আর তার সঙ্গে সম্ভবত যুক্ত হয়েছিল এক তুমুল বারিবর্ষণ যা মক্কা-উপত্যকায় প্রায়ই ভয়ানক প্লাবন আনত।

এই ঘটনার অল্পকাল পরে ইয়াসরিব শহরে গমনকালে পঁচিশ বছর বয়সে আব্দুল্লাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১] এর কয়েকদিন পরে তার বিয়োগ-বিধুরা স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তার নাম রাখা হল মুহম্মদ। হস্তী বছরের ১২ই রবিউল আউয়াল, আবিসিনীয় সৈন্যবাহিনী ধ্বংসের পঞ্চাশ দিনের কিছু পরে, ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২] ঐতিহ্যবাদীরা বলেন যে তাঁর জন্মকালে এমন কতকগুলো চিহ্ন ও অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল যা থেকে জগতের মানুষ জানতে পেরেছিল যে পরিত্রাণকারীর আবির্ভাব ঘটেছে। বুদ্ধিবাদী ঐতিহাসিকেরা মুচকি হাসেন, ধর্মীয় তার্কিকগণ যারা পূর্বসিদ্ধ যুক্তির উপর ভিত্তি করে তারকা অনুসরণে প্রদত্ত জ্ঞানীদের বিবরণ বিনা মন্তব্যে গ্রহণ করেন

১. তার মামা, আদী পুত্রদের অধিকৃত অঞ্চলে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

২. খসরু নওশেরওয়ানের শাসনের চল্লিশ বছরের শেষের দিকে এবং সেলুসিডা বর্ষের ৮৮০ বছর পূর্তির শেষের দিকে।

তারা এসব অলৌকিক ঘটনায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। যেসব সমালোচক ছাত্রের হৃদয় পূর্ববর্তী চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে সমবেদনাশূন্য নয় এবং যারা পূর্ব-সিদ্ধ ধারণা দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট নয় তাদের কাছে মুসলমান-কথিত "চিহ্ন ও অশুভ লক্ষণ" যা হযরতের জন্মের সঙ্গে উপস্থিত ছিল তা এমন ঘটনা যা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দাবীদার। আমরা আধুনিকেরা সাধারণ ঘটনা-বলীর মধ্যে ব্যক্তি ও জাতির জীবনে এক অমোঘ নিয়মের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি; তাহলে এতে বিস্ময়ের কি আছে যে ১৪০০ শত বছর পূর্বে তারা জাতির স্মৃতি-চিহ্নের পতনে ঐশী হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যা অনিবার্য নিয়তির নির্দেশক, যা তার পাপের ক্ষেত্রে ধ্বংস আনয়ন করত। আরব-জাতির প্রথানুযায়ী, হাওয়াজিন শাখার বণীসাদ গোত্রের এক বেদুইন মহিলার[১] নিকট জন্মের পরেই শিশু মুহম্মদের লালনপালনের ভার অর্পিত হয়েছিল; মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেবার পর মা আমিনার গভীর অপত্য-স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মা আমিনা পরলোক গমন করেন। পিতৃমাতৃহীন শিশুর লালন-পালনের ভার পড়ল পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের উপর। অল্প যে কয়েক বছর তিনি জীবিত ছিলেন অতিশয় আদরযত্ন সহকারে পৌত্রের দেখাশোনা করতেন। কিন্তু পিতামাতার স্নেহ ও আদর যা সন্তানের জন্য আশীর্বাদ তার অভাব অন্য কিছুতেই পূরণ হয় না। তিনি জন্মগ্রহণ করবার পূর্বেই পিতাকে হারিয়ে-ছিলেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর তখন মাতাকে হারিয়েছিলেন এবং অপূরণীয় ক্ষতি সংবেদনশীল শিশুমনের উপর গভীর রেখাপাত করে-ছিল। এর তিন বা চার বছর পর তিনি তাঁর পিতামহকেও হারান। ৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দের[২] দিকে আব্দুল মুত্তালিব সানা থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্প-কাল পরেই মারা যান। পারসিকদের সাহায্যে জুল ইয়েজেনের পুত্র সায়েফের তোব্বাসের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য কোরাইশদের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।

---

১. পরবর্তী জীবনে যখন এই বেচারী বেদুইন রমণী কোরাইশদের দ্বারা বন্দী হয়ে মক্কায় আনীত হয়েছিল তখন হযরত মুহম্মদ আনন্দ-উদ্বেল সাশ্রু নয়নে তাকে চিনেছিলেন এবং তাঁর সম্পদশালিনী স্ত্রীর নিকট থেকে ধাত্রীমাতার মুক্তিপণ সংগ্রহ করেছিলেন।

২. আব্দুল মুত্তালিব সিকায়্যা ও রিফাদা—এই দু'টি বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। জমজম কূপের রক্ষণাবেক্ষণসহ সিকায়্যা তার পুত্র আব্বাসের উপর ন্যস্ত হয়। আর দ্বিতীয় কাজটি আবু তালিবের উপর বর্তে।

আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীন শিশুর জীবনে আরেক নূতন অধ্যায় সূচিত হল। মৃত্যু-শয্যায় বৃদ্ধ পিতামহ তাঁর লালন-পালনের ভার আবু তালিবের উপর ন্যস্ত করে যান এবং আবু তালিবের গৃহেই তিনি তাঁর প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন। আমরা প্রায়ই বালক মুহম্মদকে উৎসুক ও চিন্তাশীল দেখি, যেন তিনি ভবিতব্যকে দেখেছেন, এমন গভীর সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাচার নিরাবরণ সাদাসিধে পরিবারের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত দেখতে পাই কিংবা প্রকৃতির সুষমা নিরীক্ষণ করতে প্রায়ই মরুভূমিতে চলাফেরা করতে দেখি। তিনি মিষ্টভাষী ও কোমল স্বভাব এবং মানুষের দুঃখদুর্দশার প্রতি অত্যধিক সংবেদনশীল। মরুভূমির এই পবিত্র হৃদয় সন্তান তাঁর ক্ষুদ্র পরিচিত মহলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; আর চাচা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে গভীরতম অনুরাগ বিরাজ করত। "আল্লাহর ফিরেশতারা তাঁর হৃদয় উন্মোচিত ক'রে ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন।" তাঁর প্রথম জীবন পরিশ্রমের ভারমুক্ত ছিল না। চাচার মেষপাল চরাতে তাঁকে প্রায়ই মরুভূমিতে যেতে হত। হাশিম ও আব্দুল মুত্তালিবের রাজকীয় ঐশ্বর্য তাদের উত্তরাধিকারীদের ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পায় এবং অর্থাভাবের দরুন হাশেমীয়গণ তাদের নেতৃত্ব দ্রুত হারাতে থাকেন। তীর্থ-যাত্রীদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব বিরোধী উমাইয়াদের হস্তে ন্যস্ত হয়। উমাইয়ারা হাশিমের সন্তানদের প্রতি সর্বদা চরমতম ঈর্ষা পোষণ করত।

মুহম্মদ সবেমাত্র শিশু যখন 'গাজাতুল ফিজার' বা অবমাননাকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধ নানা ভাগ্য বিপর্যয় ও বহু মানুষের প্রাণ-হানির মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল চলেছিল। ওকাজ নামক স্থানে এই যুদ্ধ বাধে—একদিকে কোরাইশ ও বণী কিনানা এবং অন্যদিকে কায়েম ও আয়লান গোত্র। আরবের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এই স্থানে পবিত্র জুল্‌কাদ মাসে এক বার্ষিক মেলা বসত। তখন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কিংবা ক্রোধের বশে মানুষের রক্তপাত করা নিষিদ্ধ ছিল—এ ছিল "এক ধরনের ঐশী যুদ্ধ-

---

আবু তালিব মক্কা নগরীতে বিশেষ ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি এই 'রিফাদা'র ভার তার সন্তানদের উপর ন্যস্ত করেননি। তার মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব আব্দ্ মান্নাফের পুত্র নওফেলের পরিবারে হস্তান্তরিত হয়েছিল। মক্কা যখন হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করে তখন আমরের পুত্র হারিস—নওফেলের পৌত্র 'রিফাদা'র পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।—জৈনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

বিরতি"। অন্যান্য মেলা বসত মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত মারুজ জুহ্‌রানের নিকটবর্তী মাজনায় এবং আরাফাত পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত জুল্‌ মার্জাজে, কিন্তু ওকাজের মেলা ছিল এক বিরাট জাতীয় ব্যাপার। এখানে এই পবিত্র মাসে সর্ববিধ শত্রুতা ও গোত্র-বিরোধ মুলতুবী থাকত বলে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও দূরবর্তী দেশ থেকে বিশ্বের বাণিজ্যসম্ভার এখানে জমায়েত হত। এখানে হিজাজ ও নজদের "আরবের আশীর্বাদধন্য" ব্যবসায়ীদের আগমন ঘটত; আগমন ঘটত মরুভূমির কবি—বীরদের, অভিনেতাদের, যারা প্রায়ই রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের ছদ্মবেশে মুখোশ বা আবরণ পরিহিত অবস্থায় তাদের কবিতা আবৃত্তি করত ও সমবেত জাতির অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়োত। ওকাজ ছিল "আরব দেশের অলিমপিয়া"; এখানে তারা শুধু বাণিজ্য করতেই আসত না—তারা আসত তাদের পরাক্রম ও গৌরব গাঁথা ঘোষণা করতে—কবিত্ব-শক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রদর্শন করতে। 'কাসিদাস' সমবেত জনগণের প্রশংসা অর্জন করেছিল—এ সব কবিতা সোনালী অক্ষরে লিখে পরবর্তী বংশধরদের জন্য স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে জাতীয়-ভজনালয় কাবাগৃহে টাঙিয়ে রাখা হত।[১] এই উৎসবের সপ্তাহগুলিতে ওকাজ আনন্দ ও উত্তেজনার জমকাল দৃশ্য ধারণ করত। কিন্তু এই চিত্রের অন্যদিকও ছিল। নর্তকীগণ তাদের আধুনিক প্রতি-নিধি, মিশরের 'আলমাস্‌ ও গাওয়াজিন'দের মতো তাবু থেকে তাবুতে গমন করত ও তাদের গান ও স্ফূর্তির মাধ্যমে মরুভূমির প্রমত্ত সন্তানদেরকে উত্তেজিত করত; করিন্থবাসীদের মতো লম্পটদের সমাবেশ ঘটত যারা সঙ্গীতের পেশাতেও ভাণ করত না; মদ্যপায়ী লম্পট ও হৈহুল্লোড়কারীরা প্রায়ই তুমুল বাকবিতণ্ডা ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হত; জুয়ার আড্ডায় মক্কার জুয়াড়ীরা সারা রাত কাটিয়ে দিত; প্রতিদ্বন্দ্বী কবিদের তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বগুলো যে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ উদ্দীপিত করত তা সহসা প্রকাশ্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং স্থায়ী ও প্রলয়ঙ্করী বিবাদের রূপ পরিগ্রহ করত। এসব ওকাজের চিত্রকে বিষাদের কালিমায় আবরিত করত: এসব চিত্র আমিনার এতিম সন্তানের মনের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

এই ভ্রাতৃঘাতী প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের মধ্যবর্তী বিরতিকালে—এই যুদ্ধকে অবমাননাকর যুদ্ধও বলা হয়েছে কেননা এই বিশেষ মাসে সব বিবাদ-বিসম্বাদ নিষিদ্ধ—মুহম্মদ তাঁর চাচা ও অভিভাবক আবু তালিবের

---

১. এই সব কবিতা 'মুয়াল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত কবিতাবলী' নামে অভিহিত হত।

সঙ্গে বাণিজ্য ব্যপদেশে সিরিয়ায় গমন করেছিলেন।[১] এখানে এসে সামাজিক দুরবস্থা ও ধর্মীয় অধঃপতনের দৃশ্য তাঁর চক্ষুর সম্মুখে উন্মোচিত হয়েছিল। যা তাঁর স্মৃতিতে কোনদিন ম্লান হয়নি। নানাবিধ চিন্তা অন্তরে নিয়ে নীরবে ও বিনয় সহকারে নিঃসঙ্গ পিতৃমাতৃহীন বালক শিশু থেকে নবীনে এবং নবীন থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে পরিণত হন।

জাতির লৌকিক কাহিনী সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, কিন্তু আধুনিক অর্থে শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তা তাঁর ছিল না। স্বীয় জাতির লোকদের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে তিনি তাদের থেকে বহু দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন; একটি উচ্ছৃঙ্খল সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র, একটি ক্ষয়িষ্ণু ও নীতি-ভ্রষ্ট যুগের চলমান পরিদৃশ্যের উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল অভিনিবিষ্ট। মক্কাবাসীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যথেচ্ছাচার, ওকাজ মেলায় যোগদানকারী বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সহসা উদ্দীপিত কারণবিহীন ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, কোরাইশদের নীতিহীনতা ও সঙ্কিণ্ণতা স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল যুবক মুহম্মদের মনে তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছিল।

পঁচিশ বছর বয়সে মুহম্মদ জ্ঞাতী স্ত্রীলোক, খাদিজা নাম্নী এক মহাপ্রাণা কোরাইশ রমণীর প্রতিনিধি বা ব্যবস্থাপক হিসেবে আরও একবার সিরিয়ায় গমন করেছিলেন। যে বিজ্ঞতার সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন করেছিলেন তা খাদিজার নিকট অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং এই প্রতিক্রিয়া ক্রমশ অনুরাগে রূপান্তরিত হয়েছিল। অল্প-কাল পরেই মুহম্মদ ও মহাপ্রাণা জ্ঞাতী মহিলার মধ্যে বিবাহের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সার্বজনীন আনন্দোল্লাসের ভেতর দিয়ে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়েছিল। এ বিবাহ এককভাবে সুখী বিবাহ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। মুহম্মদ ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে বয়সের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও—স্ত্রী স্বামী অপেক্ষা অধিক বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর অনুরাগ বিদ্যমান ছিল। এই বিবাহ "তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল শান্তি ও প্রাত্যহিক পরিশ্রম থেকে মুক্তি যা তাঁর মহান কার্যে তাঁর মনকে প্রস্তুত করার জন্য অপরিহার্য ছিল। এ ছাড়াও তিনি লাভ করেছিলেন এক অনুরক্তা নারীর

১. আবু তালিব তদীয় পিতা ও পিতামহের মতো সিরিয়া ও ইয়েমেনের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়েছিলেন। তিনি দামেস্ক, বসরা ও সিরিয়ার অন্যান্য স্থানে হিজাজ ও হিজরের খেজুর এবং ইয়েমেনের সুগন্ধি দ্রব্য রপ্তানি করতেন এবং বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানী করতেন।

হৃদয়, যিনি সর্বপ্রথম তাঁর নবুয়্যতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। যিনি তাঁর হতাশার মুহূর্তে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য, এবং যখন কোন ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করত না, এমন কি তিনি নিজেকেও বিশ্বাস করতেন না এবং যখন তাঁর নয়ন সম্মুখে প্রগাঢ় অন্ধকার বিদ্যমান ছিল, তখন তিনি তাঁর মধ্যে আশার দোদুল্যমান আলোক শিখা জাগরুক রাখার নিমিত্ত সদাপ্রস্তুত ছিলেন।"

খাদিজা মুসলিম নারীজগতের স্মরণীয় চরিত্র ও আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। যে মিথ্যা অপবাদ মুহম্মদের জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আরোপিত হয় যে এতে নারীজাতিকে অবনমিত করা হয়েছে তা মুসলমানদের কাছে তাঁর সহধর্মিণী এবং কনিষ্ঠা কন্যা ফাতিমা যে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিতা আছেন তা দ্বারা পর্যাপ্তরূপে খণ্ডিত হয়েছে। খাদিজার গর্ভে মুহম্মদের তিন পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু সব পুত্রসন্তান শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে, এবং তাদের অকাল মৃত্যু বিয়োগ-বিধুর পিতৃহৃদয় যেভাবে উদ্বেলিত করে তাতে বিরোধী কোরাইশগণ পরবর্তীকালে নবী মুহম্মদের প্রতি নিন্দনীয় উপাধি আরোপ করেছিল।[১] কন্যাগণ নবুয়্যত লাভের পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। নিজের অবস্থানগত-মর্যাদার তাগিদে কিংবা তাঁর জন্মভূমির প্রয়োজন ব্যতিরেকে তিনি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হননি ; বিবাহের পরবর্তী পনের বছর ছিল তাঁর জীবনের অন্তদর্শন, প্রস্তুতি ও আধ্যাত্মিক যোগ-সাধনের নীরব নির্ঘণ্ট। আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর থেকে মক্কার কর্তৃত্বভার কমবেশী বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক সিনেটর বা ব্যবস্থাপক একরূপ সীমিত কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন এবং বিভিন্ন কার্যের মধ্যে প্রশাসন বিভাগ ছিল না, যার ফলে নাগরিকগণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অধিকার ও সম্পত্তি ভোগ করতে পারত না। রক্ত ও পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধন অন্যায় ও জোরজবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রত্যেক নাগরিককে কিছুটা আশ্রয় দান করত ; কিন্তু আগন্তুক-দেরকে সব ধরনের জুলুম সহ্য করতে হত। প্রায়ই তাদেরকে লুণ্ঠনের সম্মুখীন হতে হত—তাদেরকে কেবল দ্রব্যসম্ভার, অর্থসম্পদই হারাতে হত না, স্ত্রী-কন্যাদেরকেও হারাতে হত। বণী কায়ান গোত্রের একজন বিখ্যাত কবি হানজা৹া—আবু তামাহান নামে তিনি সমধিক পরিচিত—আব্দুল্লাহ

১. কোরাইশরা হযরতকে 'আবতার' উপাধি দিয়েছিল—শব্দটির আক্ষরিক অর্থ লেজ বা লাঙ্গুলবিহীন—ভাবার্থ নিঃসন্তান।

বিন জুদান নামক একজন বিখ্যাত কোরাইশের মক্কেল হিসেবে মক্কা শহরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও জনসাধারণের সমক্ষে শহরের রাজপথে লুণ্ঠিত হন। নীতি-হীনতার অপর একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত অবস্থাকে অধিকতর গুরুতর করে তুলেছিল। মুহম্মদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হাশিম ও মুত্তালিবের বংশধরগণ এবং জুহ্‌রা ও তায়াম পরিবারের প্রধান সদস্যগণ একটি পবিত্র শপথের মাধ্যমে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন যে প্রত্যেক ব্যক্তি, সে মক্কাবাসী বা আগন্তুক হোক, স্বাধীন নাগরিক বা দাস হোক, মক্কার যে-কোন এলাকায় তাকে যে-কোন অন্যায় বা অবিচারের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে হবে এবং তার প্রতি অত্যাচারীর যে-কোন জুলুমের প্রতিকার করতে হবে। এই বিরোচিত সঙ্ঘ জুরহুম বংশের লোকদের মধ্যে অনুরূপ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন সংগঠনের স্মরণে 'হিলফুল ফুজুল' নাম গ্রহণ করেছিল এবং চারজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ফজল, ফজাল, মুফাজ্জাল ও ফুজাইল, একত্রে ফুজুল, সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। মুহম্মদ এই নূতন সঙ্ঘের প্রধান সদস্য ছিলেন; তাঁর বিবাহের অল্পকাল পরেই, ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এই সঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল। এই 'ফুজুল সঙ্ঘ' দুর্বল ও মজলুম মানুষের সংরক্ষণে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিল এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম বর্ষেই এর হস্তক্ষেপে সবল ভীতি-প্রদর্শন বলশালীর আইন-শৃঙ্খলা লঙ্ঘন দমনে এবং সহায়হীনের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার বিধানে যথেষ্ট ছিল। এই সঙ্ঘ ইসলামের প্রথম শতাব্দীর অর্ধাংশ পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে সক্রিয় ছিল। 'হিলফুল ফুজুল' প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শুরুর দিকে হুয়ারিসের পুত্র ওসমান বাইজানটাইনের অর্থপুষ্ট হয়ে হিজাজকে রোমানদের অধীন রাজ্যে পরিণত করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। মুহম্মদের কর্তৃত্বপ্রভাবে তার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং ওসমান সিরিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল; পরবর্তীকালে সেখানে খাসানিয়া যুবরাজ তাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল। মুহম্মদের পঁয়ত্রিশ বছর বয়ঃক্রমকালে ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরাইশরা কাবাগৃহের পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিল। এই কাজ চলাকালে কাবাগৃহের পুনর্নির্মাণে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে এমন একটি কলহের সূত্রপাত হয়েছিল যার ফলে এক সময়ে ভয়ানক রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মুহম্মদের ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপের ফলে তার সন্তোষজনক সমাধান ঘটেছিল। এই পনের বছরের মধ্যে এসব জনহিতকর কার্য তিনি করেছিলেন। কোমল স্বভাব, চরিত্রের তপশ্চর্যা, জীবনের কঠোর বিশুদ্ধি, বিবেক-সম্পন্ন শিষ্টাচার, দীন

ও দুর্বলের প্রতি সদা প্রস্তুত সাহায্য, সম্মানবোধের মহৎ ধারণা, অবিচলিত বিশ্বস্ততা, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা তাঁকে তাঁর স্বদেশবাসীর নিকট মহান আল-আমীন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

এই সময়ে তিনি চাচা আবু তালিবের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুটা লাঘব করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন—তদীয় পুত্র আলীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করে। পরিবারের পূর্বতন অবস্থা বজায় রাখতে গিয়ে আবু তালিবকে আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দকে অনেকাংশে সঙ্কুচিত করতে হয়েছিল। মুহম্মদের সঙ্গে খাদিজার পরিণয়ের ফলে মুহম্মদ সম্পদশালী হলেন, এবং আবু তালিবের ভ্রাতা আব্বাস মক্কার সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী নাগরিক ছিলেন। একবার দেশের নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময়ে মুহম্মদ তদীয় চাচা আব্বাসকে আবু তালিবের একটি পুত্রের প্রতিপালনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং তিনি নিজেও তাঁর চাচার অপর একটি পুত্রের প্রতিপালনের ভার নিয়েছিলেন। এভাবে আব্বাস জাফরকে এবং মুহম্মদ আলিকে গ্রহণ করে-ছিলেন; আকিল তার পিতার সঙ্গেই ছিল।[১] শিশু অবস্থায় মুহম্মদের পুত্রদের অকাল মৃত্যু ঘটে। আলীর প্রতি অপত্য স্নেহের ভেতর দিয়ে তিনি পুত্রদের বিয়োগ-ব্যথার সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন এবং মুহম্মদের কনিষ্ঠা কন্যা ফাতিমার[২] সঙ্গে আবু তালিবের পুত্র আলীর ভাবী বিবাহ স্নেহ ও আনুগত্যের বন্ধন চিরস্থায়ী করে দিয়েছিল।

এই সময়ে মুহম্মদ একটি মানব-হিতৈষী কাজের মাধ্যমে তাঁর দেশ-বাসীর কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এই কাজটি তাঁর স্বদেশবাসীর উপর হিতকর প্রভাব বিস্তার করেছিল, জায়িদ বিন হারিস নামক এক আরব যুবককে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বন্দী করে মক্কায় নিয়ে এসেছিল এবং খাদিজার এক ভাগিনেয়ের কাছে বিক্রয় করেছিল। খাদিজাকে উক্ত যুবকটিকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। মুহম্মদ খাদিজার নিকট থেকে যুবকটিকে উপঢৌকন হিসেবে পেলেন এবং অবিলম্বে তাকে মুক্ত করে দিলেন। মুহম্মদের তরফ থেকে এই দয়ার কাজটি যুবকটির মধ্যে এতই অনুরাগ সৃষ্টি করেছিল যে পিতার সনির্বন্ধ অনুনয় সত্ত্বেও মুহম্মদকে পরি-ত্যাগ করে সে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যায়নি।

এ:পে প্রয়াস ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পনের বছর কেটে

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ১০০; আল্ হালাবী 'ইনসানুল য়ুয়ান' ২১২শ খণ্ড; ইবনুল আছির ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২।

২. ফাতিমা ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

গেল। এই বছরগুলো অনেক দুঃখ-দুর্দশার সাক্ষী ; কিন্তু মুহম্মদ মানুষের দুঃখবেদনার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলেন।

তিনি দেখেছিলেন যে তাঁর স্বদেশ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধবিগ্রহ ও আন্তগোত্রীয় বিবাদ-বিসম্বাদের দ্বারা রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত, দেশবাসী অজ্ঞতার তিমিরে নিমজ্জিত, অশ্লীল আচার-আচরণ ও কুসংস্কারে আসক্ত এবং মরুভূমির সদগুণাবলী থাকা সত্ত্বেও উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুর। দু'বার সিরিয়ায় গমন অনির্বচনীয় নৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের দৃশ্যের প্রতি তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল, বিরোধী ধর্মমত ও সম্প্রদায় একে অন্যকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করছিল, যে ঈশ্বরের উপাসনা তারা করছিল তাকে নিয়ে তারা বিবাদ-বিসম্বাদ করছিল ; হিজাজের মরুভূমি ও উপত্যকায় তারা বিদ্বেষ বহন করছিল এবং তাদের ঝগড়া ও রেষারেষি দ্বারা আরবের শহর এলাকাসমূহ ছিন্নবিছিন্ন করছিল। তাঁর নয়নের সামনে নিরতিশয় হতাশার ছবি ফুটে উঠেছিল। অল্পসংখ্যক লোকেই তাদের প্রাচীন বিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের জন্য অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিল এবং এদের মনোভঙ্গীর মধ্য দিয়ে অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছিল।[১] তাদের মানসলোকে এমন কিছুই ছিল না যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে মানবজাতির কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। মুহম্মদ (দঃ)-র আত্মা ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে সৃষ্টি, জীবনমৃত্যু, ইষ্ট-অনিষ্টের রহস্যের যবনিকা ভেদ করার এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা খুঁজে পাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। আল্লাহর যে বাণী মুহম্মদের কাছে নাজিল হয়েছিল তা অবশেষে জগতের প্রাণসঞ্চারী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিবাহের পর থেকে কোন কোন সময়ে

জায়েদ, ওয়ারাকা বিন নওফেল—খাদিজার জ্ঞাতি-ভাই এবং ওয়াবায়দুল্লাহ ও ওসমান—এই চারজন লোক স্বদেশবাসীর পৌত্তলিক ধর্ম পরিহার করে প্রকৃত ধর্মের অন্বেষণে বের হয়েছিলেন। জায়েদ ছিলেন তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ঈসা (আঃ)-এর মতো হযরত মুহম্মদ (দঃ) খোদার সান্নিধ্য লাভের জন্য নিজকে ধ্যানমগ্ন হওয়ার পূর্বে জায়েদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং পৌত্তলিকতার প্রতি জায়েদের বীতস্পৃহা ও বিতৃষ্ণাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে জায়েদের জ্ঞাতি-ভাই যখন হযরতকে জায়েদের আত্মার জন্য আল্লাহর মাগফেরাত কামনার জন্য অনুরোধ করেছিল, হযরত তা সানন্দে করেছিলেন, যদিও তিনি নিজের পিতামহের জন্য কোন প্রার্থনা করেননি, কারণ তিনি পৌত্তলিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।—ইবনে হিশাম, পৃ. ১৪৩।

পরিবারসহ, বেশীর ভাগ সময়ে একাকী হিরা পর্বতের[১] গুহায় গিয়ে প্রার্থনা করা এবং ধ্যানমগ্ন হওয়া তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। হিরা পর্বত একটি বিশাল অনুর্বর পাহাড়, একটি বিদীর্ণ ও শূন্যগর্ভ গিরিখাত দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং মরুভূমির সূর্যকিরণে এক ছায়াহীন, পুষ্পহীন, কূপ বা নদী-বিহীন গিরি হিসেবে দণ্ডায়মান। নির্জনতা তাঁর কাছে সত্যই ভাবাবেগের উৎস হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। এই গুহায় তিনি প্রায়ই সারা রাত্রি ধরে গভীরতম চিন্তায়, বিশ্বের অদৃশ্য অথচ সর্বব্যাপী অল্লাহর ধ্যানে তন্ময় থাকতেন। ধীরে ধীরে স্বর্গমর্ত্য এক পূর্ব-নির্ধারিত দৃষ্টি ও আদেশ দ্বারা পূর্ণ হচ্ছিল। প্রাণহীন বস্তু থেকেও মনে হয় বাণী উত্থিত হওয়ার উপক্রম করছিল; যে মহান কার্য সম্পাদনের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁকে পরিচালিত করছিলেন পাহাড়-পর্বত বৃক্ষলতা তা পূর্ণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছিল।[২] আত্মার কবিত্ব শক্তি কী এর চেয়ে দূরে যেতে পারে? এই সময়ে ফিরেশতাদের মানসিক দর্শন ও ভীতি-সঞ্চারী মূর্তি ছিল সেই সব সত্যের ক্রমিক সুস্পষ্ট প্রকাশ যার দ্বারা তিনি জগতের প্রাণ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রায়শ বাস্তব অস্তিত্বের তমসাচ্ছন্ন পথে প্রত্যেক মহান জগৎ-গুরুর আত্মা অদ্যাবধি অদৃষ্ট নয়, কিন্তু অনুপলব্ধ প্রভাবসমূহ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন যা মানবজাতির কতিপয় সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক সাফল্যের পথ দেখিয়েছে। প্রাচীন যুগের সেই মহাপুরুষ স্যামুয়েল—প্রচণ্ড ও বিস্ময়কর—অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন পরিমণ্ডলে গভীর ব্যক্তিত্ব, যিশুখ্রীষ্ট বিজন প্রদেশে তাঁর লোকেদের অস্পষ্ট অদৃষ্ট ও তাঁর কর্ম-পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধ্যান করেছিলেন, মুহম্মদ ভেবেছিলেন গভীরভাবে তাঁর পার্বত্য নির্জন বাসে—স্যামুয়েল থেকে যিশুখ্রীষ্ট, যিশুখ্রীষ্ট থেকে মুহম্মদ—কারুর ক্ষেত্রেই এই সব প্রভাবের ছেদ ঘটেনি।[৩] রাত্রির নিথর নিস্তব্ধ মুহূর্তে, অতি প্রত্যুষের প্রশান্ত মুহূর্তে, নির্জনতার গভীরতায়

---

১. এখন এই পর্বতকে আলোকের পর্বত বলা হয়ে থাকে। ইবনে হিশাম, ইবনুল আসির ও আবুল ফেদা রমজান মাসকে এমন মাস হিসেবে অভিহিত করেছেন যখন মুহম্মদ প্রায়ই হিরায় প্রার্থনারত থাকতেন এবং মরুভূমির দরিদ্র ও বুভুক্ষু পথচারীদের সাহায্যের জন্য অতিবাহিত করতেন। আবার রজব মাসের উল্লেখ করেন।

২. ইবনে হিশাম, পৃ. ১৫১।

৩. আল্ কোরআন, সুরা, ৯৬; ইবনে হিশাম, পৃ. ১৫৩; আল্ হালাবীর 'ইনসানুল্ আয়ান' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪।

যখন কোন মানুষের সহানুভূতির স্পর্শ কাছাকাছি ছিল না। তখন ভোরের বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের মতো তাঁর নিকট আকাশবাণী ধ্বনিত হল "আপনি সেই মানুষ। আপনি আল্লাহর রাসুল"; কিংবা চিন্তামগ্ন অবস্থায় প্রবল প্রবাহে ধ্বনিত হল: "আপনার প্রভুর নামে পাঠ করুন।"[১] এই মুহূর্তে তন্ময় মনের সামনে ভেসে ওঠে স্বর্গীয় ফিরেশতাদের দর্শন, যারা আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বাহন হিসেবে কাজ করে থাকেন বলে বিশ্বাস করা হয়। "সত্যের মালিক তাঁর প্রেরিত পুরুষদের মনোনীত করেন এবং বজ্রনির্ঘোষের চেয়ে প্রবলতর ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই একই অন্তরের বাণীতে তিনি আমাদের সকলের সঙ্গে কথা বলে থাকেন। ঐ বাণী ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে অশ্রুতপ্রায় হয়ে আসে; তা তার ঐশী শক্তি হারিয়ে জাগতিক বিজ্ঞতার ভাষায় পর্যবসিত হতে পারে কিন্তু মাঝে মাঝে আল্লাহর মনোনীত পুরুষদের নিকট ঐ বাণী নিজ স্বরূপে ব্যক্ত হতে পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে ঐশী বাণী হিসেবে শ্রুত হতে পারে।"[২]

একজন মহান গ্রন্থকার[৩] বলেন, "যুগের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আল্লাহর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কীয় মুহম্মদের বিরাট ধারণার স্বাভাবিক সম্বন্ধ, যে বিস্ময়কর মিতাচার ও আত্মসংযম নিয়ে তিনি তাঁর সর্বব্যাপী দর্শন পোষণ করেছিলেন তার একমাত্র ব্যাখ্যা"; তিনি আরও বলেছেন, "এটা আকস্মিক হতে পারে না সে যুগের এক সর্বভৌম শক্তি সেই বিশাল উপদ্বীপে নির্জনতা থেকে উত্থিত হয়েছিল, যার আশেপাশে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের জোয়ার-ভাটার খেলা চলেছিল। এক সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তির নামে প্রত্যেক স্বতন্ত্র নবুয়্যেতের দাবী মরুভূমি থেকেই উত্থিত হয়েছে। খ্রীষ্টান প্রেরিত পুরুষের প্রত্যাহারের দ্বারা আরবদেশের প্রতি যে প্রতীক-ধর্মী তাৎপর্য প্রদত্ত হয়েছে রক্তমাংসশূন্য এক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তা মুহম্মদের নিকট প্রতীকের চেয়ে অধিক প্রতীত হয়েছিল। আরবদেশে তখন পরিণত হয়েছিল ঘটনপটিয়সী শক্তিতে, আর ইসলামের নবী মুহম্মদ (দঃ) তার কেন্দ্রীভূত কণ্ঠস্বরে। তারকাখচিত রাত্রির নির্জন স্থানসমূহে এক গোপন বাধ্যতাবোধের দ্বারা চালিত, দেশের ধূলিধূসরিত,

১. তুলনীয় ঈসা ১০. ৬।
২. অধ্যাপক মুলার, ডিন স্ট্যানলীর লেকচারস অন্ দি হিষ্ট্রী অব জিউইন চার্চ, ১ম খণ্ড, ভাষণ ১৮, পৃ. ৩৯৪ থেকে উদ্ধৃত।
৩. জনমন ওরিয়েন্টাল রিলিজিয়ানস, পৃ. ৫৬১।

সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী এই সন্তানের প্রতি মরুভূমি হৃদয় উজাড় করে কথা কয়েছিল।”

এক রাত্রি—“শক্তি ও সৌভাগ্যের রজনী”—যখন ঐশী শান্তি সমগ্র চরাচরে বিরাজমান এবং সমগ্র প্রকৃতি তার স্রষ্টার দিকে উন্নীত, সেই রজনীর মধ্যভাগে মহাগ্রন্থ কোরআন তৃষ্ণার্ত আত্মার নিকট উণ্মুক্ত হল। যখন তিনি চিন্তায় আত্মনিমগ্ন, তখন তিনি সমুদ্র কল্লোলের মতো মহাশক্তিশালী এক কণ্ঠস্বর দ্বারা জাগরিত হলেন—উচ্চৈস্বরে দু'বার সেই কণ্ঠস্বর-ধ্বনিত হল, কিন্তু দু'বারই সে বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হলেন। এক বিভীষিকাপূর্ণ ভার তাঁর উপর চেপে বসল এবং তাঁর হৃদয় থেকে একটি উত্তর বেরিয়ে আসল। তৃতীয়বারের মতো কণ্ঠস্বরটি বিঘোষিত হল “পড়ুন”।

তিনি বললেন, “আমি কি পড়ব?” উত্তর এল “পড়ুন আপনার প্রভুর নামে।”

কিভাবে ক্ষুদ্রতম সূচনা থেকে মানুষ অস্তিত্বে আনীত হয় এবং প্রতিপালকের উপলব্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা ঊর্ধে উন্নীত হয়, যিনি পরম করুণাময় এবং যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষ জানত না,[১]—এই কথা বলে কণ্ঠস্বরটি থেমে গেল, মুহম্মদ সম্মোহিত অবস্থা থেকে জেগে উঠলেন এবং তাঁর মনে হল তাঁর নিকট যে কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছে তা তাঁর হৃদয়পটে লিখিত হয়ে গেছে। তাঁর সমগ্র দেহে কম্পন শুরু হল, তিনি দ্রুতপদে বাড়ীতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, “হে খাদিজা, আমার কি হয়েছে?” তিনি শুয়ে পড়লেন ও খাদিজা তাঁকে অবলোকন করতে লাগলেন। ভাবাবেশ তিরোহিত হলে তিনি খাদিজাকে বললেন, “হে খাদিজা, যার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না (অর্থ মুহম্মদ স্বয়ং) সে হয় ভবিষ্যদ্বক্তা[১] নয়তো বিকারগ্রস্ত—উন্মাদ হয়েছে।” তিনি জবাব দিলেন, “আল্লাহ আমার রক্ষক, হে আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা—হযরতের একটি নাম—এই নামটি তাঁর শিশুপুত্র ‘কাসিমে'র নামানুসারে হয়েছে), নিশ্চয়

১. সূরা ৯৬, আ. ১-৫। 'ইকরা' শব্দ সাধারণত 'পড়' হিসেবে অনুবাদিত হয়; কিন্তু আমি ডিউশা নির্দেশিত ভাষান্তর পছন্দ করি যা হযরতের প্রতি আহ্বানের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ রড্ওয়েলও দেখুন এবং জামাকশারী (কাশশাফ) সঙ্গে তুলনা করুন।

১. গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতি হযরতের বিশেষ বিতৃষ্ণা ছিল; তারা অধিকাংশ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

তিনি (আল্লাহ) আপনাকে এরূপ অবস্থায় নিপতিত করবেন না ; কারণ আপনি সত্য বলেন, অনিষ্টের বদলে অনিষ্ট করেন না, বিশ্বাস রক্ষা করেন, সৎজীবন যাপন করেন এবং আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সদয়। আর আপনি হাটে-বাজারে প্রগলভের মতো আচরণ করেন না। আপনার কি হয়েছে? আপনি কি ভয়ানক কিছু দর্শন করেছেন?" মুহম্মদ উত্তর দিলেন, "হাঁ।" আর তিনি যা দেখেছিলেন তাকে সব বললেন। এতে তিনি জবাব দিলেন, "হে স্বামিন্, আপনি উৎফুল্ল হোন। যাঁর হাতে খাদিজার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি এই জাতির প্রেরিত পুরুষ হবেন। অতঃপর তিনি গাত্রোত্থান করলেন এবং জ্ঞাতি-ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের নিকট গমন করলেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং "ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।" যখন খাদিজা তাঁকে যা ঘটেছিল সবকিছু বিবৃত করলেন তখন তিনি আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "কুদ্দুসুন, কুদ্দুসুন! পবিত্র, পবিত্র! নিশ্চয়ই ইনি 'নামুসুল্ আকবর'[১]—যিনি মুসা ও ঈসার নিকট এসেছিলেন। তিনি তাঁর জাতির প্রেরিত পুরুষ হবেন। তাঁকে একথা বলো। তাঁকে সাহসী হৃদয়ে থাকতে নির্দেশ দাও।"

সাম্রাজ্য ও জাতিসমূহের ধ্বংসের মধ্যে, গোত্র ও পরিবারের প্রচণ্ড কলহকোন্দলের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্র আকাশে বাতাসে একটি বাণী ভেসে বেড়াচ্ছিল যে আল্লাহর পয়গাম সন্নিকটবর্তী : মেষপালক নিকটবর্তী হয়েছেন যিনি পথভ্রষ্ট দলকে প্রভুর নিয়ন্ত্রিত দলের দিকে পরিচালিত করবেন। ওয়ারাকার হৃদয় এই কথাই বলেছিল।

পরবর্তী সময়ে যখন রাস্তায় হযরত মুহম্মদ ও ওয়ারাকার সাক্ষাৎ ঘটত, তখন ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের অন্ধ বৃদ্ধ পাঠক যিনি তাদের মধ্যে বৃথাই সান্ত্বনা খুঁজতেন, কিন্তু যিনি মানবজাতির নিকট একজন ত্রাণকর্তা প্রেরণের ঐশী ওয়াদা সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত ছিলেন, তিনি তাঁর বিশ্বাসের কথা বলতেন। বৃদ্ধ বলেছিলেন, "আমি তাঁরই নামে শপথ করে বলছি

---

১. আরবীতে 'নামুস্' শব্দটির প্রাথমিক অর্থ বাণীবহ যিনি গোপনীয় বার্তা সরবরাহ করেন। এশব্দ আইনও বুঝায়, যেমন গ্রীক 'নোমোস'। ডিউশ বলেন, "তালমুদ শব্দ-রীতিতে শব্দটি প্রত্যাদিষ্ট আইন বুঝায়। ওয়ারাকার মনে এসব বিভিন্ন অর্থ সমন্বিত ছিল ; ঐশীবার্তাবহ ও বার্তা উভয়ই মুহম্মদেরও নিকট এসেছিল যেমন এসেছিল মূসা ও ঈসার নিকট।"

যাঁর হাতে আমার জীবন নির্ভরশীল যে আল্লাহ এই জাতির প্রেরিতপুরুষ হিসেবে আপনাকে মনোনীত করেছেন ; 'নামাস্সুল্ আকবার' আপনার নিকট এসেছেন। এই জাতি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে, আপনার উপর অত্যাচার করবে, আপনাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করবে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। হায়! আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকতাম তবে আমি আপনার পক্ষে যুদ্ধ করতাম।"[১] এই বলে তিনি তাঁর কপালে চুম্বন করলেন। আশা ও বিশ্বাসের এই বাক্যগুলি উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করেছিল।[২] তারপর সেই কণ্ঠস্বরের পুনরায় উপস্থিতির জন্য চলল প্রতীক্ষা, চলল উদ্বিগ্ন হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেরণার পুনঃপ্রতিফলনের প্রতীক্ষা।

মুহম্মদ (দঃ) যে আধ্যাত্মিক বেদনাবোধ, সাংঘাতিক মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংশয়, আশা এবং আশঙ্কা দ্বারা পর্যায়ক্রমে আন্দোলিত হয়েছিলেন তার যথার্থ পরিমাপ করতে পারি যখন আমাদের বলা হয় যে স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার পূর্বে তিনি আত্মহননের তীরে উপনীত হয়েছিলেন যখন আল্লাহর ফিরেশতা তাঁকে মানবজাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য পুনরায় আহ্বান করেছিলেন।[৩] স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর সংশয় ও ভীতি আলোড়িত ব্যথিত হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাস ও সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন সঞ্চার করেছিলেন যখন তিনি দেখলেন এক মহাসত্যের চন্দ্রাতপ তলে বিশ্বের মানুষ সমবেত হচ্ছে।

সদাশয় উপদেশের দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করে দেহ-মনে অবসন্ন হয়ে তিনি অনুরক্তা স্ত্রীর কাছে গৃহে ফিরে আসলেন, বিবশকারী উপস্থিতি এড়ানোর জন্য নিজেকে আবৃত করতে অনুরোধ করলেন।

তাঁর ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ সাধন সেই সব আত্মকেন্দ্রিক সাধকদের মতো নয়, যারা মরুভূমি বা অরণ্যে নির্বাসিত হন এবং ব্যক্তিগত আত্মোৎকর্ষের জন্য জীবন ধারণ করেন। কিন্তু মুহম্মদের কঠোর সংগ্রাম ছিল এমন মহাপুরুষের সংগ্রাম-সাধনা যা এক মহান পরিণতি দ্বারা ক্রমশ সম্মুখের দিকে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পৌত্তলিকতার বন্ধন পাশ থেকে তাঁর জাতির মুক্তির কারণ হয়েছিল। গভীর অনুধ্যানমগ্ন বিষণ্ণ অবস্থায় যখন তিনি

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ১০৩; আল্ হালাবীর 'ইনসানুল্ আয়ান' ,১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬।

২. এই ঘটনার অল্পকাল পরেই ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করেন।—ইবনে হিশাম, পৃ. ১০৪।

৩. ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬, টিবরি (রোটেনবার্গের অনুবাদ) ২য় খণ্ড পৃ. ৩৯২।

অনুভব করলেন যে তিনি স্বর্গীয় বাণী দ্বারা আহূত হয়েছেন যে বাণী তাঁর পূর্বে যাঁরা বিগত হয়েছেন তাদেরকেও আহ্বান জানিয়েছে সত্য প্রচার করতে। তখনি তাঁর কাছে তাঁর ভাবী নির্ধারিত কর্ম-পরিকল্পনা উন্মোচিত হয়েছিল। "ওহে বস্ত্রাবৃত, আপনি উঠুন, সতর্ক করুন, আর নিজ পালন-কর্তার মহিমা ঘোষণা করুন।"[১] তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি যে কাজের জন্য আহূত হয়েছিলেন তা সম্পাদনার্থে প্রস্তুতি নিলেন। তারপর থেকেই তাঁর জীবন মানবতার সেবায় উৎসর্গীত। সীমাহীন নিষ্পেষণ, জুলুম ও অবমাননার মধ্যে অবিচলিত লক্ষ্য সামনে নিয়ে তিনি তাঁর তিরস্কার ও সংশোধনের পথে নিষ্কম্প ছিলেন।

খাদিজা সর্বপ্রথম তাঁর প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রত্যাদেশে সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করেন, আরবজাতির পৌত্তলিকতা বর্জন করেন এবং বিশুদ্ধ অন্তরে স্বামীর সঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপাসনায় যোগদান করেন। তিনি যে শুধু সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ও তাঁর নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এমন নয়, বরং যে সংগ্রাম শুরু হতে চলছিল সে সংগ্রামের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন তাঁর প্রকৃত সান্ত্বনাদাত্রী। হাদিস অনুসারে "যখন তিনি (মুহম্মদ) তাঁর (খাদিজার) নিকট প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই তাঁকে (মুহম্মদ) সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করেছিলেন। তাঁর প্রতি স্বীয় বিশ্বাসের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং মানুষের বাজে কথার অসারতা প্রতিপন্ন করে তিনি (খাদিজা) তাঁর মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিলেন, তাঁর বোঝা তাঁর কাছে লঘু করে তুলেছিলেন।"

সূচনায় মুহম্মদ একমাত্র অনুরক্তজনদের কাছে তাঁর হৃদয়ের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদের স্থূল রীতি-নীতি থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। খাদিজার পর আলী তাঁর দ্বিতীয় শিষ্য।[২] হযরত প্রায়ই তাঁর স্ত্রী ও তরুন চাচাতো ভাই আলীসহ মক্কার মরুভূমির গভীর নির্জনতায় যেতেন যাতে করে তারা সমগ্র মানবজাতির স্রষ্টা আল্লাহর বহুমুখী করুণার জন্য তাদের হৃদয়-উজাড়-করা কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেন। একদিন তারা আলীর পিতা আবু তালিব কর্তৃক তাদের প্রার্থনার

---

১. সু. ৭৪ আ. ১-৩।
২. ইবেন হিশাম, পৃ. ১৫৫; আল্ হালাবীর 'ইনসানুল আয়ান' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

ভঙ্গীর ব্যাপারে বিস্মিত বোধ করেছিলেন। তিনি মুহম্মদকে বললেন, "ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি কোন্ ধর্ম অনুসরণ করছ?" হযরত মুহম্মদ উত্তর দিলেন, "এই ধর্ম আল্লাহর, তাঁর ফিরেশতাদের, তাঁর নবীদের এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষ ইবরাহিমের ধর্ম। আল্লাহ আমাকে তাঁর বান্দাদের নিকট পাঠিয়েছেন তাদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করতে; হে চাচা, আপনি সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি। এটা একটা সম্মেলন, আমি আপনাকে অনুরোধ করি যে, আপনি এই ধর্ম গ্রহণ ক'রে এর প্রচারের সহায়ক হোন।" আবু তালিব একজন দৃঢ়চিত্ত সেমিটিকের যথার্থ ভঙ্গীতে বললেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি আমার পিতা-পিতামহদের ধর্ম জলাঞ্জলি দিতে পারি না, তবে পরম সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলছি যে যতদিন আমি বেঁচে আছি কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।" অতঃপর তদীয় পুত্র আলীর দিকে ফিরে সম্মানিত গোত্রপতি তার ধর্ম কি তা জিজ্ঞাসা করলেন। আলী উত্তর দিলেন, "হে আমার পিতা, আমি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস করি এবং তাঁকে অনুসরণ করি।" আবু তালিব বললেন, "হে আমার পুত্র, সে তোমাকে যা ভাল নয় এমন কিছুর দিকে আহ্বান করবে না, কাজেই তুমি স্বাধীনভাবেই তাঁর প্রতি অনুগত হতে পার।"[১]

অল্পকাল পরেই জায়েদ বিন হারিস, যিনি মুক্তি পাওয়ার পরও মুহম্মদকে পরিত্যাগ করেননি, নূতন ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তার পরেই কুরাইশ গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য আব্দুল্লাহ বিন আবু কুহাফা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি পরবর্তীকালে ইতিহাসে আবু বকর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[২] তিনি তায়িম ইবনে মুর্রা নামক গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্য, সম্পদশালী ব্যবসায়ী, স্বচ্ছ ও সুস্থির বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে কর্মঠ, বিজ্ঞ, সৎ ও অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি হযরতের মাত্র দু'বছরের ছোট ছিলেন এবং নূতন ধর্মের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন এই ধর্মের নৈতিক শক্তির উপর প্রচণ্ড প্রভাব

---

১. উপরের অনুচ্ছেদটি ইবনে হিশাম-প্রদত্ত বর্ণনারই শব্দান্তর। পৃ. ১৫৯—১৬০; এবং ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২—৪৩।

২. ডিভারজার্স টীকায় (পৃ. ১০৮) উল্লেখ করেন যে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি আব্দুল কাবা, "কাবার বান্দা" বলে অভিহিত হতেন।

বিস্তার করেছিল। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পাঁচজন নামজাদা ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমাইয়া বংশের ওসমান বিন আফ্‌ফান যিনি তৃতীয় খালিফা হয়েছিলেন, আউফের পুত্র আব্দুর রহমান, আবি ওয়াক্কাসের পুত্র সাদ যিনি পরবর্তীকালে পারস্যবিজেতা হয়েছিলেন এবং আয়েমের পুত্র ও খাদিজার জ্ঞাতীভাই জুবাইর—এরা সকলেই হযরতের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া নিম্নস্তরের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আরবের নবীর একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য যা তাঁর চরিত্রের অকপটতা, তাঁর শিক্ষার বিশুদ্ধতা, তার খোদা-বিশ্বাস ও খোদার উপর নির্ভরতার শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করে তা হল এই যে, তাঁর নিকটতম আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, জ্ঞাতী ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব তাঁর প্রচারিত ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর নবুয়্যত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। যারা তাঁর সম্পর্কে সম্যক্‌রূপে অবহিত ছিলেন—নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গতম বন্ধু-বান্ধব, যে সব লোক তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন ও তাঁর যাবতীয় গতিবিধি লক্ষ্য করতেন তারাই ছিলেন তাঁর নিষ্ঠাবান ও সর্বাপেক্ষা অনুরক্ত অনুসারী। এ সব নরনারী ছিলেন মহৎ, বুদ্ধিমান; এবং নিশ্চয়ই গ্যালিলির ধীবরদের চেয়ে কম শিক্ষিত ছিলেন না। যদি তারা মহানবীর মধ্যে পৃথিবীর প্রতি মোহ, প্রতারণা বা বিশ্বাসের অভাব লক্ষ্য করতেন, তবে অচিরকালের মধ্যেই মুহম্মদের নৈতিক পুনরুজ্জীবন ও সামাজিক সংস্কারের সকল আশা ধূলিসাৎ হয়ে যেত। তারা মহানবীর জন্য সব জুলুম ও অত্যাচার বুক পেতে নিয়েছিলেন; সামাজিক অন্তরীণ করার মাধ্যমে যে দৈহিক নির্যাতন ও মানসিক সন্তাপ সৃষ্ট হয়েছিল তাও তারা সহ্য করেছিলেন। এই যদি হতে পেরে থাকে তবে তারা কি তাদের মহাশিক্ষকের মধ্যে আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র পদস্খলন লক্ষ্য করেছিলেন? যদি এ সব লোক মুহম্মদের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন না করত তবে তাঁর কর্ম-পরিকল্পনার মহত্ত্ব বা তাঁর নিষ্ঠার গভীরতার প্রতি তাদের অবিশ্বাসের কারণ দেখা দিত। নিকটতম জ্ঞাতিবন্ধুদের মধ্যে যিশুর প্রভাব ছিল অত্যন্ত নগণ্য। তাঁর ভ্রাতৃগণ তাঁর প্রতি কখনও বিশ্বাস স্থাপন করেনি,[১] তারা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে তারা একবার তাঁকে মৃত মনে করে তাঁর দেহ অধিকার করতে প্রয়াসী

১. বাইবেল, জন ৭, ৫।

হয়েছিল।[১] এমন কি তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যগণ তাদের বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন না।[২]

সম্ভবত এই বিচলন চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব জ্ঞাপক হয়ে থাকবে কিংবা মিলম্যানের[৩] মতানুসারে যিশুর পরিবর্তনশীল শিক্ষণ-নীতি থেকে এসে থাকবে। কিন্তু তথ্যটি অনস্বীকার্য।[৪] মুহম্মদের সাক্ষাৎ অনুসারীদের সুতীব্র বিশ্বাস ও প্রত্যয় তাঁর ঐকান্তিকতা এবং আরোপিত প্রচারকার্যের প্রতি তাঁর নিরতিশয় আত্মনিমগ্নতার মহত্তম সাক্ষ্য বহন করে।

দীর্ঘ ক্লান্তিকর তিন বছর ধরে তিনি তাঁর লোকদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত করার জন্য নীরবে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। পৌত্তলিকতা তাদের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল। প্রাচীন ধর্মমত নানান্‌ প্রলোভন বিস্তার করেছিল কিন্তু নূতন ধর্মমতের মধ্যে সে ধরনের কোন প্রলোভন ছিল না। প্রাচীন ধর্ম-উপাসনায় কোরাইশদের কায়েমী স্বার্থ ছিল এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে তাদের মানসম্মান জড়িত ছিল। কাজেই মুহম্মদকে শুধু যুগ যুগ ব্যাপী আচরণ ও বিশ্বাসের দ্বারা শুদ্ধিকৃত মক্কার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই শুধু রুখে দাঁড়াতে হয়নি তাঁকে পৌত্তলিকতার ভাগ্যনিয়ন্তা শাসকদের বিরোধিতার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল। সাধারণ লোকদের মতো তাদের ক্ষেত্রেও কুসংস্কার সংশয়বাদের শক্ত সহচর ছিল. এই সব শক্তির সঙ্গে লড়াই করেও তিন বছরের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি যে কেবল ত্রিশজন অনুসারী করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কিন্তু এতে এই মহান শিক্ষকের হৃদয় মোটেই দমেনি। যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশ তিনি বাস্তবে রূপ দিচ্ছিলেন তাঁর প্রতি অবিচল বিশ্বাস রেখে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। তথাপি তিনি নীরবে ও বিনীতভাবে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। তাঁর দেশবাসীরা তাঁর দিকে বক্রদৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করেছিল,

---

১. প্রাগুক্ত, মার্ক ৩, ২১।

২. এইসব লোককে যিশু নিজের মাতা ও ভ্রাতাদের পরিবর্তে "তাঁর মাতা ও সহযোগী ভাই" বলে অভিহিত করেছেন। ম্যাথু ১২, ১৫—৪৮, মার্ক ৩, ৩২, ৩৩।

৩. 'মিলম্যানের' *হিস্ট্রী অব্‌ ক্রিশ্চিয়ানেটি'* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৪—২৫৫।

৪. স্যার উইলিয়াম মুয়ির দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেন যে (২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪)। "যিশুর শিষ্য ধর্মপ্রচারকগণ বিপদের আভাস মাত্র পেয়েই পালিয়ে গিয়েছিলেন"।

আল্-আমীন উপাধির স্বাভাবিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিল, তারা তাঁকে মস্তিষ্কবিকৃত বা "আবিষ্ট" বলে ভেবেছিল, কিন্তু তাঁর বিচ্ছিন্ন প্রচারকার্যের বিরোধিতা করেনি। এবার তিনি কোরাইশদের জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে তাদেরকে পৌত্তলিকতা বর্জন করার জন্য আবেদন জানাতে কৃত-সংকল্প হলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সাফা পর্বতের উপরে একটি সভা আহ্বান করলেন এবং সেখানে তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে তাদের অপরাধের ব্যাপকতা, খোদিত মূর্তির প্রতি তাদের পূজা নিবেদনের অসারতা সম্পর্কে বললেন। অতীতকালে পয়গাম্বরদের আহ্বানে সাড়া না দেবার জন্য বিভিন্ন গোত্রের যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল তিনি সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন এবং পুরাতন পঙ্কিল ধর্ম পরিত্যাগ করে প্রেম, সত্য ও বিশুদ্ধতার ধর্মগ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। কিন্তু ব্যঙ্গকারীরা তাঁর আহ্বানের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করল, তরুণ আলীর উদ্দীপনাকে হেসে উড়িয়ে দিল, তারা মুখে উপহাস ও তামাসার মহড়া করতে করতে এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবের যে মনোভাব জেগে উঠছে তাতে হৃদয়ে শঙ্কা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করল। এভাবে কোরাইশদেরকে আল্লাহর হুঁশিয়ারী শোনাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি বাণিজ্য বা তীর্থ উপলক্ষে মক্কা নগরীতে উপস্থিত আগন্তুকদের প্রতি নজর দিলেন। তাদেরকে তিনি আল্লাহর বাণী শোনাতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু এখানেও কোরাইশরা তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ করে দিল। যখন তীর্থযাত্রীরা নগরীর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল তখন কোরাইশরা বিভিন্ন প্রবেশ-পথে দণ্ডায়মান হয়ে তাদেরকে মুহম্মদের সঙ্গে যে-কোন রকম যোগাযোগ স্থাপন করতে ভীতি প্রদর্শন করল, কারণ তারা তাঁকে একজন বিপজ্জনক যাদুকর হিসেবে প্রচার করল। এই কৌশল এমন ফল উৎপন্ন করেছিল যা মক্কাবাসীরা প্রত্যাশা করেনি। তীর্থযাত্রী ও বণিকগণ তাদের দূরবর্তী দেশে প্রত্যা-বর্তন করল, তারা একজন অদ্ভুত, উদ্দীপনা-সঞ্চারী প্রচারকের খবর বয়ে নিয়ে গেল যিনি তাঁর জীবনের বিনিময়ে আরবের বিভিন্ন জাতিকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন।

কোরাইশগণ যদি এই ধারণা পোষণ করে থাকত যে মুহম্মদ তাঁর জ্ঞাতিদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হবেন তবে তারা শীঘ্রই আবু তালিব কর্তৃক তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে প্রতারিত হত। বৃদ্ধ পরিবার প্রধান যিনি বংশগত আনুগত্যের ফলে প্রাচীন ধর্ম বর্জন ও নূতন ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তিনিই সংস্কারকের বিরুদ্ধে তাঁর দেশবাসীর

অবিচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি প্রকৃত মরুভূমির বীরত্ব নিয়ে একটি কবিতায় 'আল্ আমীন' যিনি এতিম ও বিধবাদের কল্যাণকামী এবং যিনি বাক্য ও কার্যে স্বীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি তাঁর বিরুদ্ধে কোরাইশদের অত্যাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে নিরতিশয় বেদনা প্রকাশ করেছেন—এই কবিতাটি ইতিহাসে অন্তরের সুরভিতে মণ্ডিত হয়ে আছে, এবং তিনি একথাও ঘোষণা করেছিলেন যে হাশিম ও মুত্তালিব পরিবারের লোকেরা জীবন বিসর্জন দিয়েও নির্দোষ ব্যক্তিটিকে রক্ষা করবে। প্রায় এই সময়ে ইয়াসরিবের একজন প্রধান মক্কার কোরাইশদের লিখলেন এবং পুরাতন যুগের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে তাদেরকে অন্তর্ঘাতী বিভেদ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। তিনি নূতন প্রচারকের বক্তব্য শোনার জন্য তাদেরকে উপদেশ দিলেন। "একজন সম্মানিত ব্যক্তি কোন বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁকে নির্যাতন করা কেন? একমাত্র স্বর্গের প্রভু মানুষের হৃদয়ের খবর রাখেন।" তার উপদেশ কোরাইশদের মধ্যে কিছু ফল উৎপন্ন করেছিল এবং তাদের কর্মধারায় পরিবর্তন আনয়ন করেছিল। এক সময়ে তদনুযায়ী মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম, গালিগালাজ ও অবমাননার বিনিময়ে প্রকাশ্য ও প্রচণ্ড নিষ্পেষণ শুরু হল। বিরোধী কোরাইশগণ হযরতকে কাবাগৃহে নামাজ পড়া বন্ধ করে দিল; তিনি যেখানে যেতেন সেখানেই তারা তাঁকে অনুসরণ করত। তিনি ও তাঁর শিষ্যগণ নামাজে দাঁড়ালে তারা তাঁদের উপর ময়লা ও নোংরা জিনিস নিক্ষেপ করত। তারা তাঁকে অপমান করার জন্য শহরের শিশু ও দুশ্চরিত্র লোকদের লেলিয়ে দিত। তিনি উপাসনা করা ও ধ্যানমগ্ন হওয়ার জন্য যে সব রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতেন তারা সেই রাস্তায় কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। এইসব অমার্জিত নির্মমতা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মুহম্মদের চাচা আবু লাহাবের পত্নী উন্মুল জামিল সর্বদা নেতৃত্ব দিত। সে ছিল হযরতের অত্যাচারীদের মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়চেতা। তাঁর শিষ্যরা উপাসনার জন্য যেসব জায়গায় ভ্রমণ করত সেসব জায়গায় কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। এই ক্রুদ্ধ আচরণের জন্য তার স্ত্রী "কাষ্ঠ বহনকারীনী" খেতাব প্রাপ্ত হয়েছিল।

এসব দুঃখকষ্টের পরীক্ষার মধ্যেও মুহম্মদ কখনও বিচলিত হননি। তাঁর মহান ব্রতপালনের প্রতি তীব্রতম আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি অবিচলিত ভাবে কাজে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বহুবার তিনি কোরাইশদের হাতে আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। একবার তিনি তাঁর শান্ত ও ধীর আত্মসংযমের মাধ্যমে তাদের খুনের ক্রোধকে প্রশমিত করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু জুলুম যতই বাড়তে লাগল নূতন ধর্মের শক্তিও ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। "শহীদের রক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি"—একথা শুধু একটি ধর্মমত সম্পর্কেই সত্য নয়। মুহম্মদের প্রতি কোরাইশদের উৎপীড়ন, তাদের তীব্র অসহিষ্ণুতা আব্দুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বীর হামজাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। এই অকুতোভয় সাহসী, উদার ও সত্যপরায়ণ যোদ্ধা মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং তারপর থেকেই তিনি ইসলামের একজন অনুরক্ত সমর্থক এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শেষপর্যন্ত আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কোরাইশগণ হামজার তরবারীর প্রচণ্ড আঘাতকে ভীষণ ভয় পেত।

এসব অত্যাচার ও জুলুমের মধ্যেও মুহম্মদ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত রূপান্তর বিমুখ জাতির প্রতি তাঁর আহ্বান কখনও বন্ধ করেননি। তিনি ধর্মপ্রচারের মধ্যে তাঁর মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি উদ্দীপনাময় ভাষায় তাদেরকে বলেছিলেন কিন্তু তা তাদের হৃদয়কে দ্রবীভূত করতে পারেনি। তিনি বলেছিলেন যে, আদ ও সামুদ জাতি খোদার প্রেরিত-পুরুষদের উপদেশ অগ্রাহ্য করার ফলে তাদের উপর শাস্তি নেমে এসে-ছিল, নূহের লোকদের পাপের পরিণতি হিসেবে তাদের উপর নেমে এসে-ছিল মহাপ্লাবন। তিনি প্রকৃতির বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর, মধ্যদিনের উজ্জ্বলতার, রাত্রি যা সবকিছুকে আবরিত করে তার, দিন যা সবকিছুকে স্পষ্ট করে তার শপথ করে বলেছিলেন যে, তোমরা বিগত যুগের মতো ধ্বংস সংঘটিত হওয়ার পূর্বে হুঁশিয়ার হও। তিনি তাদের বিচার দিবসের কথা বলেছিলেন যেদিন মহাবিচারকের সামনে এ জগতে মানুষের কৃত কার্যাবলীর মূল্যায়ন হবে, সেদিন যেসব শিশুকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ; আর সেদিন আকাশ ও পৃথিবীকে গুটিয়ে রাখা হবে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নিকটবর্তী থাকবে না। তিনি তাদেরকে পরজগতের পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলেছিলেন, তিনি "প্রাচ্যের উপমাসমূহের আভায়" তাঁর জড়বাদী লোকদের নিকট স্বর্গের আনন্দ ও নরকের যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন অবিশ্বাসীরা কেমন ঃ

"এদের দশা ঠিক এমনি—যেমন একটি লোক আগুন জ্বালিয়ে নিল—তার চারপাশের সবকিছু আলোকিত হল ; কিন্তু আল্লাহ পাক সেই আলো নিবিয়ে দিলেন—সব অন্ধকারে ফেলে দিলেন—যেন কিছুই দেখতে না পায়।"

"তারা বধির মূক ও অন্ধ, তাই তারা ফিরবে না।"
"অথবা আসমান থেকে ঘন বৃষ্টি পড়ছে, যা'তে রয়েছে ঘন অন্ধকার, গুরুগর্জন ও বিদ্যুৎ ; তারা বজ্রের গর্জন শুনে মরণের ভয়ে কানে আঙুল দেয়। অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ ঘিরেই রেখেছেন।"

"মনে হয় এই বুঝি বিদ্যুৎ ঝলক তাদের চোখ ঝলসে দেবে। যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখনই তারা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়, তখন দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে অনায়াসে তাদের কান ও চোখ ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী।"[১]

"আর যারা অবাধ্য হয়েছে—তাদের কাজকর্ম যেন ঠিক মায়া-মরীচিকা—যা দেখে পিপাসার্ত লোক পানি বলেই মনে করে। অথচ সে যদি তার কাছেও পৌঁছায়, তবুও সেখানে কিছুই পাবে না। অবশ্য আল্লাহ-তায়ালাকেই সে নিজের কাছে পায়। আর তিনিই তার প্রাপ্য পুরোপুরি দান করবেন। কেননা আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব নেবেন।"

"কিংবা ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে গভীর সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গ-মালা—একটার উপর দিয়ে আরেকটা তরঙ্গ ধেয়ে আসছে, তার উপরে ঘন কালো মেঘ একটার উপর দিয়ে আরেকটা ছুটে বেড়াচ্ছে। তখন যদি সে নিজের হাত বের করে তবে সে তাও দেখতে পাবে না। আসলে যে কেউ এমন হবে—যার জন্য আল্লাহ পাক আলো দান করেননি—তার জন্য কোথাও যে কিছুমাত্র আলো নেই।"[২]

মক্কাবাসীরা হতবাক হয়ে পড়ল এবং ধর্মান্তকরণ প্রায়ই হতে লাগল। কোরাইশগণ এখন সম্পূর্ণরূপে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল ; মুহম্মদের ধর্মপ্রচার এক মারাত্মক বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূর্বাভাষ হিসেবে সূচিত হল। তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি হুমকির সম্মুখীন হল। তারা ছিল বিগ্রহগুলির হিফাজত-কারী যা মুহম্মদ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন, তারা যে উপাসনার তত্ত্বাবধায়ক ছিল মুহম্মদ তা প্রত্যাখান করেছিলেন—তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের উপর। যদি তাঁর ভবিষদ্বাণীসমূহ বাস্তবায়িত হয় তাহলে তারা আরবের জাতিসমূহের মধ্যে যে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নূতন ধর্ম-

১. সূ. ২ আ. ১৭-২০।
২. সূ. ২৪ আ. ৩৯-৪০।

প্রচারকের প্রবণতা অত্যন্ত গণতান্ত্রিক; প্রভুর দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। প্রাচীন পার্থক্যসমূহের ভেদচিহ্নের বিলোপ তাদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী ছিল। তাদের এ ধরনের কোন ঐতিহ্য ছিল না, আর তা তাদের নিরঙ্কুশ সুবিধাভোগের পক্ষেও শুভ ছিল না। কাজেই এই আন্দোলন অধিকতর শক্তিলাভের পূর্বেই তার গতিরোধ করার জন্য আশু জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

সেই অনুসারে তারা অত্যাচারের এক সুসংহত পদ্ধতি স্থির করল। বংশগত বিরোধ-নীতি লঙ্ঘন না করার জন্য প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে নূতন ধর্মের শ্বাসরোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব সদস্য, আশ্রিত ব্যক্তি বা দাস যদি নূতন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হত তবে তাদের উপর জুলুম করা হত। মুহম্মদ, আবু তালিব ও তার জ্ঞাতি কুটম্ব আবুবকর ও আরও কয়েকজন, যারা হয় তাদের পদমর্যাদার জন্য বিশিষ্ট ছিল কিংবা কোরাইশদের মধ্যে তাদের প্রভাবশালী বন্ধু বা আশ্রয়দাতা ছিল, তাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য কিছু কালের জন্য অব্যবহিত অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন। অন্যান্য নব-দীক্ষিত ব্যক্তিরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, অনাহারে ক্লিষ্ট হয়েছিল এবং শেষে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়েছিল। রামফার পাহাড় ও বাসা নির্মম অত্যাচারের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল।[১] যেসব নরনারীকে কোরাইশগণ মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে দেখতে পেত তাদেরকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে প্রচণ্ড রৌদ্রে রাখা হত এবং পিপাসার শেষ প্রান্তে যখন পৌঁছত তখন তাদের নিকট দুটি বিকল্প উপস্থাপিত করা হত—হয় মূর্তিপূজায় ফিরে যাওয়া নতুবা মৃত্যুবরণ করা। কিছুলোক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইসলাম ধর্ম প্রতিপালন মানসে পূর্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করত। কিন্তু নব-দীক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের গৃহীত ধর্মে অবিচলভাবে লেগে থাকত। তেমন একজন ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল। তার প্রভু উমাইয়া বিন খালাফ যখন সূর্য প্রচণ্ডতম উত্তাপ বর্ষণ করত তখন তাকে 'বাসা' নামক স্থানে নিয়ে যেত এবং তাকে খালি পিঠে সূর্যের দিকে মুখ করে শোয়াত, বুকে একখানা বড় পাথর চাপা দিয়ে বলত, "যতক্ষণ না তুমি মৃত্যুবরণ করবে বা ইসলাম পরিত্যাগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে এখানে এই অবস্থায় থাকতে হবে।" বড় পাথরের গুরুভারে অর্ধশ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় শায়িত থেকে, পিপাসায় মৃতপ্রায় অবস্থায় তিনি শুধু উত্তর

১. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০ ; ইবনে হিশাম পৃ. ২০৫—২০৯।

দিতেন, "আহাতুন, আহাতুন"—"আল্লাহ এক, আল্লাহ এক"। দিনের পর দিন তার উপর একই ধরনের অত্যাচার চলতে থাকল এবং তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন। এ সময়ে হযরত আবুবকর বন্দীপণ প্রদান করে বেলালকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন, এভাবে তিনি আরও ছয়জন দাসের মুক্তিপণ প্রদান করে তাদেরকে স্বাধীন করেছিলেন। তারা নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে ইয়াসার ও তদীয় স্ত্রী সামিয়াকে হত্যা করেছিল এবং তাদের সন্তান আম্মারের উপরও তারা ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছিল। মুহম্মদ প্রায়শ তার অনুসারীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তারা নিদারুণ ধৈর্য ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সব সহ্য করে শহীদের সম্মান লাভ করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের আদি পর্বের শহীদ শুধু এরাই ছিলেন না।[১]

ফ্যারিসিরা যেভাবে যিশুখ্রীষ্টকে প্রলোভিত করেছিল কোরাইশগণ মুহম্মদকে পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তির প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে তাঁর কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াস পেয়েছিল। এক জীবনীকার বলেন, একদিন মুহম্মদ বিরোধীদলের নেতাদের মজলিসের অনতিদূরে বসেছিলেন। একজন মোলায়েমপন্থী বিরোধী নেতা, ওতবা বিন রাবিয়া তাঁর কাছে এসে বলল, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি তোমার ব্যক্তিগত গুণাবলী ও বংশ-গৌরব বিশিষ্ট। এখন তুমি আমাদের লোকদের মধ্যে দলাদলি এবং আমাদের পরিবারের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছ; তুমি আমাদের দেব-দেবীকে প্রত্যাখ্যান করেছ; তুমি আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে নাস্তিকতা আরোপ করেছ। আমরা তোমাকে একটি প্রস্তাব দিতে চাই; ভাল করে ভেবে দেখো তুমি গ্রহণ করতে পারো কিনা।" হযরত মুহম্মদ বললেন, "হে ওলিদের পিতা,[২] বলুন।" ওতবা বললেন, "আমি শুনছি,

দৃষ্টান্ত। খোবাই বিন আদিকে বিশ্বাসঘাতকতার ভেতর দিয়ে কোরাইশদের কাছে বিক্রয় করা হয়েছিল। কোরাইশগণ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে ও শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে মাংস কেটে নিয়ে তাকে হত্যা করেছিল। সমূহ অত্যাচারের মধ্যে তাকে জিজ্ঞাসা করা হত যে মুহম্মদের অবস্থা তার মতো হোক 'সে কি তা' চায়। উত্তরে তিনি বললেন—"মুহম্মদের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক এই শর্তে আমি আমার পরিবার, আমার ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই না।"

ওয়ালিদ ওতবার পুত্র। আরবদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল, এমন কি এখনও আছে কোন্ ব্যক্তির নিজের নাম না ধরে অমুকের পিতা বলে ডাকবার। এটা বিশেষ বিবেচনায় করা হত।

হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, যদি তুমি এ কাজ দিয়ে সম্পদশালী হতে চাও তবে আমরা তোমার জন্য আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে অধিকতর সম্পদ জোগাড় করে দেব; যদি তুমি সম্মান ও প্রতিপত্তি চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা মনোনীত করব এবং তোমার নির্দেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না; যদি তুমি রাজ্য চাও তবে তোমাকে আমাদের নৃপতি বানাব, এবং যে দুষ্টাত্মা তোমার উপর ভর করেছে সে যদি তোমাকে ছেড়ে যেতে না চায় তবে আমরা বড় বড় চিকিৎসক আনাব এবং তাদেরকে প্রচুর ঐশ্বর্য দিয়ে তোমাকে সুস্থ করে তুলব।" হযরত প্রশ্ন করলেন, "হে ওয়ালিদের পিতা, আপনার কি বলা শেষ হয়েছে?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ।" "তবে শুনুন" বললেন হযরত। তিনি উত্তরে বললেন, "হাঁ, শুনছি।" সতর্ককারী হযরত বললেন, "পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। পরম করুণাময় আল্লাহতালার তরফ থেকেই যে এই কালাম নাজিল করা হয়েছে। এ যে এমন কিতাব—যার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; আরবী ভাষায় কোরআন—জ্ঞানী কওমদের জন্যত সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই যে তা এড়িয়ে যাচ্ছে—যেন তারা শুনতেই পায়নি। তারা বলছে, আপনি আমাদেরকে যেদিকে ডাকছেন, তা থেকে আমাদের মন যে পর্দার আড়ালেই রয়েছে। আর আমাদের কানে ছিপি আটকানো রয়েছে। আর আমাদের ও আপনার মাঝখানে যেন একটা পর্দা রয়েছে। সুতরাং আপনি আপনার কাজ করতে থাকুন। আর আমরাও নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব। আল্লাহর নির্দেশ আপনি ঘোষণা করে দিন: "আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে এই ওহী এসেছে: তোমাদের মাবুদ মাত্র একজনই। সুতরাং সোজা তাঁর দিকেই নিবিষ্ট হও। আর তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, আর মুশরিকরা ধ্বংস হোক। যারা জাকাত আদায় করে না, আর আখিরাতকেও[১] যারা অস্বীকার করছে। যারা ঈমান এনেছে আর নেক কাজও করেছে—তাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে—যা মওকুফ করা হবে না—একথা সত্য সুনিশ্চিত।[২]" হযরত কোরআনের আয়াতগুলি আবৃত্তি করে ওতবার দিকে ফিরে বললেন, "আপনি আল্লাহর

---

১. আরবদের মধ্যে আতিথেয়তা একটি বড় গুণ হিসেবে বিবেচিত হত, কিন্তু দানশীলতা একটা দুর্বলতা হিসেবে গণ্য হত। তারা পারলৌকিক জীবনকে বৃদ্ধ মহিলাদের রূপকথা মনে করত।

২. সূ. ৪১ আ. ২-৮।

নির্দেশ শুনলেন, এখন আপনার নিকট যে পন্থা উত্তম মনে হয় সেটাই আপনি গ্রহণ করতে পারেন।[১]

উত্তরোত্তর হযরতের অনুসারীদের দুঃখদুর্দশা অসহনীয় হয়ে উঠল। তাদের দুরবস্থায় মর্মাহত হয়ে তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে প্রতিবেশী খ্রীষ্টান রাজ্য আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ কোরাইশদের অন্তরে পরিবর্তন আনয়ন করেন। সেখানে একজন ধার্মিক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি খ্রীষ্টান-রাজ্যের ধর্মপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ও আতিথেয়তার কথা শুনেছিলেন এবং নিশ্চিত ছিলেন তাঁর শিষ্যরা সেখানে অভ্যর্থনা লাভ করবে।

কেউ কেউ অবিলম্বে হযরতের উপদেশ অনুসরণ করলেন এবং পনের-জনের একটি দল 'নেগাস' বা নাজ্জাশীর রাজ্য আবিসিনিয়ায় উপস্থিত হলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই প্রথম দেশত্যাগ বা হিযরত এবং এটা সংঘটিত হয়েছিল হযরতের নবুয়্যত লাভের পঞ্চম বৎসরে (৬১৫ খ্রী.)। এই দেশত্যাগী দলের সঙ্গে শীঘ্রই আরও নরনারী যুক্ত হল। তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়াল: ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রীলোক।[২] কিন্তু কোরাইশদের অন্তহীন শত্রুতা সেখানে গিয়েও তাদেরকে স্পর্শ করল। পালিয়ে গেছে দেখে তারা ক্রোধান্বিত হল এবং রাজার সমীপে প্রতিনিধি প্রেরণ করল তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল: তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে এবং একটি নূতন ধর্ম গ্রহণ করেছে। নাজ্জাশী হিযরতকারীদের ডেকে পাঠালেন এবং শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে যা বলছে তা সত্য কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা প্রশ্ন করলেন: "এই ধর্মটি কি যার জন্য তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ধর্মত্যাগ করেছ এবং আমার ধর্ম কিংবা অন্য কোন জাতির ধর্ম গ্রহণ করনি?" আবু তালিবের পুত্র ও আলীর ভ্রাতা জাফর দেশত্যাগীদের প্রবক্তা হিসেবে জবাব দিলেন, "হে রাজন্, আমরা মূর্খতা ও বর্বরতার মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আমরা মূর্তি-পূজা করতাম, ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম; আমরা মৃত প্রাণীর মাংস খেতাম, আমরা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতাম; আমরা মনুষ্যত্বের প্রত্যেকটি অনুভূতি, অতিথি ও প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব একেবারে জলাঞ্জলি

---

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

২. ইবনে হিশাম, পৃ. ২০৮, ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮, আব্দুল ফেদা।

দিয়েছিলাম ; আমরা "জোর যার মুল্লুক তার"—নীতির বাইরে কোন আইন জানতাম না। এই সময়ে আমাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ এমন একজন মানুষ উত্থিত করলেন যার জন্ম, সত্যবাদিতা, সততা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা অবহিত ছিলাম ; তিনি আল্লাহর একত্বের দিকে আমাদের আহ্বান জানালেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন বস্তুর শরীক স্থাপন না করতে শিক্ষা দিলেন ;[১] তিনি মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে আমাদের আদেশ দিলেন ; সত্যকথা বলতে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে, দয়ালু হতে এবং প্রতিবেশির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিলেন ; নারীজাতির বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা না করতে, এতিমের ধন অপহরণ না করতে তিনি আদেশ দিলেন ; তিনি পাপসমূহ ও অনিষ্ট থেকে দূরে থাকবার জন্য, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেওয়া ও রোজা রাখার জন্য আমাদের আদেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং এক আল্লাহর ইবাদত ও কোন কিছুর সঙ্গে তাঁর শরীক স্থাপন না করার নির্দেশ মেনে নিয়েছি। এই কারণে আমাদের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, আমাদের উপর জুলুম করেছে যাতে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে কাষ্ঠ, প্রস্তর ও অন্যান্য দ্রব্যের পূজায় পুনরায় ফিরে যাই। তারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, আমাদের ক্ষতিসাধন করেছে। তাদের মধ্যে আমাদের নিরাপত্তার একান্ত অভাব লক্ষ্য করে আমরা আপনার রাজ্যে এসেছি এবং আশা রাখি। তাদের অত্যাচার থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করবেন।"[২]

কোরাইশদের দাবী রাজা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং প্রতিনিধিদল বিভ্রান্ত হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল।

মুহম্মদের অনুসারীবৃন্দ দুশমনদের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেশে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিলেন, কিন্তু হযরত নিজে তাঁর কর্তব্যস্থলে সাহসিকতার সঙ্গে অবস্থান করছিলেন এবং অবমাননা ও অত্যাচারের মধ্যেও তাঁর প্রচারকার্য অব্যাহত রেখেছিলেন। পুনরায় কোরাইশগণ সম্মান ও ঐশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল, তাঁকে তাঁর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর

---

১. মূর্তিপূজকদের কোরআনে প্রায়ই "মুশরিকিন" বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুশরিকিন তারাই যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য বস্তুর শরীক করে।

২. মুহম্মদের মহান কার্য বা তাঁর শিক্ষার সংক্ষেপ-সার এর চেয়ে উত্তম হতে পারে কি ?—ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১ ; এবং ইবনে হিশাম, পৃ. ২১৯-২২০।

জবাব ছিল পূর্বের মতই জীবন্ত ও বিশ্বাস-নির্ভর। আমি ঐশ্বর্যলাভে ইচ্ছুক নই, প্রতিপত্তি ও রাজ্যলাভেও আমার বিন্দুমাত্র বাঞ্ছা নেই। আমি আল্লাহ কর্তৃক আপনাদের কাছে সুসংবাদ ঘোষণার জন্য প্রেরিত হয়েছি। আমি আপনাদেরকে আল্লাহর বাণী শুনিয়েছি, আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিয়েছি। আমি যে পয়গাম প্রাপ্ত হয়েছি তা যদি আপনারা গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ আপনাদের প্রতি ইহজগতে ও পরজগতে প্রসন্ন থাকবেন ; আর আপনারা যদি আমার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আমার ও আপনাদের বিচারের ভার তাঁর হাতেই ন্যস্ত করব।" তাঁরা এবারও তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করল এবং কপটতা-পূর্ণ প্রশ্নের দ্বারা তাঁর শিক্ষার ভ্রান্তি প্রদানের প্রয়াস পেল।[১] প্রভুর প্রতি অকপট নির্ভরতা ও সুমহান বিশ্বাস পৌত্তলিকদের পার্থিব সংশয়-বাদের ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়েছিল। তারা নহর প্রবাহিত করে পানির ফোয়ারা আনতে, স্বর্গের টুকরা আনতে, পর্বত সরিয়ে দিতে, স্বর্ণের তৈরী একটি ঘর বানাতে এবং মই দিয়ে আকাশে উঠতে বলল।[২] এটা পুরাতন গল্পেরই পুনরাবৃত্তি, পার্থক্য এই যে, যিশুর ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাঁর নবুয়্যতের সত্যতা সম্পর্কে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য তাঁকে অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। অধ্যাপক মোমেরি বলেন, "তাঁর (যিশুর) সাক্ষাৎ শিষ্যগণ সর্বদা তাঁকে ও তাঁর কাজকে ভুল বুঝেছিল। তারা চাইছিল যে তিনি স্বর্গ থেকে আগুন নিবিয়ে দিক, নিজেকে ইহুদিদের রাজা বলে ঘোষণা করুক, তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত এবং তার রাজত্বে বাম হস্তের উপর আসন গ্রহণ করুক, তিনি তাদেরকে আল্লাহকে দেখান এবং তাদের চর্ম-চক্ষেই তাঁকে দৃশ্যমান করে তুলুন, তিনি নিজে করুন এবং তাদের জন্য করুন সবকিছু যা তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে বেমানান। এভাবেই তারা তাঁর সঙ্গে তাঁর অন্তিম সময় পর্যন্ত আচরণ করেছিল। যখন তাঁর শেষ সময় এল, তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করল।"

এইসব অপরিতৃপ্ত উদাসীন মানুষগুলির কোরাইশদের চেয়ে অলৌকিকতার আকর্ষণ কম ছিল না। পরবর্তীকালে তারা যিশুর সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে অস্পষ্টতার কুয়াসায় আবৃত করেছিল, আধুনিক ভাববাদী খ্রীষ্ট-ধর্মও এই ঐতিহ্যকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। কোন কোন সময় যিশু

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ১৮৮। একজন খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক পৌত্তলিকদের যুক্তি-কৌশলে উল্লসিত হয়েছিলেন। ওসবোর্ণের ইসলাম আণ্ডার দি অ্যারাবস দেখুন।
২. সু. ১৭ আ. ৯২-৯৬।

রাগান্বিত হয়ে উত্তর দিতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন যে এই যুগ অনিষ্ট ও ভেজালের যুগ—এই যুগ অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায় এবং কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখানো উচিত হবে না। যদি কোন ব্যক্তি মুসা ও অন্যান্য নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে তিনি মোটেই অনুতপ্ত হবেন না, যদিও মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠে।[১]

এটা অবশ্যই আরবের নবীর অনুসারীদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় যে তারা তাদের পয়গাম্বরের কাছ থেকে অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের জন্য কখনো দাবী করেননি। জ্ঞানী, ধনিক ও সৈনিক—তার সব ধরনের শিষ্য তাঁর মহান নবুয়্যতের নৈতিক ভিত্তির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছিল। তারা যাবতীয় পার্থিব স্বার্থ ও জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে নিঃসঙ্গ ধর্মপ্রচারকের চারপাশে সমবেত হয়েছিলেন এবং জীবনে-মরণে তাঁর পাশেই ছিলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর মানবিক ব্যক্তিত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। জগতের ইতিহাসে এর তুলনা নিতান্তই বিরল।

এমন এক যুগ ছিল যখন অলৌকিক ঘটনা সাধারণ সাধু-সজ্জনদের কাছে আটপৌরে ঘটনার সামিল ছিল, যখন সমগ্র পরিবেশ অলৌকিকতার দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, শুধু আরবে নয়, প্রতিবেশী দেশসমূহে যেখানে সভ্যতা আরও এগিয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধিবাদের মহান অগ্রনায়ক নির্দ্বিধায় অলৌকিকতা-সন্ধানী পৌত্তলিকদের দাবীর জবাবে বলেছিলেন—"আল্লাহ আমাকে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর জন্য প্রেরণ করেননি। আপনাদের কাছে তাঁর বাণী প্রচারের জন্যই আমাকে তিনি পঠিয়েছেন। আমার প্রভুর প্রশংসা—তিনি পবিত্র মহান। আর আমি একজন মানুষ ও রাসুল বৈ তো কিছু নই।···দুনিয়ার বুকে যদি ফিরেশতারাই চলা-ফিরা করত, বিশ্রাম করত, তাহলে তাদের জন্য আসমান থেকে একজন ফিরেশতাকেই রাসুল হিসেবে পাঠিয়ে দিতাম[২] আমি কখনো বলিনি যে আল্লাহের ধনসম্পদ সব আমার দখলে আছে, সব গোপনীয় বিষয়

১. প্রাচীন খ্রীষ্টধর্ম অলৌকিকতাকে যিশুর ঐশীত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং এখনও করে থাকে ; কিন্তু আধুনিক খ্রীষ্টধর্ম এসবকে কুসংস্কার বলে অভি-হিত করে থাকে। 'লিটারেচার এণ্ড ডগ্‌মা'র গ্রন্থকার বলেন যে, এটার সম্ভাবনা খুব বেশী যে অলৌকিকতার শেষ ঘণ্টাধ্বনি বাজছে ; আর খ্রীষ্টধর্মে অলৌকিক বীরত্ব গাঁথা আজ হোক কাল হোক, সমুদয় প্রাচ্য প্রতীচ্যের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিলুপ্ত হবে।

২. সু. ১৭ আ. ৯৫-৯৮ ; সু. ৭২ আ. ২১-২৪।

আমি অবগত আছি কিংবা আমি একজন ফিরেশতা…এমন কি আমি নিজের প্রতি আস্থা রাখতে বা নিজেকে সাহায্য করতে পারি না আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা না করেন।”…হযরতের চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের শান-শওকত বৃদ্ধির জন্য কোন প্রয়াস, কোন অতিরিক্ত দাবী, সম্ভাব্য ভাষায় কোন অমিতাচার প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। তিনি সর্বদা বলতেন, “আমি আল্লাহর বাণীর প্রচারক মাত্র, মানুষের নিকট আল্লাহর পয়গামের বাহক মাত্র।” শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হযরতের ভাষায় “এমন কোন উক্তি নেই যা মানুষের উপাসনার দিকে কোনরূপ অনুরোধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।”[১] প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরতের মধ্যে ভাষায় অপরিবর্তিত সংযম, যুগ ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর বিস্ময়কর, প্রথম থেকে শেষ অবধি তাঁর স্রষ্টার সমীপে তাঁর সরল গভীর বিনম্র ভাব প্রকট ছিল। আর অধ্যাত্ম উপলব্ধির চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁর অনুভূতি বিনীত ও মধুর ছিল।

“পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর বুকে যা কিছু রয়েছে সবই যে আল্লাহ পাকের জন্য পবিত্রতা ঘোষণা করছে—যিনি অধিপতি, পবিত্র মহান, পরম প্রতাপশালী ও মহান কুশলী। তিনিই ত মহান সত্তা—যিনি জনগণের মধ্য হতে তাদের জন্য একজন রাসুলকে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাচ্ছেন তাদেরকে পাক পবিত্র করছেন, আর তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান কৌশল শেখাচ্ছেন। আর এই লোকগুলি আগে থেকেই গোমরাহির মধ্যে ছিল। …এই ত হচ্ছে আল্লাহর ফজল—সাহায্য সামগ্রী—তিনি যাকে খুশি দান করেন। আসলে আল্লাহতায়ালাই যে বিপুল সাহায্য-সামগ্রী ফজলের অধিকারী।”[২]

অলৌকিকতার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে ইসলামের নবী নবুয়্যতের কর্মভারকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রচারের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। তিনি কখনো অলৌকিকতার আশ্রয় নিয়ে তাঁর প্রভাব কিংবা নবুয়্যতের বিষয়বস্তু চাপানোর চেষ্টা করেননি। আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন হিসেবে প্রকৃতির পরিচিত ঘটনাবলীর দিকে তিনি নিয়ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[৩]

---

১. অধ্যাপক মোমেরি।

২. সূ. ৬২ আ. ১-৫।

৩. এই বিষয়ে স্যার ডব্লু. মুয়িরের অনুচ্ছেদটি কম উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, “মক্কার পৌত্তলিকতা মুহম্মদের ধর্মপ্রচারের পূর্বে কোন সংগ্রাম ছাড়া নিশ্চিহ্ন হত কিনা, ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দ্বারা টিকে থাকত কিনা তা অনুমানের বিষয়।

তিনি অবিচলিতভাবে মানুষের অন্তর-চেতনার, তার প্রজ্ঞার প্রতি আবেদন জানিয়েছেন ; মানুষের দুর্বলতা বা তার বিশ্বাসপ্রবণতার প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। আপনারা চারদিকে দৃষ্টিপাত করুন—এই যে বিস্ময়কর জগৎ, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি নীল আকাশে তাদের নিয়মিত নীরব পথ পরিক্রমা করছে ; নিয়ম ও রীতিপদ্ধতি সমগ্র বিশ্বজগতে সক্রিয় রয়েছে ; বৃষ্টির পতন বিশুষ্ক ধরণীকে প্রাণবন্ত করে তুলছে ; বাণিজ্যজাহাজ লাভজনক পণ্যবহন করে সমুদ্রে ভেসে চলেছে ; আর ঐ সুন্দর খেজুর গাছে কাঁদি-কাঁদি সোনালী খেজুর ঝুলছে—সে কি আপনাদের কাঠ বা পাথরের নির্মিত দেবতাদের সৃষ্টি কৌশল ?[১]

হায় নির্বোধ! তুমি একটিমাত্র নিদর্শন চাও, যখন সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর অগণিত নিদর্শনে পরিপূর্ণ ? তোমার শরীরের সংগঠন কতই না জটিল, অথচ কতই না সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত ; দিবসরজনীর যাওয়া-আসা ; জীবনমৃত্যুর উঠাপড়া ; তোমার নিদ্রা ও জাগরণ ; আল্লাহর প্রাচুর্য থেকে তুমি সংগ্রহ করে থাকো ; জলভরা মেঘ বাতাস তাড়িত হয়ে ধেয়ে চলে দেশ থেকে দেশান্তরে বয়ে নিয়ে যায় স্রষ্টার করুণার সংকেত ; বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের অবস্থিতি ; মনুষ্যজাতির বৈচিত্র্য অথচ তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ; ফল, ফুল, প্রাণী, মানুষ—এসব কি মহাজ্ঞানী আল্লাহর অস্তিত্বের যথেষ্ট নিদর্শন নয় ?[২]

ইসলামের মহান নবীর কাছে এই বিশ্বচরাচর বা প্রকৃতি স্বয়ং একটি প্রত্যাদেশ ও অলৌকিক ঘটনা।

> “প্রতিটি পাতা বাকময়
> প্রতিটি স্রোতোস্বিনী কথা কয়
> সে ভাষা সর্বত্র ব্যাপ্ত—ব্যাপ্ত বিশ্বময়
> —জলের কল্লোল, জলস্রোতে, মৃত্তিকা ও বায়ুর প্রবাহে।
> সে ভাষা কখনো নিস্তব্ধ নয়।[৩]

২য় খণ্ড পৃ. ১৪৪। কোরাইশদের মতো স্যার ডব্লু. মুয়ির শিক্ষার শক্তিতে পরিতৃপ্ত নন, যদি না তা অলৌকিকতার দ্বারা সমর্থিত হয়।

১. সূ. ২৫ আ. ৪৯-৫৯ ; সূ. ৫০ আ. ৯ ইত্যাদি।

২. সূ. ৬ আ. ৯৬-৯৯ ; সূ. ৫১ আ. ২০ ; সূ. ১৫ আ. ৫০-৫৭ ; সূ. ৩৪ আ. ২০-২৮, ৩৯ ইত্যাদি।

৩. তুঃ হর গয়াহে কিহ্, আয় জমিন রুইয়াদ
ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু গুইয়াদ।—মৃত্তিকা থেকে উত্থিত প্রতিটি পত্রফলক আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করছে।

তৌহীদবাদী / একত্ববাদী নবী মুখ্যত প্রকৃতির নবী। তাঁর নৈতিক আবেদন ও ঐশী একত্বের ঐকান্তিক ঘোষণা এক সর্বব্যাপী ঐক্য-শৃঙ্খলা, এক সর্বব্যাপী মনের দৃশ্যমান অস্তিত্বও এক বিশ্বনিয়ন্ত্রক ইচ্ছাশক্তির বৌদ্ধিক স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা হল কোরআন যা প্রেরণালব্ধ জবানীতে "প্রকৃতি, বিবেক ও ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত প্রত্যাদেশ"। হে অবিশ্বাসীর দল, তোমরা কি এর চেয়ে অধিকতর অলৌকিক ঘটনা চাও যে তোমাদের অমার্জিত ভাষাকে সেই তুলনাবিহীন গ্রন্থের ভাষা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে, যার সামান্য অংশ তোমাদের সোনালী কবিত্ব ও মোয়াল্লাকা (কাবাগৃহে ঝুলন্ত কবিতাগুচ্ছ) দীপ্তিকে চিরতরে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে—সার্বজনীন করুণার সুসংবাদ এবং অহঙ্কার ও জুলুমের প্রতি হুঁশিয়ারী বহন করে এনেছে।

কিন্তু মুহম্মদের উপদেশের প্রতি কোরাইশগণ ভ্রূক্ষেপ করল না। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অন্ধ ছিল, প্রকৃতিতে ঐশী ব্যক্তিত্বের বর্তমানতা সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন ছিল, ধর্মনিষ্ঠায় পুনরায় প্রত্যাবর্তনের জন্য, প্রাচীন যুগের অপরাধ ও অশ্লীলতা বর্জন করার জন্য জ্ঞানীদের আহ্বানের প্রতি তারা ছিল সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তাঁর প্রতি তাদের জবাব এমন দুশমনির রূপ পরিগ্রহ করেছিল যা খ্রীষ্টানজগতের শুধু এরিয়ান বা পেলাজিয়ানদের নির্যাতনের আঁধারতম দিনগুলির সমকক্ষ। তারা বলেছিল, "ওহে মুহম্মদ, জেনে রাখো যতদিন পর্যন্ত তুমি বা আমরা নিশ্চিহ্ন না হচ্ছি ততদিন পর্যন্ত আমরা তোমাকে প্রচারকার্যে বাধা দেওয়া থেকে বিরত হব না।"

এই বিরতির অবসরে একটি ঘটনা ঘটেছিল মুসলমান ঐতিহাসিক-গণ ও হযরতের খ্রীষ্টান-জীবনীকারগণ স্বতন্ত্রভাবে বুঝেছিলেন। একদিন হযরত পয়গাম-প্রাপ্তির এক তন্ময় মুহূর্তে কাবাগৃহের অভ্যন্তরে কয়েকটি আয়াত আবৃত্তি করছিলেন যা এখন কোরআনে পাকের ৫৩তম সুরার (নজমের) অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন "তোমরা কি লাত ও উজ্জাকে ও জঘন্য মানাতকেও এবং তৃতীয় আর একজনকে", তখন একজন পৌত্তলিক সেখানে উপস্থিত ছিল, যাকে হাদিসে শয়তান বলে বিবেচনা করেছে, এই ভয়ংকর দোষারোপসূচক উচ্চারিত উক্তি নিবারণ করার জন্য: "তারা সম্মানিত কুমারী, খোদার নিকট তাদের সুপারিশ আশা করা যেতে পারে।" এই শব্দগুলি হযরতের নিকট প্রত্যাদিষ্ট বিষয়ের অংশ বিশেষ বলে অনুমান করা হয়েছিল। কোরাইশরা

এই কৌশল বা মুহম্মদের আন্দাজকৃত অনুমোদনে উৎফুল্ল হয়ে মুহম্মদের সঙ্গে একটা আপোষরফা করতে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, যখন হযরত ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোষণা করলেন, "এই সব ত শুধু নামই—যা তোমরা আর তোমাদের বাপদাদারা রেখেছ।" মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ও হাদিসবেত্তাগণ এই ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। খ্রীষ্টান জীবনীকারদের মতে, ঘটনাটি হযরত মুহম্মদের পক্ষে কোরাইশদের সঙ্গে সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য একটা আপোষরফা করার সাময়িক বাসনা হিসেবে অনুমিত হয়েছে। ধর্মান্ধরা একে "একটি ভ্রান্তি" ও "একটি অধঃপতন" বলে অভিহিত করে কিন্তু উদার ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে এমনভাবে বিবেচনা করেন যা আরবের নবীর চরিত্রের উপর নূতন আলোকপাত করে। নির্যাতন প্রতিদিন প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হচ্ছিল, তাঁর অনুসারীদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সমগ্র মক্কানগরী তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল। তাঁর অভাগা অনুসারীদের দুর্দশার ছবি তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল, আরব পৌত্তলিকদের সঙ্গে তাঁর ক্লান্তিকর সংগ্রাম তাঁকে দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে তাঁর শত্রুদের ধর্মান্ধতার কাছে সামান্য সুবিধাদান করে শত্রুতার অবসান ঘটানোর কথা তাঁর মনে এ সময়ে সাময়িকভাবে আসতেই পারে।" সুতরাং মুহম্মদ তাঁর প্রথম ও শেষ সুবিধা দিলেন। তিনি কোরাইশদের নিকট প্রত্যাদেশের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করলেন যেখানে তিনি সম্মানের সঙ্গে তিনজন চন্দ্র-দেবীর নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন, যে আল্লাহর কাছে তাদের সুপারিশ আশা করা যেতে পারে, 'অতএব আল্লাহর নিকট প্রণিপাত কর এবং তাঁর বন্দেগী কর'। এতে শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দে আপ্লুত হল, মুহম্মদের আল্লাহর নামে প্রণিপাত করল—সারা শহরবাসী তু' ধর্মে সমন্বিত হল। কিন্তু মরুর এই স্বাপ্নিক মিথ্যার উপর নির্ভর করার লোক ছিলেন না। সমগ্র মক্কা শহরের সমর্থনের বিনিময়ে তিনি নিজের লব্ধ সত্যকে অসত্য হতে দিতে পারেন না। তিনি এগিয়ে এলেন ও ঘোষণা করলেন যে তিনি ভুল করেছেন—শয়তান তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে। তিনি যা বলেছিলেন তা মুক্তকণ্ঠে ও সরলভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, আর 'তাদের মূর্তিসমূহ সম্পর্কে বললেন যে তারা শূন্যগর্ভ নাম মাত্র এবং তারা ও তাদের পূর্ব-পুরুষগণ এই নামগুলি বানিয়েছে।' '

"পাশ্চাত্য জীবনীকারগণ মুহম্মদের পতন বা স্খলন"-এর উপর অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করেছেন। তথাপি এটা ছিল চিত্তাকর্ষক আপোষ, কম-

লোকই এতে বাধা দিত। মুহম্মদের জীবন কোন দেবতার জীবন নয়, মানুষের জীবন; প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত এ জীবন মনুষ্য-জীবন। যদি তিনি একবার সমগ্র শহরবাসীর চিত্তজয়ের প্রলোভনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন না করতেন এবং পূর্বে যেখানে তীব্র নির্যাতন ছিল সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা না করতেন তবে তিনি যে মূল্যবান পুরস্কার পেয়েও তা পৌরুষ সহকারে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন, স্বাধীনভাবে তাঁর বিচ্যুতি স্বীকার করে-ছিলেন, এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পুরাতন অসম্মান ও অবমাননা আবার স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কি বলতে পারতাম? যদি তিনি একবার কপট হতেন—তিনি তা ছিলেন না—তবে কতখানি অকুতোভয় হত তাঁর পরবর্তী অকপটতা! কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিজের প্রতি সুবিচারক ছিলেন না—একথা তিনি লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে সর্বদা তাঁর ধর্মপ্রচার সভায় প্রকাশ করতেন। তাঁর গৌরবব্যঞ্জক প্রত্যাখ্যানের দ্বারা সেই মিথ্যা পদ-ক্ষেপটির অতিরিক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল।"[১]

লাত, উজ্জা ও মানাত শূন্যগর্ভ নাম মাত্র—এই ঘোষণার পরে নির্যাতনের মাত্রা নূতনভাবে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল। এতদসত্ত্বেও ঐশী সাহায্যের অবিচল বিশ্বাস নিয়ে এবং ফিরেশতার মাধ্যমে প্রদত্ত ঐশী পরামর্শের সাহায্যে তিনি তাঁর প্রচারকার্য অব্যাহত রেখেছিলেন, কোরাইশদের বাধা-বিপত্তির সাময়িক বিরতি কিংবা তাদের প্রচণ্ড দুশমনির ভেতর দিয়ে। সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ক্রমশ নিশ্চিতভাবে নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠার কাজ চলতে থাকে। সত্যে যে বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল তা পুষ্পিত হতে ব্যর্থ হয়নি। মরুভূমির দুর্বার আরবগণ, দূরবর্তী শহরের ব্যবসায়ী নাগরিক যারা জাতীয় মেলায় আসত তারা সেই অদ্ভুত লোকের কথা শুনেছিল যাঁকে তাঁর শত্রুরা অপ্রকৃতিস্থ বলে অভিহিত করেছিল। তারা তাঁর হৃদয় মথিত উপদেশ শুনেছিল, তারা বিস্ময় ও হতবুদ্ধির সঙ্গে তাদের দেবত্ব ও কুসংস্কার, তাদের ধর্মহীনতা ও ক্ষতিকর জীবন-পথের কথা শুনেছিল, এবং এমন কি তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের দূরবর্তী বাসভূমিতে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল নূতন আলোক ও নূতন জীবনের কথা। যে ব্যঙ্গোক্তি ও দুর্নাম তারা মুহম্মদের উপর স্তূপীকৃত করেছিল তা শুধু তাঁর বাণীকে সুদূরপ্রসারী করেছিল।

---

১. স্টেনলী লেন পুল, 'ইনট্রোডাকশান টু দি সিলেকশান ফ্রম দি কোরআন' পৃ. ৪৯।

মক্কাবাসীগণ কিন্তু মোটেই নিষ্ক্রিয় ছিল না। অনেকবার কোরাইশ-গণ আবু তালিবের নিকট তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা বন্ধ করার জন্য। প্রথম প্রথম আবু তালিব কোমলতা ও ভদ্রতার সঙ্গে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতেন, যেহেতু মুহম্মদ তাদের ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী নিন্দাবাদ অব্যাহত রেখেছিলেন, কাজেই তারা কাবা থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত করল যেখানে তিনি নিয়মিত প্রচারকার্য চালাতেন। তারা সদলবলে তাঁর চাচার নিকট গমন করল।[১] তারা বললো, "আমরা আপনার বয়স ও পদ-মর্যাদাকে সম্মান করি, কিন্তু আপনার প্রতি আমাদের সম্মানেরও একটা সীমা আছে। আর নিশ্চয়ই আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেবদেবীর প্রতি যে নিন্দা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বিরুদ্ধে যে অশ্লীল বাক্য আরোপ করছে তাতে হয় আপনি তাকে তা থেকে বিরত করুন নতুবা তার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করুন যাতে আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে এর একটা নিষ্পত্তিতে পৌঁছতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত দু'দলের একদল নিশ্চিহ্ন হই।"[২] এই বলে কোরাইশগণ নিষ্ক্রান্ত হল। আবু তালিব তাঁর লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অনিচ্ছুক ছিলেন, আর ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোরাইশদের নিকট ছেড়ে দিতেও তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি মুহম্মদকে ডেকে পাঠালেন, কোরাইশদের কথা তাঁকে জানালেন এবং তাঁকে তাঁর প্রচারকার্য বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন। মুহম্মদ ভাবলেন যে, তাঁর চাচা তাঁর প্রতি আশ্রয়ের হস্ত সরিয়ে নিতে চান; কিন্তু এই অসহায় মুহূর্তেও তাঁর মনোবল হ্রাস পেল না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, "হে আমার পিতৃব্য, যদি তারা আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য এবং বাম হস্তে চন্দ্র এনে উপস্থিত করে তথাপি আমি আমার প্রচারকার্য থেকে বিরত হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ কোন নূতন কারণ উদ্ভব করেন অথবা আমি আমার কাজ সম্পাদন করতে মৃত্যুবরণ করি। কিন্তু তাঁর রক্ষণাবেক্ষণকারী তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন—এই চিন্তায় অভিভূত হয়ে তিনি যাত্রার উদ্যোগ করলেন। তখন আবু তালিব উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ফিরে এসো", তিনি ফিরে এলেন। আবু তালিব বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা তাই প্রচার কর। আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে

---

১. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬। গ্রন্থকারের প্রমাণ অনুসারে এই সময়ে কোরআনের ২১-তম সূরার ২১৪ আয়াত নাজিল হয়েছিল।

২. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭; ইবনে হিশাম পৃ. ১৬৭, ১৬৮।

কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করব না, কখনো নয়।"[১] কোরাইশগণ আর একবার আবু তালিবকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা তাঁর পরিবর্তে মাখজুম পরিবারের একটি যুবককে তাকে প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল। এতে কোন ফল ফলল না।[২] ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমর্থন করার জন্য আবু তালিবের ঘোষিত অভিপ্রায় কোরাইশদের ক্রোধ বাড়িয়ে দিল এবং তারা তাদের নির্যাতনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করল। মাননীয় গোত্রপ্রধান বণী হাশিম ও বণী মুত্তালিব গোত্রের লোক, মুহম্মদের জ্ঞাতিদের আত্মসম্মানবোধের নিকট আবেদন করলেন তাদের বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিরোধী গোত্রের বিদ্বেষের বলি হতে রক্ষা করার জন্য। তাঁর এই আবেদনের প্রতি মহৎ প্রতিক্রিয়া হল, একমাত্র ব্যতিক্রম বক্রদৃষ্টি আবু লাহাব—"আগুনের পিতা"—পরিশিষ্টে আমরা দেখতে পাব।

এই সময়ে নূতন ধর্ম ওমরের মতো একজন দৃঢ়চেতা সমর্থক লাভ করল; তাঁর চরিত্রশক্তি ইসলামের ভাবী গণতন্ত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। মুহম্মদের ধর্মে তাঁর উৎসর্গীত সেবা ইতিহাসের পাতায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে। আদ বিন কাব পরিবারের উল্লেখযোগ্য সদস্য ওমর বিন খাত্তাব মুসলমানদের নির্যাতনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ছিলেন ইসলামের প্রচণ্ড বিরোধী, মুহম্মদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ইসলাম গ্রহণ তদীয় ভগিনীর গৃহে শ্রুত কোরআনের একটি সুরার আবৃত্তির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবের ফলশ্রুতি বলে বলা হয়ে থাকে। তিনি তাঁর ভগিনীর গৃহে সুতীব্র ক্রোধ ও খুনের অভিপ্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেখানে যে বাণী তিনি শুনতে পেয়েছিলেন তাতে অভিভূত হয়ে মুক্ত তরবারী হস্তে সোজা মুহম্মদের নিকট গমন করলেন—এই তরবারী দিয়েই তিনি মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ওমরের মুক্ত অসি দেখে হযরতের উপদেশ শ্রবণরত শিষ্যদের মনে কিছুটা ত্রাশ সঞ্চার করেছিল। তিনি হযরত মুহম্মদের হস্ত চুম্বন করলেন ও তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে স্থান দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ওমরের উপর ঐশী করুণা নিপতিত হওয়ায় মুসলমানগণ আল্লাহর প্রতি অজস্র কৃতজ্ঞতা

---

১. ইবনে হিশাম পৃ. ১৬৮; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮; আবুল ফেদা, পৃ. ১৭।

২. ইবনে হিশাম, পৃ. ১৬৯; ইবুনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮।

প্রকাশ করলেন। দীক্ষা লাভের পর তিনি ইসলামের এক শক্তিশালী আশ্রয়স্থলে পরিণত হলেন।

এখন থেকে ইসলামের সঙ্গোপনে চলার দিন শেষ হল, আল্লাহর ইবাদত করার জন্য গোপন আশ্রয়ের খোঁজ ও ভীতির প্রয়োজন শেষ হল। জীবনের নিম্ন অবস্থা থেকে আগত ইসলামের বহু অনুসারী ছাড়াও এখন হযরতের পাশে সমবেত হলেন একদল নির্বাচিত শিষ্য—হামযা, আবুবকর ও ওমর—শক্তি, প্রতিভা ও সম্মানের অধিকারী—অশিক্ষিত অজ্ঞ নন। তখন আলি যদিও তরুণ তথাপি তিনি দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দিকে এগিয়ে চলছিলেন।

এসব গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করল এবং এখন তারা প্রকাশ্যে ধর্মপালন করার পদক্ষেপ নিলেন। কোরাইশগণ ওমরের ইসলাম গ্রহণে প্রথমে হতবাক হলেও তারা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করল। তারা এক চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আবিসিনিয়া থেকে কোরাইশ প্রতিনিধিদের প্রত্যাবর্তন এবং তাদের কার্যক্রমের ব্যর্থতার সংবাদ তাদেরকে উন্মাদ করে তুলল। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা এক আঘাতেই সমগ্র হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের মূলোৎপাটন করবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তারা নবুয়্যতের সপ্তম বর্ষে ৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে হাশিম ও মুত্তালিবের বংশধরদের বিরুদ্ধে একটি সঙ্ঘ গঠন করল। তারা একটি পবিত্র দলিল দ্বারা অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, হাশিমীয়দের সঙ্গে তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবে না, তাদের সঙ্গে কোনরূপ পণ্যদ্রব্যের বেচাকেনা করবে না। হাশিম ও মুত্তালিব পরিবারের মুসলমান ও পৌত্তলিকগণ এতে সন্ত্রস্ত হলেন ও ভাবলেন যে, এই বাহানা কোন ভাবী আক্রমণেরই পূর্বাভাষ। কাজেই তারা শহরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বাস না করে এক জায়গায় সমবেতভাবে বাস করা নিরাপদ মনে করলেন। সেই মোতাবেক তারা আবু তালিবের একটি বাসগৃহ শেব গিরি-সংকটে সমবেত হলেন। এই গিরিসংকটটি মক্কার পূর্ব-প্রান্তসীমায় অবস্থিত—দীর্ঘ সংকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল, মক্কা নগরী থেকে ছোট পাহাড় বা প্রাচীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং সেখানে একটিমাত্র প্রবেশপথ বিদ্যমান ছিল। আবুলাহাব একাকী এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।

কোরাইশদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে সর্বপ্রকার অভাব-নিগৃহীত এই রক্ষণাত্মক অবস্থায় তারা মুহম্মদকে নিয়ে প্রায় তিন বছরকাল অতিবাহিত

করেছিলেন, তারা যেসব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়েছিলেন তা শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, বাইরে থেকে অনাহার-ক্লিষ্ট শিশুদের ক্রন্দনরোল শোনা যেত। কম ধর্মান্ধ স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে সাময়িক সাহায্য না পেলে সম্ভবত তারা অনাহারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কোন কোন গোত্রপ্রধান তাদের অন্যায় অবরোধের জন্য লজ্জাবোধ করতে লাগল। নবুয়্যতের দশম বছরে (৬১৯ খ্রীঃ) কাছাকাছি সময়ে আমরের পুত্র হিশাম হাশেমীদের ব্যাপারে প্রাণবন্ত আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিলেন, তিনি কোরাইশদের এবং হিশাম ও মুত্তালিব পরিবারদ্বয়ের মধ্যে একটা আপোষ রফার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। তিনি আবু উমাইয়ার পুত্র জোবাইরকে তার এই কাজের সঙ্গী হিসেবে পেলেন। তার ও আরও কয়েকজনের সমর্থনে চুক্তিটি ভেঙে ফেলা হল, দু'টি পরিবারকে পুনরায় সামাজিক অধিকার ভোগ করতে এবং মক্কায় ফিরে যেতে দেওয়া হল।

যে সময়ে মুহম্মদ তাঁর জ্ঞাতিবর্গসহ শেব গিরিসংকটে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন বাইরে ইসলামের প্রগতি সাধিত হয়নি। পবিত্র মাসগুলিতে যখন বাদ-বিসম্বাদ রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল হযরত তাঁর অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ধর্মের বাণী শোনাবার জন্য লোকের সন্ধান করতেন, তখন বক্রদৃষ্টি আবু লাহাব (আগুনের পিতা) তাঁর গতিবিধির উপর নজর রাখত এবং তিনি কিছু কথা বললে সে বলে উঠত: "একজন মিথ্যাবাদী ও একজন সেবীয়।" এভাবে সে হযরতের কথার গুরুত্বকে ধূলিসাৎ করে দিত।

এর পরবর্তী বছর ইসলামের ইতিহাসে "শোক-বছর" হিসাবে কথিত; কারণ এই বছরে আবু তালিব ও খাদিজার তিরোধান ঘটে—অল্পকালের বিরতিতে দু'জনের মৃত্যু ঘটে। আবু তালিবের মধ্যে মুহম্মদ হারালেন তাঁর যৌবনের অভিভাবককে, যিনি অদ্যাবধি তাঁর ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে মীমাংসার একটা যোগসূত্র ছিলেন। খাদিজার মৃত্যু ছিল তাঁর জন্য এক দুঃসহ আঘাত। যখন কেউ তাঁকে বিশ্বাস করত না, যখন তিনি তাঁর নবুয়্যতের পরিপূর্ণ চেতনায় জাগরিত হননি, যখন তাঁর চারদিকে সব কিছুই ছিল তমসাচ্ছন্ন ও ভয়াবহ এবং তাঁর মন ছিল সন্দেহে পরিপূর্ণ, তখন একমাত্র তাঁর সহধর্মিনী খাদিজাই তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ও অবিচল বিশ্বাস নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। "তিনি ছিলেন চিরকালের জন্য মুহম্মদের আশা ও সান্ত্বনার স্বর্গীয় দূত।" জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খাদিজার ভালবাসা ও নিষ্ঠার কোমল স্মৃতি তাঁর হৃদয়ে চির-অম্লান ছিল।

প্রথম অধ্যায়ের টীকা

স্যার উইলিয়াম মুয়ির মনে করেন যে, এম. কাসিম দ্য পার্সিভেল 'বাসা'-কে একটি স্থানের নাম অনুমান করে ভুল করেছেন। তিনি মনে করেন যে, শব্দটি মাটির উপর এই লোকদেরকে অত্যাচার করা হয়েছিল তার প্রকৃতিকে বুঝায়।—২য় খণ্ড, পৃ. ১২৮। এম. কাসিম দ্য পার্সিভেল ও আমার মতের সমর্থনে আমি এইমাত্র যোগ করতে পারি যে, এই জায়গার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে একটি ঘটনা; আর মুসলমান গ্রন্থকারগণ 'বাসা'কে পুনঃপুনঃ মক্কার সন্নিকটবর্তী একটি স্থান বলে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিখ্যাত হাকিম সানাই বলেন:

চো ইলমাত হাস্ত খিদমত কুন চো
বি ইল্‌মান কী যিস্ত আয়েদ
গিরিফৎ চিনিয়ান ইহ্‌রাম, ওয়া মেক্কী
খুফ্‌তা দর বাসা।

অর্থাৎ যদি তোমরা জ্ঞানী হও তবে যারা মূর্খ তাদের মত কাজ করবে কি? কেননা এটা অশোভন যে চায়না থেকে লোক এসে ইহ্‌রাম করবে (অর্থাৎ মক্কায় এসে হজব্রত পালন করবে), আর মক্কার অধিবাসীরা বাসা'য় ঘুমিয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হিজরত বা স্বদেশ ত্যাগ

"মুহম্মদ ইহজগৎ ও পরজগতের, মানবজাতি ও জ্বিনজাতির, আরব ও অনারব (আযম) সকলের সর্দার।"

উমাইয়া ও অন্যান্য বিরোধী গোত্রসমূহ তাদের পুরাতন ধর্মমতের প্রতি অনুরাগ, হাশেমীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মক্কা থেকে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য বর্তমান অবস্থাকে অনুকূল সুযোগ বলে বিবেচনা করল : আর আবু তালিবের মৃত্যু, যার ব্যক্তিগত প্রভাব ও চরিত্র তাদের ক্রোধকে একটা সীমার মধ্যে রেখেছিল, তা কোরাইশদের পক্ষে তাদের নির্যাতনকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার সংকেত হিসেবে দেখা দিল।[১]

শ্রদ্ধাস্পদ অভিভাবক ও বাঞ্ছিত সহধর্মিনীর তিরোধানের ফলে অভিভূত ও কোরাইশদেরকে পৌত্তলিকতা থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজে হতাশ হলেও দুঃখপূর্ণ ও বিশ্বাস উদ্দীপিত হৃদয়ে মুহম্মদ অন্যত্র তাঁর প্রচারকার্য চালানোর জন্য সংকল্প গ্রহণ করলেন। মক্কা তাঁর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, হতভাগ্য তায়েফ তাঁর বাণী শ্রবণ করতে পারে। বিশ্বাসী অনুচর জায়েদ সমভিব্যাহারে তিনি তায়েফবাসীদের[২] মধ্যে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদের নিকট তাঁর নবুয়্যাতের কথা বললেন, তাদের পাপাচারের বিষয় শোনালেন এবং আল্লাহর উপাসনা করার জন্য আহ্বান জানালেন। তাঁর কথায় তারা ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হল। তারা বলল, "কে এই উন্মাদ যে তাদেরকে তাদের সুন্দর উপাস্য দেবতাদের প্রত্যাখ্যান করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, ভারমুক্ত হৃদয়ে ও নৈতিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে আসছে?" তারা শহর থেকে তাঁকে বের করে দিল। তারা ইতরজন ও দাস শ্রেণীর লোকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিল—তারা তাঁকে গালিগালাজ করতে করতে ও পাথর মারতে মারতে সারা শহর তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল যতক্ষণ না তিনি শহর থেকে বের হয়ে

১. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯।
২. 'তাকিফা'-এর অর্থ তায়েফের বাসিন্দা।

'সন্ধ্যায় নিজ পথে চলা শুরু করলেন। আহত ও রক্তাপ্লুত অবস্থায় তিনি একটা খেজুরের বাগানে নামাজের জন্য প্রবেশ করলেন সেখানে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত পথচারী স্বাগত অভ্যর্থনা লাভ করলেন। আকাশের পানে হাত তুলে তিনি প্রার্থনা করলেন, "ওগো প্রভু, আমার দীনতা ও বঞ্চনার ঔদ্ধত্যের জন্য আমি তোমার সকাশে নালিশ জানাচ্ছি যে, আমি মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছ। ওগো পরম করুণাময়, ওগো দীনজনের প্রভু, তুমি আমার প্রতি-পালক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করো না। তুমি আমাকে অপরিচিত লোক ও আমার দুশমনদের শিকারে পরিণত করো না। যদি তুমি আমার প্রতি অখুশী না হও তবে আমি নিরাপদ। আমি তোমার প্রসন্নতার আলোতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ফলে সব অন্ধকার দূরীভূত হয়, ইহ-জগতে ও পরজগতে শান্তি নেমে আসে। তোমার ক্রোধ যেন আমার উপর বর্ষিত না হয়। যেভাবে তুমি সন্তুষ্ট হও সেভাবেই আমার সমস্যাবলী সমাধান কর। তুমি ছাড়া আমার কোন শক্তিবল, কোন সাহায্য আশ্রয় নেই।"[১]

অত্যন্ত ব্যথাহত হৃদয়ে হযরত মুহম্মদ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। স্বল্প সময়ের জন্য তিনি এখানে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর লোকজনদের থেকে সরে গিয়েছিলেন; আর সাময়িকভাবে তিনি তাদের কাছে ধর্মপ্রচার কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, যারা মক্কায় ও তার সন্নিকটবর্তী স্থানে বার্ষিক তীর্থ ব্যপদেশে সমবেত হত। ঐতিহাসিক তাবারীর মতে এই আশায় তিনি প্রচার চালাতেন যে, তাদের মধ্যে তিনি কিছুলোক পাবেন যারা তাঁর ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তাদের লোকজনদের নিকট সত্যের বাণী বয়ে নিয়ে যাবে।

একদিন যখন তিনি বিষণ্ণ অথচ আশান্বিত হৃদয়ে এসব আধা-ব্যবসায়ী আধা-তীর্থযাত্রীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন, তখন দূর ইয়াসরিব থেকে আগত পরস্পর কথোপকথনরত ছয়জন লোকের একটি দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাদেরকে উপবেশন ও শ্রবণ করতে অনুরোধ জানালেন। তারা উপবেশন করল ও মনোযোগ সহকারে তার কথা শ্রবণ করল। তাঁর ঐকান্তিকতা ও বক্তব্যের সত্যতায় বিমুগ্ধ হয়ে তারা তাঁর শিষত্ব গ্রহণ করল (৬২০ খ্রী)।[২] দেশে প্রত্যাবর্তন করে তড়িত-

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৭৯-২৮০; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১।
২. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৮৬-২৮৭; তাবারী (জোটেনবার্গের অনুবাদ) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।

গতিতে তারা প্রচার করল যে, আরবদের মধ্যে একজন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে যিনি আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করছেন এবং শতাব্দীব্যাপী আত্মঘাতী কলহ দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

পরের বছর এই ইয়াসরিববাসীরা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করল এবং সেই শহরের দুটি প্রধান গোত্রের[১] প্রতিনিধি হিসেবে আরও ছয়জন সহ-নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে এল।

যে স্থানে পূর্ববর্তী ছয়জন লোক দীক্ষা নিয়েছিল সেখানে আগন্তুক ছয়জন লোকও মুহম্মদের নিকট বয়েত হল। যে পর্বতের পাদদেশে এই আলোচনা সভা সংঘটিত হয়েছিল তার নামানুসারে এই শপথের নাম হল আকাবার প্রথম শপথ।[২]

তারা যে শপথ গ্রহণ করেছিল তা ছিল নিম্নরূপ : "আমরা আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুর শরীক করব না; আমরা চুরি করব না; ব্যভিচারেও লিপ্ত হব না; আমরা আমাদের শিশুসন্তানদের হত্যা করব না; আমরা সর্বপ্রকার অশোভন ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকব। সকল উত্তম কাজে আমরা হযরতের নির্দেশ মেনে চলব এবং সুখে-দুঃখে আমরা তাঁর প্রতি অনুগত থাকব।"[৩]

এই শপথ গ্রহণের পর নূতন ধর্মের মূল নীতিসমূহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুহম্মদের একজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসরিববাসীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন করল। এই নূতন ধর্ম অল্পদিনের মধ্যেই ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচার লাভ করল।

আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথের অন্তর্বর্তীকাল মুহম্মদের নবুয়্যতের প্রচারকার্যের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ কালসমূহের মধ্যে অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আল্লাহর প্রতি মুহম্মদের পরম নির্ভরতা ও তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব এই সময়ে যে গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছিল তেমনটি পূর্বে দৃষ্ট হয়নি। মানুষ শিরকের মধ্যে যেভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছিল তাতে তিনি

১. আস ও খাজরাজ।
২. এই শপথ ইসলামের ইতিহাসে "নারীদের শপথ" নামেও অভিহিত। দ্বিতীয় আ· াবার শপথের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, এই দ্বিতীয় বারের শপথে ইয়াসরিবের প্রতিনিধিবৃন্দ এই শপথ গ্রহণ করল যে মুসলমানদের পক্ষে শত্রুদের আক্রমণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তারা অস্ত্র ধারণও করবে।
৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৮৯; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪।

মর্মাহত হয়েছিলেন,[১] তবে পরিশেষে সত্য অবশ্যই বিজয়ী হবে—এই আশা তাঁর মর্মব্যথা প্রশমিত করেছিল,[২] তিনি তা দেখার জন্য হয়তো বেঁচে থাকবেন না,[৩] যেহেতু সূর্যের আলোকের সামনে অন্ধকারের ঘনঘটা দূরীভূত হয় কাজেই সত্যের আগমনে মিথ্যা অপসৃত হবেই।[৪] ঐতিহাসিক মূয়িরের মুখ থেকে এই কাল সম্পর্কে অবচেতনভাবে কিছু প্রশংসার বাণী নিঃসৃত হয়েছে। "এভাবে মুহম্মদ তাঁর লোকজনদেরকে বিপদের সম্মুখে রেখে, বাহ্যত তার ছোট দলটিকে সিংহের কবলে পতিত রেখেও তার সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভর করে নিষ্কম্প অবিচলভাবে অপেক্ষা করছিলেন যে তিনি বিজয়ী হবেন—এটা এমন একটা মহান দৃশ্যের অবতারণা করে যা শুধু ইসরাইলদের নবীর পবিত্র বিবরণের মধ্যেই মেলে, যিনি তাঁর প্রভুর কাছে অভিযোগ করেছিলেন, "আমি, একমাত্র আমি আছি, প্রভু।"[৫]

এই কালের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা মেরাজের বিখ্যাত সন্দর্শন দ্বারাও বিশেষিত। এই মেরাজের ঘটনা জগতের কবি ও ঐতিহ্যবাদীদের কাল্পনিক প্রতিভার সোনালী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। তারা কোরআনের সহজ সরল বর্ণনাকে কেন্দ্র করে সুন্দর ও জমকাল রূপকথার জন্ম দিয়েছে। "তিনিই পবিত্র মহান সত্তা, যিনি তাঁরই এক বান্দাকে এক রাতে কাবাগৃহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চারদিক আমি বরকত মহিমায় ঘিরে রেখেছি যেন আমার কতকগুলো আয়াত আমিই তাঁকে দেখাতে পারি। একথা সত্য সুনিশ্চিত যে একমাত্র তিনিই সব শোনেন ও দেখেন।" (১৭—১)[৬] আর আপনি স্মরণ করুন, আমি আপনাকে

---

১. সূ. ৬ আ. ১০৭।

২. সূ. ৪০ আ. ৭৮; সূ. ৪৩ আ. ৪০ ইত্যাদি।

৩. সূ. ২১ আ. ১৮।

৪. সূ. ১৭ আ. ১৮।

৫. 'লাইফ অব মহমেট', ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮।

৬. কোরআন: সূ. ১৭ আ. ১। "মেরাজ সম্পর্কে যা মুসলমানেরা অবশ্যই বিশ্বাস করেন তা হল এই যে ধ্যান সন্দর্শনে হযরত মুহম্মদ (দঃ) নিজেকে মক্কা থেকে জেরুজালেমে নীত দেখতে পেয়েছিলেন এবং এই ধ্যান সন্দর্শনে তিনি যথার্থই তার প্রভুর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন। পাঠকদের কাছে এ অবশ্যই সুস্পষ্ট হবে যে নবীদের সন্দর্শনও এক ধরনের ঐশী প্রেরণা"—সৈয়দ আহম্মদ খান, এসেজ, ৯, পৃ. ৩৪। মুয়ির বলেন যে "প্রাথমিক প্রামাণ্য দলিল

বলেছিলাম, নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মানুষ জাতিকে ঘিরে আছেন। আমিই মেরাজ নিয়মিত করেছিলাম, আমিই তা আপনাকে দেখিয়েছিলাম।" ঐতিহ্যবাদীরা যে সুন্দর সাজে এই ঘটনাকে সজ্জিত করেছিলেন তা সত্ত্বেও এ সন্দর্শন গৌরবব্যঞ্জক দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ এবং গভীর তাৎপর্যবহ।[১]

পরের বছর (৬২২ খ্রীঃ) ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে যাঁরা নূতন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের পৌত্তলিক নাগরিকসহ মোট সত্তরজন হযরত মুহম্মদকে তাদের শহরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এসেছিলেন ;[২] কিন্তু আগত পৌত্তলিকগণ তাদের সাথীদের অভিপ্রায় সম্পর্কে কিছুই জানত না।

রাত্রির নীরবতায়[৩] যখন সব বিরোধী শক্তি নিদ্রায় অসাড় হয়ে পড়েছিল তখন এই নূতন ধর্মের পথিকৃৎগণ যেখানে প্রথম শপথ গ্রহণ করেছিলেন সেখানে পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলেন। চাচা আব্বাস সমভিব্যাহারে হযরত মুহম্মদ সেখানে উপস্থিত হলেন। আব্বাস তখনও ইসলামে দীক্ষিত হননি তবে ইসলামের অগ্রগতিতে তিনি খুবই আগ্রহ অনুভব করতেন। তিনি আলোচনার উদ্বোধন করে পরিষ্কার ভাষায় ইয়াসরিববাসীদের বুঝিয়ে দিলেন যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ও পয়গাম্বরকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে তারা কি ধরনের বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে। তারা সকলে সমস্বরে উত্তর দিলেন যে, বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই তারা এ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তারা বললেন, "হে আল্লাহর নবী, আপনি বলুন, এবং আপনার ও আপনার প্রভুর জন্য যে কোন শপথ

নির্দেশ করে মেরাজ শুধু সন্দর্শন—প্রকৃত দৈহিক ভ্রমণ নয়।"—২য় খণ্ড, পৃ. ২২১, টীকা। ইবনে হিশাম (পৃ. ২৬৭) যে ঐতিহ্য পরম্পরা পেশ করেছেন তা এই মত সমর্থন করে। আমার মনে হয় এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, খ্রীষ্টানগণ যারা যিশু ও এলিজার দৈহিক পুনরুজ্জীবন ও দৈহিক উড্ডয়নে বিশ্বাস করেন তারা মুহম্মদের দৈহিক উড্ডয়নে বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে নিজেদের চেয়ে কম বুদ্ধিদীপ্ত বলে বিবেচনা করবেন।

১. স্টেনলী লেনপুল, 'ইনট্রোডাকশন টু দি সিলেকশানস ফ্রম দি কোরআন' পৃ. উপক্রম ৫৬।
২. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৯৬ ; আল্ হালাবী, 'ইনসানুল্ উয়ুন' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।
৩ 'তাশরিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের রাত্রি—হজব্রত পালনের অব্যবহিত পরের তিন দিন।

করান। হযরত অভ্যস্ত পথে কোরআনের কতিপয় আয়াত আবৃত্তি করে শুরু করলেন; তারপর তিনি উপস্থিত সকলকে আল্লাহর উপাসনা করার জন্য আহ্বান জানালেন এবং ইসলামের আশীর্বাদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন।[১] প্রথম শপথটি পুনর্বার উচ্চারিত হল যে তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের ভজনা করবে না, তারা ইসলামের নির্দেশাবলী মেনে চলবে, তারা যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত কাজে মুহম্মদের নির্দেশ প্রতিপালন করবে এবং তাঁকেও তাঁর লোকজনদের রক্ষা করবে।[২] তারা বললেন, "যদি আমরা আল্লাহর কাজে মৃত্যুবরণ করি তবে আমাদের পুরস্কার কি?" তিনি জবাব দিলেন, "পরকালে শান্তি।"[৩] তারা বললেন, "যখন আপনার সুদিন আসবে তখন কি আপনি আমাদের ছেড়ে আপনার লোকদের কাছে ফিরে যাবেন না?" হযরত মৃদু হেসে বললেন, "না কখনো না; তোমাদের রক্ত আমার রক্ত; আমি তোমাদের, তোমরা আমার।" "তাহলে এবার আপনার হাত দিন"—প্রত্যেকে হযরতের হাতে হাত রেখে তাঁর ও আল্লাহর কাছে শপথ নিলেন। শপথ-পর্ব প্রায় শেষ এমন অবস্থায় দূর থেকে দৃষ্ট এই ঘটনার দ্রষ্টা একজন আরবের কণ্ঠস্বর নিশীথের বাতাসে ভেসে এল। এতে সমবেত আত্মোৎসর্গীত লোকদের মধ্যে সহসা আতঙ্ক দেখা গেল। হযরতের দৃঢ়চিত্ততা অবিলম্বে তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ফিরিয়ে আনল।

অতঃপর মুহম্মদ তাদের ভেতর থেকে বারজন লোক নির্বাচন করলেন—সকলেই মর্যাদাসম্পন্ন লোক—সকলের অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত—তারা হযরতের প্রতিনিধি (নকিব)।[৪] এরূপে আকাবার দ্বিতীয় শপথ সম্পন্ন হল।

মক্কার গুপ্তচর এই সম্মেলনের খবর সারা শহরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দুঃসাহস দেখে হতবাক হয়ে কোরাইশরা

---

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৯৬; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬।

২. প্রাগুক্ত।

৩. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭।

৪. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৯৯-৩০০। পঁচাত্তর জন নরনারী এই শপথে অংশ গ্রহণ করেছিল। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল জিল হজ মাসে এবং হযরত এই মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি, মহর্রম ও সফর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মদিনায় গমন করেছিলেন। —ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, প. ৩৮।

সদলবলে ইয়াসরিববাসীদের কাফেলোর নিকট গিয়ে মুহম্মদের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ লোকদেরকে দাবী করল। কোন্ কোন্ লোক শপথ নিয়েছে তার কোন ইঙ্গিতলাভে ব্যর্থ হয়ে কোরাইশরা কাফেলাকে উৎপীড়ন না করেই যেতে দিল। কিন্তু কোরাইশদের এই রূপ ব্যবহার মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর প্রচণ্ড উৎপীড়নেরই পূর্বাভাষ হিসেবে দেখা দিয়েছিল। দিনের পর দিন তাদের অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটছিল। হযরত তাঁর শিষ্যদের সামগ্রিক বিপর্যয় আশঙ্কা করে তাদেরকে অবিলম্বে ইয়াসরিবে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নির্দেশ দিলেন। দু'তিনটি পরিবার একবারে নীরবে ইয়াসরিবের পথে মক্কা ত্যাগ করতে লাগল এবং একশতটি পরিবার ইয়াসরিবে পাড়ি দিল, সেখানে তারা উদ্দীপনার সঙ্গেই অভ্যর্থিত হল। শহরের বাসগৃহসমূহ এরূপে পরিত্যক্ত হল। বারিয়ার পুত্র ওতবা প্রাণবন্ত ধরনের লোক হয়েও এসব পরিত্যক্ত গৃহের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিম্নোক্ত কবিতার পঙতি আবৃত্তি করেছিল : "প্রত্যেকটি বাসগৃহ যা এতদিন স্বর্গীয় আনন্দের নিলয় ছিল তা একদিন অসন্তোষ ও তীব্র অশান্তির শিকারে পরিণত হবে।" সে দুঃখের সঙ্গে আরও উক্তি করল—"এসব আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাজেরই পরিণতি, সে আমাদের দলবল বিধ্বস্ত করেছে, আমাদের কর্মপন্থাকে ধ্বংস করেছে এবং আমাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করেছে।"[১]

যেমন যিশুর ক্ষেত্রে হয়েছিল তেমনি মুহম্মদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল শুধু দু'জনের মধ্যে এই তফাত ছিল যে এক ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারক স্বয়ং বলেছিলেন : "ভেবো না যে আমি জগতে শান্তি প্রেরণের জন্য এসেছি, আমি শান্তি প্রেরণের জন্য আসিনি, তরবারি প্রেরণের জন্য এসেছি; কেননা আমি ছেলেকে পিতার বিরুদ্ধে, কন্যাকে মায়ের বিরুদ্ধে এবং পুত্র-বধূকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার জন্যই এসেছি।"[২] মুহম্মদের ক্ষেত্রে তাঁর একজন অধ্যবসায়ী প্রতিপক্ষ শুধু এই বলে অভিযোগ করেছিল যে তিনি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন।

এই কালে, যখন ঝড়ের তাণ্ডব ছিল সবচেয়ে উঁচুতে এবং যে-কোন মুহূর্তে তাঁর উপর তা আঘাত হানতে পারত, হযরত মুহম্মদ মোটেই সন্ত্রস্ত হননি। তাঁর সকল শিষ্য ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেছে, তিনি

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩১৬।
২. বাইবেল, ম্যাথু. ১০, ৩৪, ৩৫।

একাকী অনুগত আলী ও শ্রদ্ধাসম্পদ আবু বকরসহ সাহসিকতার সঙ্গে নিজ অবস্থান আগলে ছিলেন।

ইতিমধ্যে বিপদের মেঘ দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল। হযরত মুহম্মদ যে কোন সময়ে পলায়ন করতে পারেন—এই আশঙ্কায় দার-উন-নাদওয়ায় কোরাইশদের একটা জরুরী অধিবেশন বসল, অন্য গোত্র থেকেও কিছু-সংখ্যক প্রধানকেও এই অধিবেশনে ডাকা হল। সভা অতিশয় বাকবিতণ্ডা-পূর্ণ ছিল, কারণ কোরাইশদের অন্তরে ভীতি প্রবেশ করেছিল। অধিবেশনে মুহম্মদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান ও নগর থেকে বহিষ্কার করা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হল। অতঃপর তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব উঠল কিন্তু একজন তাঁকে হত্যা করলে সে ও তার পরিবার রক্তের প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় কবলিত হয়ে পড়বে, অবশেষে আবু জেহেল[১] এই অসুবিধার মীমাংসার জন্য একটি প্রস্তাব প্রদান করল। প্রস্তাবটি এই: বিভিন্ন পরিবার থেকে কয়েকজন সাহসী লোক বেছে নেওয়া হবে তারা একই সময়ে একইভাবে মুহম্মদের বুকে তরবারী বসিয়ে দেবে যাতে হত্যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর না বর্তে—সকলের উপর নিপতিত হয়, ফলে মুহম্মদের আত্মীয়গণ হত্যাকারীর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে সমর্থ হবে না। প্রস্তাবটি গৃহীত হল এবং রক্তক্ষয়ী কাজটি সম্পাদনের জন্য কতকগুলো উচ্চবংশজাত তরুণকে নির্বাচিত করা হল। রাত্রি এসে পড়ল, হত্যাকারী-দেরকে হযরতের বাড়ীর চারিদিকে মোতায়েন করা হল। তারা সারা রাত্রি

ইবনে হিশাম, পৃ. ৩২৩-৩২৫ ; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯ ; কোরআন সু ৮ আ. ৩০। হিশামের মতানুসারে অন্যতম কোরাইশ আবু জেহেলের প্রস্তাব নজদের সম্মানিত শেখের ছদ্মবেশে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সমর্থন করেছিল যাকে হাদিসে শয়তান বলে অভিহিত করেছে। আবু জেহেল ছিল হযরতের একজন উগ্রতম দুশমন। তার প্রকৃত নাম ছিল আমর, এবং বিচক্ষণতার জন্য সে 'আবুল হিকাম' ("জ্ঞানের পিতা") উপাধি পেয়েছিল। ধর্মান্ধতার জন্য নূতন ধর্মের মধ্যে সে কল্যাণ দেখতে পায়নি, সে কারণ হযরত মুহম্মদ তাকে 'আবু জেহেল' ("অজ্ঞানতার পিতা") অভিহিত করতেন। অজ্ঞানতা সব যুগেই ধর্মান্ধতার প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এভাবে আবু জেহেল একটা নমুনায় পরিণত হয়েছে। বিখ্যাত মরমী কবি হাকিম সানায়ী নিম্নোক্ত দুই পঙক্তি কবিতায় ঘটনাটির ইঙ্গিত করেছেন:

> "নবী আহমদ যেথায় বসে আছেন জ্ঞানের মশাল সঙ্গে নিয়ে
> কেমনে সেথায় বু' জেহেলের অবিশ্বাস পশে হৃদয় দিয়ে।"

জেগে পাহারা দিতে লাগল এবং অতি প্রত্যুষে যখন তিনি গৃহ থেকে বহির্গত হবেন তখন তাঁকে হত্যা করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারা মাঝে মাঝে দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে দেখতে লাগল যে মুহম্মদ এখনও বিছানায় শায়িত আছেন কিনা। ইত্যবসরে আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তি যা নাজারাতের মহান প্রেরিত পুরুষকে প্রায়ই শত্রুদের[১] এড়িয়ে চলতে চালিত করত তা মুহম্মদকে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করল। হত্যাকারীদের দৃষ্টি তাঁর শয্যার উপর নিবদ্ধ করার জন্য তিনি তাঁর সবুজ পোশাক অনুগত ও বিশ্বস্ত আলীকে পরিধান করালেন, ও তাঁর বিছানায় শয়ন করতে আদেশ করলেন,[২] এবং তিনি "দাউদের মত জানালা দিয়ে পালিয়ে গেলেন"। তিনি আবু বকরের বাটীতে গমন করলেন এবং তাঁরা একই সঙ্গে সকলের অলক্ষ্যে তাঁদের নির্দয় জন্মভূমি থেকে পলায়ন করলেন। তাঁরা মক্কার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সওর গিরি-গুহায় কয়েকদিন আত্ম-গোপন করেছিলেন।[৩]

কোরাইশদের উন্মত্ততা এবার সীমাহীন আক্রোশে ফেটে পড়ল। হবু হত্যাকারীরা ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং মুহম্মদ পলায়ন করেছে—এই সংবাদ তাদের সমগ্র শক্তিকে জাগিয়ে তুলল। অশ্বারোহী-গণ দেশময় তন্ন তন্ন করে মুহম্মদকে খুঁজতে লাগল। তাঁর মস্তিষ্কের উপর মূল্য নির্ধারিত হল।[৪] একবার বা দু'বার বিপদ এত কাছে এসে পড়েছিল যে বৃদ্ধ আবু বকর সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বললেন, "আমরা যে মাত্র দু'জন।" হযরত বললেন, "না, আমরা তিনজন; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" সত্যই আল্লাহ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তিনদিন পর কোরাইশগণ তাদের তল্লাসী প্রয়াস শিথিল করল। এই কয়দিন আবু বকরের এক কন্যা হযরত ও তাঁর সঙ্গীর জন্য রাত্রিতে আহার সরবরাহ করত। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় পলাতকদ্বয় গুহা ত্যাগ করলেন; বহু কষ্টে তাঁরা দু'টি উট জোগাড় করলেন ও স্বল্প ব্যবহৃত পথে ইয়াসরিবে উপনীত হওয়ার জন্য যত্নবান হলেন। মুহম্মদের শিরের জন্য ধার্য উচ্চ মূল্য মক্কা

---

১. তুলনা—মিলান, 'হিস্ট্রী অব্ ক্রিশ্চিয়ানিটি', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
২. ইবনে হিশাম, পৃ ৩২৫, ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।
৩. ডেস ভারজার্সের টীকা (৫৭), পৃ. ১১৬।
৪. একশত উট হযরতের শিরের মূল্য নির্ধারিত হয়। ইবনে হিশাম, পৃ. ৩২৮। ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।

থেকে বহু অশ্বারোহীকে পথে টেনে এনেছিল এবং তখনও তারা সযত্নে অসহায় গৃহত্যাগীকে খুঁজে ফিরছিল। একজন দুর্বার, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা পলাতকদের দেখতে পেয়েছিল এবং তাদেরকে অনুসরণ করেছিল। পুনরায় আবু বকর ভয়ার্ত হয়ে বলে উঠলেন, "আমাদের সর্বনাশ।" হযরত বললেন, "ভীত হবেন না। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন।" পৌত্তলিকটি মুহম্মদকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘোড়ার পিছনের পা মাটিতে দেবে গেল ও ঘোড়াটি ভূতলশায়ী হল। হঠাৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে যাঁকে অনুসরণ করছিল তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী হল এবং ক্ষমা-প্রদর্শনের সাফাইয়ের জন্য অনুরোধ করল। আবু বকর প্রদত্ত একখানি অস্থির উপর এই সাফাই প্রদত্ত হল।[১]

পলাতকদ্বয় আর কোন বিড়ম্বনা ছাড়াই তাদের যাত্রার অগ্রগতি অব্যাহত রাখলেন এবং তিনদিন পথ চলার পর ইয়াসরিবের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করলেন। ৬২১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের এক গরমের দিনে হযরত মুহম্মদ তাঁর উষ্ট্র থেকে অবতরণ করলেন ইয়াসরিবের মাটিতে, যা পরে তাঁর স্বদেশ ও আশ্রয়স্থলে পরিণত হল। একজন ইহুদী গৃহের চূড়া থেকে প্রথমে তাঁকে দেখেছিল[২] আর এরূপে কোরআনে বাণী বাস্তবায়িত হয়েছিল। "যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা সে জিনিসটিকে বেশ জানে—ঠিক যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে তারা জানে।"[৩] মুহম্মদ ও তাঁর সঙ্গী কয়েকদিনের জন্য[৪] 'কোবা' নামক গ্রামে অবস্থান করেছিলেন। এই কোবা গ্রাম ইয়াসরিবের মাত্র দু'মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং সৌন্দর্য ও উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানেই আলী তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। মুহম্মদ তাদের নাগালের বাইরে যাওয়ায় কোরাইশগণ হতাশ হয়ে আলীর প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করেছিল।[৫] আলী মক্কা থেকে পালিয়ে পদব্রজে এখানে পৌঁছেছিলেন। তিনি দিনে লুকিয়ে থাকতেন ও শুধু রাত্রে পথ চলতেন যাতে কোরাইশদের কবলে নিপতিত না হন।[৬]

এই গ্রামের মালিক ছিল বনী আমর বিন আউফ গোত্র। তারা হযরতকে দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু কর্তব্য তাঁর সামনে প্রসারিত ছিল। তিনি অগণিত শিষ্য

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩১, ৩৩২; ইবনুল আসির, প্রাগুক্ত।
২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩০। ৩. সূ. ৬ আ. ২০।
৪. সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার—ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩৫।
৫. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০। ৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২।

সমভিব্যাহারে ইয়াসরিব নগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি ১৬ই রবিউল আউয়াল, ৬২২ খ্রী.-র ২রা জুলাই (এম কসিন দ্য পার্সিভালের মতানুযায়ী) শুক্রবার সকালে নগরে প্রবেশ করেছিলেন।[১]

এরূপে হিযরত সম্পন্ন হয়েছিল যা ইউরোপের বর্ষপঞ্জীতে "ফ্লাইট অব মুহম্মদ" বলে অভিহিত। এ থেকে শুরু হয় মুসলমানদেব বর্ষ-পরিক্রমা।

প্রথম টীকা

"হিযরা" বা হিযরী বর্ষ দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) সতের বছর পরে প্রচলন করেন। অবশ্য ৪ঠা রবিউল আউয়াল হযরত মক্কা ত্যাগ করেছিলেন—এই যথার্থ তারিখ থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয় না বরং প্রথম চান্দ্র মাস মহর্রমের প্রথম দিন থেকে ধরা হয়। যখন প্রথম হিজরী সাল চালু হল তখন পহেলা মহর্রম ছিল ১৫ই জুলাই।

যদিও ওমর সরকারী হিযরী বর্ষের প্রচলন করেছিলেন, তথাপি কতিপয় হাদিস অনুসারে হযরত নিজেই ঘটনা উল্লেখের সময় হিযরতের পূর্বে বা পরের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করতেন। হযরতের ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই প্রধানতম সংকট হিসেবে চিহ্নিত।

তুঃ—আল্ হালাবার 'ইন্সানুল উয়ুন'।

দ্বিতীয় টীকা

বারটি মুসলিম মাস হল মুহর্রম (পবিত্র মাস), সফর (বিদায়ের মাস), রবিউল আউয়াল (বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস), রবিউস সানী (বসন্ত ঋতুর দ্বিতায় মাস), জামাদিউল্ আউয়াল (প্রথম শুষ্ক মাস), জামাদিউস্ সানী (দ্বিতায় শুষ্ক মাস), রজব (সম্মানিত মাস), শাবান (গাছের কুঁড়িফোটার মাস), রমজান (গরমের মাস), শাওয়াল (সংযোগের মাস), জুলকাদ (সন্ধি, শান্তি বা আরামের মাস) জুল হাজ্জ (হজব্রত উদযাপনের মাস)। প্রাচীন আরবগণ ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ সেকেণ্ডে চান্দ্র বর্ষ গণনা করত এবং তারা সময়কে পর্যায়ক্রমে ২৯ ও ৩০ দিনে মাস ধরে ১২ মাসে বিভক্ত করত। প্রতিবেশী গ্রীক ও রোমানদের সৌর বর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং প্রত্যেকটি মাস যথার্থ ঋতুতে পড়ার জন্য আরবেরা প্রত্যেক তৃতীয় বছরের সঙ্গে এক মাস যোগ করত। এই অন্তর-সংযুক্তিকে 'নসি' বলা হত; যদিও এটা খুব একটা নিখুঁত ছিল না তথাপি তা মাস ও ঋতুর মধ্যে একটা সমন্বয়ের প্রয়াস ছিল। যে বছরে এই সংযুক্তি ঘটত সেই বছরে অনেক পৌত্তলিক প্রথা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অনুষ্ঠিত হত; এই কারণে 'নসি' বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই প্রথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাসের নাম সমূহের সঙ্গে ঋতুর কোন সম্পর্ক নেই।

---

১. কসিন দ্য পার্সিভেল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭-২০; ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩৫।

তৃতীয় অধ্যায়

মদিনায় রাসুল মুহম্মদ

'সব নবীদের আগে তুমি,
স্বজিয়াছে প্রভু তোমায়
সবার শেষে আগম তব
এ ধরণীর ধূসর ধূলায় ;
খাতেমুন নবী তুমি
পরশ তোমার পেয়েছি যে
সবার শেষে এসেছো
সুদূর হতে এসেছো যে।

অধ্যায়ের শীর্ষে যে মরমী কবিতার পঙতিগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে বর্তমান যুগের খুব কম মুসলমানই তার পরিপূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করে থাকেন কিন্তু যে মহান সাধকের কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর প্রতি অনুরাগের বিষয় সকলেই প্রশংসার সঙ্গে মূল্যায়ন করে থাকেন।' এই অনুরাগ কোন পৌরাণিক আদর্শকে কেন্দ্র করে কিংবা কালের বিস্মৃতির ফলে উদ্ভুত হয়নি। যে মুহূর্তে ইয়াসরিবে তাঁর আগমন ঘটেছে তখন থেকেই তিনি দিনমণির পূর্ণ রশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়েছেন—ঐতিহাসিক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্বে প্রদীপ্ত হয়েছেন—ইতিহাসের পরিপূর্ণ আলোকচ্ছটা তাঁর উপর প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে ও পরবর্তী বংশধরদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়েছে পরিশ্রুত হওয়ার জন্য, অনেক সময় তাঁর শিক্ষার প্রতিকূলে গিয়ে যে শিক্ষা মানবজাতির বিরামবিহীন বিকাশকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। আমরা এই বিস্ময়কর ব্যক্তিকে দেখেছি একজন পিতৃহীন শিশু হিসেবে যিনি পিতার স্নেহ কি তা কোনদিন জানতে পারেননি, শৈশবে মাতৃহারা হয়ে মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—এমনি করুণ তাঁর শৈশব—তিনি চিন্তাশীল শিশু থেকে অধিকতর চিন্তাশীল যুবকে পরিণত হয়েছেন। তাঁর যৌবন তাঁর শৈশবের মতই নির্ভেজাল ও সত্যনিষ্ঠ; তাঁর পরিণত বয়স তাঁর যৌবনের মতই কঠোর ও অকপট! তাঁর

শ্রবণেন্দ্রিয় দীন ও দুর্বলদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি চিরউন্মুক্ত; তাঁর হৃদয় খোদার সমগ্র জীবের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। তিনি এত বিনয় ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে চলাফেরা করতেন যে, লোকে তাঁর দিকে ফিরে বলত—'এই যে আল্‌ আমিন—বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন চলেছেন'। একজন বিশ্বস্ত বন্ধু, একজন অনুরক্ত স্বামী, জীবন-মৃত্যুর রহস্য, মানুষের ক্রিয়াবলীর দায়িত্বসমূহ, মানুষের অস্তিত্বের পরিণতি ও লক্ষ্য উন্মোচনের জন্য নিবেদিত চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি একটি জাতি তথা বিশ্বকে ঢেলে সাজানো ও পরিশ্রুত করার মহান ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এই কাজে একটিমাত্র অনুরক্ত হৃদয় তাকে শান্তি ও সান্ত্বনা জুগিয়েছে। ব্যর্থতা দ্বারা হতবুদ্ধি হলেও তিনি কখনো বিচলিত হননি; পরাভবের সামনে পড়েও হতাশ হননি। যে কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তিনি অবিরত সংগ্রাম করেছেন। তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব, আল্লাহর করুণা সম্পর্কে তাঁর সুতীব্র ও ঐকান্তিক বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত তাঁর চারপাশে টেনে এনেছিল বিপুল সংখ্যক অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলীকে। যখন তীব্রতম পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়েছিল তিনি বিশ্বাসী নাবিকের মতো তাঁর শিষ্যগণ নিরাপদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজ অবস্থানে অবিচল ছিলেন এবং তারপর তিনি অনুকূল আশ্রয়ের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন—এটাই আমরা তাঁর ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছিলাম। এখন থেকে আমরা তাঁকে দেখব মানুষের অধিপতি, মনুষ্যহৃদয়ের নিয়ন্ত্রক, নেতা, আইন-প্রণেতা, প্রধান প্রশাসক হিসেবে; কিন্তু এসব সত্ত্বেও অহমিকা তাঁর মধ্যে স্থান পায়নি—তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্রনত। এই সময় থেকে তাঁর ইতিহাস তিনি যে প্রজাতন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন তার সঙ্গে মিলিত হয়ে বয়ে গেছে। এখন থেকে যে ধর্মপ্রচারক নিজ হাতে তাঁর পরিধেয় সেলাই করতেন এবং প্রায়ই অনাহারে অতিবাহিত করতেন, তিনি হলেন জগতের প্রবলতম নৃপতিদের চেয়েও প্রবলতর ব্যক্তিত্ব।

"মুহম্মদ মানুষকে দেখিয়েছিলেন তিনি কি ছিলেন, তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব, তাঁর কঠিন বন্ধুত্ব, তাঁর সহনশীলতা ও সাহসিকতা, সর্বোপরি, তিনি যে সত্য প্রচার করার জন্য এসেছিলেন তার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনা—এসব উৎকর্ষ তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রমূর্ত করে তুলেছিল—এসব গুণ গুরুকে অমান্য করা ও তাঁর-প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ পোষণ না করার ব্যাপারকে অসম্ভব করে তুলেছিল। এর পর থেকে শুধু সময়ের

প্রশ্ন। মদিনার অধিবাসীরা যখন তাঁকে জানতে পারবে তারাও তাঁকে মনেপ্রাণে ভালবাসবে—তাঁর প্রতি প্রবল অনুরাগ পোষণ করবে। এই উদ্দীপনায় অগ্নির ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে ও সকল গোত্রের মধ্যে বিস্তৃত হবে, যতদিন না সমগ্র আরবদেশ এক আল্লাহর পয়গাম্বরের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। 'মুকুটধারী কোন সম্রাটই নিজহস্তে সেলাইকৃত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এই মানুষটির মতো আনুগত্য পায়নি।' মানুষকে প্রভাবিত করার প্রতিভা ছিল তাঁর। আর একমাত্র কল্যাণের পথেই মানুষকে প্রভাবিত করার মহত্ত্ব ছিল তাঁর।

"আলোকোজ্জ্বল"[১] মদিনা নগরী—বহু নামবিশিষ্ট এই নগরী মক্কার উত্তরে প্রায় এগার দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এখন শহরটি প্রাচীরবেষ্টিত ও বেশ শক্তিশালী। সেকালে এ শহর ছিল সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত এবং হযরত মুহম্মদ কোরাইশদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য যে বিখ্যাত পরিখা খনন করিয়েছিলেন তার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে তা বহিরাক্রমণের অনুকূল ছিল। এই শহর একজন আমেলাকাইত প্রধান প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন। হযরতের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই শহর প্রতিষ্ঠাতার নামেই পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে ইয়াসরিব[২] ও তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে আমেলাকাইতগণ বাস করত। তারা পরপর ইহুদী ঔপনিবেশিকদের দ্বারা পর্যুদস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে কথিত আছে। ব্যাবিলনীয়, গ্রীক ও রোমান অত্যাচারীদের আগমনের পূর্বে তারা আরবে প্রবেশ করেছিল এবং হিজাজের দক্ষিণ অংশে নিজেদের দখল কায়েম করেছিল। এই ঔপনিবেশিকদের মধ্যে খায়বরের বনী নাজির, ফিদাকে বনী কোরাইজা ও মদিনার নিকটবর্তী বনী কাইনুকা—এই তিনটি গোত্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ ছিল। সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করে তারা প্রতিবেশী আরব গোত্রদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ইয়াসরিবে আস ও খাজরাজ, এই দু'টি কাহতান গোত্রের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত তারা এই আধিপত্য বজায় রেখেছিল। এই দু'টি গোত্র প্রথমে ইহুদীদের নিকট বিশেষ ধরনের বশ্যতা স্বীকার করলেও পরে তাদেরকে আশ্রিত করে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। বহুপূর্ব থেকেই এই দু'টি গোত্রের মধ্যে কোন্দল চলে আসছিল। যখন হযরত মক্কায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তাদের

---

১. মানওয়ারাহ

২. 'ইয়াসরিব' শব্দের ث ধ্বনিটি আরবগণ 'থ' এবং অনারবগণ 'স' উচ্চারণ করত।

ভেতরকার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটিয়ে তারা তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল।

যখন হযরত ইয়াসরিবে ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে আসলেন তখন সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা এরূপ ছিল, তাঁর আগমনের ফলে শহরে এক নূতন যুগের ঢেউ খেলে গেল।

বনী আস ও বনী খাজরাজ গোত্রদ্বয় ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রভাবে তাদের দৃঢ়মূল ও সাংঘাতিক রক্তক্ষয়ী বিবাদ বিস্মৃত হয়ে ইসলামের আদর্শকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয় এবং মুসলিম প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়। পুরাতন বিভেদ মুছে গেল; বিপদের সময়ে ইসলামকে যারা সাহায্য করেছিল তারা পেলেন সম্মানিত উপাধি 'আনসার' বা সাহায্যকারী। যে বিশ্বাসীর দল তাদের প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছিলেন, গৃহের সব বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন তারা 'মুহাজেরিন' বা স্বদেশ-ত্যাগী উপাধি পেলেন।

'আনসার' ও 'মুহাজেরিনে'র মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হযরত তাদের মধ্যে ভ্রাতৃসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং এই সঙ্ঘ তাদেরকে আনন্দ ও বেদনায় একাত্ম করে তুলেছিল।

ইয়াসরিবের নামের পরিবর্তন ঘটল। তখন থেকে এর নাম হল মদিনাতুন্নবী—নবীর শহর, সংক্ষেপে মদিনা—চরম উৎকর্ষসম্পন্ন শহর।

শীঘ্রই একটি মসজিদ নির্মিত হল। এই মসজিদের নির্মাণকার্যে মুহম্মদ স্বহস্তে কাজ করেছিলেন। মুহাজেরিনের বাসস্থানের জন্যও দ্রুত ঘরবাড়ী তৈরী হয়েছিল। যে জমির উপর মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রস্তাব হয়েছিল তা ছিল দুই ভ্রাতার—তা তাঁরা দান করে দিয়েছিলেন; কিন্তু যেহেতু তাঁরা ছিলেন এতিম তাই হযরত তাদেরকে জমির মূল্য প্রদান করেছিলেন।

গঠনকৌশলের দিক দিয়ে মসজিদ গৃহটি ছিল সাদাসিধে ধরনের—তিনি যে আড়ম্বরহীন ধর্মপ্রচার করেছিলেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-পূর্ণ। গৃহের দেওয়াল তৈরী হয়েছিল ইট ও মাটি দিয়ে এবং ছাউনি দেওয়া হয়েছিল খেজুর পাতার। যাদের ঘরবাড়ী ছিল না তাদের বসবাসের জন্য মসজিদের একাংশ আলাদা করা হয়েছিল।

মসজিদের প্রত্যেকটি কার্যক্রম অত্যন্ত সরলভাবে সম্পাদিত হত। মুহম্মদ খালি মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে কিংবা একটা খেজুর গাছের কাণ্ডের

সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে ধর্মপ্রচার ও প্রার্থনার কাজ চালাতেন। আর অনুরক্ত ভক্তের দল তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষণে শিহরিত হত।

তিনি বলতেন, "আল্লাহর সৃষ্টজীব ও তার নিজ সন্তান-সন্ততিদের প্রতি যে স্নেহশীল নয় আল্লাহ তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন না। যে মুসলমান বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান করবে আল্লাহ তাঁকে স্বর্গের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন।"[১]

হযরত তাঁর একটি ভাষণে দান প্রসঙ্গে এরূপ বলেছেন: "যখন আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তা কম্পিত ও শিহরিত হতে থাকল। যখন তিনি তার উপর পাহাড় স্থাপন করলেন, কম্পন থেমে গেল। তখন ফিরেশতারা জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহ, তোমার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে অধিকতর শক্ত কোন বস্তু আছে কি?" আল্লাহ বললেন, 'লৌহ পাহাড়ের চেয়ে শক্ত, কেননা লৌহ দিয়ে পাহাড় ভাঙা যায়।' আবার ফিরেশতারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ, তোমার সৃষ্টিতে লৌহ অপেক্ষা শক্ত কিছু আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, অগ্নি লৌহ অপেক্ষা শক্ত, কারণ অগ্নি লৌহকে গলায়।' পরে প্রশ্ন উঠল: 'আগুনের চেয়ে শক্ত কোন বস্তু আছে নাকি তোমার সৃষ্টিতে?' জবাব এল, 'হাঁ পানি; কেননা পানি আগুন নিবিয়ে দেয়।' আবার প্রশ্ন হল: 'পানির চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি?' উত্তর হল, 'বাতাস' কেননা বাতাস পানিকে জয় করে ও তাকে গতি প্রদান করে।' তারা আবার প্রশ্ন করল, 'হে আমাদের প্রভু, বাতাসের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি?' তিনি বললেন, 'হাঁ, কোন ভাল লোক যখন দানখয়রাত করে; যখন সে বাম হস্তে দান করে আর তার দক্ষিণ হস্ত তা জানতে না পারে, তখন সে সবকিছুকে অতিক্রম করে।"

দান খয়রাত সম্পর্কে তাঁর সংজ্ঞা বিভিন্ন ধরনের দয়ার কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি বলতেন, "প্রত্যেকটি ভাল কাজ দানশীলতার অন্তর্ভুক্ত। ভাইয়ের মুখ দেখে উৎফুল্ল হয়ে স্মিত হাস্য করাও তোমার পক্ষে দানশীলতা; তোমার নিজের লোকদের ভাল কাজ করতে উপদেশ দেওয়া দান খয়রাত করার সমান। বিপথগামী লোককে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া দানশীলতা; অন্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করাও দানশীলতা; পথ থেকে পাথর, কাঁটা ও অন্যান্য বাধা অপসারণ করা দানশীলতা, তৃষ্ণার্তকে জল

১. হযরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) বর্ণিত এই হাদিসটি মিশকাত শরীফে ১২শ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

দেওয়াও দানশীলতা।"[১] "পরজগতে মানুষের সম্পদ হল ইহজগতে সে মানুষের কল্যাণের যা কিছু কাজ করে। যখন সে মারা যায়, লোকে জিজ্ঞাসা করে, বেচারা কি রেখে গেল? কিন্তু যে সব ফিরেশতা তাকে কবরে[২] পরীক্ষা করবে তারা জিজ্ঞাসা করবে, তুমি পূর্বে কি ভাল কাজ প্রেরণ করেছ?"

হযরতের একজন শিষ্য বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আমার আম্মা উম্মে সাদি মৃত্যুবরণ করেছেন; কি উত্তম দান খয়রাত আমি তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্য করতে পারি?" মুহম্মদ মরুভূমির ছাতিফাটা রৌদ্রতাপের কথা ভেবে উত্তর দিলেন, "পানি।" "তাঁর জন্য একটি কূপ খনন কর এবং তৃষ্ণার্তকে পানি বিলাও।" সেই ব্যক্তি তার মায়ের নামে একটি কূপ খনন করল এবং বলল, "এটা আমার মায়ের জন্য করা হল, এর আশীর্বাদ যেন তাঁর আত্মায় পৌঁছায়।

আরভিং বলেন, "মুখের দানশীলতা যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা কম অনুশীলিত তার উপর মুহম্মদ ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বসরার অধিবাসী, আবু জারিয়া, মদিনায় এলেন এবং মুহম্মদের নবুয়্যতের সত্যতা সম্পর্কে সংশয়াতীত হয়ে আচরণের কিছু মহান বিধি অবহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। হযরত উত্তর দিলেন, "কারও মন্দ বলো না।" আবু জারিয়া বলেন, "সেই থেকে আমি মালিক বা দাস, কখনো কারও কুৎসা রটনা করিনি।"

ইসলামের শিক্ষাসমূহ জীবনের শিষ্টাচারসমূহের প্রতি সম্প্রসারিত হয়েছিল। কোন গৃহে প্রবেশ করতে হলে ও সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে হলে সালাম করতে হবে।[৩] বন্ধুবান্ধব, পরিচিত লোকজন এবং পথের পথচারীদের সালামের উত্তর প্রদান করবে। অশ্বারোহী পদচারীকে প্রথমে সালাম করবে; যে উপবিষ্ট ব্যক্তির কাছে হেটে আসবে সে তাকে সালাম করবে। ছোটদল বড়দলকে সালাম করেবে এবং যুবক বৃদ্ধকে সালাম করবে।"[৪]

১. আবু সাঈদ খাজরী থেকে বর্ণিত।
২. পরবর্তী ২য় খণ্ড, অধ্যায়—১০
৩. তুলনীয়: কোরআন—সূ. ২৪ আ. ২৭, ২৮, ৬১ ও ৬২।
৪. আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মিশকাত শরীফ, খণ্ড ২২, অধ্যায় ১, বিভাগ ১ দ্রষ্টব্য। এছাড়া 'কিতাবুল মুস্তাত্রাফ' অধ্যায় ৪, ৫, ১০, ১৯, ২২, ২৩ ও ২৪ দেখুন। মুস্তাত্রাফ পরিপূর্ণভাবে তিরমিজী, মুসলিম ও বোখারী শরীফের উল্লেখ করেছে। আরও দেখুন 'মজলিশুল আবরার' 'মজলিশ' ৮৪।

চতুর্থ অধ্যায়

কোরাইশ ও ইহুদীদের শত্রুতা

১ম হিজরী—১২শে এপ্রিল, ৬২২—৭ই মে, ৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ

আল্লাহপাক পৌঁছে দিন নবীর পরে
আমার সালাত, আমার সালাম
রাসুলে আরাবী, রাসুলে মক্কী,
রাসুলে মাদানী—আমার ইমাম।
সূর্যের মতো জ্বলছেন তিনি
মহিমা তাঁর আকাশ-ছোঁওয়া
তাঁর উদারতা, স্নিগ্ধতা ও কোমলতা
সুধাকরের পীযুষ-চুয়া।
সারা সৃষ্টির সেরা তিনি
মহত্ত্ব ও মাধুরিমায়
ব্যক্তিত্বের কিরণ তাঁর ঝরে নিতি
মানবতার নীল দরিয়ায়।

এই সময়ে মদিনায় তিনটি স্বতন্ত্র দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। মুহাজির (বাস্তুত্যাগী) ও আনসার (সাহায্যকারী) ইসলামের প্রাণশক্তি ধারণ করেছিলেন। হযরতের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল সীমাহীন। মুহাজিরগণ তাদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছিলেন এবং আরব ঐতিহ্যের বিপরীত দিকে ধর্মের জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। আল্লাহর কাজে তারা সাহসিকতার সঙ্গে সর্বপ্রকার দুঃখ-দুর্দশার মোকাবিলা করেছিলেন, যাবতীয় প্রলোভনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেই নিঃসম্বল অবস্থায় মদিনায় এসেছিলেন। তাঁরা মদিনার দীক্ষিতের দ্বারা ঐকান্তিকতার সঙ্গে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। মদিনার মুসলমান ভাইয়েরা তাঁদের দেশত্যাগী ভাইদের মধ্যে তাঁদের সম্পত্তি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। হযরত অত্যন্ত জ্ঞানবত্তার সঙ্গে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ ঈর্ষা-বিদ্বেষের বিকাশকে বন্ধ করে-ছিল এবং আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে উদার দানশীলতার প্রতিযোগিতার

জন্ম দিয়েছিল যে, কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। যে উদ্দীপনা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে এই নরনারীগণ নূতন ধর্মীয় উজ্জীবনের প্রতি আত্মনিবেদন করেছিলেন, যে উৎসাহ নিয়ে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তেমন অভিব্যক্তি ধর্মীয় বিকাশের খ্রীষ্টীয় পর্যায়ের উত্তম দিনগুলিতে দৃষ্ট হয়নি। দ্বিতীয় দলটিও কোন দিক দিয়ে প্রথমে গুরুত্বহীন ছিল না। এই দল প্রধানত ইসলামে দীক্ষিত উদাসীন দীক্ষিতদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল—এরা পৌত্তলিকতার জন্য গোপনীয় পূর্বানুরাগ বজায় রেখেছিলেন। এ দলের নেতা ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। তিনি মদিনায় বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং মদিনার রাজত্ব লাভের উচ্চাভিলাষ পোষণ করতেন। মক্কার আবু সুফিয়ানের মতো তিনিও তার অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য একটি শক্তিশালী সমর্থক দল সংগ্রহ করেছিলেন। মদিনার শাসনভার দখলের সর্বপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু হযরতের মদিনায় আগমণ তার পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। লৌকিক উদ্দীপনা তাকে ও তার সমর্থকদের নাম-মাত্র ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। সামান্যতম সুযোগ পেলেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা সর্বদা প্রস্তুত ছিল; তারা নবোদ্ভূত মদিনার প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিপদের কারণ ছিল। কাজেই হযরতকে তাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়েছিল। তিনি তাদের প্রতি সর্বোত্তম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন এবং আশা পোষণ করতেন যে শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামের পতকাতলে সমবেত হবে। আর এই আশা পরিণতি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত হয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুতে তার দল যা 'মুনাফেকিন' (ধর্মদ্রোহী) হিসেবে নিন্দিত[১] হয়েছিল তা কিছুকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়েছিল।

ইহুদীরা ছিল তৃতীয় দল এবং তারা ছিল সবচেয়ে মারাত্মক বিপদের কারণ। কোরাইশদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং তাদের দল-উপদলসমূহ বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়েছিল ও নূতন ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিল। প্রথমে তারা মুহম্মদের ধর্মের প্রতি কিছুটা অনুকূল

---

১. কোরআন সূ. ১৩। ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৬৩, ৪১১। মুনাফিকগণ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়নি। মাঝে মধ্যে তারা ইসলাম জাহানে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে তারা ধর্মের গোড়ামির প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেছে। আফ্রিকার 'খারেজীরা' তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

মনোভঙ্গী নিয়ে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের অঙ্গীকৃত মসিহ হতে পারেননি, তিনি তাদের নিকট সম্ভবত তাদের পুরাতন শত্রুদের আতেথিয়তার উপর নির্ভরশীল একজন স্বপ্নবিলাসী, একজন তুচ্ছ প্রচারক মাত্র ছিলেন। এই পুরাতন শত্রুরা, আস ও খাজরাজ গোত্র এখন তাদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের প্রতিশোধগ্রহণকারী হতে পারে, আরবদের জয় করতে ও ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে হযরতের অভ্যর্থনায় তারা উদাসীনতার সঙ্গে মদিনাবাসীদের সাথে যোগ দিয়েছিল। আর কিছুকালের জন্য তারা শান্ত মনোভাব গ্রহণ করেছিল। এটা নেহায়েত সাময়িক ছিল, এক মাস যেতে না যেতে তাদের বিদ্রোহী মনোভাব যা তাদের পয়গাম্বরদের হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং গোপন বিশ্বাসঘাতকতায় প্রকাশ পেল। মদিনায় আগমনের পর হযরতের অন্যতম প্রথম কর্তব্য ছিল মদিনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা যে বিভিন্ন জাতি ও বিরোধী উপাদান নিয়ে গঠিত তা একটি সুশৃঙ্খল সন্ধিবদ্ধ জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করা। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি মদিনার বিভিন্ন জাতির লোকদের একটি সনদ প্রদান করলেন, যার মাধ্যমে মুসলমানদের নিজেদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ, মুসলমান ও ইহুদীদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হল। ইহুদীরা সাময়িকভাবে সনদের দুর্দমনীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য নিরুৎসাহিত হলেও আনন্দের সঙ্গে চুক্তিগ্রহণ করেছিল। এই দলিল ইবনে হিশাম তাঁর গ্রন্থে সযত্নে রক্ষা করেছেন। এ হযরতের প্রকৃত মহত্ত্ব ও বিরাটত্বকে প্রকাশ করে—মূয়ির বলেন, তিনি শুধু তাঁর যুগের মহানায়ক ছিলেন না, তিনি সব যুগেরই মহানায়ক। তিনি অবাধ স্বাপ্নিক ছিলেন না, আর সমাজ-জীবনের প্রচলিত কাঠামোকে ভেঙেচুরে দেওয়ার জন্যও তিনি কোমর বেঁধে লাগেননি। তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রনায়ক, যিনি অতীত হতাশাব্যঞ্জক বিচ্ছিন্নতার যুগেও আল্লাহ্ তাঁকে যে উপাদান ও জনশক্তি প্রদান করেছিলেন তা দিয়েই বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র, একটা প্রজাতন্ত্র, একটা সমাজ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিবেকের স্বাধীনতা সম্বলিত সনদের বর্ণনা এরূপ :

"পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আল্লাহর প্রেরিতপুরুষ হযরত মুহম্মদ কর্তৃক বিশ্বাসীদেরকে, তারা কোরাইশ-বংশোদ্ভূত বা ইয়াসরিবের নাগরিক হোক এবং যে কোন বংশোদ্ভূত লোক হোক যারা তাদের সঙ্গে সাধারণ স্বার্থে জড়িত তাদেরকে সনদ প্রদান করা হচ্ছে যে তারা সকলে

এক জাতি বলে বিবেচিত হবে।" অতঃপর তিনি গোত্র বা বংশ কর্তৃক 'দিয়াতে'র[১] মূল্য নিরূপণ করেছিলেন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক জীবনের ব্যক্তিগত কর্তব্যসমূহ নির্ধারণ করেছিলেন। দলিলে আরও বলা হয়েছে : শান্তি-অবস্থা ও যুদ্ধাবস্থা সকল মুসলমানের জন্য সাধারণ; তাদের মধ্যে কারও পক্ষে তাদের সহ-ধর্মাবলম্বী লোকদের শত্রুদের সঙ্গে শান্তির চুক্তি কিংবা যুদ্ধের চুক্তি করতে পারবে না। যে সমুদয় ইহুদী আমাদের এই কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত তাদের সর্ববিধ অবমাননা ও হয়রানি থেকে রক্ষা করা হবে; তারা আমাদের নিজস্ব লোকদের মতো আমাদের সাহায্য সহযোগিতা ও সেবার সমান অধিকারী হবে; আউফ, নাজ্জার, হারিস, জাশম, সালাবা, আস ও অন্যান্য শাখার ইহুদী যারা মদিনায় বসবাস করে তারা মুসলমানদের সঙ্গে এক মিশ্রজাতি গঠন করবে; তারা মুসলমানদের মতো স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মপালন করতে পারবে; ইহুদীদের আশ্রিত ও মিত্রগণ ও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে; "অপরাধীকে অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে ও শাস্তি প্রদান করা হবে"; সকল দুশমনের বিরুদ্ধে ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে মদিনাকে রক্ষা করবে; এই সনদ যারা গ্রহণ করবে তাদের জন্য ইয়াসরিব একটি পবিত্র স্থান; মুসলমান ও ইহুদীদের আশ্রিত ও মিত্রপক্ষ তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মতোই সম্মানিত হবে; প্রকৃত মুসলমানগণ অপরাধী, জুলুমকারী, বিশৃঙ্খলাকারীকে ঘৃণা করবে; যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নিন্দনীয় হয় তাহলেও তাকে সমর্থন করবে না।" তারপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার অন্যান্য শর্তাদী বর্ণনার পরে এই অসাধারণ দলিল এরূপে পরিসমাপ্ত হয়েছে : "এই সনদ যারা গ্রহণ করে তাদের মধ্যকার যাবতীয় ভাবী বিবাদবিসম্বাদ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে তাঁর প্রেরিতপুরুষের নিকট সমর্পিত হবে।"[২]

আরবদের যে নৈরাজ্যমূলক প্রথার ক্ষেত্রে 'অদ্যাবধি ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিজেদের বা তাদের জ্ঞাতিদের শক্তির উপর নির্ভর করতে হত, প্রতিশোধ গ্রহণ বা বিচারের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য সে প্রথার প্রতি এরূপে মরণাঘাত হানা হল। এ সনদ মুহম্মদকে জাতির

---

১. 'দিয়াত' হল কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য যে মূল্য নিহত পরিবারকে দিতে হয় তাই, যদি নিহত ব্যক্তির পরিবার রাজী হয়।

২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৪১—৩৪৩। এ একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলের শব্দান্তর।

প্রধান প্রশাসকে পরিণত করল, এ যেমন তাঁর প্রেরিতপুরুষ সুলভ ভূমিকার দ্বারা, তেমনি তিনি ও তাঁর জনগণের ভেতরকার চুক্তির দ্বারা সাধিত হয়েছিল।

মদিনার উপকণ্ঠে বসতিস্থাপনকারী বণী উন্ নাজির, বণী কোরাইজা ও বণী কাইনুকা প্রমুখ ইহুদী বংশসমূহকে প্রথমে এই সনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কিন্তু অল্পকাল পরেই তারাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে এই সনদের শর্তাদি গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয় হিজরী ৭ই মে, ৬২৩ থেকে ২৬শে এপ্রিল, ৬২৪ খ্রী.

যা'হোক, মুহম্মদের পক্ষে দয়া বা উদারতা, কোনটাই ইহুদীদের পরিতৃপ্ত করত না; যে তিক্ত অনুভূতি দ্বারা তারা প্রাণবন্ত ছিল কিছুতে তা শান্ত করতে পারত না। ইহুদীরা হযরতের মাধ্যমে সমগ্র আরবকে ইহুদীবাদে রূপান্তরিতকরণে সমর্থ না হওয়া এবং তাঁর ধর্মমত তালমুদীয় পুরাণের চেয়ে সরলতর হওয়ায় ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর সঙ্গে শীঘ্রই সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং নূতন ধর্মের শত্রুদের পক্ষ অবলম্বন করল। যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হল তারা পৌত্তলিকতা অথবা ইসলামকে পছন্দ করে তারা বহু খ্রীষ্টান তার্কিকদের মতো ঘোষণা করল যে, তারা মুহম্মদের ধর্মমত অপেক্ষা আনুষঙ্গিক অনিষ্টসহ পৌত্তলিকতা পছন্দ করে। তারা হযরতকে গালাগালি করত; তারা "মুখ ভেঙচাত", কোরআনের শব্দাবলীর বিকৃত উচ্চারণ করত, ইসলামের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও ফরমূলা বিকৃত করত, এভাবে সে সব অর্থহীন, অবান্তর বা অপবিত্র বলে প্রতিপন্ন করত। সে সময় অনেক ইহুদী পুরুষ ও মহিলা কবি মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করে আরবদের মর্যাদাবোধ ও সাহসিকতা বিষয়ক যাবতীয় সাধারণ মার্জিত রুচি ও স্বীকৃত বিধানকে পদদলিত করত। কিন্তু এ সব ছিল গৌণ অপরাধ। শুধু মুসলমান রমণীদেরকে অপমান ও হযরতকে অপদস্থ করে তারা পরিতৃপ্ত হয়নি, তারা রাষ্ট্রের শত্রুদের নিকট গোপনে দূত প্রেরণ করল, যে রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াদাবদ্ধ ছিল। কোরাইশরা মুহম্মদকে নিহত করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। তারা মুসলমানদের প্রকৃত জনশক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দল ও অবিশ্বাসী ইসরাইলদেরকে ধন্যবাদ প্রদান করল। তারা একথাও জানত যে ইহুদীরা মুহম্মদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।সাময়িক উপযোগিতার অভিপ্রায় থেকে এবং যে মুহূর্তে তারা মদিনার সমীপবর্তী

হবে জিহোবার উপাসকেরা মুহম্মদের দল পরিত্যাগ করে পৌত্তলিকদের দলে যোগদান করবে।

এখন ইসলামের তীব্রতম পরীক্ষার সময় এল। হযরত নগরের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে ও বিশ্বাসীদের সুগঠিত করতে না করতে ভীষণ আঘাত তাঁর উপর নেমে আসল।[১] মদিনার ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারণামূলক শক্তি দ্বারা পরিবৃত ছিল। কাজেই ভেতর থেকে যে ভয়াবহ বিপদপাতের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল তার কিংবা বাইরে থেকে আকস্মিক আক্রমণের বিপক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা মুহম্মদের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। তিনি শুধু ইসলামের প্রচারক মাত্র ছিলেন না, তিনি তাঁর জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার রক্ষকও ছিলেন। একজন প্রেরিতপুরুষ হিসেবে তিনি তাঁর শত্রুদের গালিগালাজ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে, "প্রায় বিরামবিহীন যুদ্ধ-বিগ্রহকালে সেনাপতি হিসেবে" যখন মদিনাকে সামরিক প্রতিরোধব্যবস্থা বা এক ধরনের সামরিক সংরক্ষণের অধীনে রাখা হয়েছিল, তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতকে উপেক্ষা করতে পারতেন না। অধীনস্থদের প্রতি কর্তব্য হিসেবে তিনি সেই দলকে দমন করতে বাধ্য ছিলেন। যে দল শত্রু দ্বারা শহর লুণ্ঠন করতে পারত কিংবা শহর লুণ্ঠনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল। যে বিশ্বাসঘাতকেরা মদিনার অভ্যন্তরে রাজদ্রোহের বীজ বপন করছিল কিংবা বাইরের শত্রুদের নিকট সংবাদ সরবরাহ করছিল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাদের নিষিদ্ধকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ছ'জন বিশ্বাসঘাতককে নিষিদ্ধকরণের আওতায় আইন বহির্ভূত করা হয়েছিল, প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই দণ্ডাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঘটনাপ্রবাহের গতি প্রত্যাশা করছি।

মুহম্মদ যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পূর্বে কোরাইশ সৈন্যদলকে যুদ্ধের ময়দানে মোতায়েন করা হয়েছিল। যিনি জীবনে কোন-দিন অস্ত্র ধারণ করেননি, যাঁর নিকট মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তীব্র বেদনা সঞ্চার করত, যিনি আরবদের পৌরুষ বিষয়ক বিধিসমূহের বিরুদ্ধে তাঁর সন্তান বা শিষ্যদের ক্ষতিতে নিদারুণ অশ্রুবিসর্জন করতেন, যাঁর চরিত্র এতই কোমল ও দয়ার্দ্র ছিল যে তাঁর শত্রুরা তাঁকে স্ত্রীজনোচিত বলে অভিহিত করত[২]

---

১. কোরআন সূ. ৯ আ. ১৩। জামাকসারী (কাশ্শাফ) মিশর সংস্করণ, পৃ. ৩১৪, ৩১৫, আল্ হালাবী, 'ইনসানুল উয়ুন' ২য় খণ্ড।

২. তুঃ ডোজি, 'হিস্ট্রী দাস মুশলমানস দ্য এসপেগনি' খম ১ও, পৃ. ৩২

—এই মানুষটি এখন প্রয়োজনের তাগিদে এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্ত্রের বলে তাঁর শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আত্মরক্ষার জন্য তাঁর শিষ্যদেরকে সংগঠন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং প্রায় বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখনও আরবদের যুদ্ধ বিগ্রহ নিশাকালে বা ভোর রাত্রে পরিচালিত আকস্মিক ও হত্যামূলক লুণ্ঠন পর্যায়ে সীমিত ছিল; বিচ্ছিন্ন লড়াই বা সাধারণ দাঙ্গার পর্যায়ভুক্ত ছিল, যখন আক্রান্ত ব্যক্তিরা আক্রমণকারী দলের অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন হত। মুহম্মদ তাঁর দেশবাসীর অভ্যস্ত কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই পরিদর্শক দল পাঠিয়ে এসব আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতেন।

মক্কাবাসী ও তাদের মিত্রগণ মদিনার প্রান্তসীমা পর্যন্ত লুঠতরাজ শুরু করে দিয়েছিল, মুসলমানদের ফলের বৃক্ষ ধ্বংস করত ও তাদের গবাদি পশু ধরে নিয়ে যেত। এক হাজার সুসজ্জিত সেনাদল আবু জেহেল, "অজ্ঞতার পিতা"র অধীনে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রবাহী তাদের একটি কাফেলাকে হিফাযত করার জন্য মদিনার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। মুসলমানেরা যথাসময়ে এই অগ্রগতির খবর পেয়েছিলেন এবং তিনশত জন শিষ্যের একটি দল যে বদরের উপত্যকার উপর দিয়ে আবু জেহেল অগ্রসর হচ্ছিল তা অধিকার করে পৌত্তলিকদের অভিসন্ধি ফাঁস করে দেওয়ার জন্য কাল বিলম্ব না ক'রে যাত্রা করল। যখন মুহম্মদ ধর্মদ্রোহীদের সৈন্যবাহিনীকে ঔদ্ধত্যসহকারে উপত্যকার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে অবলোকন করলেন তখন তিনি ইসরাইলদের প্রেরিতপুরুষদের মতো ঊর্ধ্বে হস্ত উত্তোলিত করে প্রার্থনা করলেন যাতে বিশ্বাসীদের ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়। "হে প্রভু, তোমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। হে প্রভু, যদি এই ক্ষুদ্র দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে তোমার নির্ভেজাল প্রার্থনা করার মতো কেউ থাকবে না।"[১]

কোরাইশদের তিনজন উন্মুক্ত প্রান্তরে এগিয়ে এল এবং মুসলমানদেরকে পৌত্তলিকদের থেকে পৃথক করে ফেলল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্য থেকে তিনজনকে একক যুদ্ধে আহ্বান করল। হামজা, আলী ও ওবাইদা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং বিজয়ী হলেন। তারপর যুদ্ধ সাধারণ রূপ পরিগ্রহ করল। এক সময়ে যুদ্ধের ভাগ্য-

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৪৪ ; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

বিপর্যয় দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু শিষ্যদের প্রতি হযরতের আবেদন যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দিল। "দিনটি ছিল শীতের ঝড়ো দিন। এক প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব সারা উপত্যকা দিয়ে বয়ে গেল।" মনে হয়েছিল ফিরেশতারা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মতো মনের আন্তরিকতায় প্রকৃতির অবদান-সমূহে, জীবনের প্রত্যেক সম্পর্কে, তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কার্যাবলীর প্রত্যেক পরিবর্তনে আল্লহর দূরদর্শিতা দেখতে পেতেন,—তাঁদের নিকট ঝড় ও বালির তাণ্ডব, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধনিরত উপাদানসমূহ সেই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে যথার্থ স্বর্গীয় সাহায্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, যেন ফিরেশতারা বাতাসের পাখায় ভর করে অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহীদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১] মক্কাবাসীরা অনেক ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেটে পড়ল; তাদের অনেক নেতা নিহত হল। আবু জেহেল তার দুর্নিবার অহঙ্কারের শিকার হল।[২]

বহু সংখ্যক কোরাইশ মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। তাদের মধ্যে দু'জনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। তারা নূতন ধর্মের অনুসারীদের প্রতি উৎকট বিদ্বেষ পোষণ করত এবং আরবদের মধ্যে প্রচলিত যুদ্ধনীতি অনুসারে এখন তাদেরকে তাদের আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।[৩]

আরবদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্যের বিপরীতে অবশিষ্ট বন্দীদের প্রতি উচ্চতম মানবতার সঙ্গে আচরণ করা হল। হযরত কড়া নির্দেশ দিলেন যে বন্দীদের দুর্ভাগ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে। যে-সব মুসলমানের তদারকীতে এ-সব বন্দী অবস্থান করছিল তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে হযরতের নির্দেশ পালন করে-ছিলেন। তারা তাদের আহার্য রুটি বন্দীদের খেতে দিতেন এবং নিজেরা

১. কোরআনঃ সু. ৮ আ. ৯ এবং সু. ৩ আ. ১১, ১২১—১২৮। তুঃ মুয়ির ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।

২. ইবনে হিশাম পৃ. ৪৪৩; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড পৃ. ২৬। স্যার উইলিয়াম মুয়ির বর্ণনা করেছেন যে যখন মুহম্মদের নিকট আবু জেহেলের ছিন্নশির আনীত হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "আরবদেশের সর্বোৎকৃষ্ট উটের চেয়ে এটা আমার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।" এই অনুচ্ছেদ ইবনে হিশাম ইবনে আসির। আবুল ফিদা বা তাবারীর গ্রন্থে নেই, কাজেই অপ্রমাণিত।

৩. হারিসের পুত্র নজর কোরআনের ৮ম সুরাত ৩২ আয়াতে উল্লিখিত এবং এসব লোকদের অন্যতম।

শুধু খেজুর ভক্ষণ করে কাটাতেন।[১] এটা ছিল তাদের সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ নজির।

যুদ্ধের গণিমতের দ্রব্যের বণ্টন নিয়ে মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধতা দেখা দিয়েছিল। মুহম্মদ তাদের মধ্যে এই মালের সমান বণ্টন করে তাদের বিরোধের অবসান ঘটিয়েছিলেন।[২] যেহেতু এ-ধরনের বিরোধ দুর্বিনীত লোকদের মধ্যে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে; কাজেই মুহম্মদ যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মাল নিয়ে ভবিষ্যতে যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে তার অবসান-কল্পে একটি জরুরী আইন বলবৎ করলেন।

এ কোরআনের সুরা আনফাল (গণিমত)-এর মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। এই আইনানুসারে গণিমতের বণ্টনের ভার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রধানের কর্তৃত্বাধীন করা হয়েছিল। এর এক-পঞ্চমাংশ দীনদরিদ্রের প্রতিপালনের জন্য বায়তুল মালে সংরক্ষিত হয়েছিল।[৩]

---

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৫৯, ৪৬০ ; কসিন দ্য পার্সিভেল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯। মুয়ির এরূপ বলেন, "মুহম্মদের নির্দেশানুসারে মদিনার নাগরিকগণ ও যেসব মুহাজির তাদের গৃহের অধিকারী হয়েছিলেন তারা সকলে বন্দীদের অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রভূত গুরুত্ব সহকারে তাদের প্রতি আচরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে একজন বন্দী বলেছিল "মদিনার লোকদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা আমাদের অশ্বপৃষ্ঠে যেতে দিতেন এবং নিজেরা হেঁটে যেতেন। তারা আমাদেরকে রুটি খেতে দিতেন, নিজেদের জন্য রুটি অবশিষ্ট থাকত না, তারা খেজুর ভক্ষণ করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতেন, তাতেই তৃপ্ত থাকতেন।" ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২২।

২. মেল বলেন, "এটা উল্লেখ্য যে মুহম্মদের শিষ্যদের মধ্যে বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত নিয়ে যে বিরোধ বেধেছিল দাউদের সৈন্যদের মধ্যেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমলেকাইতদের নিকট থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল নিয়ে বিরোধ বেধেছিল। যারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল তাদের দাবী ছিল যে যারা উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত ছিল ও বিলম্ব করছিল তাদের উক্ত দ্রব্যে কোন অধিকার নেই। উভয় ক্ষেত্রে একইরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য তা আইনে রূপ লাভ করেছিল এবং স্থিরীকৃত হয়েছিল যে সবাই সমান অংশ পাবে।"—প্রাথমিক আলোচনা, ৬ দেখুন।

৩. কোরআন, সু. ৮ আ. ৪১। যদিও গনিমতের বণ্টনের ভার রাষ্ট্রপ্রধানের উপর অর্পিত হয়েছিল, কতিপয় প্রথা অনুসৃত হত যা খলিফাদের আমলে নজির হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এবং তা অধিকতর সুনির্দিষ্ট আইনের রূপ

যে অদ্ভুত পরিস্থিতি বদরের বিজয় সূচিত করেছিল এবং তা থেকে যে ফলাফল ঘটেছিল সে-সব মুসলমানদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে স্বর্গের ফিরেশতারা তাদের পক্ষে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

কোরআনের দু' একটি উক্তির মধ্য দিয়ে ফিরেশতারা আল্লাহর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন—এই ধারণা যেভাবে জীবন্ত বৈশিষ্ট্যে কবিত্বপূর্ণ উপাদান সঞ্চার করেছে তা ধর্মগীত লেখকদের সর্বাপেক্ষা বাগ্মিতাপূর্ণ শব্দাবলীর সৌন্দর্য বা গরিমার কাছেও হার মানবে না। যথার্থই একই কবিত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উভয়ের মধ্যে লক্ষণীয়।[১]

সম্ভবত মুহম্মদ যিশু খ্রীষ্ট ও অন্যান্য ধর্মগুরুদের মতো আল্লাহ ও মানুষের মধ্যবর্তী সত্তা, ফিরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। ফিরেশতাদের প্রতি আধুনিকদের অবিশ্বাস আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণাকে হাস্যস্পদ করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা বহন করে না; আমাদের অবিশ্বাস তাদের বিশ্বাসের মতো সমানভাবে কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত, শুধু পার্থক্য এই যে, একটি নঞর্থক ও অন্যান্য সদর্থক। আধুনিক যুগে যা আমরা প্রকৃতির নিয়মাবলী বলে দেখি তারা তাকে ফিরেশতা, স্বর্গের সাহায্যকারী হিসেবে দেখেছেন। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যবর্তী সত্তাসমূহ সম্পর্কে লক যেভাবে চিন্তা করেছেন তা মানুষ ও জীবসৃষ্টির মধ্যে মধ্যবর্তী সত্তাসমূহের মতোই এমন একটি প্রশ্ন যা মানবপ্রজ্ঞার উপলব্ধির অতীত।

মুহম্মদও খ্রীষ্টের মতো সম্ভবত ব্যক্তিগত সত্তা হিসেবে অনিষ্টের নীতিতে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের বিশ্লেষণ অধিকতর বাস্তবধর্মী উপাদান ব্যক্ত করে, তাঁর অনুসারীদের উপলব্ধির উপযোগী ভাষায় ব্যক্তিনিষ্ঠ ধারণাই রূপায়িত। যখন কোন ব্যক্তি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিল শয়তান কোথায় থাকে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন "মানুষের হৃদয়ে" পক্ষান্তরে খ্রীষ্টান ঐতিহ্য যে ফ্যারিসিগণ যিশুখ্রীষ্টকে প্রলুব্ধ করেছিল তাদেরকেই দোজখের প্রকৃত যুবরাজে পরিণত করে।[২]

গ্রহণ করেছিল। তুলনীয় এম. কুইরীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ড্রয়িট মুসলমান, (প্যারিস ১৮৭১) পৃ. ৩৩৫।

১. ধর্মসংগীত (১৮)

২. শেফারম্যাচার সম্প্রদায়ের সকলেই প্রধান পুরোহিতকেই প্রলুব্ধকারী হিসেবে বিশ্বাস করে। মিলম্যান এবং প্যাট্রিস্ট ও গোঁড়া খ্রীষ্টানগণও এই মত পোষণ

ফিরেশতা ও শয়তানে বিশ্বাস ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে অসংখ্য পুরাণের সৃষ্টি করেছে। স্বর্গের সাধুপুরুষ ও ফিরেশতারা খ্রীষ্টানদের জন্য যুদ্ধ করেন। মুসলমানেরা জীবনযুদ্ধে শুধু ফিরেশতাদের সাহায্যই স্বীকার করেন।

চতুর্থ অধ্যায়ের টীকা

যখন ওকবা বিন মুয়াতকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার প্রশ্নের যে উত্তর মুহম্মদ দিয়েছিলেন তা নির্মম। কথিত আছে যে ওকবার প্রশ্ন: "আমার সন্তানদের কে দেখাশোনা করবে", এর উত্তরে মুহম্মদ জবাব দিয়েছিলেন, "নরকের অগ্নি"। এই গল্প সত্যি অসঙ্গত; মুহম্মদের চরিত্রের এতই পরিপন্থী (তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ শিশুদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, যিনি এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের প্রতি ভালবাসাকে পরম কর্তব্য হিসেবে শিক্ষা দিতেন, এবং এ কাজটি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়) যে এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। খ্রীষ্টান লেখকগণ এর প্রতি লোলুপনেত্রে দৃষ্টিপাত করেছেন বলে মনে হয় এবং সে কারণে এই গল্প কিভাবে উদ্ভুত হয়েছে তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ওকবার সন্তানদের প্রতি 'সিবাতুন্নার নার' (অগ্নির সন্তান)-এই ডাক-নাম প্রযুজ্য ছিল—খুব সম্ভব এই ডাক-নাম থেকে গল্পটির জন্ম হয়েছিল। ওকবা নিজে 'আযলান'* গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই শাখা সাফরার নিকটবর্তী বিশেষ উপত্যকা-সমূহে বাস করত এবং বানুন্ নার (অগ্নির সন্তান বা বংশধর) নামে পরিচিত ছিল। এই ডাক-নাম সম্ভবত এই পরিস্থিতি থেকে গৃহীত এবং মুহম্মদের উত্তর সম্পর্কিত গল্পটি এই ডাক-নাম থেকে গৃহীত হয়েছিল।

সৎকার উপলক্ষে পৌত্তলিকদের মৃতদের প্রতি মুহম্মদের তীব্র আবেগপূর্ণ সম্বোধন সম্পর্কীয় অপর গল্পটি বলতে গেলে সর্বাপেক্ষা কম বিকৃত। যে পরিস্থিতি থেকে এই

করেন। কিন্তু মিলম্যান কৌশলে পাঠকদেরকে যে কোন মত গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। রিউসের স্বর্গীয় দূতদের উপর যে অধ্যায় ('হিস্ট্রী অব ক্রিশ্চিয়ান থিয়োলজী ইন দি এপোসলিক এজ', ইংরেজী অনুবাদের টীকা, পৃ. ৪০১—৪০৪) তাতে যে সব নির্দেশিকা প্রদত্ত হয়েছে তাতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিক খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ শিষ্যগণ ফিরেশতা ও শয়তানদেরকে ব্যক্তিগত সত্তা, সামান্য সূক্ষ্ম অথচ সব দিক দিয়ে মানুষের মতো বলে বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাস খ্রীষ্ট শিষ্যগণ অবশ্যই ধর্ম-গুরুর নিকট থেকেই পেয়েছিলেন, যিনি রেনানের মতে এদিক দিয়ে তাঁর যুগের লোকদের থেকে বুদ্ধির মানদণ্ডে স্বতন্ত্র ছিলেন না।—জেসাস ওয়্ সং. ১৮৬৭, পৃ. ২৬৭।

* সি দ্য পার্সিভ্যাল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯, অনুসারে 'আগাণী'।

নিন্দার জন্ম হয়েছে, তাবারী এরূপে তার বর্ণনা দিয়েছেন: "মৃতের জন্য তৈরী কবরের পাশে মুহম্মদ উপবিষ্ট হতেন, যখন দেহ কবরে শয়ন করানো হত তখন মৃতের নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করা হত এবং মুহম্মদ তখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করতেন "হে আমার জ্ঞাতি, তোমরা আমাকে মিথ্যা দোষারোপ করতে, যখন অন্য লোকে আমাকে বিশ্বাস করত; তোমরা আমাকে আমার গৃহ থেকে বাহির করে দিয়েছিলে, যখন অন্যরা আমাকে গ্রহণ করেছিল; তোমাদের কি ভাগ্য! হায়! আল্লাহ যে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন তা পূর্ণ হল।" এই শব্দাবলী স্পষ্টত সহানুভূতি নির্দেশক, কিন্তু তা তিক্ততা বুঝানোর জন্য বিকৃত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কোরাইশদের মদিনা অভিযান

দ্বিতীয় হিয্‌রী—৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ

পুষ্পসম কোমল তিনি, পূর্ণ চাঁদের দীপ্তিময়
সাগরসম উদার তিনি কালের মতই দুর্জয়।

সফলতা সব সময়েই সত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। খ্রীষ্টধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ে সদাশয় ফ্যারিসী বলেছিলেন, "তাদের একা থাকতে দাও; যদি এ সব লোক মিথ্যাবাদী হয় তবে তারা তুচ্ছতায় পর্যবসিত হবে, তা না হলে তোমরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হবে।" "যদি কনস্তানতাইন ২ হি.=৬২৪ খ্রী. স্বর্গে স্মরণীয় ক্রস চিহ্ন না দেখতেন কিংবা কল্পনা না করতেন যে তিনি ক্রস চিহ্ন দেখেছেন; যদি তিনি এর আনুকূল্যে সাফল্যের পথে যাত্রা না করতেন; যদি তিনি বিজয় লাভ না করতেন ও সিংহাসনে আরোহণ না করতেন; তবে খ্রীষ্টধর্মের ভাগ্যে কি ঘটত তা আমরা আদৌ অনুমান করতে পারি না। বদরের বিজয় মুসলমানদের যেমন ছিল মিলভিয়ান ব্রীজের বিজয় খ্রীষ্টানদের জন্য তদ্রূপ ছিল।[1] সেই সময় থেকে এ সিজারের সিংহাসন থেকে শাসন চালিয়েছিল।

বদর যুদ্ধে বিজয় মুসলমানদের জন্য যথার্থ ই সর্বাপেক্ষা শুভফলদায়ক হয়েছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না যে অতীতকালের ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের মতো তারা পৌত্তলিকদের উপর তাদের বিজয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর হস্তক্ষেপ অবলোকন করেছিলেন। যদি মুসলমানেরা বিফলকাম হতেন তবে তাদের ভাগ্যে কি ঘটত তা আমরা কল্পনা করতে পারি—সার্বজনীন ধ্বংস।

মুহম্মদ যখন এই অভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি ওসমানের

১. খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণ কনস্তানতাইন কর্তৃক মেক্সেনটিয়াসের পরাজয় (৩১২ খ্রী.)-কে তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। গিবনের গ্রন্থের ৩য় খণ্ড, ২০তম অধ্যায়ে, যেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ইতিহাস সম্মিলিত হয়েছে তা নির্দেশ করে কিভাবে খ্রীষ্টধর্মের সাফল্য ঐ ঘটনা থেকেই ধরা হয়।

স্ত্রী—আবিসিনিয়রা নির্বাসন থেকে সবেমাত্র প্রত্যাবর্তিত, তাঁর প্রিয় কন্যা রোকেয়াকে হারান। কিন্তু পৌত্তলিকগণ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য যে ভেতরে ভেতরে জ্বলছিল তা তাঁকে পারিবারিক দুঃখের দিকে মনোযোগী হতে দিল না। কোরাইশ বন্দীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন করার অব্যবহিত পরেই আবু সুফিয়ান দু'শত অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যহারে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে মক্কা থেকে প্রত্যাগত হল যে মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত সে দেশে প্রত্যাবর্তন করবে না। মদিনার কয়েক মাইল অভ্যন্তর পর্যন্ত সে দেশটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাশী চালাতে চালাতে এগিয়ে চলল, অপ্রস্তুত মুসলমানদের উপর নৃশংস বাজপাখীর মতো নেমে আসল, জনগণকে হত্যা করল এবং যে খেজুরের বাগান আরবদের প্রধান আহার্য সরবরাহ করত তা ছারখার করে দিল। মক্কাবাসীরা তাদেরকে এই লুণ্ঠনের অভিযানে 'সয়িক'[১] পরিপূর্ণ থলি-সমূহ প্রদান করেছিল। মুসলমানেরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মদিনা থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মক্কার লুণ্ঠনকারীগণ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে পলায়ন করল। আর যাত্রাকালে পশুর বোঝা হাল্কা করার জন্য তারা থলিগুলো ফেলে গেল। এই ঘটনাকে মুসলমানেরা বিদ্রূপাত্মকভাবে 'গাজাওয়াতুস্ সয়িক'[২] বা আহার্যপূর্ণ থলির যুদ্ধ নামে অভিহিত করেছিলেন।

এই সময়ে হযরতের জীবনে একটি ঘটনা ঘটেছিল যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ওয়াশিংটন আরভিং বলেছেন। মুহম্মদ তাঁর তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে একটি গাছের তলায় নিদ্রা যাচ্ছিলেন ; একটি কর্কশ শব্দ শুনে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। তিনি দেখলেন যে দুরসুর নামীয় একজন দুশমন যোদ্ধা মুক্ত তরবারী হাতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে চীৎকার করে বলল, "হে মুহম্মদ, কে এখন তোমাকে সাহায্য করবে?" হযরত উত্তর দিলেন, "আল্লাহ"। দুরন্ত বেদুইন সহসা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল ও তার হাত থেকে

৬ই জিলহজ—১লা এপ্রিল, ৬২৪ খ্রীঃ

---

১. খেজুর বা চিনি সহযোগে সবুজ শস্য পিষে ও সেঁকে যে আহার্য প্রস্তুত হয় তার প্রাচীন ও আধুনিক আরবী নাম 'সয়িক'। দীর্ঘ ভ্রমণকালে যখন রান্না-বান্না করা সম্ভব হয় না তখন এই খাদ্য ভক্ষণ করা হয়।

২. যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছিল এখন সেই স্থানের নাম ধারণ করেছে 'সুয়ায়কা' —এই স্থানটি মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা।

তরবারী খসে পড়ল। হযরত তৎক্ষণাৎ তরবারীখানা নিজ হস্তে ধারণপূর্বক ঘোরাতে ঘোরাতে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "ওহে তুরসুর তোমাকে কে এখন রক্ষা করবে?" সৈনিক উত্তর দিল, "হায় কেউ নেই।"—"তবে আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও কিভাবে দয়ালু হতে হয়"। এই বলে তিনি সৈনিককে তরবারী ফেরত দিলেন। আরববাসীটির হৃদয় বিজিত হল; পরবর্তীকালে তিনি হযরতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবিচল শিষ্যে পরিণত হয়েছিলেন।[১]

পৌত্তলিক ও মুসলমানদের মধ্যে যে খণ্ডযুদ্ধগুলি হয়েছিল তা পরবর্তী বিরাট যুদ্ধেরই পূর্বাভাষ ছিল।

৩য় হি —২৬শে এপ্রিল ৬২৪—১৫ই এপ্রিল ৬২৫ খ্রীঃ

পৌত্তলিকরা প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য জ্বলছিল। মুসলমানদের সঙ্গে আরেকটি ভীষণ যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত হয়েছিল। তাদের দূত তিহামা ও কিনান গোত্রদ্বয়ের সাহায্য লাভে সমর্থ হয়েছিল এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনী তিন সহস্র সুসজ্জিত সৈনিকে উন্নীত হয়েছিল (যাদের মধ্যে সাতশ' ছিল বর্মাবৃত সৈনিক), তারা একমাত্র প্রতিহিংসার বাসনা দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল। এই সেনাবাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব গোত্র-সমূহের নিকট ভীতিপ্রদ ছিল যেমন জারেফেজসের বিপুল সৈন্যদল গ্রীস রাষ্ট্রসমূহের নিকট ভীতিপ্রদ ছিল।

নিষ্ঠুর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোন দিক দিয়ে কোন বাধা না পেয়ে তারা মদিনার উত্তর-পূর্বদিকে একটি সুনির্বাচিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করল। একমাত্র ওহদের পর্বত ও একটি উপত্যকা এস্থান থেকে মদিনাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই নিরাপদ সুবিধাজনক অবস্থান থেকে তারা মদিনাবাসীদের শস্যক্ষেত্র ও খেজুরের বাগান ধ্বংস করেছিল।

অনুসারীদের উদ্দীপনা ও তাদের সম্পদ ধ্বংসের ফলে জাত ক্রোধের

---

১. এই বছরের শেষ মাসে ওসমান বিন মাহ্‌জুনের মৃত্যু ঘটে এবং হযরতের কন্যা ফাতিমার সঙ্গে আবু তালিবের পুত্র আলীর বিবাহ হয়।
ওসমান ছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ের একজন বিশ্বাসী, এবং মুহাযিরদের মধ্যে তিনি প্রথম, যিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন আর মদিনার উপকণ্ঠে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন। এখানে বহু বিখ্যাত ও সাধু পুরুষদের সমাধি বিদ্যমান এবং অদ্যাবধি মুসলমানেরা সসম্মানে তাদের মাজার জিয়ারত করেন।
বদর অভিযানের কয়েকদিন পূর্বে আলীর সঙ্গে ফাতিমার বাগদান পর্ব সমাপ্ত হয়; মাত্র তিন মাস পরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তখন আলীর বয়স একুশ বছর, আর ফাতিমার বয়স পনের।

দ্বারা মুহম্মদ এক হাজার অনুসারী নিয়ে মদিনার বাইরে আসতে বাধ্য হলেন। ইহুদীদের গুপ্ত শত্রুতা, মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের তিনশত অনুসারীসহ দলত্যাগ করল। এই দলত্যাগের ফলে মুহম্মদের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা মাত্র সাত শ'-তে নেমে আসল। তাঁদের সঙ্গে মাত্র দু'টি অশ্ব ছিল। তত্রাচ এই সাহসী দলটি দৃঢ়তাসহকারে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকল খেজুরের বনের মধ্য দিয়ে নীরবে অগ্রসর হয়ে তাঁরা ওহোদের পর্বতে এসে পৌঁছল। তাঁরা সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করল এবং ফজরের নামাজ পড়ে সেই গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে সমতল ভূমিতে উপস্থিত হল। মুহম্মদ এখন পর্বতের পাদদেশে অবস্থান গ্রহণ করলেন।[১] একটি উচ্চ সুড়ঙ্গ মুখে সৈন্যবাহিনীর পিছনে তিনি কিছু সংখ্যক তীরন্দাজ মোতায়েন করলেন এবং তাঁদেরকে কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ না করতে কড়া নির্দেশ দিলেন ; শত্রুর অশ্বারোহী সৈন্যদের অসুবিধা সৃষ্টি করা ও মুসলমান সৈন্যদের হিফাজত করাই তাঁদের একমাত্র কাজ ছিল। সংখ্যাধিক্যে অতিশয় বিশ্বাসী হয়ে সেনাবাহিনীর

১. বার্টন এরূপে স্থানটির বর্ণনা করেছেন : "এই স্থানটি ইসলামের ইতিহাসে এত অধিক প্রসিদ্ধ, এ ওহোদ পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশের সন্নিকটবর্তী তাক-তাক করে-সাজানো একখণ্ড জমিন। পৌত্তলিকদের সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ আবু সুফিয়ান ও তার মূর্তিসমূহ মধ্যে রেখে নূতন চন্দ্রাকারে অগ্রসর হল। এই জায়গা আল্ মদিনা থেকে উত্তর দিকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। দর্শকরা এখানে যা দেখতে পান তা হল শক্ত নুড়িযুক্ত মাটি। বিভিন্ন বর্ণের ছোট ছোট গ্রানাইড পাথরের স্তূপ, লাল বেলে পাথর ও শক্ত পাথরের টুকরা যা দ্বারা স্থানটি আবৃত। এসব দিয়ে যেসব জায়গায় শহীদগণ শাহাদৎ বরণ করেছিলেন ও সমাহিত হয়েছিলেন তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখলে এই পবিত্র পর্বতটির দর্শনে ভীতির উদ্রেক করে। এর বিবর্ণ ও এবড়ো-খেবড়ো ধার সমতল ভূমি থেকে লৌহের পিণ্ডের মতো উঠেছে এবং এর ফাটলের মধ্যে মুসলিম সৈন্যরা চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছিলেন, যখন তীরন্দাজগণ হযরতের নির্দেশ অমান্য করে শত্রুদের পরিত্যক্ত দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় খালিদ বিন ওয়ালিদকে পিছন থেকে মুহম্মদের সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহায্য করেছিল। পর্বত-প্রাচীরের এটাই ছিল একমাত্র সুড়ং -পথ। তীব্র রৌদ্রতাপের ফলে এ স্থানে একটা সবুজ লতাগুল্ম বা গাছও জন্মে না, এদিকে একটা পাখি বা পশুও আসে না। উপরে উজ্জ্বল নীলাকাশ বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরের উপর রৌদ্র ঝরায়, তাতে স্থানটি অধিকতর বীভৎস রূপ ধারণ করে।" —বার্টনের 'পিলগ্রিমেজ টু মেক্কা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৬, ২৩৭।

কেন্দ্রে মূর্তি রেখে পৌত্তলিকগণ কুচকাওয়াজ করতে করতে সমতল ভূমিতে নেমে আসল। গোত্রপ্রধানদের স্ত্রীগণ যুদ্ধের গান গেয়ে ও তাম্বুরা বাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।[১] হামজার নেতৃত্বে মুসলমানেরা কোরাইশদের প্রথম প্রচণ্ড আক্রমণ সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিনিবৃত্ত করল। শত্রুপক্ষের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে হামজা কোরাইশ সৈন্যদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং শত্রু নিপাত করতে করতে ভীতি-বিহ্বল অবস্থার সৃষ্টি করলেন। বিজয় যখন মুসলমানদের প্রায় করতলগত হয়ে আসছিল এবং শত্রুরা পশ্চাদধাবন করছিল, সে সময় তীরন্দাজগণ হযরতের নির্দেশ বিস্মৃত হয়ে স্বস্থান ত্যাগ করে লুণ্ঠনে যোগ দিল।[২] যা পরবর্তীকালে তুর প্রান্তরে ঘটেছিল, তাই ওহোদ প্রান্তরে সংঘটিত হয়েছিল। কোরাইশদের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ খালিদ বিন ওয়ালিদ নিমেষে মুসলমানদের বিচ্যুতি লক্ষ্য করে তার অশ্বারোহী সৈন্যদের ঘুরিয়ে এনে পশ্চাদদিক থেকে মুসলমানদের উপর নিপাতিত হল।[৩] কোরাইশদের পদাতিক সৈন্যগণও যোগদান করল। সামনের ও পিছনের মুসলিম সৈন্য-গণকে ভয়ানক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করতে হল। মুসলমান সেনাদলের অসীম সাহসী বীর যোদ্ধাদের অনেকে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদৎ বরণ করলেন। অনেকের সঙ্গে অকুতোভয় হামজাও শহীদ হলেন। আলী যিনি অসম সাহসিকতার সঙ্গে পৌত্তলিকদের প্রথম যুদ্ধ আহ্বানের জবাব দিয়েছিলেন[৪] তিনি, ওমর ও আবু বকর গুরুতরভাবে

---

১. তাদের রণসংগীতের উদ্ধৃতি ইবনুল আসির তাঁর গ্রন্থের ২য় খণ্ডে, ১১৮ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। "হে আবুদ্দারের সন্তানগণ, সাহস সঞ্চয় কর। সাহস সঞ্চয় কর। হে নারীকুলের রক্ষক, তোমরা তোমাদের তরবারীর সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে আঘাত কর।" অপর রণসংগীত এরূপ : "আমরা প্রভাতী তারকার কন্যা, আমরা সিল্কের কুশনের উপর দিয়ে চলি ; সাহসের সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করি এবং আমরা তোমাদেরকে আমাদের বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন করি। যদি পলায়ন কর তবে আমরা তোমাদের পরিত্যাগ করব, ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করব।"

২. এই অবাধ্যতার কথা কোরআনের ৩য় সুরার ১৪৬ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

৩. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯ ; আল্ হালাবীর 'ইন্সানুল আয়ুন' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

৪. তবারী বলেন যে পৌত্তলিকদের পতাকাধারী বীরসুলভ শৌর্যের অধিকারী তালহা আলীর সম্মুখে হাজির হয়ে তার তরবারী ভাজতে থাকে ও

আহত হলেন। যা'হোক পৌত্তলিকদের প্রয়াস প্রধানত মুহম্মদের দিকে নিয়োজিত হয়েছিল; তিনি কতিপয় শিষ্য দ্বারা পরিবৃত হয়ে মুসলমান সৈন্যদের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এখন তিনি কোরাইশদের আক্রমণের প্রধান বস্তুতে পরিণত হলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ তাঁকে ঘিরে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হতে লাগলেন। যদিও তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন, দরদর ধারায় রক্ত তাঁর দেহ থেকে প্রবাহিত হতে লাগল; তথাপি তিনি তাদের অনুরক্ত হৃদয়ের কথা বিস্মৃত হননি। যিনি তাঁর ললাটের ক্ষত থেকে প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর জন্য তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন।[১] মুক্তি সন্নিকটবর্তী হয়েছিল, আলীর নেতৃত্বে যে সব সাহসী যোদ্ধা কেন্দ্রস্থলে উঠে পড়ে যুদ্ধ করছিলেন তাঁরা পর্বতের উপরের দিকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পেরেছিলেন। সেখানে তাঁরা শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের পায়গাম্বরের মৃত্যু ঘটছে অনুমান করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে তাঁদের অন্যান্য সহকর্মী ভাইয়েরা তখনও যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য স্থানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁরা পৌত্তলিকদের মধ্যে তড়িতের বেগে নেমে আসলেন। যেখানে ছোট মুসলিম যোদ্ধৃদল তখনও হযরতকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন সেখানে তাঁরা প্রবেশ করে দেখলেন তিনি তখনও জীবিত আছেন। তারা বহু কষ্টে

আলীকে অগ্রাহ্য করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে, "ওহে মুসলমানগণ, তোমরা বল যে আমাদের মৃতেরা নরকে যাবে এবং তোমাদের মৃতেরা স্বর্গে যাবে: দেখি আমি তোমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারি কিনা।" উত্তরে আলী বললেন, "তবে তাই হোক।" তাঁরা যুদ্ধ করলেন। আলীর আঘাতে তালহা ভূপাতিত হল। তালহা চীৎকার করে বলল, "হে আমার চচার পুত্র, করুণা চাই।" আলী বললেন, "তাই হোক, তুমি নরকাগ্নির যোগ্য নও।"—৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫।

১. ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪ এবং আবুল ফিদা, পৃ. ৪৪। তাঁরা উল্লেখ করেন যে ৭ই শওয়াল ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল। তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ.২১, ৮ই শওয়াল এবং ইবনে হিশাম ৫ই শওয়ালে ওহোদ যুদ্ধের দিন বলে উল্লেখ করেছেন; আরও অনেকে ১১ই শওয়াল এই দিন ধার্য করেন। সি. দ্য পার্সিভেল ১১ই শওয়ালকে ওহোদ যুদ্ধের সঠিক দিন বলে গণনা করেছেন, কেননা সকল ঐতিহাসিকের মতে দিনটি ছিল শনিবার এবং ১১ই শওয়াল (২৬শে জানুয়ারী) শনিবারে পড়েছিল।—'হিস্ট্রী দাস অ্যারাবস', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৬ টীকা।

হযরতকে নিয়ে ওহোদের উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে সমর্থ হলেন ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আলী ঢালে ক'রে পাহাড়ের গহ্বর থেকে পানি আনলেন। এই পানি দিয়ে তিনি মুহম্মদের মুখমণ্ডল ও ক্ষতসমূহ ধুয়ে দিলেন এবং উপবিষ্ট অবস্থায় সাহাবাগণসহ জোহরের নামাজ আদায় করলেন।

কোরাইশগণ এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে মদিনা আক্রমণ করে কিংবা ওহোদের উপত্যকা থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। নৃশংস বর্বরতার সঙ্গে নিহত শত্রুদের দেহ বিকৃত ক'রে তারা মদিনার এলাকাসমূহ পরিত্যাগ করল, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, হিন্দ্ বিন্‌তে ওতবা অন্যান্য কোরাইশ রমণীদের প্রতিহিংসা গ্রহণের বন্যবর্বরতার ক্ষেত্রে অধিকতর হিংস্রতার পরিচয় দিয়েছিল। সে হামজার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়েছিল এবং মৃতদের কর্ণ ও নাসিকা কর্তন করে গলার মালা ও বাজুবন্দ তৈরী করেছিল।

নিহতদের উপর কোরাইশরা যে বর্বরতা প্রদর্শন করেছিল তাতে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এমন কি মুহম্মদও প্রথমে এতই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে তিনি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে কোরাইশদের মৃতদেহের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করা হবে।[১] কিন্তু পরিশেষে তাঁর স্বভাবসুলভ কোমলতা তাঁর হৃদয়ের তিক্ততাকে জয় করল। তিনি প্রচার করলেন, "ধৈর্য সহকারে কৃত অন্যায় সহ্য কর, নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার।"[২] ঐদিন থেকেই নিহতদের দেহ বিকৃত করার প্রাচীন পৈশাচিক প্রথা মুসলমানদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।[৩]

মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে হযরত তাঁর শিষ্যদের একটি ছোটদলকে

---

১. ইবনে হিশাম পৃ. ৫৮০ ; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ ১১৫, ১১৬ ; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬ ; আল্ হালাবী 'ইনসামুল য়ুয়ান' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২।

২. কোরআনের সু-১৭ আ. ১২৭ ; ইবনে হিশাম পৃ. ৫৮৪, ৫৮৫ ; জামাকশারী (কাশ্শাফ), মিশর সংস্করণ, পৃ. ৪৪৬।

৩. ইহুদীরা তাদের বন্দীদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত, নিহতদের দেহ বর্বরভাবে বিকৃত করত! গ্রীক, রোমান ও পারসিকগণ একই রূপ বর্বর প্রথা অনুশীলন করত, এই ভয়াবহ অনুশীলনের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের মধ্যেও কোন অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়নি, কেননা ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেও আমরা ভয়াবহ বিকৃতির ঘটনা জানতে পাই।

প্রস্থানকারী শত্রুদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিতে বললেন যে যুদ্ধে মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয় ঘটলে তারা মোটেই মনোবল হারায়নি ও তারা পুনরায় আক্রান্ত হলে পরাজয় বরণ করবে না। মুসলমানেরা পশ্চাদানুসরণ করছে জেনে আবু সুফিয়ান তড়িঘড়ি মক্কায় ফিরে গেল এবং পথিমধ্যে সে যে দু'জন মদিনাবাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছিল তাঁদেরকে হত্যা করেছিল। যাহোক, সে হযরতের কাছে সংবাদ পাঠাল যে তাঁকে ও তাঁর দলকে উৎপাটিত করার জন্য সে শীঘ্রই ফিরে আসবে। তার উত্তরে হযরত যে জবাব দিয়েছিলেন তা ছিল বিশ্বাস ও নির্ভরতায় পরিপূর্ণ। "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক।"[১]

এই দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধের নৈতিক ফল প্রতিবেশী যাযাবরগণ মদিনার বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করার জন্য যে প্রস্তুতি নিয়েছিল তার মধ্যে পরিস্ফুট। অবশ্য তাদের অধিকাংশ প্রয়াস মুহম্মদের শক্তিশালী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে অবদমিত হয়েছিল। কতিপয় বিরোধী গোত্র ইসলাম গ্রহণের ছলে মুসলিম ধর্মপ্রচারকদেরকে তাদের মধ্যে গমন করতে প্রলুব্ধ করে এবং তারপর তাদের ধ্বংস সাধন করে। এ ধরনের একটি উপলক্ষে সত্তর জন মুসলমান রিব্ মাউনা নামক ক্ষুদ্র তটিনীর কাছে বণী আমির ও বণী সুলায়েমদের রাজত্বের মধ্যে বণী সুলায়েমদের বিশ্বাসঘাতকতায় নৃশংস-ভাবে নিহত হয়। এদের মধ্যে যে দু'জন হত্যাকাণ্ড এড়াতে পেরেছিল তাঁদের একজন মদিনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বণী আমির গোত্রের যে দু'জন অস্ত্রবিহীন আরব হযরতের ছাড়পত্র নিয়ে ভ্রমণ করছিল তাদের সঙ্গে পথে তার সাক্ষাৎ ঘটে এবং শত্রু মনে করে তাদেরকে হত্যা করেছিল। যখন হযরত এ ঘটনার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। যদিও ভুলবশতঃ তাঁর এক শিষ্যের দ্বারা একটি অন্যায় অনুষ্ঠিত হল, তথাপি নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের আত্মীয়স্বজনেরা প্রতিকারের দাবীদার। কাজেই মুসলমান এবং সনদগ্রহণকারী অন্যান্য লোকদের কাছ থেকে মৃত্যুপণ সংগ্রহ করার আদেশ দেওয়া হল।[২] বণী উন্ নাজির, বণী কোরাইজা ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও মুসলমানদের সঙ্গে এই পণ প্রদানের

১. *ইবনে হিশাম পৃ. ৫৯০। কোরআন সূ ৩ আ ১৬৭*

২. এ বিষয়ে অধ্যায়—৪-এ আলোচিত হয়েছে।

ব্যাপারে সমভাবে দায়ী ছিল।[১] মুহম্মদ কতিপয় শিষ্য সমভিব্যবহারে বণী নাজির গোত্রের লোকদের নিকট গমন করলেন এবং তাদের কাছ থেকে তাদের দেয় পণের ভাগ দাবী করলেন। তারা তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করল। যখন তিনি একটি বাড়ীর দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ রেখে উপবিষ্ট ছিলেন তখন স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কুমতলব লক্ষ্য করলেন এবং এ থেকে তিনি তাদের হত্যার অভিসন্ধি আঁচ করতে পেরেছিলেন।

ইহুদীদের শত্রুতা ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদেরকে ঘটনার প্রবাহ অনুসরণ করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি মুহম্মদের মদিনায় আগমনের পরমুহূর্ত থেকে কী তীব্র শত্রুতা নিয়ে মুহম্মদের পদক্ষেপগুলির অনুসরণ করেছিল। তারা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করার চেষ্টা করেছিল। তারা তাঁকে ও তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছিল। তারা কোরআনের শব্দাবলীর ভুল উচ্চারণ করে আপত্তিজনক অর্থ বোঝাত। এসব করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। উৎকৃষ্ট শিক্ষাদীক্ষা ও বুদ্ধি-বিবেচনা, মুনাফিকদের দলের সঙ্গে যোগসাজুজ্য এবং তাদের মধ্যকার সাধারণ সম্মতি দ্বারা (যা আরবদের মধ্যকার বিভেদ থেকে স্বতন্ত্র) ইহুদীরা হযরতের গঠিত যুক্তরাষ্ট্রে একটি সবচেয়ে বিপজ্জনক উপাদান হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল। অনগ্রসর জাতিসমূহের মধ্যে কবিগণ বর্তমান যুগের সাংবাদিকদের মতো মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হত।[২] ইহুদী

---

১. ইবনুল আসির ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩; তাবারী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০। মুয়ির ও স্প্রেনজার এ বিষয়ের এ অংশ ছাটাই করেছেন। স্যার উইলিয়াম মুয়ির এম. সি. ত্ব পার্সিভেলের উক্তি—সন্ধির দ্বারা ইহুদীগণও দিয়াত বা মৃত্যুপণ দিতে বাধ্য—গ্রহণের জন্য কোন যৌক্তিকতা দেখতে পান না। তিনি তাবারীর ৩য় খণ্ড পৃ. ৫০ (জাটেনবার্গের অনুবাদ) দেখলেই বিষয়টি পেয়ে যেতেন। ইবনুল আসির (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩)-এর গ্রন্থেও পাওয়া যেত।

২. অনগ্রসর জাতিসমূহের মধ্যে কবিগোষ্ঠী যে প্রভাব বিস্তার করত তার একটি উদাহরণ ওহোদ যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত একটি ঘটনার মাধ্যমে প্রদান করা যায়। এই ঘটনাবহুল অভিযানের প্রস্তুতিকালে কোরাইশরা আবু উজ্জা নামক একজন কবিকে মরুভূমির বিভিন্ন গোত্রের কাছে যেয়ে তার গান ও কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে উদ্দীপিত করতে এবং মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের ধ্বংস করার জন্য মক্কাবাসীদের গঠিত আঁতাতে যোগদান করার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করতে অনুরোধ করেছিল। বদরের যুদ্ধে মুসলমানেরা এই লোকটিকে

কবিগণ তাদের উৎকৃষ্ট কৃষ্টির বলে মদিনাবাসীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রভূত প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। এই প্রতিপত্তি প্রধানত মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করা ও তাদের মধ্যকার পার্থক্যের প্রসার ঘটনার জন্য নিয়োজিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধে পৌত্তলিকদের পরাজয় মক্কাবাসীদের মতো ইহুদীরাও তীব্রভাবে অনুভব করেছিল। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কা'ব বিন আশরফ নামক নাজির গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণ্যে পৌত্তলিকদের এই দুর্গতির গাথা গাইতে গাইতে মক্কার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। সেখানে কোরাইশদেরকে ব্যর্থতায় ম্রিয়মাণ দেখতে পেয়ে সে তাদের সাহস পুনরুদ্ধার করার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস চালিয়েছিল। সে হযরত ও তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক এবং বদরযুদ্ধে বিপর্যস্ত মক্কাবাসীদের জন্য শোক গীতিমূলক কবিতার মাধ্যমে কোরাইশদের তীব্র প্রতিশোধ বাঞ্ছা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল যা ওহোদ প্রান্তরে বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছিল। অভীষ্ট সিদ্ধির পর সে মদিনার সন্নিকটবর্তী তার বাসগৃহ বনী নাজিরদের মধ্যে ফিরে গিয়েছিল। সেখানে সে তার অশ্লীল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতার সাহায্যে মুহম্মদ ও মুসলমানদের অনবরত আক্রমণ করত। তার এ ধরনের কাজ থেকে মুসলিম মহিলারাও পরিত্রাণ পেত না—সে তাদেরকেও অশ্লীল কদর্য ভাষায় চিত্রিত করত। তার কার্যাবলী সে যে প্রজাতন্ত্রের একজন সদস্য ছিল তার বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে নিয়োজিত হয়েছিল। সে যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে মদিনা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য নিরাপত্তার জন্য সকলে একযোগে কাজ করে যাবে।[১] বনী নাজির গোত্রের অপর একজন ইহুদী আবুল হোদায়েকের পুত্র আবু রাফে সাল্লাম সমভাবে মুসলমানদের তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করত। সে তার গোত্রের একটি অংশের সঙ্গে মদিনার উত্তর-পশ্চিমে মদিনা থেকে চার-পাঁচ দিনের দূরত্ব খয়বরে বাস করত। মুহম্মদ ও মুসলমানদেরকে সে

বন্দী করেছিল, কিন্তু মুহম্মদ তাকে বিনা পণে মুক্তি দিয়েছিলেন এই অঙ্গীকারের উপর যে, সে আর কখনো মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। এ সত্ত্বেও সে তার কথা রাখেনি এবং বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে তার কবিতার দ্বারা তাদেরকে অস্ত্রধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, সে একাজে খুবই সফল হয়েছিল। ওহোদ যুদ্ধের পর সে পুনরায় বন্দী হয়েছিল ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ইবনে হিশাম, পৃ. ৫৯১।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

ঘৃণা করত ; সে প্রতিবেশী আরবগোত্র সোলায়েম ও গাতাফানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাত। মুসলিম প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এসব প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা বরদাস্ত করা অসম্ভব ছিল—এসব প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি, সমর্থনের জন্য না হলেও নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্য সর্ববিধ সুবিবেচনা প্রদর্শন করা হত। মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। নিরাপত্তার প্রয়োজনে এসব বিশ্বাসঘাতকতামূলক অভিসন্ধি নির্মূল হওয়া বাঞ্ছনীয়। মদিনা-বাসীগণ এ সবের উপর থেকে আইনের শাসন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল—একটি ক্ষেত্রে আউস গোত্রের একজন সদস্যের দ্বারা এবং অপর একটি ক্ষেত্রে খাজরাজিয়া গোত্রের একজন সদস্যের দ্বারা।

খ্রীষ্টান তার্কিকগণ এই দণ্ডাজ্ঞাকে "নিধন" বলে নিন্দিত করেছেন। যেহেতু একজন মুসলমানকে গোপনে পাঠিয়ে অপরাধীকে হত্যা করার জন্য প্রেরিত হয়েছিল, সেহেতু হযরতের বিরুদ্ধে তাদের পূর্ব-সংস্কার থাকার জন্য তারা এই দণ্ডাজ্ঞার ন্যায়পরায়ণতার ও দ্রুততা ও গোপনীয়তার সঙ্গে তা সম্পাদনের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন ছিল। সে যুগে পুলিস আদালত, দেওয়ানী আদালত, এমনকি সামরিক আদালতও ছিল না যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেত। রাষ্ট্রীয় আইন-বলবৎ সংস্থা না থাকায় ব্যক্তিই আইন হাতে তুলে নিত। এসব লোক তাদের আনুষ্ঠানিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল : তাদেরকে বন্দী করা কিংবা অযথা রক্তপাত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও চিরস্থায়ী গোত্রগত বিরোধ এড়িয়ে তাদের গোত্রের লোকদের সম্মুখে তাদের প্রাণদণ্ড কার্যকরী করা অসম্ভব ছিল। রাষ্ট্রের স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যে, যা করতে হবে তা দ্রুত করতে হবে এবং জনসমক্ষে যারা অভিযুক্ত ও দোষী তাদেরকে বিনা হৈ হুল্লোড়ে সাজা দিতে হবে।[১] প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব, নগররাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণ নির্ভর করত অপরাধীগণ তাদের গোত্রের লোকদের সঙ্গে

---

১. আমাদের খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকরা ভুলে যান যে "জ্ঞানী" সোলন তাঁর ক্ষুদ্র শহরটির নিরাপত্তার জন্য সব এথেন্সবাসীর উপর অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছিলেন। আইনের বলবৎকারী হওয়ার জন্য ও দলাদলিতে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য, দাঙ্গায় যে কোন দলে অংশ গ্রহণ করার জন্য! তারা একথাও ভুলে যান যে খ্রীষ্টান ইংলণ্ডেও "একজন ডাকাত বা আইন বহির্ভূত লোককে" অনুসরণ করা ও হত্যা করার অধিকার দেওয়া হয়।

মিলিত হয়ে শক্তিসঞ্চয় করার পূর্বেই তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত রায়ের দ্রুত কার্যকরী করার মধ্যে।

এই দু'জন দেশদ্রোহীর পরিণতি ও তাদের গোত্র বণী কাইনুকার মদিনা থেকে নির্বাসন হযরতের বিরুদ্ধে বণী নাজির গোত্রের লোকদের মধ্যে শত্রুতার তীব্র অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল। কাইনুকা গোত্রের নির্বাসনের সঙ্গে যেসব পরিস্থিতি জড়িত ছিল সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখের প্রয়োজন। অন্যান্য ইহুদী গোত্র ছিল মুখ্যত কৃষিনির্ভর ; বণী কাইনুকা গোত্রের কোন খামার বা খেজুরের আবাদ ছিল না। তাদের বেশীর ভাগ লোক ছিল কারিগর—বিভিন্ন শিল্পকার্যে ব্যাপৃত।[১] আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসকারী তাদের স্বধর্মাবলম্বী লোকদের মতো দেশদ্রোহী ; দুর্বিনীত ও কলহপ্রিয় বণী কাইনুকা গোত্র তাদের চরমনৈতিক শৈথিল্যের জন্যও বিখ্যাত ছিল। একদিন এক গ্রাম্য তরুণী বাজারে দুগ্ধ বিক্রয় করতে আসে। ইহুদী তরুণগণ তার সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করে। একজন মুসলমান পথচারী বালিকার পক্ষ গ্রহণ করে। যে মারামারি শুরু হয় তাতে অশ্লীল আচরণকারী নিহত হয়। ফলে উপস্থিত ইহুদীগণ মুসলমানটাকে হত্যা করে। তখন এক বন্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। স্বধর্মাবলম্বীর নিধনে উত্তেজিত মুসলমানগণ অস্ত্রধারণ করে ; রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং উভয়পক্ষে বহু লোক নিহত হয়। দাঙ্গার প্রাথমিক খবর পেয়েই মুহম্মদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তাঁর শিষ্যদের উন্মত্ততা আয়ত্তে আনতে সমর্থ হন। তিনি অবিলম্বে দেখতে পেলেন যে দেশদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলাকে যদি এভাবে চলতে দেওয়া যায় তবে এক ভয়াবহ পরিণতি নেমে আসবে। মদিনা রণাঙ্গণে পরিণত হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্যগণ একজন অন্যজনকে হত্যা করবে। ইহুদীরা প্রকাশ্যে ও জ্ঞাতসারে চুক্তির শর্তাদী লঙ্ঘন করছে। কঠোর হস্তে এ সবের পরিসমাপ্তি ঘটানো প্রয়োজন, নইলে শান্তি ও নিরাপত্তাকে চিরতরে বিদায় দিতে হবে। ফলে মুহম্মদ তৎক্ষণাৎ বণী কাইনুকা গোত্রের আবাসস্থলে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে মুসলিম কমনওয়েলেথের অন্তর্ভুক্ত হতে কিংবা মদিনা ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। ইহুদীরা অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় এই নির্দেশের জবাব দিয়েছিল : "হে মুহম্মদ, তোমার লোকেরা

২য় হিজ্‌রী শাওয়াল, ফেব্রুয়ারি ৬২৪ খ্রী.

১. তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮

(কোরাইশদের) উপর বিজয়ী হয়েছ বলে গর্বিত হয়ো না। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নয় এমন লোকদের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করেছ। আমাদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়ায় আসতে চাও তবে আমরা তোমাকে দেখিয়ে দেবো আমরা কেমন বাপের ব্যাটা।"[১] তারা তাদের দুর্গে আশ্রয় নিল এবং মুহম্মদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করল। তাদের দমন করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য ছিল এবং কালবিলম্ব না করে দুর্গ অবরোধ করা হল। পনের দিন পরে তারা আত্মসমর্পণ করল। প্রথমে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে বলে মনস্থ করা হয়েছিল কিন্তু মুহম্মদের চরিত্রের কোমলতা বিচারের অনিবার্য রায় জয় করল এবং কাইনুকা গোত্রের লোকদেরকে শুধুমাত্র নির্বাসিত করা হল।

বণী নাজির গোত্রের লোকদের অন্তরে এসব অবস্থা বিরক্তি উৎপাদন করছিল। তারা মুহম্মদের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শুধু একটা অনুকূল সুযোগের অপেক্ষা করেছিল। কাজেই তাদের মধ্যে মুহম্মদের উপস্থিতিকে তারা দৈব ঘটনা বলে মনে করেছিল। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি যে তাদের অশুভ অভিসন্ধি মুহম্মদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইহুদীদের সন্দেহের উদ্রেক না করেই তিনি অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করলেন। এভাবে তিনি নিজেকে ও তাঁর শিষ্যদেরকে প্রায় নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করলেন।[২]

বণী কাইনুকা গোত্র পূর্বে যেরূপ করেছিল বণী নাজির গোত্র ঠিক একই অবস্থায় নিজেদের স্থাপন করেছিল। তারা তাদের কাজের দ্বারা সনদ-বহির্ভূত অবস্থায় পতিত হয়েছিল। কাজেই মদিনায় উপনীত হওয়ার পর মুহম্মদ কাইনুকা গোত্রের নিকট প্রেরিত বার্তার অনুরূপ বার্তা তাদের নিকট প্রেরণ করলেন। মুনাফিক ও আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সমর্থনের উপর নির্ভর করে বণী নাজিরগণ একটা উদ্ধত উত্তর প্রদান

---

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৫৪৩। তাবারী কাইনুকা গোত্রের উত্তর সামান্য পরিবর্তিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সকল ঐতিহাসিক একমত যে তাদের উক্তি ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও আপত্তিকর। আমি বুঝতে পারি না গিবন কোত্থেকে তাদের বিনীত জবাব পেয়েছিলেন যা তিনি তাদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

২. যদি মুহম্মদ বা তাঁর শিষ্যগণ দেখাত যে তাঁরা ইহুদীদের অভিসন্ধি বুঝে ফেলেছে তবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে উঠত এবং ব্যাপারটি সংকটজনক হয়ে দাঁড়াত। তাই মুহম্মদ তাঁর শিষ্যদের রেখে নিজেই চলে গেলেন। এতে ইহুদীরা ভাবল যে তিনি বেশী দূরে যাননি এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।

করেছিল। আব্দুল্লাহর এবং তাদের সহ-গোত্র বণী কুরাইজা গোত্রের অঙ্গীকৃত সাহায্যের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পনের দিন অবরোধের পর[১] তারা সন্ধির জন্য আবেদন জানাল। পূর্বের প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করা হল, তারা তাদের আবাসস্থল পরিত্যাগ করতে সম্মত হল। অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হল।[২] মুসলমানরা যাতে তাদের বাসগৃহ অধিকার করতে না পারে সেজন্য তারা সেগুলো পরিত্যাগ করার পূর্বেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।[৩]

তাদের জমি, যুদ্ধাস্ত্র যা তারা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি সেগুলো আনসারদের সম্মতি ও আন্তরিক অনুমোদন সহকারে মুহাযিরদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন, এ পর্যন্ত মুহাজিরগণ মদিনাবাসীদের দানশীলতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন। মুহাযির ও আনসারদের মধ্যে শক্তিশালী

রবিউল আউয়াল ৪র্থ হি. জুন-জুলাই ৬২৫ খ্রী.

ভ্রাতৃসুলভ অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও মুহম্মদ জানতেন যে, মদিনাবাসীদের সাহায্য তাদের জীবিকার একটি অনিশ্চিত উপায়। কাজেই তিনি আনসারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইহুদীদের পরিত্যক্ত দ্রব্যসম্ভার তাদের গরীব মুহাযির ভাই যারা তাঁর সঙ্গে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন তাদের মধ্যে বণ্টন করায় তাদের কোনরূপ আপত্তি আছে কিনা। সমস্বরে তারা উত্তর করল: "ইহুদীদের দ্রব্যাদী আমাদের ভাইদের মধ্যে বিতরণ করুন, আমাদের একটি অংশও তাদেরকে প্রদান করুন, আমরা স্বেচ্ছায় সম্মতি দিচ্ছি।" ফলে হযরত মুহাযিরিন ও যে দু'জন আনসার অতিশয় দরিদ্র ছিলেন তাদের মধ্যে উক্ত সম্পদ বণ্টন করলেন।[৪]

১. তাবারী এগার দিন বলেছেন।—৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪।
২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৫৩, ৬৫৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩, আবুল ফিদা পৃ. ৪৯।
৩. কোরআন, সূ. ৫৯, আ. ৫।
৪. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৫৪; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ ৫৪। এ সময় থেকে একটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, সে সম্পদ প্রকৃত যুদ্ধের মাধ্যমে করায়ত্ত হয় নি তা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ সম্পদের ব্যবহার তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। (এম. কোয়েরীর 'ড্রয়িট মুসুলমান' পৃ. ৩৫৭) কোরআনের সূরা. ৫৯-তে বণী নাজির গোত্রের নির্বাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহের প্রায় সবিস্তারেই বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বণী নাজিরদের নির্বাসন কার্যকরী হয়েছিল।[১] এই বছরের বাকী সময় ও পরবর্তী বছরের প্রথম দিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাযাবর গোত্রগুলোর আকস্মিক শত্রুতামূলক তৎপরতা দমন করতে এবং মদিনা রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন হত্যামূলক আক্রমণের শাস্তি প্রদানে ব্যয়িত হয়েছিল।[২]

ইত্যবসরে ধর্মের শত্রুরা মোটেই নিষ্ক্রিয় ছিল না। পৌত্তলিকগণ দেশে-বিদেশে তাদের দূত পাঠিয়ে বিভিন্ন গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। ইহুদীরা ছিল এ ব্যাপারে সবচেয়ে সক্রিয়। খয়বরের ইহুদীদের পিছনে কিছু নাজির গোত্রের লোক ছিল। সেখানকার লোকেরা প্রতিশোধের স্পৃহায় উদ্দীপিত হয়ে মুসলমানদের বিনাশ সাধনের জন্য অপর একটি লীগ গঠনের প্রয়াস পেতে লাগল।[৩] তাদের প্রয়াস আশাতিরিক্ত সফল হয়েছিল। একটি প্রবল আঁতাত শীঘ্রই গড়ে উঠল; দশ সহস্র সুনিয়ন্ত্রিত লোকের একটি বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনা অভিমুখে অগ্রসর হল। পথে কোন বাধার সম্মুখীন না হওয়ায় তারা মদিনার কয়েক মাইলের মধ্যে ওহোদের দিকে আক্রমণের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে তাবু স্থাপন করল। এই সেনাবাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য মুসলমানেরা মাত্র তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল।[৪] সংখ্যার স্বল্পতা এবং মদিনার অভ্যন্তরে মুনাফিকদের দলগত প্রতিবন্ধকতা দ্বারা বাধ্য হয়ে তারা রক্ষণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করল, তারা মদিনার অরক্ষিত এলাকার চতুর্দিকে গভীর পরিখা খনন করল। নিরাপত্তার

---

১. ইবনে হিশামের মতানুসারে; পৃ. ৬৩৩ এবং আবুল ফিদা পৃ. ৪৯; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫। তাবারা বলেন যে, মাসটি ছিল সফর।

২. এই অভিযান দুমাতুল জানদালের স্থানটি আবুল ফিদার মতে দামেস্কের দক্ষিণে সাতদিনের পথ খ্রীষ্টান আরবদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। তারা সিরিয়াগামী মদিনার বাণিজ্যিক কাফেলা বন্ধ করেছিল এবং মদিনা লুণ্ঠনের ভীতি প্রদর্শন করেছিল। মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে লুণ্ঠনকারীরা পলায়ন করেছিল। একজন প্রতিবেশী দলপতির সঙ্গে একটি সন্ধি সম্পাদন করে মুহম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাকে মদিনার সীমানায় গোচারণের অনুমতি প্রদান করলেন।—সি. দ্য পার্সিভেল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০।

৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯৬৩, ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৯; তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০, ৬১।

৪. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৭৮।

জন্য সুরক্ষিত গৃহসমূহে নারী ও শিশুদের রেখে পরিখার সম্মুখে নগরের বাহিরে তারা তাবু স্থাপন করল। এ সময়ে সক্রিয় সাহায্যের প্রত্যাশা না করলেও অন্য দিকের নিরাপত্তার জন্য অন্ততঃপক্ষে তারা বণী কোরাইজাদের নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করেছিল। এই গোত্রের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অনেকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল, এবং মুসলমানদের যাবতীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য তারা সনদের দ্বারা চুক্তিবদ্ধ ছিল। যাহোক, এসব ইহুদীরা তাদের অঙ্গীকার লঙ্ঘন ক'রে কোরাইশদের দলে যোগদান করার জন্য প্ররোচিত হল। তাদের চুক্তি ভঙ্গের খবর মুহম্মদের কানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাদ্‌বিন্‌ মোয়াজ ও সাদ বিন উবাদ্দাকে পাঠিয়ে তাঁদের অনুরোধ করলেন তাঁদের কর্তব্য পালন করতে ফিরে যাওয়ার জন্য। তারা যে উত্তর দিয়েছিল তা ছিল অতীব ঔদ্ধত্যপূর্ণ। "কে মুহম্মদ, কে সেই প্রেরিতপুরুষ যাকে আমরা মানব? আমাদের ও তার মধ্যে কোন চুক্তি নেই।[১]

ইহুদীরা এলাকাটির সঙ্গে সুপরিচিত ছিল এবং তারা অবরোধকারী-দেরকে মদিনার দুর্বল জায়গাগুলো দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাস্তবিক সাহায্য করতে পারত। সে কারণে মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। মদিনার অভ্যন্তরের শত্রুভাবাপন্ন লোকেরা বিপদের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল।[২]

পৌত্তলিক ও ইহুদীরা মুসলমানদেরকে সম্মুখ সমরে টেনে আনতে ব্যর্থ হয়ে কিংবা ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে মদিনা নগরীকে চমৎকৃত করে দিতে না পেরে তারা নিয়মিত আক্রমণ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হল।

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৭৫ ; মুয়ির ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

২. কোরআনের সুরা আহজাব (৩৩ সংখ্যা)-এ সমগ্র পরিস্থিতি এত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে যে তার দু' একটা (আয়াতের উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। "ওরা যখন তোমাদের উপরে চড়াও হয়ে এল—উপর থেকে, তোমাদের নিচের দিক থেকে, আর যখন তোমাদের চোখ বিস্ফারিত অবস্থায় ছিল আর যখন তোমাদের কলিজা মুখে এসে যাচ্ছিল আর তোমরা আল্লাহপাক সম্পর্কে নানা-রকম জল্পনা-কল্পনা করে যাচ্ছিলে। তখন কিন্তু সেখানে মু'মিন মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে, আর কঠিন ভূমিকম্পে ঘিরে ধরা হয়েছে। আর মুনাফিকরা আর যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে তারা বলতে লাগল : আমাদের সাথে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসুল ত শুধু ধোঁকা দেবার জন্য ওয়াদা করে রেখেছেন (১০—১২)।

অবরোধ বিশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। মরুভূমির অস্থির গোষ্ঠিসমূহ কোরাইশ ও তাদের মিত্রদের সাথে জুটি বেঁধেছিল ও সহজ শিকারের জন্য প্রত্যাশা করছিল; কিন্তু বিলম্বিত অভিযানের দরুন তারা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সংকটময় মুহূর্তে অবরোধকারীদলের নেতারা পরিখা পার হয়ে ছোট্ট মুসলীম বাহিনীর উপর নিপতিত হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু হযরতের অতন্দ্র প্রহরার ফলে তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। অবরোধকারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সবই মনে হচ্ছিল সম্মিলিত হয়ে আসছে; তাদের অশ্বসমূহ দ্রুত মরে যাচ্ছিল ও রসদও ফুরিয়ে আসছিল। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘনীভূত হয়ে আসছিল; দূরদর্শী মুসলমান প্রধানগণ অতুলনীয় বিজ্ঞতা সহকারে এই মতপার্থক্যকে প্রকৃত বিভেদে ফেনায়িত করে তুলেছিলেন। অকস্মাৎ এই বিশাল সমাবেশ যা মুসলমানদের মনে অনিবার্য ধ্বংসের ত্রাস সঞ্চারিত করেছিল তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তাদের তাবু উড়ে গেল, আলো নিভে গেল; আবু সুফিয়ান ও তার দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ পালিয়ে গেল; অবশিষ্ট সৈন্য বণী কোরাইজা গোত্রের শরণ নিল।[১] মুহম্মদ তাঁর শিষ্যদেরকে শত্রুদের অন্তর্ধানের পূর্বভাষ রাত্রেই দিয়েছিলেন। প্রভাত হলেই তারা দেখতে পেলেন যে হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। মুসলমানেরা আনন্দে শহরে প্রত্যাবর্তন করলেন।[২]

কিন্তু মুসলমানদের মতে বণী কোরাইজা গোত্র যতদিন মদিনা শহরের সন্নিকটে বিপজ্জনক নৈকট্যে ছিল ততদিন বিজয় আদৌ আসেনি। অঙ্গীকৃত চুক্তি সত্ত্বেও তারা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিল এবং এক সময়ে তাদের দিক থেকে তারা মদিনাবাসীদেরকে প্রায় হতবাক করে দিয়েছিল—এটা এমন একটি ঘটনা যা সফল হলে বিশ্বাসীগণ সাধারণভাবে নির্মূল হতেন। কাজেই মুসলমানগণ এই বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাখ্যা দাবী করা তাদের কর্তব্য হিসেবে মনে করেছিলেন। এই দাবী বণী কোরাইজা গোত্র স্পর্ধার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে ইহুদীদের অবরোধ করা হল এবং স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হল। তারা একটিমাত্র শর্ত প্রদান করেছিল যে আউস গোত্রের প্রধান

৫ হিজরী = ২৮শে ফেব্রুয়ারি ৬২৬ খ্রী
২৪শে মার্চ ৬২৭ খ্রী

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৮৩; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০।
২. ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ "পরিখার যুদ্ধ" নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

মাদ ইবনে মুয়াজের বিবেচনার উপর তাদের শাস্তি নির্ভর করতে হবে। এই লোকটি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ; আক্রমণের ফলে তিনি আহত হয়েছিলেন এবং আঘাতের ফলে পরদিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস-ঘাতকতামূলক আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি রায় দেন যে এই গোত্রের যোদ্ধা-দেরকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে এবং শিশু ও স্ত্রীলোকদেরকে মুসলমানদের দাসদাসী হতে হবে। এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করা হয়েছিল।[১] লেনপুল বলেন, "এই নির্মম রক্তাক্ত দণ্ডাজ্ঞা আলবিজেনবাসীদের বিরুদ্ধে বিশপ সেনাধ্যক্ষ কিংবা অগাস্টাইন যুগের অতিনৈতিকতা নির্দেশক কার্যাবলীর যোগ্য, কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে এসব লোকের অপরাধ অবরোধকালে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বড় ধরনের রাজদ্রোহিতা ; কিভাবে ওয়েলিংটন মরুবাসী ও লুণ্ঠনকারীদের হত্যা করে বৃক্ষে টাঙিয়ে রাখতেন যা থেকে তার অভিযানের পথ নির্দেশ করা হত সে-সম্পর্কে যারা অধ্যয়ন করেছেন তাদের পক্ষে একটি বিশ্বাসঘাতক গোত্রের সংক্ষিপ্ত দণ্ডাজ্ঞায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।"[২]

বিভিন্ন ইহুদী গোত্রের প্রতি নিপতিত শাস্তি হযরতের খ্রীষ্টান জীবনীকার মুয়ির, স্প্রেনজার, ওয়েল ও ওসবোর্ণকে আক্রমণের একটি ভিত্তি প্রদান করেছিল। তাদের তুলনায় বণী কাইনুকা ও বণী নাজিরদের উপর নিপতিত শাস্তি অনেক কম ছিল। শুধু বণী কোরাইজা গোত্রের প্রতি নির্মম আচরণ প্রদর্শন করা হয়েছিল।

মনুষ্য প্রকৃতি এমনিভাবে গঠিত যে কোন ব্যক্তির কার্যাবলী যতই অপরাধমূলক হোক না কেন, যখন তার সংগে নির্মম ব্যবহার করা হয় যা আমাদের কাছে নিষ্ঠুর বলে মনে হয় তখন অনুভূতির স্বাভাবিক আকস্মিক ও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, আমাদের হৃদয়ে ন্যায়বিচারের অনুভূতির স্থানে করুণার অনুভূতি জন্মে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোরাইজা গোত্রের উপর নিপতিত দণ্ডাজ্ঞা ছিল নিঃসন্দেহে নির্মম। আমরা যতই দুঃখ করি না কেন যে এই অভাগা লোকদের নিয়তি যদিও তাদের বিশেষ অনুরোধে একজন ক্রোধোন্মত্ত সৈনিকের হাতে পড়েছিল ; আমরা যতই দুঃখ করি না কেন যে এই ব্যক্তির দণ্ডাজ্ঞা যথাযথভাবেই

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৮৬-৬৯০ ; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড পৃ. ১৪১ ; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৮।

২. 'সিলেকশান ফ্রম দি হোলি কোরআন' গ্রন্থের সূচনা পৃ. LXV.

প্রতিপালিত হল ; তত্রাচ করুণার আবেগে আমরা ন্যায়বিচার ও দোষ-বহতার কঠোর প্রশ্ন অবশ্যই উপেক্ষা করতে পারি না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যে অপরাধে তারা অভিযুক্ত—তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের প্রকাশ্য শত্রুতা, তাদের চুক্তিভঙ্গ যে চুক্তিতে তারা পবিত্র শর্তে আবদ্ধ ছিল। এছাড়া জিহোভার উপাসক হিসেবে পৌত্তলিক আরবদেরকে তাদের পৌত্তলিকতার অনুশীলনে যে প্রলোভন দেখিয়েছিল সেটাও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়া যায় না। খ্রীষ্টান নীতিবিদের সঙ্গে কোন কোন মুসলমান হয়ত স্বাভাবিকভাবেই বলতে চাইবেন : "অদ্যাপি নির্দোষ রয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে নিজেদের দলে ভিড়তে প্রলুব্ধ করার চেয়ে দুষ্টদের বহুবার মৃত্যুবরণ করা উত্তম।"[১]

এই সব মুসলমান খ্রীষ্টান নীতিবিদদের সঙ্গে মাত্র একটি শব্দ পরিবর্তন করে বলতে পারতেন : "আমাদের ভাগ্য আর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভাগ্য এ সময়ে কি হতে পারত যদি আরবদের তরবারী[২] অধিকতর মিতব্যয়িতার সঙ্গে তার কার্য সম্পাদন করত, আসুন শুধু সে সম্পর্কে ভাবা যাক। আরবদের তরবারী রক্তপাতহীন দণ্ডাজ্ঞায় কিয়ামৎ পর্যন্ত জগতের সকল দেশের প্রতি করুণার কাজ করেছে।" যদি খ্রীষ্টানদের যুক্তি ঠিক হয় ও অমানুষিক না হয়, তবে মুসলমানদের যুক্তিও অন্যথা হতে পারে না। যাহোক, অন্যান্য মুসলমানেরা বণী কোরাইজাদের উপর নিপতিত ভয়াবহ দণ্ডাজ্ঞা একইভাবে দেখতে পারেন, যেমন কার্লাইল দ্রোঘেদার আইরিশ অধিবাসীদের এলোপাথাড়ি ধ্বংসের জন্য ক্রমওয়েল যে নির্দেশ জারি করেছিলেন তা দেখেন।" একজন সশস্ত্র সৈনিক যিনি ন্যায়-পরায়ণ আল্লাহর সৈনিক হিসেবে আত্মসচেতন—যে আত্মসচেতনতা সকল সৈনিক, সকল মানুষের সব সময় থাকা উচিত—সশস্ত্র সৈনিক মৃত্যুর মতো ভয়াবহ ধ্বংসের মতো প্রচণ্ড—আল্লাহর শত্রুদের উপর তিনি আল্লাহর বিচার কার্যকরী করে থাকেন।"

যাহোক, আমরা ইহুদীদের শাস্তির বিষয়টি এ দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাই না। সে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যেভাবে যুদ্ধ বুঝত তার নিয়মাবলীর আলোকেই আমরা এই যুদ্ধ বিচার করব : "সে যুগে যুদ্ধের গৃহীত প্রথাসমূহের সঠিক প্রয়োগ"।[৩] যদি সাদের বিচার ব্যতিরেকেই

১. আর্ণল্ডের 'সারমন' ৪র্থ 'সারমন'—"ইসরাইলদের যুদ্ধবিগ্রহ" পৃ. ৩৫, ৩৬।
২. অবশ্য আসলে ইসরাইল।
৩. গ্রোটের হিস্ট্রী অব গ্রীস ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৯।

তাদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হত, সে ক্ষেত্রেও তদানীন্তন যুদ্ধনীতির সঙ্গেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। কিন্তু তারা নিজেরাই সাদকে একমাত্র সালিস ও বিচারক মনোনীত করেছিল; তারা জানত যে তার বিচার আদৌ গৃহীত প্রথার বিপরীত নয়। কাজেই তারা অনুযোগ করেনি। তারা একথাও জানত যে যদি তারা জিতত তবে তারা কোন বিবেচনা ছাড়াই শত্রু নিধন করত। লোকেরা রাজা দাউদের ধ্বংস বিচার করে "তাঁর যুগের আলোকে"।[১] আদিম কালে খ্রীষ্টানদের দ্বারা যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা বিশেষ "আলোকে" বিচার করা হয়ে থাকে। কেন আদি যুগের মুসলমানদের রক্ষণাত্মক যুদ্ধ একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা হবে না? যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন কুসংস্কারমুক্ত মন[২]কী কোরাইজাদের দণ্ডাজ্ঞায় হযরতের প্রতি কোন দোষ সম্ভবত আরোপিত হত না।

যেসব লোককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা ২০০ কিংবা ২৫০ জনের অধিক নয়।

জীবিত ইহুদীদের বণ্টনের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে রায়হানা নাম্নী এক ইহুদী তরুণীকে হযরতের ভাগে দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে তাকে পূর্ব থেকেই আলাদা করে রাখা হয়েছিল। খ্রীষ্টান লেখকগণ মুহম্মদকে আক্রমণ করার জন্য কোন সম্ভাব্য ছুঁতা পেলেই তাঁর সমালোচনা করেন। এই গল্পকে মূলধন করতেও তারা পশ্চাদপদ হননি। দাসত্বের প্রশ্নটি পরীক্ষার জন্য পরবর্তী একটি অধ্যায় রেখে এখানে আমরা শুধু এই মন্তব্য করব যে রায়হানার বণ্টনের ব্যাপারটি সত্য হলেও তা আধুনিক আক্রমণের কোন ভিত্তি প্রদান করে না, কেননা এটা সে যুগের স্বীকৃত যুদ্ধনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। রায়হানার পক্ষে

---

১. ২ সামু. ৮, ২: তিনি অধিকতর হিংস্রতা সহকারে বিজিত অ্যামোনাইটদের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন, তাদের কাউকে কাউকে বিদে, কুড়াল ও করাত দিয়ে চেরা হয়েছিল; আর অন্যান্যদেরকে ইটের চুল্লিতে ঝলসিয়ে মারা হয়েছিল।" (XII, ৩১) মৈয়তল্যাণ্ড, 'জিউয়িশ লিটারেচার এণ্ড মডার্ণ এডুকেশান' পৃ. ২১। তুলনীয়—স্টেনলীর লেকচারস অন্ জিউয়িশ চার্চ' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭।

২. আমি ইউরোপীয়দের মধ্যে শুধু এম. বার্থেলিমি সেণ্ট হিলেয়ার, মি. জনসন এবং মি. স্টেনলী লেনপুলের নাম স্মরণ করতে পারি যারা কুসংস্কারের দ্বারা চালিত হননি।

হযরতের স্ত্রী হওয়া সম্পর্কীয় গল্পটি বানোয়াট, কেননা এই ঘটনার পর সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং তার সম্পর্কে আমরা আর কিছু জানতে পারি নাই, পক্ষান্তরে অন্যান্যদের সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ও পরিস্থিতি-সংক্রান্ত বিবরণ জানি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহম্মদের ক্ষমাশীলতা

"তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছিলেন; যারা তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তারা এমন রজ্জু ধরেছিলেন যা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।"

ইহুদী ও পৌত্তলিকরা মদিনার নূতন প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য যে শক্তিশালী সম্মেলন গড়ে তুলেছিল তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল, অবশ্য মুসলমানেরা বলতে পারেন যে অলৌকিকভাবে তা ঘটেছিল।[১] কিন্তু মরুভূমির পার্শ্ববর্তী বর্বর ও দুর্ধর্ষ গোত্রগুলি নরহত্যাসহ মদিনার রাজ্যসমূহ লুণ্ঠতরাজ চালাচ্ছিল। মদিনা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের খাতিরে তাদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল; কিন্তু মরুভূমির পিচ্ছিল সন্তানেরা সাধারণভাবে মুসলমানদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার প্রয়াস পেয়েছিল। বণী লিহইয়ানরা মুহম্মদকে তাদের মধ্যে ইসলামের নীতি প্রচারের জন্য কয়েকজন শিষ্য প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেছিল। যখন এসব ধর্মপ্রচারক সেখানে পৌঁছল তখন তারা কয়েকজনকে হত্যা করল এবং বাকীদেরকে মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রয় করল। এ পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু এখন এই অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়ার সময় এল। এই বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে হযরতের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বণী লেহইয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান করে। যথাসময়ে হযরতের আগমনের সংবাদ পেয়ে লুণ্ঠনকারীরা পর্বতে পলায়ন করে এবং মুসলমানেরা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন না করেই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।[২]

৬ হিজরি=২৩শে এপ্রিল ৬২৭ খ্রী.—১২ই এপ্রিল ৬২৮ খ্রী.

এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরে গাতাফান (খায়েল গাতাফান)-এর এক যাযাবার শাখা বণী ফিজারার প্রধান সহসা মদিনার শহরতলী

---

১. তুলনীয়: কোরআন সূ. ৩৩ আ. ৯।

২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৭১৮; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৩, তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২।

এলাকায় আক্রমণ করে উষ্ট্রের রাখালকে হত্যা করে তার স্ত্রীসহ বহু সংখ্যক উষ্ট্র নিয়ে চলে যায়। মুসলমানেরা তৎক্ষণাৎ তাদের পিছু নেয় এবং স্বল্প সংখ্যক উষ্ট্র উদ্ধার করতে সমর্থ হয়, কিন্তু তারা অপহৃত গবাদীর এক বৃহদংশ নিয়ে মরুভূমির মধ্যে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

প্রায় এই সময়ে হযরত সিনাই পর্বতের নিকটবর্তী সেণ্ট ক্যাথারিন মঠের সন্ন্যাসীদের ও সকল খ্রীষ্টানদের একটি সনদ প্রদান করেছিলেন। জগতের ইতিহাসে এই সদন সংস্কৃত সহিষ্ণুতার এক মহত্তম কীর্তিস্তম্ভ হিসেবে যথার্থই বিবেচিত হয়েছে। ইসলামের ঐতিহাসিকগণ এই স্মরণীয় দলিলটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংরক্ষিত রেখেছেন। এই দলিল মতবাদের বিস্ময়কর প্রসস্ততা ও ধারণার উদারতার নির্দেশক। এর দ্বারা হযরত খ্রীষ্টানদেরকে যে সব সুযোগ, সুবিধা ও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তা তারা তাদের স্বধর্মী নৃপতিদের শাসনাধীনেও পায়নি। আর তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সনদের মধ্যে যে সব বিষয় নির্দেশিত হয়েছে তা যে মুসলমান লঙ্ঘন ও নিন্দা করবে সে আল্লাহর নির্দেশনামার খেলাফকারী ও তার ধর্মের অবহেলাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। তিনি খ্রীষ্টান ও তাদের গির্জা, ধর্মযাজকদের নিরাপত্তা ও তাদের বাসগৃহ সংরক্ষণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের প্রতি কড়া নির্দেশ দান করেছিলেন। এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল যে খ্রীষ্টানদেরকে অন্যায়ভাবে কর দিতে না হয়; কোন বিশপ তার নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত না হন; কোন খ্রীষ্টান যেন নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য না হন; কোন সন্ন্যাসী যেন মঠ থেকে বহিষ্কৃত না হন; কোন তীর্থযাত্রী যেন তীর্থ দর্শনে বঞ্চিত না হন। মুসলমানদের মসজিদ কিংবা তাদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য যেন খ্রীষ্টানদের কোন গির্জা ধ্বংস করা না হয়। মুসলমান-দের সঙ্গে বিবাহিত খ্রীষ্টান মহিলাদের স্বীয় ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার থাকবে, এবং সে বিষয়ে তাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম বা উৎপাত করা চলবে না। যদি খ্রীষ্টানরা তাদের গির্জা বা মঠ সংস্কারের জন্য কিংবা তাদের ধর্মসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে সাহায্যে আবশ্যকতা বোধ করে তবে মুসলমানদেরকে তাদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করতে হবে। এ কাজ তাদের ধর্মে অংশগ্রহনের সামিল বিবেচিত হবে না, এ শুধু তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং হযরতের অধ্যাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কর্তৃক তাদের অনুকূলে প্রদত্ত হয়েছে। যদি মুসলমানেরা মদিনা বহির্ভূত খ্রীষ্টানদের সঙ্গে শত্রুতায় অবতীর্ণ হয়

তবে দেশের খ্রীষ্টান অধিবাসীদের প্রতি তাদের ধর্মের জন্য অবমাননা করা চলবে না। কোন মুসলমান খ্রীষ্টানদের প্রতি অন্যথা আচরণ করলে সে হযরতের অবাধ্য বলে ঘোষিত হবে।

মানুষ সর্বদা সেই ব্যক্তির প্রতি মহত্ত্বের ধারণা আরোপ করে যিনি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমার স্বর্গীয় নীতির শুধু প্রচার করেন না বরং তার **অনুশীলন করে থাকেন**। রাষ্ট্রপ্রধান ও জনগণের জীবন ও সম্পদের অভিভাবক হিসেবে মুহম্মদ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অপরাধীদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কিন্তু রাসুল মুহম্মদ, ধর্মপ্রচারক মুহম্মদ ছিলেন তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুর প্রতিও কোমল হৃদয় ও দয়ালু। তাঁর চরিত্রে মানুষের চিন্তায় অধিগত শ্রেষ্ঠ গুণ—ন্যায়-বিচার ও করুণার সম্মিলন ঘটেছিল।

মুসলমানেরা মরুভূমির অবাধ্য আরবদের বিরুদ্ধে অভিযানে হানিফা গোত্রের প্রধান সুমামা বিন উসালকে বন্দী করেছিল। তাকে মদিনার আনা হল; সেখানে সে হযরতের দয়ার্দ্র আচরণে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে সে দুশমন থেকে হযরতের সবচেয়ে অনুগত ভক্তে রূপান্তরিত হল। নিজের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে সে মক্কায় খাদ্যদ্রব্য পাঠানো বন্ধ করে দিল। সুমামার এই বাণিজ্যিক বিরতি মক্কাবাসীদেরকে নাজুক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিল। হুনাফিয়াদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে বিন্দু-মাত্র টলাতে না পেরে তারা অবশেষে মুহম্মদের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ জানাল। হযরতের হৃদয় বিগলিত হল; তারা যা চায় তা প্রদান করতে তিনি সুমামাকে অনুরোধ জানালেন। তাঁর অনুরোধে আবার মক্কার অভিমুখে বাণিজ্য জাহাজ প্রেরিত হল।

মুহম্মদের দয়ার্দ্র স্বভাবের অগণিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত দেব। হযরতের একজন কন্যা—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সন্তান হোদাইবিয়ার সন্ধি হওয়ার পর মক্কা থেকে পলায়ন করছিলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন ও প্রসবকাল নিকটবর্তী ছিল। তিনি যখন উষ্ট্রে আরোহণ করছিলেন তখন হাবরার নামক একজন কোরাইশ তার স্বভাবসুলভ হিংস্রতা নিয়ে বল্লমের বাটের খোচায় তাকে উষ্ট্র থেকে ভূতলে ফেলে দেয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন। মক্কা বিজয়ের পর তাকে অপরাধী ঘোষণা করা হয়। কিছুদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখার পর সে হযরতের সামনে হাজির হয় এবং সন্তানহারা পিতার করুণার উপর নিজেকে সমর্পণ করে। তার অন্যায় ছিল গুরুতর, অপরাধ ছিল বর্বরোচিত,

কিন্তু ক্ষতিটি ছিল ব্যক্তিগত। লোকটি তার অনুশোচনা ও ধর্ম গ্রহণে দৃশ্যত অকপট ছিল। হযরত তাকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদান করলেন। যে ইহুদী রমণী খায়বারে তাঁর প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং আবু জেহলের পুত্র ইকরামা যে হযরতের প্রতি তীব্র দুশমনি প্রদর্শন করত—উভয়কে তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদান করেছিলেন।

খ্রীষ্টান বেদুইনদের একটি গোত্র বণী কালব দুমাতুল জান্দালের নিকট বাস করত। তারা লুণ্ঠন করতে করতে মদিনা রাজ্যসমূহে আবির্ভূত হল। তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ ও আইন লঙ্ঘন জনিত অনুশীলন পরিত্যাগ করার সমনসহ তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। যে অধিনায়ক এই ক্ষুদ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত তাকে স্মরণীয় বাক্যে উপদেশ দিলেন : "কোন ক্ষেত্রেই তোমরা প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকার আশ্রয় গ্রহণ করবে না কিংবা কোন শিশুকে হত্যা করবে না।"[১]

লুণ্ঠনকারী ও শত্রুভাবাপন্ন গোত্র ও লোকদের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানসমূহের নেতাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশে তিনি সর্বদা দুর্বলকে আঘাত না করার জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষা প্রয়োগ করতেন। বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, "আমাদের ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরিবারের অন্তরালস্থিত নিরীহ ব্যক্তিদের অবমাননা করবে না ; নারীদের অব্যাহতি দেবে ; শিশুদের কিংবা পীড়িত ব্যক্তিদের আঘাত করবে না। বাধা দান করে না এমন অধিবাসীদের গৃহ ধ্বংস করবে না ; তাদের জীবিকার অবলম্বন বিনষ্ট করবে না, তাদের ফলের গাছও নষ্ট করবে না, তাদের খেজুর গাছও স্পর্শ করবে না।" আবু বকর তাঁর নেতার অনুসরণে সেনাধ্যক্ষের উপর নির্দেশ দিলেন : "হে এজিদ, নিশ্চিত হওয়া চাই যে তুমি তোমার লোকজনদের উপর জুলুম করছ না, তাদের অস্বস্তির কারণ হচ্ছ না, আর তোমার প্রতিটি কাজে তাদের সঙ্গে

---

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯৯২। আরবের নবীর এই অধ্যাদেশকে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর কর্তৃক ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে প্রদত্ত নির্দেশের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরণকালে ইসরাইলদের নবীর হুকুমনামা তিনি তার নিকট উদ্ধৃত করেছিলেন : "এরূপে জিহোভা বলেন... এখন আমালেকদের হত্যা কর, আর তাদের যা আছে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর, তাদের কাউকে পরিত্রাণ দিও'না, নরনারী, বালক শিশু, ষাঁড় ও মেষ, উট ও গাধা নির্বিচারে সব হত্যা কর।" ১ স্যামু ১৫.৩ ; "তরুণ বৃদ্ধ, নারী-শিশু, সবাইকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা কর।" এজেক ৯.৬।

পরামর্শ করছ ও যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত কাজে যত্নবান হচ্ছ ; কেননা যারা এর অন্যথা করে তারা উন্নতি করতে পারে না। যখন তোমরা শত্রুর মোকাবিলা করবে তখন সাহসের সঙ্গে তা করবে এবং কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না। যদি তোমরা বিজয়ী হও তবে শিশু-বৃদ্ধ-নারীদের হত্যা করো না। খেজুর গাছ ধ্বংস করো না। শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দিও না। কোন ফলের গাছ কেটে ফেলো না। গবাদী পশুর কোন ক্ষতি করো না, শুধু জীবিকার প্রয়োজনে জবেহ করা ছাড়া। যখন তোমরা কোন চুক্তি সম্পাদন করো তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করো, যেমন কথা তেমন কাজ করো। তোমরা দেখবে যে কিছু সংখ্যক ধর্মপরায়ণ লোক মঠ বা আশ্রমে আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর সেবা করতে চায়। তাদেরকে তাদের পথে থাকতে দিও, তাদেরকে হত্যা করো না কিংবা তাদের মঠ ধ্বংস করোনা।"[১] এই অধ্যাদেশসমূহ সেণ্ট ল্যাক্ ট্যান্টিয়াসের সময় থেকে কভেণ্টারদের সময় পর্যন্ত ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যাণ্ট ও গ্রীক খ্রীষ্টানদের ভয়াবহ পরিবর্জনের সঙ্গে অদ্ভুত বৈপরীত্যপূর্ণ।[২] "শান্তির যুবরাজের" অনুসারীরা সম্প্রতিকাল পর্যন্ত বিবেকের দংশন ব্যতিরেকে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও এলোপাথাড়ি হত্যা করেছেন, যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। আর পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি পোপ, যাজক, প্যাটিরিয়ার্ক, বিশপ, পুরোহিত ও প্রেসবিটারগণ তাদের অপরাধ অনুমোদন করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা ন্যাক্কারজনক অপরাধের জন্যও পুনঃপুনঃ সম্পূর্ণ পাপস্খলনের সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন।

এই বছর শাবান মাসে (নভেম্বর ডিসেম্বর, ৬২৭ খ্রীঃ) বণী মোস্তালিকদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরিত হয়েছিল। এই সময় পর্যন্ত এই গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে সৌহার্দের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাদের প্রধান হারিস বিন আবু দিরার[৩] কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে তাদের আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করল এবং মদিনার শহরতলী লুণ্ঠন করল। এই অভিযান সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন বন্দীকে আনা হয়েছিল তাদের মধ্যে হারিসের কন্যা জুওয়ায়রিয়া।

---

১. তুলনীয় : মিলেব 'হিস্ট্রী এব্ মোহামেডানিজম' পৃ. ৪৫, ৪৬ ; গাজিনিয়ার 'ভাই দি মোহমেদ'।

২. মাঞ্চুরিয়ার ব্লাগোভেস্টচেকে ৫০০০ হাজার চীনা নরনারীশিশুকে বিংশ শতাব্দীতে বিপুল খ্রীষ্টান শক্তির সেনাবাহিনী হত্যা করে, একথা বলাই বাহুল্য।

৩. ض—দিয়ে লিখিত ; ইবনে হিশাম, পৃ. ৭২৫ ; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

ছয় বছর হল মক্কার মুহাযিরগণ তাদের দেশ ও ভিটামাটি ত্যাগ করেছিলেন তাদের ধর্মের জন্য ও তাঁর জন্য যিনি তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন যা তাদের মধ্যে কোনদিন অনুভূত হয়নি। তাদের মধ্যে জাগ্রত করেছিলেন ঐক্য, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব। আরবের প্রত্যেক অংশ থেকে মানুষ এই বিস্ময়কর ব্যক্তির কথা শ্রবণ করার জন্য, প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজে পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁর নিকট আসতে লাগল, যেমন অতীতে বণী ইসরাইলগণ পয়গম্বর ইসমাইলের সঙ্গে আলোচনা করত।[১]

এই সব মুহাযিরের হৃদয় তখনও জন্মভূমির জন্য কাঁদত। গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাঁরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শহরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাঁরা পবিত্র কাবাগৃহের সীমানা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল—এই কাবাগৃহ ছিল তাঁদের সকল সমষ্টিগত সম্পর্কের গৌরবময় কেন্দ্র—এই স্থানটিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস সঞ্চিত হয়েছিল। ছয় বছর ধরে এই পবিত্র গৃহের তীর্থদর্শন থেকে তাঁরা বঞ্চিত ছিল। প্রাচীন ঐতিহ্য-সহকারে কাবাগৃহের জিয়ারত বা দর্শনকে পবিত্রতার আলোকমালায় সুশোভিত করেছে। হযরত নিজেও জন্মভূমি দর্শনের জন্য প্রবল ইচ্ছা অনুভব করছিলেন। কাবাগৃহ সমগ্র আরবজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। কোরাইশগণ এই পবিত্র গৃহের অভিভাবক ছিল মাত্র। তারা দেশীয় আইন অনুসারে এমন কি একজন শত্রুর আগমনও নিবারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়নি, যদি সে ব্যক্তি কোনরূপ শত্রুতামূলক অভিসন্ধি প্রদর্শন না করত এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালনের প্রকাশ্য স্বীকৃতি ঘোষণা করত।[২]

হজের মৌসুম নিকটবর্তী হল; সেই মোতাবিক হযরত কাবাগৃহ জিয়ারতের অভিপ্রায় ঘোষণা করলেন। একথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে অযুত কণ্ঠে সম্মতি ধ্বনিত হল। দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়া হল; সাত শত মুসলমান সম্পূর্ণরূপে মুসলিম মুহাযির ও আনসার সমভিব্যহারে হযরত হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।[৩] কেরাইশদের শত্রুতা কিন্তু নির্বাপিত হয়নি। মুসলমানদের পথরোধ করার জন্য মক্কায় প্রবেশের কয়েক মাইল দূরেই তারা এক বিশাল সেনাবাহিনীর সমাবেশ করল। মক্কায় প্রবেশের প্রত্যেকটি পথ বন্ধ করার

---

১. স্টেনলী, "লেকচারস অন্ জিউইশ চার্চ, ১ম খণ্ড।

২. তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪; কাসন দ্য পার্সিভেল ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪, ১৭৫।

৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৪০; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২। আবুল ফিদা পৃ. ৬০ তাঁর মতে এই সংখ্যা ছিল ১৪০০ শত।

জন্য তারা পিছনে হটে এল। তারা কঠিনভাবে শপথ গ্রহণ করল যে তারা হযরতের অনুসারীদের কাবাগৃহে প্রবেশ করতে দেবে না এবং কাবাগৃহে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে যে দূতকে তাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল তার সঙ্গে তারা অসদ্ব্যবহার করল। একদল মক্কাবাসী হযরতের তাবুর চারপাশ দিয়ে পরিভ্রমণ করতে থাকল উদ্দেশ্য কোন মুসলমান অসতর্ক অবস্থায় বহির্গত হলে তাকে হত্যা করা। এমন কি তারা পাথর ও তীর দিয়ে হযরতকে আক্রমণ করল।[১] পৌত্তলিকদের অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে, আর মুসলমান ও কোরাইশদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বন্ধ করার জন্য মুহম্মদ মক্কাবাসীরা যে শর্ত আরোপ করতে চায় তাতেই তিনি সম্মত হতে রাজী হলেন। অনেক অসুবিধার পর একটি সন্ধি চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল। উভয়পক্ষের স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ইতিহাসে **হোদাবিয়ার সন্ধি** নামে খ্যাত। এতে উভয় পক্ষ সম্মত হল যে দশ বছরের জন্য শত্রুতা বন্ধ থাকবে; যারা অভিভাবক বা প্রধানদের সম্মতি ব্যতিরেকে কোরাইশদের পক্ষ থেকে মুহম্মদের দলভুক্ত হবে তাদেরকে পৌত্তলিকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে; মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কেউ মক্কাবাসীদের নিকট ফিরে যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না; কোন গোত্র যদি কোরাইশ কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় তবে বাধামুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে তা করতে পারবে; এ বছর মুসলমানদেরকে হজব্রত পালন না করেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে; তাদেরকে পরবর্তী বছর মক্কার কাবাগৃহ দর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় তীর্থযাত্রীর অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে "কোশবদ্ধ অবস্থায়" তিন দিনের জন্য মক্কায় থাকতে পারবে।[২]

---

১. যখন এসব লোকদের কয়েকজনকে ধৃত অবস্থায় হযরতের সম্মুখে আনয়ন করা হল তিনি তাদেরকে ক্ষমা করলেন ও মুক্ত করে দিলেন। ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৪৫। এই উপলক্ষে মুসলমানেরা যে শপথ নেন তা "বায়াতুর রিদওয়ান" বা "বায়াতুস্ শাজারা"। কাবাগৃহ পরিদর্শনের অনুমতির জন্য একই অনুরোধসহ ওসমানকে পাঠানো হয়েছিল, তারা তাঁকে ধরে আটক রাখল। ওসমান নিহত হয়েছেন, এই আশঙ্কা করে তারা হযরতের চারপাশে সমবেত হল এবং তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করল। ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৪৬; কোরআ., সূ. ৪৮ আ. ১৭; তু: মুয়িরের ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২।

২. সিলাহ উর রাকিব। ইবনে হিশাম পৃ. ৭৪৭; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬। মিশকাত, বাব—১৭, পরিচ্ছেদ-১০, অংশ-১। এই সন্ধি উপলক্ষে একজন কোরাইশ দূত যিনি মুসমলানদের তাবুতে গমন করেছিলেন তিনি মুহম্মদের

এই সন্ধিস্থাপনে মুহম্মদ কর্তৃক যে সংযম ও উদারতা প্রদর্শিত হয়েছিল তা তাঁর সর্বাধিক আবেগপ্রবণ শিষ্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল; তাঁদের হৃদয়ে কোরাইশদের দ্বারা অনুষ্ঠিত আঘাত ও নির্মমতা তখনও তুষের আগুনের মতো দহন করছিল। সন্ধির তৃতীয় শর্তের বদৌলতে, যার দ্বারা মুসলমানেরা অভিভাবক বা প্রধানের বিনানুমতিতে যাঁরা মুসলমানদের দলভুক্ত হয়েছিল তাঁদের কোরাইশদের প্রত্যার্পণ করতে বাধ্য ছিলেন, কোরাইশগণ হযরতের কয়েকজন শিষ্যকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দাবী করল; কিছু কিছু মুসলমানদের আপত্তির মৃদু গুঞ্জন সত্ত্বেও মুহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাদের দাবী মেনে নিলেন।[১]

তাঁর প্রচারিত ধর্ম সর্বমানবের কাছে পৌঁছবে—যে উদার বাসনা দ্বারা মুহম্মদ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার অনুসরণে[২] তিনি প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ ও তাদের প্রজাকুলকে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণের জন্য কতিপয় দূত পাঠিয়ে আহ্বান করেছিলেন। দু'জন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রীক-সম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য-সম্রাট খসরু পরাভেজের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। মক্কার একজন দেশত্যাগী সমতার ভিত্তিতে তাঁকে মহান খসরু বলে অভিহিত করার স্পর্ধার জন্য সম্রাট খসরু বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁর পত্রের ঔদ্ধত্যের জন্য ক্রোধান্বিত হন, পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং ঘৃণার সঙ্গে দূতকে তাড়িয়ে দেন। যখন এই আচরণের খবর হযরতকে বলা হল তিনি শান্তভাবে মন্তব্য করলেন "এরূপে খসরুর সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে।"[৩] এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খোদিত হয়ে আছে। হিরাক্লিয়াস ছিলেন অধিকতর নম্র ও শ্রদ্ধাবান; তিনি দূতকে

প্রতি শিষ্যদের সুগভীর সম্মান ও ভালবাসা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন এবং কোরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি খসরু, কায়সার ও নজ্জাসীর মতো রাজকীয় জাকজমকপূর্ণ নৃপতি দেখেছেন, কিন্তু মুহম্মদের মতো কোন নৃপতি দেখেন নি যিনি তাঁর অধীনস্থদের নিকট থেকে এত অধিক সম্মান ও আনুগত্য পেয়ে থাকেন।—ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৪৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭; এবং আবুল ফেদা, পৃ. ৬১।

১. যেহেতু সন্ধির মধ্যে নারীদের অন্তর্ভুক্তি ছিল না, সুতরাং মুসলীম নারীদের প্রত্যার্পণ করার জন্য পৌত্তালিকদের যে দাবী তা চূড়ান্তরূপে প্রত্যাখ্যাত হল।

২. কোরআন, সূ. ৭ আ. ১৫৭, ১৫৮।

৩. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩, ১৬৪।

প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং পত্রের একটি সদয় ও সযত্ন উত্তর প্রদান করলেন। সিরিয়া ত্যাগর পূর্বে তিনি পত্রপ্রেরক ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হলেন। কথিত আছে, এই উদ্দেশ্যে তিনি আরবদেশ থেকে আগত গাজাতে উপস্থিত একটি কাফেলার কয়েক-জন আরব ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে ছিল পাপিষ্ঠ আবু সুফিয়ান, তখনও ইসলামের চরমতম দুশমন। প্রতীয়মান হয় গ্রীক সম্রাট তাকে হযরত মুহম্মদ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তার প্রদত্ত উত্তর যা হাদিসে সংরক্ষিত হয়ে আছে তা জাফর নাজ্জাসী সমীপে মুহম্মদের শিক্ষা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি মতবাদ মুহম্মদ উপস্থাপিত করছে?" "তিনি আমাদেরকে আমাদের পুরাতন মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে এবং এক আল্লাহর উপাসনা করতে বলছেন; তিনি গরীবদুঃখীকে সাহায্য করতে, সত্য ও সুচিতার অনুশীলন করতে, ব্যাভিচার, পাপ ও মানুষকে ঘৃণা করা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।" তাঁর শিষ্যসংখ্যা বাড়ছে কিংবা কমছে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর এল!" তাঁর শিষ্যসংখ্যা বিরামহীনভাবে বেড়ে চলেছে এবং তাঁর একজন শিষ্যও তাঁকে পরিত্যাগ করেনি।"

শীঘ্রই দামেস্কের নিকটবর্তী বসরায় অবস্থানকারী হিরাক্লিয়াসের জায়গীর ভোগী গাসানিয়া যুবরাজের নিকট অপর একজন দূত প্রেরিত হল। একজন দূতের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার পরিবর্তে একই পরিবারের অপর একজন প্রধান এবং বাইজানটাইনদের অধীন একটি খ্রীষ্টান গোত্রের আমির তাকে হত্যা করল। আন্তর্জাতিক বাধ্যতাবোধের উপর এই যথেচ্ছ প্রকাশ্য অত্যাচার ও অবমাননার ঘটনা ক্রমে সেই যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা ইসলামকে সমগ্র খ্রীষ্টান জগতের সঙ্গে লিপ্ত করেছিল। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামের ব্যাপক প্রসার

তাঁর চরিত্র ও স্বভাবে মহত্ত্ব যা আছে
স্তুতিকারীর বাসনা কেমনে সেথা পৌঁছে।

ইহুদী গোত্রসমূহ অনেক বিপর্যয় সত্ত্বেও প্রবল ছিল—এখনও তারা মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্রে মশগুল ছিল। মদিনার উত্তর-পূর্বে তিন বা চার দিনের দূরত্বে তাদের সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত একটি রাজ্য ছিল। এখানে অনেকগুলি দুর্গ ছিল, আলকামুস ছিল তাদের মধ্যে প্রধান—এটা প্রায় অগম্য পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। এই দুর্গগুলি 'খায়বার' নামে অভিহিত ছিল—শব্দটির অর্থ একটি সুরক্ষিত স্থান। খায়বারের অধিবাসীরা বণী নাজির ও বণী কোরাইজা গোত্রের লোক ছিল—তারা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। খায়বারের ইহুদীরা মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও দুর্দমনীয় বিদ্বেষ প্রদর্শন করত এবং তাদের সমগোত্রীয় লোকদের আগমনে এই অনুভূতি একটি প্রবল শক্তিতে রূপান্তরিত হল। খায়বারের ইহুদীরা একটি প্রাচীন চুক্তির মাধ্যমে বণী গাতাফানদের বেদুইন দল ও অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হল এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত দল গঠনের চেষ্টা চালাতে লাগল।[১] মুসলমানেরা তাদের ক্ষতিসাধনকারী শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং মদিনার বিরুদ্ধে অপর একটি সম্মেলনের কুফল এড়ানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছিল। সেই মোতাবেক এই বছরের মহরম মাসের প্রথম দিকে চোদ্দ শত মানুষের এক বাহিনী খায়বারের বিরুদ্ধে প্রেরিত হল। ইহুদীরা তখন তাদের মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করল। বণী ফিজারগণ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসল কিন্তু তারা এই আশঙ্কায় ভীত হল যে মুসলমানেরা তাদের আক্রমণ করতে পারে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের গবাদী পশুর দল নিয়ে নিতে পারে—এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে তারা দ্রুত পশ্চাদাপসরণ

৭ হিজরী=১২ই এপ্রিল ৬২৮ খ্রী.—১লা মে ৬২৯ খ্রী.

---

১. কসিন দ্য পার্সিভেল ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩, ১৯৪।

করল। এভাবে কেবল ইহুদীরাই যুদ্ধের ঝক্কি নেওয়ার জন্য অবশিষ্ট রইল। মুসলমানেরা তাদের নিকট সন্ধির শর্তাদি প্রদান করলেন কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল। ইহুদীদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও একটির পর একটি দুর্গ নতি স্বীকার করতে লাগল। অবশেষে আসল সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গ আল্-কামুসের পালা। প্রাণবন্ত, রক্ষণাত্মক প্রয়াসের পর দুর্গটি মুসলমানদের করতলগত হল। এই প্রধান দুর্গের দুর্ভাগ্য অন্যান্য ইহুদী নগরের অধিকতর প্রতিরোধের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করল। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং ক্ষমা পেল। তাদেরকে তাদের জমিজমা ও স্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখলের নিশ্চয়তা প্রদান করা হল (সদাচরণের উপর) এবং এই সঙ্গে নিজস্ব ধর্ম আচরণের স্বাধীনতাও দেওয়া হল। যেহেতু তারা নিয়মিত করসমূহ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে কাজেই এখন থেকে প্রজাতন্ত্রের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ভোগের জন্য হযরত তাদের উপর প্রজাতন্ত্র-কর আরোপ করলেন—এই করের পরিমাণ উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক। দুর্গমধ্যে যে সব অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া গেল যা যুদ্ধে ও অবরোধের ফলে হ্রাস পেয়েছিল তা সেনাবাহিনী বাজেয়াপ্ত করল এবং সৈন্যদের মধ্যে হাতিয়ার অনুসারে বণ্টন করা হল। অশ্বারোহী সৈন্যরা তিনি ভাগ এবং পদাতিক সৈন্যরা এক ভাগ পেল।[১]

হিজরী সপ্তম বর্ষের শেষের দিকে মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ কোরাইশ-দের সঙ্গে তাদের সন্ধি অনুসারে তাদের হৃদয়ের বাঞ্ছা[২]—পবিত্র কাবাগৃহ-সহ অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহ দর্শনার্থে হজব্রত উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৬৪ ও ৭৭৩; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯। কিনানা গুপ্ত ধনভাণ্ডারের ফাঁস করে দিয়েছিলেন বলে তার উপরে অত্যাচার করা হয়েছিল—এই গল্পটি সত্য নয়। হত্যা করার জন্য পুনঃপুনঃ প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। খায়বারে প্রবেশের পর এক ইহুদী রমণী প্রাচীনকালের জুডিথ বা বিশ্বাস-ঘাতকদের মতো হযরত ও তাঁর কতিপয় শিষ্যের দিকে বিষাক্ত খাদ্য এগিয়ে দিল। সে আহার্যের কয়েক মুষ্টি ভক্ষণের পরই একজন শিষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হল। হযরতের জীবন রক্ষা পেল, কিন্তু বিষের ক্রিয়া তাঁর শরীরের গভীরে প্রবেশ করল এবং পরবর্তীকালে তিনি এই বিষক্রিয়ার ফলে মারাত্মকভাবে ভুগেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। এই অপরাধ সত্ত্বেও হযরত মহিলাটিকে ক্ষমা করলেন এবং তাকে তার লোকদের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় বাস করার অনুমতি দিলেন; তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০।

২. কোরআন, সু. ৪৮ আয়াত ২৭।

নিলেন। মুসলমানদের ইতিহাসে এই যাত্রা সশ্রদ্ধ "তীর্থদর্শন কিংবা কৃতকার্যতার দর্শন" নামে অভিহিত হয়ে থাকে।[১] ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ২০০০ মুসলমান সমভিব্যহারে হযরত ওমরা হজ প্রতিপালনের জন্য মক্কায় উপস্থিত হলেন। মুসলমান তীর্থযাত্রী সবাইকে এই নিয়মাবলী পালন করতে হয়। এই সব তীর্থযাত্রীদেরকে কোরাইশদের কিছুই বলার ছিল না, আলোচনা করারও কিছুই ছিল না। যে তিনদিন ধরে উৎসব চলেছিল তারা নগর খালি করে দিয়েছিল এবং প্রতিবেশীর অট্টালিকার ছাদ থেকে তারা মুসলমানদের হজ বিধি পালন অবলোকন করতে লাগল। অবচেতন মনের শিহরণ নিয়ে মূয়ির বলেন, "এই দৃশ্য নিশ্চয়ই এক বিস্ময়কর অপরিচিত দৃশ্য যা মক্কার উপত্যকায় দৃশ্যমান হল—পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্যদৃশ্য। প্রাচীন শহরটি তিন দিনের জন্য খালি করে দেওয়া হল, উচ্চ-নীচ সকলে বাসগৃহ ত্যাগ করল—বাসগৃহসমূহ পরিত্যক্ত হল। গৃহবাসীরা নিক্রান্ত হওয়ার পর নির্বাসিত ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা যাঁরা দীর্ঘদিন তাদের বাসভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন তাঁরা বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে তাঁদের মিত্রদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের দীর্ঘপরিত্যক্ত গৃহসমূহ পুনঃদর্শন করলেন, বরাদ্দকৃত অল্প জায়গাতে হজের নিয়মাবলী পালন করলেন। বাইরের অধিবাসীরা চতুর্দিকের উচ্চস্থানসমূহে আরোহণ করল, তাঁবুতে কিংবা পর্বত ও সংকীর্ণ উপত্যকায় আশ্রয় নিল ; আবু কুবের ঝুলন্ত চূড়ায় সমবেত হল ও সেখান থেকে নিম্নে দর্শনার্থীদের গতিবিধি অবলোকন করতে লাগল—হযরতের নেতৃত্বে তীর্থযাত্রীদের কাবা প্রদক্ষিণ ও এস্-সাফা ও মারওয়ার ক্ষিপ্র মিছিল লক্ষ্য করল ; তারা উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের অবয়ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরিপ করতে লাগল যদি সহসা তাদের দীর্ঘদিনের হারানো কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চিনতে পারে। এ ধরনের দৃশ্য শুধু ইসলাম যে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল তা দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল।"[২] সন্ধির শর্তাবলীর সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে তিন দিন পরেই তাঁরা মক্কা ত্যাগ করলেন। মুসলমানদের দিবাস্বপ্নের এই শান্তিপূর্ণ সার্থকতা কোরাইশদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। যে আত্মসংযম ও অঙ্গীকৃত নীতির প্রতি বিবেকসম্পন্ন শ্রদ্ধাবোধ মুসলমানেরা দেখিয়েছিলেন তা

১. উম্‌রাতুল কায়া।
২. মূয়ির, লাইফ অব মুহমেট, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০২

ইসলামের শত্রুদের মধ্যে দৃশ্যতঃ বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। কোরাইশদের মধ্যে যারা হযরতের প্রতি অত্যন্ত বিরোধী ছিল তাদের অনেকেই পদমর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি, যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাকে ঘৃণা করেছে, তারা মুহম্মদের দয়া ও মহানুভবতা যা তাঁর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সকল অপরাধ উপেক্ষা করেছিল তাতে অভিভূত হয়ে পড়ল ও ইসলাম গ্রহণ করল।[১]

গ্রীক সম্রাটের জায়গীরভোগী কর্তৃক মুসলিম দূত নিধন এমন একটি প্রকাশ্য অবমাননা যা নীরবে বা শাস্তিবিহীন অবস্থায় যেতে পারে না। গাসানিয়া যুবরাজের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার জন্য তিন সহস্র সৈন্যের একটি অভিযান প্রেরিত হল।[২] বাইজানটাইন সম্রাটের সেনাধ্যক্ষরা অপরাধ অস্বীকার করার পরিবর্তে তা গ্রহণ করল এবং গোলমালটিকে রাজকীয় পর্যায়ে উন্নীত করল। সৈন্যসামন্ত ঐক্যবদ্ধ করে তারা সিরিয়ার বলখ থেকে দূরে নয় এমন একটি গ্রাম যেখানে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার নিকটবর্তী স্থানে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করল। বাইজানটাইন ও তাদের মিত্রদের প্রতিহত করা হল; কিন্তু দু'দলের মধ্যে সংখ্যা বৈষম্য ছিল প্রকাণ্ড, ফলে মুসলমানেরা মদিনায় প্রত্যাবর্তন করল।[৩]

প্রায় এই সময়ে কোরাইশ ও তাদের মিত্র বণী বকররা হোদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত লঙ্ঘন করে বণী খোজাদের আক্রমণ করল। বণী খোজাগণ মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণে ও চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তারা বণী খোজাদের বেশ কিছু লোক হত্যা করল এবং বাকী লোকদেরকে তাড়িয়ে দিল। বণী খোজাগণ মুহম্মদের নিকট অভিযোগ করল ও তাঁর কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করল। দীর্ঘদিন ধরে মক্কায় অবিচার ও অত্যাচারের

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ খালিদ বিন ওয়ালিদ যিনি ওহোদ যুদ্ধে কোরাইশদের অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন এবং আমর ইবনে আল আউস যিনি আম্রত নামে প্রসিদ্ধ।

২. কসিন দ্য পার্সিভেলের মতে এই দলনেতা আমরের পুত্র সুরাহবিল (এবং আবুল ফিদা বলেছেন শুরাহবিলের পুত্র আমর—একথা ঠিক নয়।)—২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩ এবং ৩য় খণ্ড পৃ. ২১১।

৩. কসিন দ্য পার্সিভেল ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮-১৮০। এই যুদ্ধে জায়েদ বিন হারিস যিনি মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি, মুহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র জাফর এবং আরও কয়েকজন বিখ্যাত লোক নিহত হয়েছিলেন।

রাজত্ব চলছিল। মক্কাবাসীরা নিজেরা সন্ধি ভঙ্গ করেছিল এবং তাদের কিছু সংখ্যক নেতা বণী খোজাদের ধ্বংস সাধনে অংশগ্রহণ করেছিল। হযরত অবিলম্বে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে দশ সহস্র লোক পাঠালেন। ইকরামা[১] ও সাফওয়ান[২] তাদের গোত্রপ্রধান হিসেবে সামান্য প্রতিরোধ করেছিল তাতে কিছুসংখ্যক মুসলমান শাহাদৎ বরণ করেছিলেন। এছাড়া প্রায় বিনা প্রতিরোধেই মুহম্মদ মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

এরূপে অবশেষে মুহম্মদ বিজেতা হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। যিনি ছিলেন একদা দেশত্যাগী ও মজলুম তিনিই এবার করুণা প্রদর্শন করে তাঁর মহান কর্মপরিকল্পনা প্রমাণ করতে এলেন। যে মহানগরী একদিন তাঁর প্রতি নির্মম আচরণ করেছিল, তাঁকে ও তাঁর বিশ্বাসী দলকে বিদেশ বিভুঁয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যে শহর তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তা আজ তাঁর পদতলে। তাঁর পুরাতন বিক্রমশালী ও নিষ্ঠুর জুলুমকারীরা যারা নির্দোষ নরনারীর উপর, এমনকি প্রাণহীন মৃতের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে মনুষ্যত্বের অপমান করেছিল তারা আজ সম্পূর্ণরূপে তাঁর করুণার ভিখারী। কিন্তু বিজয়-মুহূর্তে তিনি সব অনিষ্ঠের ব্যথা বিস্মৃত হলেন, সব আঘাত ক্ষমা করে দিলেন, আর সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমা মঞ্জুর করলেন। যখন তিনি তাঁর তীব্রতম শত্রুদের শহরে প্রবেশ করলেন তখন মাত্র চারজন অপরাধী যারা ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ডে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের নামই শুধু মুহম্মদের দণ্ডাজ্ঞার তালিকায় স্থান পেল। সেনাবাহিনী তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল, তারা শান্তভাবে ও শান্তির সঙ্গে প্রবেশ করল, কোন গৃহ লুণ্ঠিত হল না, কোন নারীও লাঞ্ছিত হল না। সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বলা হয়েছে যে বিজয় অভিযানের ইতিহাসে এই ধরনের সফলকাম প্রবেশ আর দেখা যায়নি। কিন্তু জাতীয় মূর্তিসমূহ নির্দয়ভাবে ধূলিসাৎ করা হল। দুঃখের সঙ্গে পৌত্তলিকগণ চারিদিকে দাঁড়িয়ে তাদের উপাস্য মূর্তি-গুলির অধঃপতন নিরীক্ষণ করতে লাগল। তখন তাদের কাছে সত্য প্রতিভাত হল, তারা অভ্যস্ত কণ্ঠে সেই পুরাতন ধ্বনি শুনতে পেল যা তারা একদিন ব্যঙ্গ করত যখন তিনি মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলতে ফেলতে

১. আবু জেহলের পুত্র, যে আবু জেহল বদর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিল।
. উম্মাইয়ার পুত্র।

বললেন : "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত ; মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী" [১] ; তাদের দেবদেবী কতই না শক্তিহীন !

এ সব প্রাচীন মূর্তি ধ্বংস করে ও পৌত্তলিক বিধি দূরীভূত করে মুহম্মদ সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি কোরআনের ভাষায় প্রথমত মানবজাতির স্বাভাবিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন এবং তারপর নিম্নোক্তরূপে বলতে লাগলেন, "হে কোরাইশ বংশোদ্ভূতগণ, আমি তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব বলে তোমরা মনে কর ?" তারা উত্তর করল, "হে দয়ালু ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র আমরা তোমার নিকট থেকে করুণা ও সহানুভূতি চাই।"[২] তাবারী বললেন যে এ কথা শ্রবণ করে হযরতের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং তিনি বললেন, "ইউসুফ তাঁর ভ্রাতাদের যেরূপ বলেছিলেন আমিও তেমনিভাবে তোমাদের বলব, "আমি আজ তোমাদের তিরস্কার করব না ; আল্লাহ 'তোমাদের ক্ষমা করবেন।' আল্লাহ সবচেয়ে দয়ালু ও সহানুভুতিশীল।"[৩]

এসময়ে এমন একটি দৃশ্যের অবতারণা হল পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা নেই। দলে দলে সবাই মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। সাফা-পর্বতের উপর বসে তিনি পুরাতন শপথনামা মদিনাবাসীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন : "তারা কোন বস্তুর উপাসনা করবে না ; তারা চুরি, ব্যভিচার, কিংবা শিশুহত্যা করবে না ; তারা মিথ্যা বলবে না কিংবা নারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে না।"[৪]

এভাবে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করল। "আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় যখন এসে পড়ল। আর আপনি দেখে নিলেন : লোকজন দলে দলে আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থায় দাখিল হচ্ছে। সুতরাং আপনি নিজ পালনকর্তার প্রশংসায় তসবীহ পাঠ করতে থাকুন, আর তাঁর কাছেই ক্ষমা চাইতে থাকুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা মঞ্জুর-কারী।"[৫] এখন মুহম্মদ দেখলেন যে তিনি যে মহান পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হল। মরুভূমির দুর্ধর্ষ

---

১. কোরআন, সূ. ১৭ আ. ৮৩ ; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২।
২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৮২১ ; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।
৩. কোরআন, সূ. ১২ আ. ৩১।
৪. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২ ; কসিন দ্য পার্সিভেল ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।
৫. কোরআন, সূ. ১১০। তু : জামাক্শারী (কাশ্শাফ) মিশর সং. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯০, ৪৯১।

গোত্রগুলোকে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আহ্বান করার জন্য তাঁর প্রধান শিষ্যবৃন্দকে তিনি বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করলেন এবং শান্তি ও শুভেচ্ছা প্রচারের কঠোর নির্দেশাবলী দিলেন। কেবল আক্রমণের বেলায় তারা আত্মরক্ষা করবে। এই নির্দেশাবলী শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আনুগত্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিল। খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্যগণ এই দুর্ধর্ষ ও নব্য ধর্মান্তরিত সেনাধ্যক্ষের আদেশে বিরোধী সৈন্য মনে করে বণী যাজিম[১] বেদুইনদের কয়েকজনকে হত্যা করেছিল, কিন্তু অন্যান্য মুসলমানরা বাধা দেওয়ায় তারা নিবৃত্ত হয়। এই অপ্রত্যাশিত রক্ত-পাতে হযরত গভীরভাবে ব্যথিত হন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে কেঁদে ফেলেন, "হে প্রভু, খালিদ যা করেছে সে বিষয়ে আমি নির্দোষ।" তিনি তৎক্ষণাৎ আলীকে পাঠিয়ে বণী যাজিমদের প্রতি সম্ভাব্য সব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলেন। আলীর স্বভাবের সঙ্গে এই ধরনের দায়িত্ব পালন অনুকূল ছিল এবং তিনি তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। তিনি সযত্নে খালিদ কর্তৃক নিহত লোকদের সংখ্যা, তাদের পদমর্যদা এবং তাদের পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করলেন এবং সঠিক-ভাবে 'দিয়াত' প্রদান করলেন। ক্ষতিপূরণ শেষে অবশিষ্ট যে অর্থ বেঁচে গেল তা তিনি নিহতদের আত্মীয়স্বজন ও গোত্রের অন্যান্য লোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। ঐতিহাসিক বলেন যে প্রত্যেকেই তাঁর কোমলতা ও উদারতা দ্বারা আনন্দিত হয়েছিল। সমগ্র গোত্রের শুভেচ্ছা নিয়ে আলী হযরতের নিকট ফিরে গেলেন। হযরত তাঁর কার্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাকে ধন্যবাদ ও প্রশংসায় বিভূষিত করলেন।[২]

হাওয়াজিন, সাকিফ[৩] ও অন্যান্য শক্তিশালী বেদুইন গোত্রগুলো মক্কার সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহে তাদের গবাদী চরাত; তাদের কোন কোন গোত্রের, তায়েফের মতো সুরক্ষিত শহর ছিল; তারা বিনা বাধায় মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা এই উদ্দেশ্যে একটি সঙ্ঘবদ্ধ সৈন্যদল গঠন করল যাতে মুহম্মদ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিহত করার পূর্বেই তাকে পর্যুদস্ত করা। যা হোক, মুহম্মদের সতর্কতা তাদেরকে

১. ذ (যাল) দিয়ে।
২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৮৩৪, ৮৩৫ ; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫ ; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১।
৩. ث (সা)দিয়ে।

হতাশ করে দিল। মক্কার প্রায় দশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে গভীর ও সংকীর্ণ গিরিবর্ত হুনায়েনের[১] নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধের পর পৌত্তলিকগণ প্রভূত ক্ষতিসহকারে পরাভূত হল।[২] শত্রুদের একটি দল, যারা সাকিফ গোত্রের লোক তাদের সৈন্যসামন্ত বিচ্ছিন্ন করে তায়েফ শহরে আশ্রয় নিল। আট-নয় বছর পূর্বে এই তায়েফের লোকেরা হযরতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বাকী সব আউতাস উপত্যকায় সুরক্ষিত শিবিরে পালিয়ে গেল। এটা বাধ্য করা হয়েছিল; হাওয়াজিন পরিবারসমূহ তাদের পার্থিব ফলাফল—গবাদী পশুপালসহ মুসলমানদের করতলগত হল। তারপর তায়েফ অবরোধ করা হল, কিন্তু কয়েকদিন পর মুহম্মদ অবরোধ তুলে নিলেন কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সে অবস্থার চাপে তায়েফবাসীরা শীঘ্রই বিনা রক্তে আত্মসমর্পণ করবে। সেখানে আটককৃত হাওয়াজিনদেরকে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল সেখানে ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে এই শক্তিশালী গোত্র থেকে তাঁর কাছে একটি প্রতিনিধি দল এসে তার আগমনের প্রতীক্ষা করছে, তাদের পরিবার-পরিজনদের ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে। নিজেদের অধিকার-সচেতনতা সম্পর্কে আরবদের স্বভাবসংবেদতা হযরত অবহিত ছিলেন, তাই তিনি বেদুইন প্রতিনিধিদের বললেন যে তিনি তাঁর লোকজনদের বিজয়ের সমুদয় ফলাফল পরিত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারবেন না; কাজেই যদি তারা তাদের পরিবার-পরিজনদের ফিরে পেতে চায় তবে অন্ততঃপক্ষে তাদের দ্রব্যসম্ভার দণ্ড দিতে হবে। এতে তারা সম্মত হল, এবং পরদিন মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ যখন জোহরের নামাজ পড়ছিলেন[৩] তখন তারা এসে একই অনুরোধ করল :

"আমাদের নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে আমরা হযরতকে মুসলমানদের সঙ্গে এবং মুসলমানদেরকে হযরতের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।" প্রতিনিধিদেরকে হযরত জবাব দিলেন,

---

১. কসিন দ্য পার্সিভেল ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮। 'কামুস' গ্রন্থে হুনায়েন মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী পথমধ্যে অবস্থিত বলে অভিহিত হয়ে থাকে। 'মুজামুল বুলদানে' মক্কা ও হুনায়েনের (জুল মাজাজের দক্ষিণে অবস্থিত) দূরত্ব তিন রাত্রির পথ বলে প্রদত্ত হয়েছে।—৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫।

২. এই যুদ্ধের কথা কোরআনের সু. ৯ আ. ২৫, ২৬ এ উল্লিখিত হয়েছে, ইবনে হিশাম পৃ. ৮৪০; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২০০, ২০১।

৩. তাবারী ফজরের নামাজের কথা বলেছেন—৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

“আমার এবং আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রদের ভাগে যে সব বন্দী পড়েছে আমি এই মুহূর্তে তাদেরকে মুক্তি দিলাম।” হযরতের শিষ্যবৃন্দ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল এবং এক মুহূর্তে ছয় হাজার বন্দী মুক্তি লাভ করল।[১] এই মহানুভবতা অনেক সাকিফদের[২] অন্তর জয় করল, তারা আনুগত্য স্বীকার করল ও অনুরাগী মুসলমানে পরিণত হল। হাওয়াজিনদের বাজেয়াপ্ত গবাদী বণ্টনের পরে যে ঘটনা ঘটল তা মদিনাবাসীদের হৃদয়ের উপর হযরতের কতটুকু অধিকার আছে এবং কিরূপ অনুরাগ তিনি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সেটাই শুধু নির্দেশ করে না, বরং এ কথাও প্রমাণ করে যে তাঁর জীবনের কোন পর্যায়েই তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য কোন পার্থিব পুরস্কার প্রদান করেননি। গণিমতের বণ্টনে বৃহদাংশ মদিনাবাসীদের চেয়ে মক্কার নব্য মুসলমানদের ভাগে পড়েছিল। কতিপয় আনসার এই কাজকে পক্ষপাতিত্বমূলক বলে বিবেচনা করলেন; তাদের অসন্তোষের কথা হযরত জানতে পেরে, তিনি তাদেরকে সমবেত হতে নির্দেশ করলেন। তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় তাদের সম্বোধন করলেন। “হে আনসারগণ, তোমরা তোমাদের মধ্যে যে আলোচনা করেছ তা আমি শুনেছি। আমি যখন তোমাদের মধ্যে এসেছিলাম তোমরা তখন অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলে এবং আল্লাহ তোমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন; তোমরা দুর্দশা ভোগ করছিলে এবং তিনি তোমাদের সুখী করেছিলেন। তোমরা যখন পরস্পরের শত্রু ছিলে তিনি তখন তোমাদের হৃদয় ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা ও ঐক্য দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। আমাকে বলো, একথা কি ঠিক নয়?” তারা উত্তর করল “হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন তা সত্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল উদারতা ও করুণার আধার।” হযরত পুনরায় বলতে লাগলেন, “না, আল্লাহর শপথ, তোমরা হয়ত সত্যই বলেছ, কেননা আমি

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৮৭৬; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, ২০৬, তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

২. তায়েফের অধিবাসীদের সাকিফ বলা হয়। মূয়িরর হযরতের জীবন পদ্ধতির অদ্ভুত দৃষ্টান্ত হিসেবে যে গল্পের (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪০) অবতারণা করেছেন তা বানোয়াট। এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথমত, গণিমতের মালের কোন বণ্টন হয়নি এবং ফলে হযরতের নিজের প্রাপ্যাংশ তিনি দান করতে পারেননি; কিন্তু তিনি হাওয়াজিনদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বণ্টনের পূর্বে অঙ্গীকার করেছিলেন। গল্পটি বানোয়াট ও নিতান্তই মূল্যহীন।

এর সত্যতা নিজেই পরখ করেছি : **'আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন যখন আপনি প্রতারক বলে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, এবং আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম; আপনি অসহায় দেশত্যাগী হিসেবে এসেছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম; আপনি দীন ও গৃহহীন অবস্থায় এসেছিলেন এবং আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম; আপনি সান্ত্বনাহীন অবস্থায় ছিলেন, আমরা আপনাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম**।' হে আনসারগণ, তোমরা কেন ইহজগতের বস্তু নিয়ে তোমাদের হৃদয় পীড়িত করবে? তোমরা কি পরিতৃপ্ত নও যে অন্যান্যরা গবাদী ও উট নিয়ে যাবে এবং তোমরা তোমাদের মধ্যে আমাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে? যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি আমি তোমাদের কখনও পরিত্যাগ করব না। যদি জগতের সব লোক এক পথে যায় এবং আনসারগণ অন্য পথে যায়, আমি নিশ্চয়ই আনসারদের সঙ্গে থাকব। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন, তাদের, তাদের সন্তান ও তাদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।" ঐতিহাসিক বলেন যে, এই কথা শ্রবণ করে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল ও তাদের শ্মশ্রু বেয়ে অশ্রুর ঢল নামল। আর তারা সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল : "হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আমাদের প্রাপ্যাংশে পরিতৃপ্ত।" অতঃপর তারা সুখী ও পরিতৃপ্ত হল।[১]

মুহম্মদ শীঘ্রই মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

১. ইবনে হিশাম পৃ. ৮৮৬; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড পৃ. ২০৮; আবুল ফিদা পৃ. ৮২।

অষ্টম অধ্যায়

প্রতিনিধি প্রেরণের বর্ষ

চেহারা ও স্বভাবে সকল নবীর অতুল তিনি
জ্ঞান আর মহত্ত্বে কেউ পারেনি তাঁরে যিনি।
ছেড়ে দাও খ্রীষ্টানেরা যা বলেছে তাদের নবীর 'পরে
তুমি বলো তোমার মনে যা আসে তব নবীর তরে।

—কাসিদাতুল বারদা॥

আমার রাসুল নূরের রবি পথের আলো
আল্লাহপাকের তরবারী, কেটে চলেন পথের কালো।

—বানাত সুয়াদ॥

নবম হিজরী স্মরণীয় হয়ে আছে মদিনায় দূতের আগমনের মাধ্যমে। এই বছর অনেক দূত মদিনায় এসে ইসলামের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বন্য বিক্রম, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও পৌত্তলিকতাসহ যে মেঘভার দেশের উপর এতদিন চেপে বসেছিল তা চিরদিনের জন্য উঠে গেল। বর্বরতার যুগের অবসান ঘটল।

মক্কা বিজয় আরবে পৌত্তলিকতার ভাগ্য চিরতরে নির্ধারণ করে দিয়েছিল। যে সব লোক তখনও লাত, মানাত ও উজ্জা প্রমুখ সুদর্শনা চন্দ্রদেবীদের ও তাদের ধর্মমত সমীহ করত তারা-এর শক্তিশালী আশ্রয়ের পতন ঘটায় জাগরিত হল। মরুবাসীদের মধ্যে মক্কার লোকেদের আত্মসমর্পণের নৈতিক ফলাফল ছিল প্রভূত। অদ্যাবধি যে সব গোত্র মুসলমানদের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন ছিল তাদের আনুগত্য ও একাত্মতা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিনিধিদল আসতে শুরু করল।[১] হযরতের প্রধান প্রধান সাহাবী ও মদিনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ তাঁর অনুরোধে তাদের গৃহে এসব দূতকে গ্রহণ করলেন এবং আরবের যুগনন্দিত আতিথেয়তার সঙ্গে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করল। বিদায়ের সময় তারা সর্বদা পাথেয়ের প্রচুর অর্থ এবং তাদের পদমর্যাদা অনুসারে অতিরিক্ত

৯ম হিজরী=২০শে এপ্রিল—৯ই এপ্রিল ৬৩১ খ্রী.

---

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯৩৪ ; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯।

উপহার পেতেন। গোত্রের সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করে সন্ধি স্বাক্ষরিত হত এবং ইসলামের খেদমতে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নব্য মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য একজন করে প্রশিক্ষক প্রেরিত হত যাতে তাদের মধ্যে থেকে পৌত্তলিকতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে যায়।

নূতন ধর্মের নিয়ন্ত্রণে মহান শিক্ষাগুরু যখন আরবের গোত্রসমূহ সংহত করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন তখনও তিনি নবোদ্ভূত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ত্রাস-সঞ্চারী বাইরের বিপদের প্রতি সচেতন ছিলেন।

বাইজানটাইনগণ এ সময়ে আরববিজয়ের স্বপ্নে বিভোর ছিল বলে মনে হয়, যা এক সময়ে রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে আরবে অভিযান প্রেরণে প্ররোচিত করেছিল।[১] পারসিকদের উপর বিজয়-সাফল্যে স্ফীত হয়ে হিরাক্লিয়াস তার রাজ্যে ফিরে গেলেন। আরবে যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছিল সে সম্পর্কে তার রাজনৈতিক দৃষ্টি অন্ধ ছিল না। আর মাত্র কয়েকজন আরবদের দ্বারা তার সেনাধ্যক্ষগণ এক প্রকাণ্ড বাহিনীর নেতা হিসেবে যেভাবে হটতে বাধ্য হয়েছিল তা তিনি সম্ভবত বিস্মৃতি হননি। সিরিয়ায় অবস্থানকালে আরব অভিযানের উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করার জন্য তিনি তার সামন্তরাজাদের নির্দেশ দিলেন। এই সুবিশাল আয়োজনের সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের মনে ভীতির সঞ্চার করল। এই সংবাদ সত্য হলে তা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের জন্য মহাবিপদের সংকেত ছিল। এই সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সম্ভাব্য সকল জায়গা থেকে স্বেচ্ছাসেবক তলব করা হল। দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি হিজাজ ও নেজদে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল, খেজুরের উৎপাদন বিপর্যস্ত হল, অনেক উষ্ট্র মারা গেল ; গ্রাম্য লোকেরা গৃহ থেকে অনেক দূরে এ ধরনের অভিযানে যোগদান করতে বহুলাংশে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। কারও কারও কাছে বছরের এই সময় যুদ্ধের জন্য অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল, এ সময়ে তাপের তীব্রতা, পথের কষ্ট এবং বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শক্তি সম্পর্কে বিস্ময়কর গল্প অনেকাংশে ভীরু প্রকৃতি লোকদের মনে ভয়ের সঞ্চার করল। অনেকে যুদ্ধে যোগদান থেকে মুক্ত থাকার দরুন আবেদন জানাল, যারা দুর্বল কিংবা অস্ত্রধারণ করতে কিংবা গৃহত্যাগ করতে নিতান্ত অপারগ এবং এমন ব্যক্তিবৃন্দ যাদের পরিবারের সদস্যদের দেখা-

১. আমি অগাস্তাসের অধীনে এলিয়াস গ্যালাসের অভিযানের ইঙ্গিত দিচ্ছি

শোনা করার মতো কেউ নেই হযরত শুধু তাদেরই আবেদন মঞ্জুর করলেন।[১]

মুনাফিকদের দুরভিসন্ধি অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অনিচ্ছাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। এটাকে অসন্তোষে পরিণত করার জন্য তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি।[২] যা'হোক হযরতের প্রধান প্রধান শিষ্য ও ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারীদের দৃষ্টান্ত ভীরুদের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করল এবং পশ্চাদপদ ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। এই উদ্দীপনা দেখতে দেখতে সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করল। চতুর্দিক থেকে চাঁদা বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতে লাগল। অভিযানের খরচের জন্য আবু বকর তাঁর সব সম্পদ দান করলেন ; ওসমান তাঁর নিজের খরচে বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবককে সজ্জিত করলেন ও তাদের খরচ বহন করলেন এবং অন্যান্য নামজাদা ও বিত্তশালী মুসলমানও মুক্ত হস্তে দান করলেন। মহিলারা তাদের অলঙ্কারাদি হযরতের কাছে পৌঁছলেন এবং রাষ্ট্রের কাজে সে-গুলোকে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত সেনা-বাহিনী সংগৃহীত হল এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ হযরত সমভিব্যবহারে সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করল।

মদিনায় তাঁর অনুপস্থিতির সময়ে তিনি আলীকে শহরের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ মুনাফিকগণ আরাফাতের পর্বত পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু তারা সেখান থেকে নীরবে পিছু হটল এবং শহরে ফিরে গেল। এখানে তারা এই সংবাদ প্রচার করল যে হযরত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভিযানের সঙ্গে নেননি কারণ তিনি এই অভিযানে বিপদের আশঙ্কা করেছেন। এই বিদ্বেষপরায়ণ গুজবে

১. এদের 'বাকাউন' বা 'ক্রন্দনকারী' বলা হত, কেননা তারা বিপদজনক শত্রুকে প্রতিরোধ করার পবিত্র প্রচেষ্টায় সামিল না হতে পারার অক্ষমতার জন্য বিব্রত বোধ করেছিল।—ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৯১ ; আল্ হালাবীর ইনসানুল উয়ুন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫।

২. মুনাফিকদের দুরভিষন্ধি কোরানের নবম সূরার ৮২ আয়াতে নিন্দিত হয়েছে। এই গুপ্তষড়যন্ত্রকারীরা জাসুমের শহরতলীর নিকটে সোয়ায়লিম নামক এক ইহুদীর গৃহে সমবেত হত। পরিশেষে এই গৃহ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে মহান শিক্ষক ভবিষদ্বাণী করেছিলেন যে প্রকৃত অনু-সারীদের কল্যাণ-প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ইসলামে সব সময়েই মুনা-ফিকদের আবির্ভাব ঘটবে।

আহত হয়ে আলী অস্ত্রধারণপূর্বক বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। সেনাবাহিনীর নাগাল পেয়ে তিনি যা শুনেছিলেন তা হযরতকে জানালেন। মুহম্মদ এটিকে একটি নীচ মিথ্যা অপবাদ বলে ঘোষণা করলেন। "আমি তোমাকে আমার খলিফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছি এবং আমার দায়িত্বে রেখে এসেছি। তাহলে তুমি তোমার কার্যস্থলে ফিরে যাও এবং আমার জনগণের কাছে আমার প্রতিনিধি হয়ে কাজ কর। হে আলী, তুমি কি তৃপ্ত নও যে হারুন মুসার কাছে যা ছিলেন তুমিও আমার কাছে তাই।"[১]

সেই মোতাবিক আলী মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

উত্তাপ ও তৃষ্ণায় সেনাবাহিনীর দুর্ভোগ হয়েছিল তীব্র। দীর্ঘ ক্লেশকর পথ অতিক্রম করে তারা মদিনা ও দামেস্কের[২] মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত তবুক নামক স্থানে উপস্থিত হলেন এবং এখানেই যাত্রা বিরতি করলেন। এখানে তারা সবিস্ময়ে ও সম্ভবত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জানতে পারলেন যে আশঙ্কিত আক্রমণটি গ্রীকদের স্বপ্ন এবং গ্রীকসম্রাট তখন দেশের নানান সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত। হযরত দেখলেন যে এই মুহূর্তে মদিনা প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য কোন আশঙ্কা নেই; কাজেই তিনি সেনা-বাহিনীকে প্রত্যাবর্তন করতে আদেশ দিলেন।[৩] তবুকে বিশ দিন প্রবাসের পর মুসলমানগণ রমজান মাসে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।[৪] সেখানে তারা নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত জল ও ভারবাহী পশুর জন্য প্রচুর আহার্য পেয়েছিলেন।

যে সব তায়েফবাসী তাদের মধ্য থেকে অপমান ও অত্যাচার করে বেচারা হযরতকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেই অবাধ্য ও কঠিন হৃদয় পৌত্তালিকদের প্রতিনিধিরা হযরতের মদিনায় প্রত্যাবর্তনকে সংকেত

---

১. ইবনে হিশাম, পৃ ৮৯৭।
শিয়াদের মতে, হযরত এই বাক্যাবলীর মধ্যে স্পষ্টত নির্দেশ করেছেন যে আলী তাঁর প্রতিনিধি হবেন

২. কসিন দ্য পার্সিভ্যাল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫, ২৮৬

৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯০৪; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫; আবুল ফিদা, পৃ. ৮৫।

৪. সি দ্য পার্সিভেলের মতে ৬৩০ খ্রীঃ-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। কোরআনের ৯র্থ অধ্যায়ে এ সব ঘটনা বিষদভাবে বিবৃত হয়েছে। তাবুকে মুহম্মদ বহু স্থানীয় নেতাদের আনুগত্য লাভ করেছিলেন।

দ্বারা জ্ঞাত করিয়েছিল। তায়েফবাসীদের নেতা, ওয়ারওয়া হোদাইবিয়ার ঘটনার পর কোরাইশদের দূত হিসেবে মক্কা গিয়েছিলেন। তিনি হযরতের কথাবার্তা ও তাঁর দয়ায় বিমুগ্ধ হয়েছিলেন; তাঁর দায়িত্বপালনের অত্যল্প কাল পরে তিনি হযরতের নিকট গিয়ে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলেন। বিপদ সম্পর্কে হযরতের পুনঃপুনঃ হুঁসিয়ারী সত্ত্বেও তিনি তার শহরের ধর্মান্ধদের মধ্যে ছুটে গেলেন, তিনি তায়েফে ফিরে গিয়ে তার পৌত্তলিকতা বর্জনের কথা ঘোষণা করলেন এবং নূতন ধর্মপ্রদত্ত কল্যাণে শরীক হওয়ার জন্য তার স্বদেশবাসীদেরকে আহ্বান জানালেন। সন্ধ্যায় পৌঁছে তিনি সাধারণ্যে তার ধর্মান্তর গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং সকলকে তার সঙ্গে যোগদান করতে আহ্বান জানালেন। পরদিন সকালে আবার তিনি তাদের প্রতি ভাষণ দিলেন। তার ভাষণ 'উজ্জা'র পুরোহিত ও উপাসকদের মধ্যে উন্মত্ততা সৃষ্টি করল এবং তারা তাকে পাথর মেরে মেরে ফেলল। তিনি মৃত্যুকালে এই কথা বলে গেলেন যে তার জাতির কল্যাণের জন্য তিনি তার প্রভুর সমীপে তার রক্ত উৎসর্গ করলেন এবং তিনি শাহাদৎ-বরণের সম্মানের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং অসিয়ত করে গেলেন হুনায়েনের যুদ্ধে যে মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন তাদের কবরের পাশে যেন তাকে কবর দেওয়া হয়।[১] জীবিতকালে তার প্রয়াসের চেয়ে মৃত্যুকালে তিনি যা বলে গিয়েছিলেন তার প্রভাব তার স্বদেশবাসীর উপর হয়েছিল প্রচণ্ড। হত্যাকারীদের হৃদয়ে শহীদের রক্ত বিশ্বাসের ফল হয়ে ফুটল। আকস্মিক অনুশোচনাবিদ্ধ হয়ে, সম্ভবত মরুভূমির গোত্রগুলোর সঙ্গে শত্রুতায় ক্লান্ত হয়ে তায়েফবাসীরা ক্ষমা ও ইসলাম গ্রহণের অনুমতি চেয়ে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিল, যে সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যা হোক, তারা তাদের মূর্তিগুলোর জন্য কিছুটা সময় প্রার্থনা করল। প্রথমে দু'বছর, পরে এক বছর, পরে ছয় মাস; কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। শেষ আবেদনে তারা এক মাস সময়ের জন্য যুক্তি দেখালো, যা মঞ্জুর হবে বলে তারা মনে করেছিল। মুহম্মদ ছিলেন অনমনীয়। ইসলাম ও মূর্তি একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। তখন তারা প্রাত্যহিক প্রার্থনা বা নামাজ কায়েম করা থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করল। মুহম্মদ উত্তর দিলেন যে প্রার্থনা ছাড়া ধর্ম অর্থহীন।[২] অবশেষে দুঃখের সঙ্গে তারা

---

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯১৪, ৯১৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬।
২. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড. পৃ. ২১৭।

সব প্রয়োজনীয় বিষয় মেনে নিল। যা হোক তাদেরকে স্বহস্তে মূর্তি ভাঙা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল; আর হার্বের পুত্র দুষ্ট আবু সুফিয়ান, বিখ্যাত মুবিয়ার পিতা—ইসলামের "জুডাস ইস্ক্রিয়াট", যাকে অন্যতম 'মুল্লাফাতুল্ কুলুব' (নামমাত্র বিশ্বাসী) নামে নিন্দিত করা হয়েছে—কারণ তারা শুধু নীতির খাতিরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ওরওয়ার ভাগ্নে মুগিরা—এই দু'জন মূর্তি ধ্বংসের জন্য নির্বাচিত হল। তায়েফের নারীদের হতাশা ও দুঃখ উচ্চনাদী চীৎকারের মধ্যে তারা তাদের ন্যস্ত কাজ সুসম্পন্ন করল।[১]

এ সময়ে তাঈয়ের গোত্রটি অবাধ্য হয়েছিল এবং পৌত্তলিক পুরোহিত তন্ত্র তাদের ধর্মদ্রোহিতা জিইয়ে রাখছিল। আলির নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরিত হল তাদের আনুগত্য আদায় করতে এবং তাদের মূর্তি-গুলোকে ধূলিসাৎ করতে। আদি বিখ্যাত হাতেমের পুত্র হাতেমের মহানুভবতা ও উদারতার কথা কবি ও চারণ কবিরা গেয়েছেন সারা প্রাচ্য জাহানে। এই আদি তখন এই গোত্রের প্রধান। আলীর আগমনের কথা শুনে সে সিরিয়ায় পলায়ন করল; কিন্তু তার ভগিনী কিছু সংখ্যক জ্ঞাতি প্রধানসহ মুসলমানদের হস্তে বন্দী হল। তাদেরকে সসম্মানে ও সহানুভূতির সঙ্গে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হল। অবিলম্বে মুহম্মদ হাতিম-দুহিতা ও তার লোকজনদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন এবং তাদেরকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করলেন। সে তার ভ্রাতার নিকট সিরিয়ায় গমন করল এবং মুহম্মদের মহত্ত্বের কথা জানাল। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে সে সত্বর মদিনায় এসে মুহম্মদের পদতলে আত্মসমর্পণ করল এবং শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করল। নিজের লোকজনদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে সকলকে পৌত্তলিকতা বর্জন করতে প্রবুদ্ধ করল। একদা সে বণী তাঈ পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত ছিল এখন থেকে তারা মুহম্মদের ধর্মের অনুগত ভক্তে রূপান্তরিত হল।[২]

---

১. ইবনে হিশাম পৃ. ৯১৭, ৯১৮, তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬৩। নবম হিজরীতে হযরত মুহম্মদ বহুসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ঘটনাবলী "প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর" হিসেবে অভিহিত হয়েছে। সাকিফদের ধর্মান্তর-করণের অব্যবহিত পরেই যারা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তারা হল ইয়েমেন, মাহরা, ওমান, বাহরায়েন এবং ইয়ামামার যুবরাজগণ।

২. ইবনে হিশাম, পৃ ৯৪৮-৯৪৯; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮; 'ইনসানুল উয়ুন' ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪। আদির ধর্মান্তকরণ ঘটেছিল নবম হিজরীর রবিউল

বণী তাই গোত্রের ধর্মান্তরকরণের প্রায় একই সময়ে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মান্তরকরণ সংঘটিত হয়েছিল যা শুধু উল্লেখেরই দাবী রাখে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা উদ্দীপিত করার জন্য মোযায়না গোত্রের একজন বিশিষ্ট কবি কাব ইবনে জোয়াহের নিষেধাজ্ঞার অধীন ছিলেন। তার ভাই ছিলেন মুসলমান এবং তিনি তাকে পৌত্তলিকতা বর্জন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রবলভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। কাব তার ভ্রাতার উপদেশ অনুসরণ করে গোপনে মদিনায় গিয়েছিলেন এবং মসজিদে, যেখানে হযরত সকলকে উপদেশ দিতেন তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে একজন মানুষকে ঘিরে বহু আরববাসী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর উপদেশ শুনছে। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরতকে চিনতে পারলেন এবং বেষ্টনী ভেদ করে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি যদি কাবকে মুসলমান হিসেবে আপনার সামনে আনি, আপনি কি তাকে ক্ষমা করবেন?" মুহম্মদ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই যুহায়ের পুত্র কাব।" কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে হত্যা করার জন্য হযরতের অনুমতি চাইল। হযরত বললেন, "না। আমি

সানী মাসে (৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট) এবং সেই অনুসারে তাবুক অভিযানের পূর্বেই তা বিন্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি আরব ঐতিহাসিকদের ঘটনাবিন্যাস প্রণালী অনুসরণ করেছি। হাতিম-দুহিতার নাম ছিল সুফানা। সে যখন হযরতের সামনে উপস্থিত হল তখন সে নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করল: "হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা মৃত; আমার ভ্রাতা আমার একমাত্র আত্মীয় মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে পর্বতে পালিয়ে গেছে। আমি আমার মুক্তিপণ দিতে অক্ষম। আমার মুক্তির জন্য আপনার বদান্যতা কামনা করি। আমার পিতা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন—তিনি তাঁর গোত্রের যুবরাজ ছিলেন, তিনি মুক্তিপণ দিয়ে বহু বন্দীর মুক্তি দান করতেন; নারাদের সম্মান রাখতেন; দানদরিদ্রদের আহার্য দান করতেন; দুর্দশাগ্রস্তদের সান্ত্বনা দিতেন; কারও বাঞ্ছা অপূরণ রাখতেন না। আমি হাতিম-দুহিতা সুফানা। মুহম্মদ উত্তর দিলেন, "তোমার পিতার একজন মুসলমানের গুণাবলী ছিল; যদি আমার পক্ষে এমন কোন ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা সম্ভব হত যে পৌত্তলিকতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছে তাহলে আমি হাতিমের আত্মার জন্য প্রার্থনা করতাম।" তখন আশেপাশের মুসলমানদের সম্বোধন করে হযরত বললেন, "হাতিম-দুহিতা স্বাধীন, তার পিতা একজন দানশীল ও দয়ালু মানুষ ছিলেন, আল্লাহ দয়ালু লোকদের ভালবাসেন ও পুরস্কার দেন।" সুফানাসহ তার সব লোকজনকে মুক্তি দেওয়া হল। পারস্যের কবি সাদীর বোস্তানে এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনা সম্পর্কে কতিপয় সুন্দর পঙ্‌ক্তি রয়েছে।

তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" কাব তখন একটি কাসিদা[১] (কবিতা) পড়ে শোনানোর জন্য অনুমতি চাইল, যা আরবী কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে সর্বকালে বিবেচিত হয়ে থাকে। যখন তিনি আবৃত্তি করতে করতে এই অধ্যায়ের শীর্ষদেশে উদ্ধৃত অংশে[২] পৌঁছলেন তখন হযরত তাকে নিজের উষ্ণীষ দান করলেন। এই উষ্ণীষটি এই পরিবার মুয়াবিয়ার নিকট ৪০,০০০ দিরহামে বিক্রয় করেছিল এবং উমাইয়া ও আববাসিয়াদের হাতে চলে গেল, এবং এখন তা অটোম্যান খলিফাদের অধিকারে রয়েছে।[৩]

অদ্যাবধি পৌত্তলিকদের কাবাগৃহে প্রবেশ কিংবা পবিত্র কাবাপ্রাঙ্গণে পুরাতন পৌত্তলিক প্রথা অনুষ্ঠানের উপর কোন বিধিনিষেধ জারি করা হয়নি। এখন এই মিশ্র অবস্থা বন্ধ করার জন্য এবং যারা নূতন ও বিশুদ্ধ ধর্মমত কতকটা হাল্কাভাবে গ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রে পৌত্তলিকতার সম্ভাবনার চির অবসান ঘটানোর জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। সেই মোতাবিক এই বছরের শেষের দিকে হজের মাসে ইয়াওমুন নাইরে

১. কবিতাটির প্রারম্ভিক শব্দগুলি থেকে এর নাম 'বানাত সুয়াদের কাসিদা' বলে অভিহিত হয়েছে। সাধারণভাবে আরবী 'কাসিদা' যেভাবে প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয় এ কবিতাও তেমনি শুরু হয়েছে। সোয়াদের (কবির প্রেমিকার) তিরোভাবে কবি তার বেদনা প্রকাশ করেছেন; তিনি তাকে ছেড়ে চলে গেছেন; তার হৃদয় বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। এই ভেবে যে তার প্রিয়া আজ বন্দিনী। কবি প্রিয়ার সৌন্দর্য, তার মধুর কণ্ঠস্বর, তার উজ্জ্বল হাসি, তার হৃদয়স্পর্শী মুচকি হাসির প্রশংসা করছেন। বিষয়বস্তু হঠাৎ পরিবর্তিত হয়েছে এবং কবি তার কবিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তরণ করেছেন যখন তিনি তার মহান বিষয়বস্তুর গান শুরু করেছেন। কাসিদার ভাষা সর্বত্র গম্ভীর ভাবপূর্ণ ও বীর্যবান —এমন একটি গুণ যা পরবর্তীকালের কবিতায় প্রায়ই অভাব রয়েছে—আর শেষ পর্যন্ত কবিতাটিতে ছন্দের প্রবাহ ও স্বরের আন্দোলন অসাধারণ সমতার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে।

২. "হযরত হলেন আলোর মশাল উজলিছেন ধরাভূমি
খোদার অসী, কেটে তিনি চলেন সদা না—খোদার ঐ বধ্যভূমি।"

৩. 'খিরকা শরীফ' (পবিত্র উষ্ণীষ) নামে অভিহিত; জরুরী পরিস্থিতিতে এই খিরকা জাতীয় মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। 'বানাত সুয়াদের কাসিদা'-কে কোন কোন সময় 'কাসিদাতুল বারদা' (উষ্ণীষের কাসিদা)-ও বলা হয়ে থাকে। এই কাসিদা আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে সায়িদ প্রণীত কাসিদা থেকে স্বতন্ত্র। আব্দুল্লাহ মুহম্মদ বিন সায়িদ মালিক জহীরের রাজত্বকালে জীবনাতিবাহিত করেছিলেন। তার কাসিদার আরম্ভ নিম্নরূপ: জি সালামের প্রতিবেশী-স্মরণে কি বইয়ে দিলে রুধির সাথে আখিবারি?

অর্থাৎ মহান কোরবানীর দিনে জনতার নিকট একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনানোর জন্য আলীকে নিযুক্ত করা হল। এই ঘোষণাপত্র সরাসরি পৌত্তলিকতা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অনৈতিক ক্রিয়াবলীর মর্মমূলে আঘাত হানল।" এই বছরের পরে কোন পৌত্তলিক কাবাগৃহে হজ্জ করতে পারবে না, আর নগ্ন অবস্থায়[১] কেউ এই গৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না; যাদের সঙ্গে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সন্ধির শেষ সীমা পর্যন্ত এটা বলবৎ থাকবে; অবশিষ্ট লোকদের ক্ষেত্রে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য চার মাস সময় প্রদান করা হল; অতঃপর যাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাদের ছাড়া আর কারও প্রতি হযরতের বাধ্যবাধকতা থাকবে না।"[২]

এই ঘোষণাকে মুসলিম লেখকগণ "ভারমোচনের ঘোষণা" বলে অভিহিত করেছেন। এটা হযরতের পক্ষে দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। তখনকার সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার পক্ষে টিকে থাকা দায় ছিল। যদি বছরের পর বছর পৌত্তলিক তীর্থযাত্রীরা মুসলমান তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্মমতের কামুকতাপূর্ণ ও অধোগামী প্রথাসমূহ অনুষ্ঠিত ও অনুমোদিত হত, তবে মুহম্মদ কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে যা সম্পাদন করেছিলেন তা শীঘ্রই নির্মূল হয়ে যেত। ইতিহাসে দেখা যায় পৌত্তলিকদের মধ্যে আরবদের মতো আর একটি মেধাবী অথচ অমার্জিত শাখা ছিল, ব্যালের উপাসকদের পাইকারী হত্যার মাধ্যমে এই শাখার নেতৃবৃন্দ জিহোভার উপাসনাকে সংরক্ষিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন; তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন। ইসরাইলগণ তাদের চারপাশের অনিষ্টকর প্রভাবের অধীনেই শুধু অবসিত হয়নি বরং তারা প্রথমে যাদের প্রতি অকথ্য অশ্লীল ভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করত তাদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মুহম্মদ অনুভব করেছিলেন যে পৌত্তলিকতার সঙ্গে যে কোন ধরনের আপোষ তাঁর সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দেবে। ফলে তিনি আপাতদৃষ্টিতে কঠোর উপায় অবলম্বন করলেও তা ছিল চূড়ান্তভাবে হিতকর প্রবণতায় পরিপূর্ণ। যে বিশাল জনতা আলীর ঘোষণা শুনেছিল তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করল এবং পরবর্তী বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই তাদের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করল।

---

১. পৌত্তলিক আরবদের এক লজ্জাকর প্রথার উল্লেখ আছে।

২. ইবনে হিশাম পৃ. ৯২., ৯২২; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২; আবুল ফিদা, পৃ. ৮৭।

নবম অধ্যায়

হযরতের নবুয়্যতের কার্যভার সুসম্পন্ন

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় যখন এসে পড়ল আর আপনি দেখে নিলেন : লোকজন দলে দলে আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থায় দাখিল হচ্ছে। সুতরাং আপনি নিজ পালনকর্তার প্রশংসায় তসবীহ পাঠ করতে থাকুন, আর তাঁরই কাছে ক্ষমা চাইতে থাকুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী, তাওবা মঞ্জুরকারী। —সূ. ১১০ আ. ১-৩

অন্যান্য পূর্ববর্তী বছরের মতো এ বছরেও[১] আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য রাষ্ট্রদূত তাদের গোত্রপ্রধান ও গোত্রের অন্তর্ভুক্তির প্রমাণ-স্বরূপ মদিনায় উপস্থিত হতে লাগলো। বিভিন্ন প্রদেশে যে সব ধর্ম-প্রচারককে মুহম্মদ প্রেরণ করেছিলেন তাদের সবাইকে একইরূপে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন : "লোকজনদের সঙ্গে ভদ্রোচিত আচরণ করবে এবং কর্কশ হবে না; তাদেরকে উৎসাহিত করবে এবং অবজ্ঞা করবে না। আর তোমাদের সঙ্গে আসমানী কিতাবধারী[২] বহু লোকের সাক্ষাৎ ঘটবে এবং তারা প্রশ্ন করবে : বিহেশতে গমনের উপায় কি? তাদেরকে জবাব দেবে যে, আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়া এবং সৎ কাজ করা স্বর্গে গমনের উপায়।"[৩]

১০ হিযরী ৯ই এপ্রিল ৬৩১ থেকে ২৯শে মার্চ ৬৩২ খ্রী.

মুহম্মদের নবুয়্যতের দায়িত্বভার এখন অর্জিত হল। বর্বরতায় নিমজ্জিত এক জাতির নিকট একজন নবী এসেছিলেন "তাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শন-সমূহ বারবার আবৃত্তি করে তাদেরকে পবিত্র করতে; তাদেরকে প্রত্যাদেশ ও জ্ঞান শিক্ষা দিতে যারা একদা নিরতিশয় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।"[৪]

১. দশম হিযরাতে ইয়েমেনের ও হিজাজের অবশিষ্ট গোত্রগুলোর ধর্মান্তরকরণ ঘটেছিল। অতঃপর হাজরামাউত ও কিন্দার গোত্রসমূহের ধর্মান্তরকরণ ঘটেছিল।
২. খ্রীষ্টান, ইহুদী ও জরথুস্ত্রপন্থী।
৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯০৭।
৪. কোরআন সূ. ৪২ আ. ২-৫।

তিনি তাদেরকে অবমাননাকর ও রক্তক্ষয়ী কুসংস্কারে নিমজ্জিত দেখতে পেয়েছিলেন ; তিনি সত্য ও প্রেমের একমাত্র আল্লাহর বিশ্বাসের দ্বারা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভ্রাতৃত্ব ও বদান্যতার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। স্মরণাতীত কাল থেকে আরব উপদ্বীপ নিরন্ধ্র নৈতিক অন্ধকারে আবৃত ছিল। অধ্যাত্ম জীবনবোধ নিতান্তই অজ্ঞাত ছিল। ইহুদী বা খ্রীষ্টধর্ম আরবমননের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। দেশের জনগণ কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা ও পাপে নিমজ্জিত ছিল। অবৈধ যৌনাচার ও কন্যা-সন্তান হত্যার মতো নারকীয় পাপ অনুষ্ঠিত হত। জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তান সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিসহ বিধবা মাতাকেও সম্পত্তি হিসেবে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হত। এর চেয়েও অমানুষিক প্রথা ছিল নির্দয় পিতা তার জীবিত কন্যা সন্তানকে কবর দিত। হিন্দু রাজপুতদের মতো কোরাইশ ও কিন্দা বংশের লোকদের মধ্যে এই প্রথা খুবই শক্ত শিকড় গেড়ে বসেছিল এবং তাতে তারা গৌরব অনুভব করত। মানুষের কর্মের উদ্দেশ্য হিসেবে পরকালের অস্তিত্ব, ভালমন্দের পুরস্কার ও শাস্তি বাস্তবিক অপরিজ্ঞাত ছিল। হযরতের আবির্ভাবের মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আরবের এই অবস্থা ছিল। এই কয়েক বছরের মধ্যে কি অভাবনীয় পরিবর্তন! স্বর্গের ফিরেশতা যথার্থই এই দেশের উপর দিয়ে বিচরণ করেছিলেন এবং যেসব লোক অদ্যাবধি অর্ধবর্বরতার বিদ্রোহাত্মক প্রথায় নিমজ্জিত ছিল তাদের হৃদয়ে একতা ও প্রেমের ভাব উদ্দীপিত করেছিলেন। যা ছিল একদা নৈতিকতার মরুভূমি, যেখানে মানবীয় ও ঐশী কানুন উপেক্ষিত ও বিনা অনুশোচনায় অবহেলিত হত, এখন তা পুষ্পকাননে পরিণত হল। অন্তহীন অবমাননাসহ পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হল। ইসলাম একটি মহান ধর্মব্যবস্থার একমাত্র একক দৃষ্টান্ত। যদিও এ এমন এক জাতির মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল এবং বহুলাংশে অনুশীলিত হয়েছিল যারা আদিম সভ্যতার উষালগ্ন থেকে অদ্যাপি বহির্গত হয়নি তথাপি তা তার অনুসারীদেরকে পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই ঘটনা সঙ্গতভাবেই ইসলামের মুখ্য গৌরব ও এই ধর্মের প্রচারকের প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর। দীর্ঘদিন ধরে খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম আরব গোত্রসমূহকে নিরতিশয় কুসংস্কার, অমানুষিক অনুশীলন ও অবাধ নীতিহীনতা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু যতক্ষণ না তারা "আল্লাহর মনোনীত রাসুলে"র "আত্মা-উদ্দীপিতকারী প্রয়াসে"র ঘটনা

দেখেছে তার পূর্বে তারা শক্তি ও প্রেমের সর্বপ্লাবী মহাশক্তি আল্লাহর সত্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়নি। এই সময় হতে তাদের লক্ষ্য শুধু এই জগতের উপরই নিবদ্ধ হল না, পরকালেও উচ্চতর, বিশুদ্ধতর ও অধিকতর বিষয় রয়েছে যা তাদেরকে দানশীলতা, সৎকর্মশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সার্বজনীন প্রেম অনুশীলনের জন্য আহ্বান জানাল। আল্লাহ্ কাঠ বা পাথরে খোদিত আজ বা কালকের আল্লাহ্ নন, তিনি জগতের শক্তিশালী, প্রেমময়, দয়ালু স্বষ্টিকর্তা। আল্লাহর নির্দেশের অধীনে মুহম্মদ এই নবজাগরণের উৎস—তিনি অত্যুজ্জ্বল প্রস্রবণ, যা থেকে তাদের অনন্তের প্রতি প্রবাহ উৎসারিত হয়েছে এবং তাঁর প্রতি তারা যথোপযুক্ত আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করেছে। তারা একই বাসনায়, সত্য ও সততায় এবং জীবনের সমুদয় কার্যে নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মহান ব্রতে উদ্দীপিত হল। সত্য, স্বতঃসিদ্ধ, উপদেশাবলী যা মুহম্মদ বিগত বিশ বছর ধরে তাঁর শিষ্যদের সকাশে প্রচার করেছিলেন তা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক কার্যের নিয়ামক নীতি হিসেবে পরিণত হয়েছিল। আইন ও নৈতিকতার সমন্বয় ঘটেছিল। "আদি খ্রীষ্টধর্ম জগতবাসীকে তাদের নিদ্রা থেকে জাগরিত করার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মারাত্মক লড়াই শুরু করার সময় থেকে আধ্যাত্মিক জীবনবোধের এমন জাগরণ মানুষ আর প্রত্যক্ষ করেনি—এমন ধর্ম যা প্রভূত ত্যাগ করেছে এবং বিবেকের খাতিরে হাসিমুখে বিষয়-আশয়ের ক্ষতি স্বীকার করেছে।"[১]

মুহম্মদের মহান কর্মভার এখন সুসম্পন্ন হল। এই ঘটনা অর্থাৎ জীবদ্দশায় সমুদয় কার্য সুসম্পন্ন করার ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে অন্যান্য কালের, অন্যান্য দেশের নবীরাসুল, জ্ঞানী ও দার্শনিকদের উপর তাঁর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব। খ্রীষ্ট, মুসা, জরথুস্ত্র, শাক্যমুনী, প্লেটো—সকলেরই আল্লাহর রাজ্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা ছিল, ছিল প্রজাতন্ত্র ও তাদের বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে প্রত্যয়, আর এ সবের সাহায্যে অধঃপতিত মানবতাকে নূতন নৈতিক জীবনে উন্নীত করতে হয়েছিল। সকলেই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে তাঁদের উজ্জ্বল দিব্যদৃষ্টি অসমাপ্ত রেখে কিংবা তাদের রক্তলিপ্সু শিষ্য বা সম্রাট শিষ্যদের হাতে তাদের উত্তরণের দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করে

১. মুয়ির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬৯। একজন সুস্পষ্ট ইসলামের শত্রু থেকে আগত এই মন্তব্য অতীব মূল্যবান।

বিদায় নিয়েছেন।[১] একমাত্র মুহম্মদ তাঁর মহান কর্মের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, তাঁর পূর্বসূরীদের আরব্ধ কার্যের পরিপূর্ণতা দান করতে পেরেছিলেন। একমাত্র তিনি মানবজাতির উন্নয়নের কাজ পরিসমাপ্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর কোন সম্রাট শিষ্য তাঁর নূতন শিক্ষাসমূহ বলবৎ করতে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। মুসলমানেরা কি সঙ্গতভাবে বলেন না যে তাঁর যাবতীয় কাজ ছিল আল্লাহর কাজ?

বিনয়নম্র প্রচারক যিনি এই সেদিন তাঁর নিজ মাতৃভূমি শহর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর বাণী প্রচার করতে গিয়ে প্রস্তরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে প্রস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি মাত্র নয় বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর জাতিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের নিম্নতম পঙ্ক থেকে শুদ্ধবুদ্ধতা ও ন্যায়পরায়ণতায় একটি বিশিষ্ট ধারণায় উন্নীত করেছিলেন।

হযরতের জীবন মহত্ত্ব ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদিত এক মহান কার্যের মহত্তম নির্ঘণ্ট। একটি সুপ্ত জাতির মধ্যে তিনি প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন; যুযুধান গোত্রসমূহকে তিনি একটি সুসংহত জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং চিরস্থায়ী জীবনের আশায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মানুষের হৃদয়ে অদ্যাবধি যেসব বিচ্ছিন্ন আলোকরশ্মি নিপতিত হয়েছিল তা তিনি একটি জ্যোতির্কেন্দ্রে সুসংবদ্ধ করেছিলেন। এমন একটি কর্ম তিনি সম্পাদন করেছিলেন; আর তিনি তা এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে করেছিলেন যাতে কোন আপোষ ছিল না, কোন বিরতি ছিল না; তিনি এমন অদম্য সাহস নিয়ে কাজ করেছিলেন যা কোন প্রতিরোধ মানে নি, ফলাফলের কোন ভয় করেনি, তিনি এমন একক উদ্দেশ্যে কাজ করেছিলেন যার মধ্যে কোন আত্মচিন্তা ছিল না। গ্যালিলির কুলে একেশ্বরবাদী যে ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তা এক অবতারবাদী খোদার উপাসনায় পর্যবসিত হয়েছিল; যারা নাজারাত-এর পয়গাম্বরের ধর্মগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে দেবীপূজার পুরাতন উপাসনা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। হিরার আত্মসমাহিত, উম্মী দার্শনিক এক দুর্বিনীত পৌত্তলিক জাতির মধ্যে জন্মেছিলেন এবং যারা তাঁর বাণী একবার শ্রবণ করেছিল তিনি তাদের উপর আল্লাহর একত্ব ও মানুষের

---

১. ইসরাইলীদের মধ্যে যশুয়া, বৌদ্ধদের মধ্যে অশোক, জরথুস্ত্রদের মধ্যে দরিউস, খ্রীষ্টানদের মধ্যে কনস্তানতাইন।

সমতা অমোচনীয়ভাবে মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর "গণতান্ত্রিক বজ্র-নির্ঘোষ" পুরোহিত ও শাসকদের বিরুদ্ধে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অভ্যুত্থানের সংকেত। "বিবদমান ধর্মমত ও নিষ্পেষণকারী ধর্মীয় বিধিনিষেধ সমূহের জগতে" যখন মানুষেব আত্মা অবোধ্য ধর্মমতের গুরুভারে পিষ্ট হয়েছিল এবং মানুষের দেহ কায়েমী স্বার্থের অত্যাচারে পদদলিত হয়েছিল, সেই সময়ে তিনি বর্ণ ও একচেটিয়া সুবিধার প্রাচীর ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় মানুষের জন্য আত্মস্বার্থ যে মাকড়শার জাল বুনেছিল তা তাঁর নিঃশ্বাসের জোরে মিলিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি সব একচেটিয়া ভাব অপসারিত করেছিলেন। এই নিরক্ষর নবীর বাণী ছিল সর্বসাধারণের জন্য। তিনি জ্ঞান ও শিক্ষার মূল্য ঘোষণা করেছিলেন। কলমের সাহায্যে মানুষের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ হয়। কলমের সাহায্যে মানুষের কার্যাবলীর বিচার হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের কার্যাবলীর চূড়ান্ত মীমাংসক কলম, প্রজ্ঞা ও মানবজাতির নৈতিক শক্তির প্রতি স্থায়ী ও অপরিবর্তিত আবেদন, অলৌকিকতার বর্জন "তাঁর ঐশী প্রশাসনের সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ধারণা ধর্মীয় আদর্শের সার্বজনীনতা, অকপট মানবতা"—এসব তাঁকে তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে, 'ওরিয়েণ্টাল রিলিজিয়ান্স'-এর গ্রন্থকার বলেন, "এ সব গুণ তাঁকে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করছে।" তাঁর জীবন ও কার্য রহস্যাবৃত নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে রূপকথার জগৎ গড়ে উঠেনি।

যখন আরববাসীগণ দলে দলে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল তখন হযরত উপলব্ধি করলেন যে তাঁর কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে।[১] তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে এই বিশ্বাসে কাবাগৃহে বিদায়ী হজ পালনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করলেন। জুলকাদ মাসের ২৫ তারিখে (৬৩২ খ্রী. ২৩শে ফেব্রুয়ারি) হযরত বিপুল সংখ্যক শিষ্য সমভিব্যাহারে মদিনা থেকে রওয়ানা হলেন।[২] মক্কায় পৌঁছে এবং হজের সব বিধি পালন সম্পূর্ণ করার

---

১. কোরআন সূ. ১১০।

২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯৬৬ ; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩০। কথিত আছে যে ৯০,০০০ থেকে ১৪০,০০০ মুসলমান হযরতের সঙ্গে হজ করতে গিয়েছিলেন। এই হজ 'হাজ্জাতুল বালাগ', 'হাজ্জাতুল ইসলাম' (মহান হজ, ইসলামের হজ) এবং কোন কোন সময় 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজ) নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

পূর্বে তিনি 'জাবালুল্ আরাফাতে'র শীর্ষদেশ থেকে সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন (৮ই জিলহজ, ৭ই মার্চ)। এই ভাষণ মুসলমানদের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে!

"হে মানবমণ্ডলী, আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর, কেননা এই বছরের পর আমি আর তোমাদের মধ্যে এখানে মিলিত হতে পারব কিনা জানি না।"

"এই দিন, এই মাস যেমন সকলের জন্য পবিত্র, তোমাদের জানমাল তেমনি তোমাদের জন্য পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য যতদিন না তোমাদের প্রভুর সমক্ষে উপস্থিত হচ্ছ; আর স্মরণ রেখো যে তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের উপস্থিত হতে হবে এবং তিনি তোমাদের কাজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন।...হে জনমণ্ডলী, তোমাদের স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার আছে, তোমাদের স্ত্রীদেরও তেমনি তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে।...দয়া ও ভালবাসার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আচরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর জামিনে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তারা তোমাদের জন্য বৈধ হয়েছে।" "তোমাদের উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত হয়েছে তার প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবে এবং পাপ পরিহার করবে।" "সুদ অবৈধ ঘোষিত হল।"[১] অধমর্ণ শুধু মূল দেয়টাই ফেরত দেবে, আর আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আমার চাচা আব্বাসের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ দিয়েই শুরু হবে এর শুরু।[২] ...এই সময় থেকে অন্ধকার যুগের অনুশীলিত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ

১. 'রিবা' বা সুদ নিষিদ্ধ কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য জমা বা ধার দেওয়া টাকার মুনাফার অংশ নিষিদ্ধ নয়। যারা আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা উপলব্ধি করেন না, তারা এই নিয়মের মূলীভূত প্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হবেন। বাস্তবিক যে সব কারণ মহান নবীকে তাঁর দেশে সুদ হারাম ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল তা-ই প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি সময়ে খ্রীষ্টান পাদরী-দেরকে সুদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত দিতে প্ররোচিত করেছে। জ্যেষ্ঠ ডিসরেলীর 'কিউরিয়োসিটিস্ অব লিটারেচার', এ বিষয়ের উপর অধ্যায়টি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।

২. এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে আব্বাস সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। 'রিবা'ও রক্তের প্রতিশোধ সম্পর্কীয় আইনের বলবৎ করণে তাঁর পরিবার থেকেই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর দেশবাসীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

নিষিদ্ধ হল এবং আব্দ্ ুল মুত্তালিবের পুত্র হারিস তস্যপুত্র ইবনে রাবিয়ার[১] হত্যাকাণ্ড থেকে সব ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটল।...

"আর তোমাদের দাসগণ! তোমরা যে আহার্য গ্রহণ করবে তাদেরকেও সেই খাদ্য প্রদান করবে, আর তোমরা যে বস্ত্র পরিধান করবে তাদেরকেও সেই বস্ত্র পরিধান করতে দেবে। যদি তোমাদের কোন দাস এমন দোষ করে থাকে যা তোমরা ক্ষমা করতে পারছ না তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর, তারা প্রভুর দাস এবং রূঢ় আচরণের যোগ্য নয়।"

"হে জনমণ্ডলী, আমার কথা শ্রবণ কর আর তা বুঝতে চেষ্টা কর। জেনো যে **এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই**। তোমরা এক ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। কারও দ্রব্য অন্যের জন্য বৈধ নয় যদি সে তা সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে দান না করে। অন্যায় করা থেকে বিরত থাকবে।"

"যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যারা এখানে অনুপস্থিত তাদেরকে সব বলবে। সম্ভবত যে শুনবে সে যে শুনেছে তার চেয়ে অধিক স্মরণ রাখতে পারবে।"[২]

আরাফাত পর্বতে প্রদত্ত ভাষণ কবিত্বের দিক থেকে অন্যান্য ভাষণ হতে কম সুন্দর নিশ্চয়ই, কম মরমীবাদী হলেও তা বাস্তবতা ও শক্তিশালী সাধারণ বুদ্ধির মাধ্যমে উচ্চতর মননে আবেদনশীল এবং যে সব নিম্নস্তরের স্বভাব যা নৈতিক নির্দেশনার জন্য সদর্থক ও বোধগম্য দিক-নির্দেশের প্রয়োজন বোধ করে তার ক্ষমতা ও দাবীর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভাষণ সমাপ্তির কালে জনগণের উদ্বেলচিত্ততার দিকে লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে হযরত বললেন, "হে আমার প্রভু, আমি আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি ও আমার কার্য সম্পাদন করেছি।" নিম্নে সমবেত বিশাল জনতা সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনি আপনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।" "হে আমার প্রভু, আমি মিনতি করছি, আপনি এ বিষয়ে সাক্ষী থাকুন।"

---

১. ইবনে রাবিয়া হযরতের চাচাত ভাই। শৈশবে তাকে বণী লাইস গোত্রের একটি পরিবারের প্রতিপালনের জন্য ন্যস্ত করা হয়েছিল। হুজাইল গোত্রের সদস্যরা নির্মমভাবে তাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় নি।

২. প্রত্যেক বাক্য শেষ হলে হযরত থামছিলেন এবং তা খালাফের পুত্র উমাইয়া তস্য পুত্র রাবিয়া উচ্চনিনাদী কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করছিল যাতে সমগ্র শ্রোতৃ-মণ্ডলী তা শ্রবণ করতে পারে।

এই কথা বলে হযরত তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করলেন। আরবের ঐতিহ্য অনুসারে এই ভাষণ বিস্তার, বাগ্মিতা ও প্রাণবন্ততার জন্য উল্লেখযোগ্য। হজের আবশ্যিক বিধি পালন করেই হযরত তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।[১]

১১হি.=২৯শে মার্চ ৬৩২—১৮ই মার্চ ৬৩৩ খ্রী.

মুহম্মদের জীবনের শেষ বছরটি মদিনা শহরেই অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি প্রদেশসমূহ ও গোত্রীয় সম্প্রদায়সমূহ যারা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য হয়েছে তাদের সংগঠিত করলেন। যদিও ইসলাম ধর্ম সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় বসতি স্থাপনকারী আরব বংশোদ্ভূতদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেনি; তাদের অধিকাংশ ছিল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। কিন্তু সমগ্র আরবদেশ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের কর্তব্যসমূহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, জাকাত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন গোত্রের নিকট অফিসার পাঠান হল। মোয়াজ ইবনে জবাল ইয়েমেনে প্রেরিত হলেন এবং মুহম্মদের বিদায়ী নির্দেশ হল যে সব ব্যাপারে কোরআনের কোন প্রত্যক্ষ নির্দেশ পাওয়া যাবে না সে সব ব্যাপারে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হবে। আলীকে, ইয়েমামায় প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করা হল, তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল : "যখন দু'দল তোমার কাছে বিচারের জন্য আসবে তখন তাদের উভয় দলের কথা শ্রবণ না করা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবে না।"

জায়েদের পুত্র ওসামার (যে জায়েদ মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন) নেতৃত্বে সিরিয়ায় মুসলিম দূত হত্যার দীর্ঘবিলম্বিত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একটি অভিযানের প্রস্তুতিও আরম্ভ হয়েছিল। বাস্তবিক যাত্রার জন্য সৈন্যবাহিনী শহরের বাইরে ছাউনী ফেলে অপেক্ষা করছিল। খায়বারে ইহুদী রমণী যে বিষ হযরতকে প্রয়োগ করেছিল এবং যা ধীরে

উবাইয়ের পুত্র আব্দুল্লাহ ছিল মুনাফিকদের নেতা। সে জুলকাদ মাসে (৬৩১ খ্রী. ফেব্রুয়ারি) মৃত্যুবরণ করল। মৃত্যুকালে সে হযরতকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল তার শেষকৃত্য বা জানাজার নামাজ পড়ার জন্য। মুহম্মদ কখনও কোন মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি। উমরের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে আব্দুল্লাহ নিয়ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত ও কুৎসা রটনা করত তার জন্য হযরত জানাজা নামাজ পড়লেন এবং নিজের হস্তে কবরে তার মৃতদেহ শুইয়ে দিলেন।

ধীরে তাঁর দেহের সর্বত্র প্রবেশ করেছিল তা এখন চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে লাগল এবং প্রতীয়মান হল যে তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে। তাঁর আসন্ন মৃত্যুর খবরে ওসামার নেতৃত্বে যে অভিযান প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তা স্থগিত হল। এই সংবাদে সীমান্তবর্তী কয়েকটি প্রদেশেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তিনজন প্রতারক তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও লুঠতরাজের শাসন কায়েম করার জন্য ঐশী পরোয়ানা প্রাপ্তির দাবী প্রচার করতে লাগল। তারা নিজেদেরকে পয়গাম্বর হিসেবে প্রচার করতে থাকল এবং সব ধরনের জালিয়াতির সাহায্যে তাদের গোত্রের লোকদের অনুমোদনের প্রয়াস চালাতে লাগল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ব্যক্তি ছিল আয়হালা ইবনে কাব, আল্‌আস্‌ওয়াদ (কৃষ্ণকায়) নামে সমধিক পরিচিত। সে ছিল ইয়েমেনের প্রধান, বিপুল সম্পদ ও প্রভূত বুদ্ধির অধিকারী, অতীব চালাক লোক। তার গোত্রের সরল বিশ্বাসী লোকদের নিকট সে যে ভেল্কীবাজী দেখাল তা ঐশী বিশিষ্টতা পেল। সে শীঘ্রই তাদেরকে দলভুক্ত করে নিল ও তাদের সাহায্যে প্রতিবেশী অনেক শহরের বশ্যতা আদায় করল। সে শাহরকে হত্যা করল। হযরত মুহম্মদ বাজানের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শাহরকে সানার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। পারস্যের খসরুর অধীনে বাজান ইয়েমেনের গভর্ণর ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তাকে ঐ পদেই বহাল রেখেছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় শুধু ইয়েমেনে বসবাসকারী তার স্বদেশবাসী 'আবনা'দের উপরই প্রভাবশালী ছিলেন না, বরং প্রদেশের আরবদের উপরও প্রভাবশালী ছিলেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইয়েমেনের পারসিকগণ মুসলমান হয়ে গেল। প্রতারক আল্ আসওয়াদ শাহরকে হত্যা করল এবং জোর করে মারজাবানাকে বিবাহ করল। এক নৈশপানোৎসব শেষে সে যখন মাতাল অবস্থায় ছিল তখন মারজাবানার সাহায্যে এক 'আবনা' তাকে হত্যা করল। অপর দু'জন প্রতারক হল খোওয়ালিদের পুত্র তুলাইহা এবং হাবিবের পুত্র আবু সুমামা হারান, সাধারণ্যে মুসাইলিমা নামে পরিচিত। আবু বকরের খেলাফত লাভের পূর্বে তাদেরকে দমন করা যায়নি। মুসাইলিমা নিম্নোক্ত ভাষায় হযরতকে আহ্বান করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল: "আল্লাহর রাসুল মুসাইলিমা থেকে আল্লাহর রাসুল মুহম্মদের প্রতি: আস্‌সালামু আলায়কুম! আমি আপনার অংশীদার; ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অবশ্যই ভাগ করতে হবে।—পৃথিবীর অর্ধেক আমার, বাকী অর্ধেক আপনার কোরাইশদের। কিন্তু কোরাইশরা লোভী জাতি—তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার নেই।"

মুহম্মদ যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তাঁর চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ঃ পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আল্লাহর রাসুল মুহম্মদ থেকে প্রতারক মুসাইলিমার প্রতি ঃ যারা সত্যপথের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম। পৃথিবী আল্লাহর; তিনি যার প্রতি সদয় হন তাকেই ত্নুনিয়ার কর্তৃত্ব দান করেন। কেবল পরহিজগারদের জন্যই পরকাল (শুধু তারাই সুফল লাভ করবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে)।

হযরতের শেষ দিনগুলি তাঁর মনের প্রশান্তি ও স্থৈর্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি দৈহিক দিক দিয়ে ত্নুর্বল ছিলেন তথাপি তাঁর মানসিক অবস্থা মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব পর্যন্ত তাকে জামাতে ইমামতি করতে শক্তি জুগিয়েছিল। একদা গভীর রাত্রে তিনি তাঁর পুরাতন সঙ্গীদের সমাধি ক্ষেত্রে গমন করলেন এবং তাদের সমাধির পাশে তাদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে প্রার্থনা করলেন ও অশ্রু বিসর্জন করলেন। এই অসুস্থতার সময়ে মসজিদসংলগ্ন আয়েশার গৃহে অবস্থান করাই তিনি পছন্দ করলেন এবং যতদিন পর্যন্ত শরীরে কুলাল তিনি জামাতে যোগদান করলেন। শেষবারে তিনি যখন মসজিদে গমন করেছিলেন, তিনি আলী ও আব্বাসের পুত্র ফজলের স্কন্ধে ভর করে মসজিদে গমন করেছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যের মৃত্নু হাসি প্রকাশিত হয়েছিল—তাঁর আশেপাশে যারা অবস্থান করতেন তারা সবাই এটা লক্ষ্য করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি অভ্যস্ত প্রশংসা জ্ঞাপনের পর তিনি সমবেত সকলকে বললেন, “হে মোসলেমগণ, যদি আমি তোমাদের কারও প্রতি কোন অন্যায় করে থাকি তবে আমি তার প্রতিকারের জন্য এখানে উপস্থিত আছি। যদি কারও কাছে আমার ধার থেকে থাকে তবে আমার যা কিছু আছে তা তার বা তাদেরই। “একথা শ্রবণ করে জনতার মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে তিন দিরহাম দাবী করল যা সে হযরতের অনুরোধে একজন গরীবকে দিয়েছিল। এই দিরহামগুলি তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হল এবং বলা হল : পরকালের চেয়ে ইহকালে লজ্জিত হওয়া উত্তম।” অতঃপর হযরত সমবেত সকলের জন্য এবং যারা শত্রুর হাতে নিধন হয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর করুণা ও রহমত প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ এবং শান্তি ও সদিচ্ছার জীবন অনুমোদন করলেন এবং কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন : “আখিরাতের এই ঘর—সে ত তাদের জন্যই আমি তৈরী করেছি—যারা দেশে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে, অশান্তি সৃষ্টি

করতে মোটেই চায় না—আসলে পরহিজগারদের জন্যই ত উত্তম পরিণাম রয়েছে।"[১]

এরপর মুহম্মদ পুনরায় জামাতে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছিল। সোমবার দুপুরে (১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হি.—৮ই জুন ৬৩২ খ্রী.) যখন হযরত ফিস্ফিস্ করে প্রার্থনা করছিলেন তখন মহান নবীর আত্মা পরম করুণাময় আল্লাহর সমীপে মহাপ্রয়াণ করলেন।[২]

এভাবে প্রথম থেকে শেষ অবধি আল্লাহ ও মানুষের সেবায় উৎসর্গীত একটি পূতপবিত্র জীবনের অবসান ঘটল। সব পরীক্ষা ও প্রলোভনসহ অপর কোন জীবনের সঙ্গে এই জীবন কি তুলিত হতে পারে? আর কোন জীবন আছে কি যা জগতের অগ্নিপরীক্ষায় এমন অক্ষত রয়েছে? বিনয়নম্র-ধর্মপ্রচারক খসরু ও সিজারের সমকক্ষ আরবের নৃপতির আসনে উন্নীত হয়েছিলেন, একটি জাতির ভাগ্যনিয়ন্তায় রূপ লাভ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সেই বিনয়নম্রতা, আত্মার সেই মহত্ত্ব ও হৃদয়ের পবিত্রতা, চরিত্রের তপশ্চর্যা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও কোমলতা এবং কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা যা তাঁকে আলআমিন উপাধিতে বিভূষিত করেছিল তা সমন্বিত হয়েছিল তাঁর আত্মসমীক্ষার কঠোর বোধের সঙ্গে—এসব তাঁর চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। একবার তিনি মক্কার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তখন একজন অন্ধ বিনয়ী বিশ্বাসীকে তাঁর সঙ্গদান থেকে বিমুখ করেছিলেন। তিনি সর্বদা অনুশোচনার সঙ্গে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর অনুমোদনের কথা ঘোষণা করতেন।[৩] এরূপ বিশুদ্ধ, কোমল অথচ বীরত্বব্যঞ্জক স্বভাব শুধু শ্রদ্ধারই উদ্রেক করে না, ভালবাসারও উদ্রেক করে। স্বভাবতই আরবের গ্রন্থকারগণ

১. কোরআন, সূ. ২৮ আ. ৮৩, ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ, ২০৭।

২. ইবনে হিশাম, পৃ. ১০০৯; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪, ২৪৫; আবুল ফিদা, পৃ. ৯১; তুঃ কসিন দ্য পার্সিভেল ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪ ও টিকা, আল্ হালাবী।

৩. এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সূরাটি হল। " 'আবাসা'—বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন" এবং এর বর্ণনা নিম্নরূপ :—
"তিনি (হযরত) বিরক্ত হলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর কাছে একটি অন্ধ লোক এল।

আব্দুল্লাহর পুত্রের সহজাত গুণাবলী ও বৌদ্ধিক মেধা সম্পর্কে স্পর্ধিত আত্মপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি বিনয়, দীনদরিদ্রের প্রতি অমায়িকতা এবং দাম্ভিকদের প্রতি মর্যাদাব্যঞ্জক আচরণ তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাঁর মুখাবয়বে ফুটে উঠেছিল তাঁর হৃদয়ের উপচিকীর্ষা। যদিও নিরক্ষর ছিলেন তথাপি প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থখানি তিনি বিশাল মন নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বিশ্বজগতের আত্মার সঙ্গে গভীর যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সমুন্নতি লাভ করেছিলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকে সমানভাবে প্রভাবিত করার প্রতিভা তিনি লাভ করেছিলেন। এই সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল একটা গাম্ভীর্য, প্রতিভার দীপ্তি যারা তাঁর সংস্পর্শে আসত তাদেরকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত।[১]

তাঁর মনের অসাধারণ উন্নয়ন, অনুভূতির একান্ত কোমলতা ও বিশুদ্ধতা এবং তাঁর শুদ্ধাচার ও সত্যনিষ্ঠা হাদিসের অপরিবর্তিত বিষয়-বস্তুতে রূপ লাভ করেছে। তিনি তাঁর চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ছিলেন এবং তাঁর আনাড়ি ছোট ভৃত্যটি তার কাজের জন্য বকুনি খাক তা তিনি কখনো অনুমোদন করতেন না। তাঁর ভৃত্য আনাস বলেছেন, "আমি দশ বছর ধরে হযরতের খেদমতে ছিলাম, তিনি কখনো উঃ পর্যন্ত বলেননি।"[২] তিনি তাঁর পরিবারের প্রতি খুবই

আপনি কি জানেন : সে হয়ত শুধরে নেবে, পবিত্র হবে।
আপনি ভাবতেন, তাহলে তাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা পেলেই তার উপকার হত।
যে লোক ধনী, যে লোক পরোয়া করে না তার দিকে আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন অথচ সে যদি পবিত্র না হয় তবে তাতে আপনার উপরে দোষারোপ হবে না। আর যে লোক আপনার কাছে দৌড়ে এল আর আল্লাহকে সে ভয় করে। তার সাথে অবহেলা করছেন। কোনভাবেই আপনার এমন করা উচিত নয়।" (সু. ৮০, আ. ১-১১)
অতঃপর যখনই হযরত দান অন্ধ লোকটিকে দেখতে পেতেন তখনি তাকে সম্মান দেখানোর জন্য কাজ পরিত্যাগ করে এগিয়ে যেতেন এবং বলতেন, "সেই ব্যক্তিকে বার বার অভিনন্দন যার জন্য প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন।" তিনি তাকে দু'বার মদিনার গভর্নর বানিয়েছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে মুয়িরের উপর বসওয়ার্থ স্মিথের মন্তব্য দেখুন।

১. মিশকাত, বাব—২৪, অধ্যায়—৩, খণ্ড ২।
২. প্রাগুক্ত, বাব—২৪, অধ্যায়—৪, খণ্ড ১।

সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর এক পুত্র সন্তান কামারের স্ত্রী এক সেবিকার ধোঁয়াটে বাড়ীতে তাঁর কোলেই মারা যায়। তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি শিশুদের রাস্তায় দাঁড় করাতেন এবং তাদের চিবুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতেন। তিনি জীবনে কখনও কাকেও আঘাত করেননি। কথোপকথনে তাঁর ব্যবহৃত নিকৃষ্ট ভাষা হল : "তার কি হয়েছে? তার ললাট ধূলায় ধূসরিত হোক!"[১] যখন কোন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য বলা হত তিনি জবাব দিতেন, "অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠানো হয়নি, আমি বিশ্বমানবের নিকট আশীর্বাদ হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"

---

১. প্রাগুক্ত, বাব -২১, অধ্যায়—৪, খণ্ড ১।

মি. পুলের মুহম্মদ-চরিত্রের মূল্যায়ন এতই সুন্দর ও এতই সত্যনিষ্ঠ যে তা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না, "এই লোকটির চরিত্রে কমনীয় ও রমণীয় অথচ বীরত্বব্যঞ্জক এমন কিছু ছিল যার ফলে কারও পক্ষে অবচেতনভাবে ভক্তি ও প্রেম দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কোন বিচারমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমস্যার ব্যাপার। তিনি একাকী বহু বছর যাবত তাঁর স্বদেশবাসীর বিদ্বেষ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন, তিনি কোন সময়েই সবপ্রথম মৈত্রীর বন্ধন ছিন্ন করেন নি। তিনি ছিলেন শিশুদের প্রতি অনুরক্ত এবং কখনও শিশুদের দলের প্রতি মৃদু হাসি ও মিষ্টভাষায় সম্ভাষণ না জানিয়ে পথ অতিক্রম করতেন না। অকপট বন্ধুত্ব, মহান উদারতা, মানুষের অকুতোভয় সাহস ও আশা—সব মিলে তাঁর ক্ষেত্রে সমালোচনা প্রশংসায় পর্যবসিত করে।

"তিনি মহত্তম অর্থে একজন আগ্রহশীল ব্যক্তি ছিলেন, যেখানে আগ্রহশীলতা জগতে অপরিহার্য, এমন একটি গুণ যা মানুষকে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পুঁকে পাওয়া থেকে রক্ষা করে। আগ্রহশীলতা প্রায়ই নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কেননা এ অনুপযুক্ত কাজে প্রযুক্ত হয় কিংবা নিষ্ফল ক্ষেত্রে পতিত হয়ে কোন ফলোৎপাদন করে না। কিন্তু মুহম্মদের ক্ষেত্রে তেমনটি ছিল না। তিনি একজন আগ্রহশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন যখন জগতবাসীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আগ্রহশীলতা ছিল অপরিহার্য এবং তাঁর আগ্রহশীলতা ছিল মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তিনি এমন একজন সুখী ব্যক্তি ছিলেন। যিনি একটি মহান সত্যকে তাঁদের জীবনের প্রেরণার উৎসে পরিণত করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক আল্লাহর পয়গাম্বর। বাণীবহ এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি বিস্মৃত হন নি, যে তিনি কে ছিলেন কিংবা যে বাণী তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা যে তাঁর জীবনের মেরুমজ্জা তা কোনদিন বিস্মৃত হন নি। তাঁর সুমহান দায়িত্বপূর্ণ পদের সচেতনতা থেকে উদ্ভূত

তিনি পীড়িত লোকদের দেখাশোনা করতেন, প্রতিটি জানাজার মিছিল যা তাঁর নজরে পড়ত তাতে যোগদান করতেন, ভৃত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করতেন। নিজের ছাগ দোহন করতেন এবং নিজের পরিচর্যা নিজেই করতেন—এসব কথা সংক্ষিপ্তভাবে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।[১] তিনি কখনো আগে কোন ব্যক্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতেন না এবং কেউ বিচ্ছিন্ন না হলে তিনি বিচ্ছিন্ন হতেন না। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দিল দরাজ, সবচেয়ে সাহসী ও সবচেয়ে সত্যবাদী; তিনি যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত রক্ষক ছিলেন। কথোপকথনে তিনি ছিলেন সবচেয়ে মিষ্টভাষী ও সবচেয়ে সদালাপী। যাঁরা তাঁকে দেখতেন তাঁরাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে পড়তেন; যাঁরা তাঁর নিকট আসতেন তারাই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হতেন, যাঁরা তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন তাঁরা বলতেন, "আগে বা পরে তাঁর সদৃশ কাউকে কখনো দেখিনি।" তিনি বিপুল মৌনীস্বভাবের; কিন্তু তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তা গুরুত্ব ও বিবেচনা সহকারে বলতেন এবং তা কেউ বিস্মৃত হতেন না। "বিনম্রতা ও অনুকম্পা, ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও উদারতা তাঁর সমগ্র আচরণের মধ্য দিয়ে প্রবহমান ছিল এবং তিনি সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করেছিলেন। স্বজনহীন ও দুর্দশা-গ্রস্ত লোকদের প্রতি তিনি গভীর 'সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন······, দুষ্প্রাপ্যতার সময়েও তিনি তাঁর আহার্য অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন এবং তাঁর চারপাশের প্রত্যেকের আরাম-আয়াসের দিকে অত্যন্ত যত্নবান থাকতেন।" তিনি নিম্নস্তরের লোকদের দুঃখদুর্দশার কথা শ্রবণ করার জন্য পথের মধ্যে থামতেন। তিনি নীচু লোকদের গৃহে যেতেন তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সমবেদনা জানাতে, তাদের ব্যর্থতায় অনুপ্রেরণা দিতে। নীচতম দাসগণও তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে তাদের মালিকদের কাছে গিয়ে দুর্ব্যবহারের প্রতিকার কিংবা দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইত।[২] তিনি কখনো প্রথমে আল্লাহর প্রশস্তি কীর্তন না করে আহার শুরু করতেন না এবং শুকরিয়া প্রকাশ না করে আহার থেকে গাত্রোত্থান করতেন না। তাঁর

মহিমাব্যঞ্জক মর্যাদাবোধের সঙ্গে তিনি তাঁর লোকদের কাছে সুসংবাদ বহন করেছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিল তাঁর বিনয় যার মূল ছিল তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতার জ্ঞানের মধ্যে।"

১. মিশকাত, ২৪শ খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ২য় বিভাগ।

২. হায়াতুল কুলুব (শিয়া) ও রৌজাতুল আহ্‌বাব (সুন্নি)।

প্রতিটি কাজের সময় স্থানর্দিষ্ট ছিল। দিবাভাগে যখন তিনি নামাজে অতিবাহিত করতেন না, তখন দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দান করতেন এবং জনসাধারণের কাজ করতেন। রাত্রিতে তিনি সামান্য নিদ্রা যেতেন, অধিকাংশ রাত্রি ধ্যানস্থ অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তিনি দীন-দরিদ্রদের ভালবাসতেন ও তাদের শ্রদ্ধা করতেন। যাদের বসতবাড়ী ছিল না তারা তাঁর গৃহসংলগ্ন মসজিদের মধ্যে রাত্রিযাপন করত। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর সামান্য আহার্যে সামিল হওয়ার জন্য তাদের কাউকে কাউকে ডাকতেন; অন্যান্যরা তাঁর প্রধান প্রধান সাহাবীর অতিথি হত।[১] চরম শত্রুর প্রতিও তাঁর আচরণ ছিল মহানুভবতা ও ধৈর্যশীলতার নিদর্শন। রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রতি তাঁর কঠোর মনোভাব এবং নিজের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, হুমকি, জুলুম ও নির্যাতন বিজয় মুহূর্তে—মানবহৃদয়ের সংকট মুহূর্তে—সব বিস্মৃতির গহ্বরের নিমজ্জিত হত এবং চরম অপরাধীর প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শিত হত।

মুহম্মদ অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র সবই ছিল অনাড়ম্বর। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে অনেক সময় হযরতকে অনাহারে থাকতে হত। খেজুর ও পানি প্রায়ই তাঁর একমাত্র আহার্য ছিল। প্রায়শ কয়েক মাস ধরে অভাবের জন্য তাঁর গৃহে হাড়ি চড়ত না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে আল্লাহ তাঁর সম্মুখে এই জগতের সম্পদের কুঞ্জি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি।

বৌদ্ধিক ও প্রগতিশীল আদর্শের দিক থেকে এই বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুর মনমানসিকতা ছিল মূলত আধুনিক। তাঁর শিক্ষায় নিত্যপ্রয়াস ছিল মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য: "নিরন্তর প্রয়াস ছাড়া মানুষ টিকতে পারে না"[২]; "প্রয়াসের দিকটি আমার, আর তার সার্থকতা আসে আল্লাহর দিক থেকে।"[৩] তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, জগৎ একটি সুশৃঙ্খল সৃষ্টি—যে সার্বভৌম ধীশক্তি সমগ্র সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করছে তাঁর দ্বারা বিশ্বজগৎ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত—"প্রত্যেক বস্তুরই নির্দিষ্ট কাল রয়েছে"[৪]—তিনি ঘোষণা করেছেন। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষ তার

১. আবুল ফিদা পৃ. ৯৯; আল্ হালাবী, 'ইনসানুল উয়ুন' ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২।
২. লায়সা লিল ইনসানে ইল্লা মা সা'য়া।
৩. লাস্‌সায়ি মিন্নি আল্ এত্‌মামো মিনাল্লাহে।
৪. কুল্লু আমরিন মারহাওনুন বে আওকাতিহি।

মুক্তির জন্য চেষ্টার ব্যাপারে স্বাধীন। তাঁর সহানুভূতি ছিল সার্বজনীন; তিনি যাবতীয় জীবন্ত বস্তুর জন্য স্রষ্টার করুণা প্রার্থনা করতেন।[১] তিনিই ঘোষণা করেছিলেন যে একটি মানুষের জীবন রক্ষা করা সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করার সমান।

তাঁর সামাজিক ধারণা ছিল গঠনমূলক—বিচ্ছিন্নতাধর্মী নয়। তাঁর সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মুহূর্তেও তিনি পারিবারিক জীবনের কর্তব্য উপেক্ষা করেননি। মানুষের সেবাই তাঁর কাছে ছিল সর্বোচ্চ ধর্মকার্য। বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর আহ্বান যাদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে তাদের প্রতি কর্তব্য এড়িয়ে চলা নয়, বরং সেই কর্তব্য সম্পাদন করে "সুকৃতি ও পুরস্কার" অর্জন করা। শিশুরা আল্লাহর তরফ থেকে আমানত; স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়ে তাদের লালনপালন করতে হবে—পিতামাতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে হবে। কর্তব্যের বৃত্ত নিজ পরিবার আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও অবহেলিত "ধূলি বিমলিন" মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে আছে।

এই পয়গাম প্রচারের পর চৌদ্দ শত বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি যে নিষ্ঠা অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং সেদিনকার মতো আজও বিশ্বাসীদের অন্তরে ও মুখে সেই স্মরণীয় বাণী উৎসারিত হয়:

"হে আল্লাহর রাসুল, আমার জীবন তোমাতে উৎসর্গীত হোক।"

---

১. রাহমাতুল্লিল্ আলামিন।

দশম অধ্যায়

খিলাফতের উত্তরাধিকার : ইমামত

"আল্লাহর রজ্জু মজবুতভাবে ধারণ কর আর তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" —আল্ কোরআন

হযরত তাঁর স্বদেশবাসীর মধ্যে যে অধ্যাত্ম জীবনবোধ সঞ্চারিত করেছিলেন তা তাঁর জীবনাবসানে নিঃশেষ হয়নি। প্রথম থেকেই এটা ধর্মের একটি শর্ত ছিল যে, উপসানায় তিনি আত্মিকভাবে উপাসকদের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি। ধ্যানতন্ময় অবস্থায় হযরতের আত্মিক শক্তির অন্তর্ব্যাপিতা মানুষের আত্মা ঐশী সত্তার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে। যাবতীয় বংশগত বিরোধ ও ধর্মীয় কোন্দলের মধ্যে উপাসনার সময় তাঁর আধ্যাত্মিক উপস্থিতির মরমী ধারণা ধর্মের ক্ষেত্রে যে শক্তির যোগান দিয়েছে তা অতিরঞ্জিত হতে পারে না।

যে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে ইসলাম আদিস্তরে বিভক্ত হয়েছিল তারা একমত হয়েছিল যে শরীয়ত কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রথা ও কর্তব্যের ধর্মীয় উপকারিতা হযরতের প্রতিনিধির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তারাই ইসলাম ও বিশ্বাসীদের ধর্মীয় নেতা বা ইমাম।

খিলাফতীয় ইমামদের সমর্থকগণ "হাদিসের অনুসারীদের" থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দর্শনের অধিকারী। তাদের মতে, হযরতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার আলী এবং হযরতের কন্যা ফাতিমার বংশধরদের উপর বর্তে ছিল। তাঁরা বলেন যে ইমামত ঐশী নিয়োগবলে খিলাফতের পারম্পর্য রক্ষা করে থাকে। তারা আবু বকর, ওমর ও ওসমানের খিলাফতকে বৈধ বলে স্বীকার করেন না; তাঁরা মনে করেন যে আলীকে হযরত তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ইঙ্গিত করেছিলেন, কাজেই তিনিই বিশ্বাসীদের সত্যকার খলিফা ও ইমাম। আর হযরত আলীর হত্যার পর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তাঁর ও ফাতিমার বংশধরদের উপর বর্তে ছিল। "সরাসরি পুরুষ-পরম্পরায়" আলীর একাদশ পুরুষ ইমাম হাসান আল্ আসকারী পর্যন্ত, যিনি ৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে / ২৬০ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা মোতামিদের

রাজত্বকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইমামত তদীয় পুত্র মুহম্মদ ওরফে আল্ মাহ্‌জী (সত্য পথপ্রদর্শক)—শেষ ইমাম-এর উপর বর্তেছিল। মুহম্মদের পরিবারে এই ইমামদের কাহিনী অতীব শোকাবহ। অত্যাচারী মোতাওয়াক্কিল কর্তৃক হাসানের পিতা মদিনা থেকে সামারায় নির্বাসিত হন এবং আমৃত্যু সেখানে অন্তরীণ থাকেন। অনুরূপভাবে মোতাওয়াক্কিলের উত্তরাধিকারীদের ঈর্ষার ফলে হাসানকে বন্দী রাখা হয়। তার মাত্র পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুপুত্র পিতার অন্বেষণে তাদের বাসস্থান থেকে অনতিদূরে একটি সরাইখানায় গমন করে, সে আর সেখানে থেকে ফিরে আসেনি। এই দুর্দৈবের শোক শিয়াদের হৃদয়ে একটি আশা, একটি প্রত্যাশায় রূপান্তরিত হয়েছিল যে, একদিন এই শিশু দুঃখপূর্ণ ও পাপময় দুনিয়াকে তার দুঃখ ও পাপের ভার থেকে মুক্ত করতে প্রত্যাবর্তন করবে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্তও যখন ইবনে খালদুন[১] তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস রচনা করে-ছিলেন তখনও সরাইখানার দ্বারে সন্ধ্যাকালে অভ্যস্ত নিয়মে সমবেত হয়ে শিশুটিকে ফেরত দেওয়ার জন্য সনির্বন্ধ প্রার্থনা করত। দীর্ঘ ও নির্নিমেষ প্রতীক্ষার পর তারা হতাশ ও দুঃখপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। ইবনে খালদুন বলেন যে এটা ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। "যখন তাদের বলা হয়েছিল যে শিশুটির জীবিত থাকার সম্ভাবনা আদৌ নেই", তখন তারা জবাব দিত যে, "যদি পয়গাম্বর খিজির (আঃ)[২] জীবিত থাকতে পারেন তবে তাদের ইমাম কেন জীবিত থাকবেন না?" শিয়াদের মধ্যে এই ইমামের উপাধি 'মুনাতাজার'—প্রত্যাশিত, 'হুজ্জা'—সত্যের প্রমাণ, এবং 'কায়িম'—জীবন্ত।

ধর্মের দার্শনিক ছাত্রেরা প্রাচীন ধারণাসমূহের সঙ্গে শিয়া ও সুন্নী ধর্মবিশ্বাসের অদ্ভুত সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করতে ব্যর্থ হবে না। জরথুস্ত্র-অনুসারী-দের মধ্যে সেলুসিডাদের অত্যাচার এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে, সোসিয়োছ নামক একজন ঐশী-নির্ধারিত ত্রাণকর্তা বিদেশীদের হাত থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য খোরাসান থেকে বহির্গত হবেন। একই কারণ ইহুদীদের মধ্যে তাদের মসীহের আগমন সম্পর্কীয় ধারণার সৃষ্টি করেছিল। ইহুদীরা বিশ্বাস করেন যে মসীহ এখনও আসেননি; তাদের মতো সুন্নী মুসলমানদেরও বিশ্বাস ইসলামের ত্রাণকর্তা এখনও জন্ম-

---

১. কয়েক পৃষ্ঠা পরে দ্রষ্টব্য।

২. পরিশিষ্ট—৩ দ্রষ্টব্য।

গ্রহণ করেননি। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে মসীহ্ এসেছেন ও চলে গেছেন এবং আবার আসবেন। ইস্না আশারিয়াগণও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মতো মাহদীর পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। যিনি জগতবাসীকে অমঙ্গল ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করবেন। এই সব ধারণার উৎপত্তি ও তাদের বৈচিত্র্য বা একই কারণসমূহ থেকে উদ্ভূত। যুগের যে পরিস্থিতি-সমূহের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্ররূপে মাহদীর ধারণা রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা প্রাচীন যুগেও একই রূপ ছিল। ইসলাম, ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মে প্রত্যেক সন্ধ্যায় জগতকে দুঃখ ও পাপ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য ঐশী মনোনীত ইমামের আবির্ভাব কামনায় প্রার্থনা স্বর্গপানে ধাবিত হয়।

শিয়ারা বিশ্বাস করেন যে ইমাম 'গায়েব' (অনুপাস্থত) তথাপি তিনি তার দলের ধ্যানতন্ময়তার মধ্যে সর্বদা আত্মিকভাবে উপস্থিত থাকেন। আইনের ব্যাখ্যাতা ও ধর্মের ব্যবস্থাপকরা জগতে তার প্রতিনিধি ; এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানেরাও জগতে তার ঐহিক কার্যাবলীর প্রতিনিধিত্ব করেন। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে অপর একটি পার্থক্য রয়েছে, তা হল ইমামতের গুণাবলী নিয়ে শিয়াদের মতে ইমামকে অবশ্যই পাপশূন্য বা নিষ্পাপ (মাসুম) হতে হবে এবং তিনি হবেন মানবজাতির মধ্যে সুন্দরতম ব্যক্তিত্ব।

সুন্নীদের ধারণা যা মুসলিম জাহানের বিপুল সংখ্যক বিশ্বাসীদের জীবন, চিন্তা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তা শিয়াদের ধারণার ঠিক বিপরীত। সুন্নী ধর্মীয় আইন জোর দেয় যে বিশ্বাসীদের নিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য ইমামকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে এবং যেখানে ইমামের পক্ষে নামাজের ইমামতি করা সম্ভব নয় সেখানে এমন লোক নেতৃত্ব করবে যার ইমামতির অপরিহার্য গুণাবলী রয়েছে।

আইনবিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতত্ত্বের অধিকাংশ গ্রন্থে এই নীতি-সমূহ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। খিলাফত হযরতের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ; ইসলামের চিরস্থায়িত্ব ও তার আইন ও নিয়ম-সমূহের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের জন্য একে সুনির্ধারিত করা হয়েছে। কাজেই ইসলামের অস্তিত্বের জন্য একজন খলিফা (প্রতিনিধি) থাকবেন, যিনি হযরতের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। ইমামত হল আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ; কিন্তু এই দুটি উচ্চপদ অবিচ্ছেদ্য ; হযরতের প্রতিনিধি সেই ব্যক্তি যিনি একমাত্র নামাজের ইমামতি করতে সমর্থ, যখন তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন। কেউই তার কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে না যদি

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি তাকে "নিযুক্ত" না করেন। ইমাম ও জামাতের (মামুম)[১] মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধন রয়েছে যা ধর্মের ক্ষেত্রে একে অন্যকে পরস্পর বেঁধে ফেলে। এই নীতি ও 'ইসলামে পুরোহিততন্ত্র নেই'—এই নীতির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। প্রত্যেক মানুষ তার প্রভুর সামনে নিজের জন্য অনুময়-বিনয় জানাবে এবং অন্য কোন মানুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। ইমাম প্রত্যেক উপাসক ও ইসলামের মহাগ্রন্থ কোরআনের মধ্যে যোগসূত্র। ইসলাম ধর্মের এই মরমী উপাদান এর উল্লেখযোগ্য ঐক্যবদ্ধতার ভিত্তি।

উপরি-উক্ত মন্তব্য 'দারুল মুক্তারে' যে উক্তি রয়েছে তার উপরই গুরুত্ব আরোপ করে—ইমামত দু'প্রকারের 'ইমামাতুল কুবরা' ও 'ইমামাতুস্ ছোগরা'—সার্বভৌম আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও বিশ্বাসীদের নিষ্ঠায় তত্ত্বাবধায়কের কাজ করার জন্য যে গৌণ উদ্ভূত অধিকার। 'ইমামুল কবির'—সার্বভোম খলিফা সুন্নী জগতের খলিফা। হযরতের প্রতিনিধি হিসেবে তার উপর যুক্তভাবে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব যাবতীয় কর্তৃত্ব বর্তায়। তিনি পরামর্শ সভার সঙ্গে আলোচনা করে জাগতিক ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যেমন প্রথম চার খালিফার আমলে হয়েছে কিংবা যেমন পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এককভাবে বা সমবেতভাবে হয়েছে। কিন্তু জামাতের নামাজ পরিচালনার ব্যাপারে দৈহিক দিক দিয়ে অপারগ না হলে তিনি স্বয়ং ইমামতি করতে বাধ্য।

শিয়াদের মধ্যে জুম্মার নামাজ ও অন্যান্য উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নামাজ বৈধভাবেই একাকী এবং সমবেতভাবে সমাধা করা যেতে পারে। সুন্নীদের মতানুসারে যেখানে মসজিদ কিংবা ঈদগাহ্ আছে সেখানে সমবেতভাবে নামাজ কায়েম করা অপরিহার্য বা ফরয; বৈধকরণ ব্যতীত এই নামাজ থেকে বিরত থাকা পাপ; এই ধরনের নামাজ পরিত্যাগকারীদেরকে সাময়িকভাবে শাস্তি পেতে হয়। নজ্‌দে ইসলামের চুক্তিকারী হিসেবে কথিত ওয়াহাবীদের শাসনামলে অমনোযোগীদেরকে মসজিদের মধ্যে বেত্রাঘাত করা হত। আজ ইবনে সাউদের শাসনকালে তাঁর শিষ্য যারা "ইখওয়ান" বা "ধর্মীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ" নাম গ্রহণ করেছে তারাও ধর্মীয় বিধি-

১. এই শব্দটি 'ফাতওয়ায়ি আলমগিরি'তে ব্যবহৃত হয়েছে। এককভাবে অনুসা দের সচরাচর 'মুক্তাদি' বলা হয়ে থাকে।

বিধান পালনের ব্যাপারে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। জামাতের নামাজ যেহেতু ফরয, ফলে ইমামের উপস্থিতি শর্তহীনভাবে অপরিহার্য।[১]

সুন্নীরা জোর দিয়ে বলেন যে হযরতের অন্তিম অসুস্থতার সময়ে আবু বকরকে ইমামতি করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করার পূর্বে হযরতের মনোনয়ন "জনমণ্ডলী" গ্রহণ করেছিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) সর্বসম্মতিক্রমে মুসলমানদের খালিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই থেকে নিয়মিতভাবে এটাই সার্বজনীন রীতিতে পরিণত হয়েছে।

ধর্মীয় নেতার আসন অলঙ্কৃত করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর মধ্যে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় গুণ হল এই যে, তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান হবেন এবং বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সার্বভৌম পার্থিব ক্ষমতা পরিচালনার যোগ্য হবেন। ইমামকে 'নির্দোষ' হতে হবে কিংবা তিনি মানবজাতির মধ্যে "সর্বোত্তম" হবেন অথবা তিনি হযরতের বংশধর হবেন—সুন্নীদের মতে এমন আবশ্যকতা নেই। তাদের মতে, তিনি ব্যক্তিগত ত্রুটিমুক্ত স্বাধীন শাসক চরিত্রবান লোক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সমর্থ হবেন। প্রাথমিক পর্যায়ের হাদিসবেত্তা পণ্ডিতগণ হযরতের একটি উক্তির বলে খিলাফতের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কিত অধ্যায়ের শেষে একটি শর্ত সংযোজিত করেছেন : খলিফা কোরাইশ বংশোদ্ভূত হতে হবে। 'দারুল মুখতার' ও 'রাদ্দুল মুহ্তার' গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত এই শর্ত সংযোজনের অভীষ্ট লক্ষ্য হল আলী ও ফাতিমার বংশধরদের মধ্যে—হযরত মহম্মদ (দঃ)-এর বংশের মধ্যে খিলাফতকে অন্তর্ভুক্ত করায় শিয়া সম্প্রদায়ের দাবীকে নাকচ করা এবং প্রথম তিনজন খলিফা এবং উমাইয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণকে বৈধ খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত করা। মহান আইনবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন[২] টৈমারলেনের সমসাময়িক ; তিনি ওসমানের বংশধরদের খিলাফতলাভের বহুপূর্বে ১৪০৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর 'মুকাদ্দামা'য় (উপক্রমণিকা) এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি

১. বিভিন্ন সুন্নী মযহাবের মধ্যে এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। বিখ্যাত মালেকী ফেক্কাহ প্রণেতা, আইনবিজ্ঞানী খলিল ইবনে ইসহাক হানাফী ও শাফেরী আইন-প্রণেতাদের মতো একই ভাষায় আইন প্রণয়ন করেছেন।

২. তিনি বহু বছর ধরে কায়রোতে মালেকী সম্প্রদায়ের কাজী ছিলেন।

উক্তিটির বৈধতা সম্পর্কে বিরোধিতা করেননি; তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে ব্যাপারটি এমন একটি অনুমোদন যা পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। তিনি উল্লেখ করেন যে, যখন বিশ্বে ইসলামী বিধান প্রচারিত হয় তখন কোরাইশগণ আরবদেশে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। মুসলমানদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্ব তাঁর স্বগোত্রের একজন সদস্যের উপর বর্তানো উচিত—এ অনুমোদন বা কামনা করার সময়ে তিনি অব্যবহিত ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করেছিলেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা নিয়মের কথা ভাবেননি। সেকালে ইসলামের একজন যোগ্য ও সমর্থ শাসক শুধু কোরাইশদের মধ্যেই পাওয়া যেত। কাজেই খলিফা ও ইমাম তাদের মধ্য থেকে অনুমোদিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। একজন সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ সুন্নী আইনজ্ঞ কর্তৃক ব্যক্ত এই মতবাদ আধুনিক পণ্ডিত ('মুতাখেরিন')-গণ সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন—অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে ইমাম-নির্বাচনের ব্যাপারে কোনরূপ গোত্রগত বা বর্ণগত বাধা-নিষেধ নেই। আবু বকর মৃত্যুর পূর্বে খিলাফতের দায়িত্বে ওমরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছিলেন এবং মুহম্মদের বংশসহ সকলেই সার্বজনীনভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন। এই মহান খলিফার কার্যাবলীতে ক্ষুব্ধ হয়ে একজন খ্রীষ্টান কিংবা মাজী ধর্মোন্মাদ তাঁর উপর যে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্বজনপ্রীতির দোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে মুসলমানদের ভেতর থেকে ছয় জন প্রখ্যাত সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করেছিলেন। তাদের নির্বাচনী মনোনয়ন পড়েছিল ওসমানের উপর। তিনি উমাইয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং জনগণের সার্বজনীন রায়ের বলেই খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওসমানের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর হযরতের জামাতা, শিয়াদের মতে যিনি খিলাফতে বৈধ অধিকার বলে হযরতের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী, খলিফা ও ইমাম হিসেবে ঘোষিত হলেন। ফাতিমার স্বামী বংশগতভাবে ও নির্বাচনের বলে এই অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর পরিণত বয়স্ক পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলে প্রশাসনে যে দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করেছিল তা যখন তিনি দূর করতে সচেষ্ট হলেন তখন এক রাজ্যের শত্রু তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। উমাইয়া বংশোদ্ভূত মুয়াবিয়া, যিনি ওসমানের অধীনে সিরিয়ার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আলী বিদ্রোহ দমন করতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু অমীমাংসিত যুদ্ধের পর যখন তিনি ইরাকে

কুফার মসজিদে উপসনায় নিমগ্ন ছিলেন তখন এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন। আলীর জীবনাবসানে প্রাথমিক পর্যায়ের সুন্নী বিদ্বান ও ধর্মতত্ত্ববিদেরা যাকে 'খিলাফাতুল কামিলা'[১] (নিখুঁত খিলাফত) বলতেন তার সমাপ্তি ঘটল; কেননা এই খালিফা চতুষ্টয়ের প্রত্যেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আলীর মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসানের নিকট থেকে খিলাফতের ভার গ্রহণ করেন। হাসান কুফা ও তার অধীনস্থ প্রদেশসমূহের সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করে খলিফা পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন; মুয়াবিয়া এই উচ্চপদ গ্রহণে সিরিয়ার জনগণ সমর্থন করেন। ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটেছিল।

এখানে একথা স্মর্তব্য যে উমাইয়া ও হাশেমীয় বংশ একই কোরাইশ বংশোদ্ভূত কোরাইশ বংশের এই দুই শাখার মধ্যে তিক্ত বিরোধ চলছিল। হযরত তাঁর জীবদ্দশায় এই বিরোধ দূর করতে কিংবা তাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের মহান প্রয়াস চালিয়েছিলেন। হযরতের প্রপিতামহ হাশেমের নামানুসারে হাশেমীয়দের নামকরণ হয়েছিল। হাশেমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিবের অনেকগুলো পুত্র-সন্তান ছিল: তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্বাস। তিনি আব্বাসীয় খলিফাদের আদিপুরুষ। অপর পুত্র আবু তালিব খলিফা হযরত আলীর পিতা এবং তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পিতা।

মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা। মুয়াবিয়ার পৌত্রের মৃত্যুর পর এই বংশের হাকামীয় শাখার মারওয়ান খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র আব্দুল মালিক ও পৌত্র ওয়ালিদের শাসনামলে সুন্নী খেলাফত সর্বাপেক্ষা প্রসার লাভ করেছিল—এ একদিকে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং অন্যদিকে টাগাস থেকে সাহারা মরুভূমি ও আবাসিনিয়ার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হযরতের চাচা আব্বাসের বংশধর আবুল আব্বাস সাফফাহ উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পদচ্যুত ক'রে কুফার প্রধান মসজিদে খলিফা হিসেবে জনগণের নিকট 'বাইয়াত'[২] লাভ করেন।

---

১. হযরত আবু বকর থেকে হযরত আলী পর্যন্ত চারজন খলিফাকে 'খোলাফায়ে রাশেদীন'ও বলা হয়।—অনুবাদক

২. জনগণের নৈতিক বা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের পবিত্র শপথ।

শপথ গ্রহণের পর তিনি মিম্বরে আরোহণ ক'রে ইমাম বা তার প্রতিনিধিরা যে খোতবা পাঠ ক'রে থাকেন সেই খোতবা পাঠ করলেন। তার উত্তরাধিকারীগণ এই ভাষণ ধর্মীয় দিক থেকে যেভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন তা আরব ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ বস্তুত খিলাফতে আব্বাসের বংশধরদের অধিকারের বৈধতা বিষয়ক সুদীর্ঘ সমর্থন। এখন থেকে আবুল আব্বাসে সুন্নী জাহানের বৈধ শাসক এবং সুন্নী ধর্মসম্প্রদায়ের বৈধ আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর প্রথম ছয় জন উত্তরাধিকারী উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; এসব উত্তরাধিকারী বিভিন্ন ধরনের শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাদের কয়েকজন অসাধারণ মনীষা ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী ছিলেন। সাফফাহর পর তাঁর ভ্রাতা মনসুর খিলাফতের অধিকারী হন। তিনি বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এই বাগদাদ নগরীর তাঁদের রাজ-ধানীতে পরিণত হয়। এ সচরাচর 'দারুল খিলাফত' (খিলাফতের নিলয়) এবং 'দারুস্ সালাম' (শান্তির নিলয়) বলে অভিহিত হত। এখানে আব্বাসীয় খলিফাগণ কয়েক শতাব্দী ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাত্ম ও জাগতিক কর্তৃত্ব চালিয়েছিলেন। কায়রোতে তাদের প্রতিপত্তিশালী বিরোধীরা সালাদীনের সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং কর্দোভার গৌরবান্বিত উমাইয়া বংশ একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অন্তর্হিত হল। আল্‌মোয়াহিদ, আলমোরাভাইদ এবং আল্‌মোরা-ভাইদদের পতনের ফলে যে সব বার্বার ও আরব রাজবংশ মরক্কোর সিংহাসনে আরোহণ করেছিল তাদের কারও সুন্নী সম্প্রদায়ের ইমামতি করার বৈধ অধিকার ছিল না। আটলান্টিক থেকে গঙ্গা নদী, কৃষ্ণসাগর ও জাক্সারটেস থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত আব্বাসীয় খলিফাগণ সুন্নী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানের নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করেছিলেন। হিয্‌রী ৪৯৩ (১০৯৯ খ্রী.)-তে আল্‌মোয়াহিদ বিজেতা ইউসুফ বিন্ তাশ্‌ফিন আখ্‌যাল্লাকার যুগান্তরকারী যুদ্ধে খ্রীষ্টান সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ক'রে আব্বাসীয় খলিফা আল্‌মুকতাদিরের নিকট থেকে 'আমিরুল মুসলেমীন', উপাধিতে বিভূষিত হন; খলিফা মুস্তাজাহরও এই উপাধি বহাল রেখেছিলেন। একথা মনে রাখা উচিত যে কর্দোভার খলিফা কিংবা পরবর্তীকালের কোন মুসলমান নৃপতি 'খলিফাতুর রাসুল' (হযরতের প্রতিনিধি) উপাধি ধারণ করেননি কিংবা দাম্ভিকতার সঙ্গে 'আমিরুল্ মুমেনীন' (মুমিনদের নেতা) উপাধিও গ্রহণ করেননি।

পরিপূর্ণভাবে পাঁচ শ' বছর ধরে বাগদাদ ছিল ইসলামের সর্ববিধ চিন্তামূলক কার্যের প্রাণকেন্দ্র। এখানে খিলাফত এবং অন্যান্য পার্থিব ও ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কে বিধিবিধান প্রণালীবদ্ধ হত। আজকের মতো খলিফা ইমাম হযরতের ঐশী নিযুক্ত প্রতিনিধি—এই ধারণা জনসাধারণের ধর্মীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। এভাবে দেখা যাবে যে সুন্নী মতানুসারে খলিফা শুধু পার্থিব শাসক নন; তিনি ধর্ম সম্প্রদায় ও প্রজাতন্ত্রের ধর্মীয় প্রধান এবং ঐশী শাসনতন্ত্রের সত্যিকার প্রতিনিধি।[১] প্রথম প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আব্বাসীয় ফিলাফত পাঁচ শত বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল। এ সময়ে মুস্তাসিম বিল্লাহ খলিফা ছিলেন; তিনি তাঁর পুত্রগণ এবং পরিবারের প্রধান সদস্যগণসহ পাইকারী হত্যাকাণ্ডে নিহত হন। আব্বাসীয় বংশের সেইসব অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের জীবন রক্ষা পেয়েছিল যাঁরা রাজধানীর বাইরে ছিল কিংবা পরিচয় এড়াতে সমর্থ হয়েছিল।

মুস্তাসিম বিল্লাহর হত্যাকাণ্ডের দু' বছর পর সুন্নী জাহান, তীব্রভাবে একজন খলিফা ও ইমামের অভাব অনুভব করেছিল; ধর্মের একজন আধ্যাত্মিক নেতার অভাবে দুঃখের তীব্রতা এবং বিশ্বাসীদের নিকটে সান্ত্বনা ও ধর্মীয় উৎকর্ষ আনতে পারেন হযরতের এমন একজন প্রতিনিধির সাতিশয় প্রয়োজনীয়তার কথা খলিফাদের ঐতিহাসিক সখেদে ব্যক্ত করেছেন।[২] একজন স্বীকৃত ইমামের উপস্থিতিতে যে ধর্মীয় উপকার সাধিত হয় তা থেকে মানুষের নিষ্ঠা ও ভক্তি বঞ্চিত ছিল, মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনাও সমভাবে উৎকর্ষশূন্য ছিল। সুলতান বায়বার সমগ্র সুন্নী জাহানের সঙ্গে একজন খলিফা ও ইমামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। পাঁচ শ' বছর ধরে খিলাফতের অধিকার আব্বাসীয় বংশের মধ্যে অবিসম্বাদিতভাবে ন্যস্ত ছিল; আবুল কাসিম আহমদ নামে এই পরিবারের একজন সদস্য মোঙ্গলদের হত্যাকাণ্ড এড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং খলিফার আসনে সমাসীন করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কায়রোর আবেষ্টনীতে উপনীত হলে সুলতান বিচারকমণ্ডলী ও পারিষদ সমভিব্যাহারে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলেন। অভিবেক-উৎসব চিত্তাকর্ষক ও পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর বংশ-পরিচয় প্রথমে প্রধান কাজী বা বিচারকের সমীপে প্রমাণ করতে

. সয়ুতি। ২. প্রাগুক্ত।

হয়েছিল। অতঃপর তাঁকে খলিফার আসনে অভিষিক্ত করা হল এবং 'মুস্তাসির বিল্লাহ'—"আল্লাহর সাহায্য অন্বেষণকারী"—এই উপাধিতে খলিফা হিসেবে স্বীকার করা হল। প্রথম 'বয়েত' (শপথ) গ্রহণ করলেন সুলতান স্বয়ং ; তারপর প্রধান কাজী তাজউদ্দীন, রাজ্যের প্রধানগণ ও মন্ত্রিবর্গ এবং অভিজাত বংশীর লোকেরা তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী। ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে এই অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নূতন খলিফার নাম মুদ্রার উপর খোদিত হয়েছিল ও তাঁর নামে 'খুতবা' পঠিত হয়েছিল। পরবর্তী শুক্রবারে আব্বাসীয় বংশের কালো[১] পোশাক পরিধানপূর্বক মিছিলে সামিল হয়ে মসজিদে গমন করেন এবং খলিফার ভাষণ দান করেন। বিশ্বাসীদের খলিফা হিসেবে অভিষেক সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি সুলতানকে পোশাক ও উপাধিতে ভূষিত করলেন, যা গোঁড়া মুসলমানদের দৃষ্টিতে বৈধ কর্তৃপক্ষের জন্য অপরিহার্য।

কায়রোতে এভাবে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খিলাফত আড়াই শ' বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ে যারা মিশর শাসন করতেন ইতিহাসে তাদেরকে মমলুক সুলতান বলা হয়। প্রত্যেক সুলতান শাসনভার গ্রহণকালে খলিফা ও "সেই সময়ের ইমামের" (ইমামুল্ ওয়াক্ত) নিকট থেকে অভিষেক সনদ প্রাপ্ত হতেন এবং খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে শাসন পরিচালনা করতেন। ধর্মাধ্যক্ষ ও বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে খলিফার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। যাবতীয় পার্থিব ক্ষমতাবিরহিত হলেও খলিফার ধর্মীয় ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল এবং জনজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বাস সুন্নী জাহানের ধর্মীয় আবেগে এতই দৃঢ়মূল ছিল যে বাগদাদের দুবার পতনের পরও ভারতের মুসলমান নৃপতি আব্বাসীয় খলিফাদের নিকট থেকে অভিষেক উপাধি লাভ করতেন। ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঘলকাবাদের বিশাল অসমাপ্ত নগরীর প্রতিষ্ঠাতা, মুহম্মদ জুনা খান তুঘলক কর্তৃক খলিফার দূতকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তার বিবরণ থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে মিশর থেকে ছ'মাসের দূরবর্তী হিন্দুস্তানেও খলিফা কত গভীরভাবে সম্মানিত হতেন। দূতের আগমন বার্তা শ্রবণ করে সুলতান সৈয়দ ও সম্ভ্রান্ত লোকজনসহ তাকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য রাজধানীর বাইরে গেলেন ; আর যখন খলিফার

---

১. আব্বাসীয়দের রাজকীয় বর্ণ কালো, উমাইয়াদের বর্ণ সাদা এবং মুহম্মদের বংশধর ফাতেমীয়দের বর্ণ সবুজ।

পত্র সুলতানকে দেওয়া হল তিনি তা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। অভিষেকের আনুষ্ঠানিক উপাধি প্রধান সুলতানের বৈধতার দলিল হিসেবে কাজ করত। রাজসভার কবি বিখ্যাত বদরুদ্দীন চাচের একটি কবিতা যা এখনও ভারতে বর্তমান তার মধ্যে এই ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা রয়েছে।

প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ওসমানের বংশধর প্রথম সেলিম ওরফে সাফ্‌ফাহর আবির্ভাব ঘটে। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল 'ধর্মের রক্ষক' এই উপাধি। কোন মুসলিম নৃপতি, এমন কি পারস্যে সূফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গোঁড়া শিয়া রাষ্ট্রের স্রষ্টা, তাঁর বড় প্রতিদ্বন্দ্বী শাহ ইসমাইলও মহত্ত্ব ও শক্তিতে ওসমানীয় নৃপতির সমকক্ষ ছিলেন না।

ঐ শতাব্দীর শেষ শতকগুলোতে মিশরের অবস্থার বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। পরবর্তী মমলুক সুলতানদের অধীনে যে নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল কয়েক বছর পরে তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। বিশৃঙ্খল দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য মিশরবাসীদের এক অংশ দ্বারা আহূত হয়ে সেলিম সহজেই অযোগ্য মমলুকদের পরাভূত করে মিশরকে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই সময়ে যে খলিফা হযরতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছিলেন তিনি আল্ মুতাওয়াক্কিল্ আলাল্লাহ (প্রভুর করুণার মধ্যে পরিতৃপ্ত) এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। সুন্নী বিবরণী অনুসারে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, একমাত্র মুসলিম নৃপতি যিনি এককভাবে খলিফা ও ইমামের দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে পারতেন, আর যিনি নীতিগত ও ব্যবহারিকভাবে ইসলামের খিলাফতকে পুনঃ প্রবর্তন করতে পারতেন এবং এই পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব কার্যকর ভাবে সম্পন্ন করতে পারতেন তিনি সেলিম। তাই তিনি ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে হস্তান্তরকরণের আনুষ্ঠানিক দলিলের সাহায্যে খিলাফত অটোম্যান-বিজেতার উপর অর্পণ করলেন এবং রাজকর্মচারী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ সহ "সুলতানের হাতে 'বয়েত' গ্রহণ করলেন।" একই বছরে মক্কার শরীফ, আলীর বংশধর, মুহম্মদ আবুল বারাকাতের নিকট থেকে সেলিম খিলাত সম্মান লাভ করলেন। তিনি তাঁর পুত্র আবু নউমির মাধ্যমে রজত রেকাবীতে মক্কা চাবি উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমে শপথও নিয়েছিলেন, সেলিমের মধ্যে প্রদান ও বয়াতের মাধ্যমে আব্বাসীয় অধিকার এবং সে সময়ে পবিত্র নগরীসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হযরতের বংশ-ধরদের প্রতিনিধির সংযুক্তি অটোম্যান সুলতানদের খিলাফতের অধিকারকে

নিখুঁত করেছিল, "যেমনি খিলাফতে আলীর অন্তর্ভুক্ত প্রথম তিনজন খলিফার নির্বাচনকে পূর্ণতা দিয়েছিল।" মক্কা ও মদিনায় প্রদত্ত চিরাচরিত খুতবার সঙ্গে পবিত্র প্রার্থনা সেলিমের খিলাফতের অধিকারকে প্রয়োজনীয় পূর্ণতা দিয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর প্রশাসন কেন্দ্র—রাজধানী কনস্টান্টিনোপল 'দারুল খিলাফতে' রূপান্তরিত হল এবং "ইসলানবোল"—"ইসলামের শহর" বলে অভিহিত হতে শুরু করল। পূর্ব থেকেই বিভিন্ন সুন্নী রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রদূত সেলিম ও তাঁর পুত্র, মহান সম্রাট সোলায়মানের দরবারে তাদের সম্মান জ্ঞাপন করতে আসত। এভাবে সুন্নীদের মতে খিলাফত ওসমানের বংশের উত্তরাধিকারে পর্যবসিত হল এবং কোন প্রতিরোধ বা বিরোধ ছাড়াই তারা চার শ' বছর ধরে এই উত্তরাধিকার উপভোগ করেছিল :

দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম

দ্বিতীয় পর্ব

ইসলামের মর্মবাণী

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের আদর্শ

যদি আসো আমার কাছে
খুঁজো নাকো আমায় ছাড়া,
আমি দাতা, দয়ার সাগর ;
খুঁজলে পাবে আমার সাড়া।
কোনদিন কি পাওনি তুমি
ডেকে আমায় সঙ্গোপনে ?
তবে কেন ভাবছ তুমি ?
—ডাকো আমায় খুল্লমনে।
বিরহী মন যখন বলে :
"আমায় তুমি খুঁজো নাকো",
তখনি ধাই তার পানে যে,
তাইতো বলি আমায় ডাকো।
বান্দার মধ্যে অবাধ্যতা দেখলে পরে
সাজা আমি দিই যে তারে।
তাইতো বলি ডাকলেই পাবে
অন্তর দিয়ে ডাকো মোরে।

যিশুর প্রচারিত ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম নাম ধারণ করেছে। এটা তাঁর উপাধি 'খ্রীষ্ট' থেকে গৃহীত। মুসা ও বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মও প্রবর্তকদের নামানুসারে রাখা হয়েছে। একমাত্র মুহম্মদ-প্রচারিত ধর্ম বিশিষ্ট নামের অধিকারী। তা হল ইসলাম মুহম্মদের ধর্মের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হলে 'ইসলাম' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। 'সালাম' (সালামা) শব্দটি প্রাথমিক অর্থে শান্তিতে থাকা, কর্তব্য সম্পাদন করা, দেনা শোধ করা, পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে অবস্থান করা বুঝায়, আর গৌণ অর্থে শব্দটি যাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা বুঝায়। এর থেকে যে বিশেষ পদ গঠিত হয় তার অর্থ হল শান্তি, অভ্যর্থনা, নিরাপত্তা, পরিত্রাণ। সাধারণ্যে যেভাবে অনুমিত হয় শব্দটি সেভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বুঝায় না, বরং ধর্মপরায়ণতার প্রতি প্রয়াস বুঝায়।

ইসলামের নৈতিক মূলনীতিসমূহের সার কোরআনের দ্বিতীয় সুরা বাকারার মধ্যে সংক্ষেপ-সারের আকারে বিবৃত হয়েছে : "এ যে সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এ যে ধর্মভীরুদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান। অদৃশ্যে যারা বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম রাখে, আমি যে রুজী তাদেরকে দান করি তা থেকে খরচ করে। আর আপনার উপর যা নাজিল হয়েছে তার উপরে আর আপনার আগেও যা নাজিল হয়েছে তাও যারা বিশ্বাস করে। আর আখিরাত সম্পর্কে যারা আস্থাবান। 'এরাই তাদের পালনকর্তার পথগামী— এরাই সফল হবে।'[১]

যেসব মৌলিক ভিত্তির উপর ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তা হল (১) স্রষ্টার একত্ব, বিমূর্ততা, ক্ষমতা, করুণা ও সর্বোচ্চ প্রেমের প্রতি বিশ্বাস, (২) মানবজাতির মধ্যে বদান্যতা ও ভ্রাতৃত্ব, (৩) প্রবৃত্তিসমূহের দমন, (৪) যাবতীয় কল্যাণ-প্রদাতার প্রতি সকৃতজ্ঞ হৃদয়, এবং (৫) পরকালে মানুষের কার্যাবলীর হিসাবনিকাশ। আল্লাহর ক্ষমতা ও প্রেম সম্পর্কে কোরআনে যে মহান ধারণাসমূহ ব্যক্ত হয়েছে আর কোন ভাষায় তার তুলনা নেই। আল্লাহর একত্ব, বিমূর্ততা, শক্তি-মহিমা ও করুণা আল্ কোরআনের সর্বাপেক্ষা বেগবান ও উদ্দীপনামূলক অনুচ্ছেদ-সমূহের নিরবচ্ছিন্ন বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জীবন, জ্যোতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ কখনও থামেনি। কিন্তু এই গ্রন্থে নির্বিচারবাদের কোন আভাস নেই। মানুষের আন্তর চৈতন্য, একমাত্র তার স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞার প্রতি আবেদন করা হয়েছে।

এবার আসুন হযরতের ইসলাম প্রচারকালে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা করা যাক। পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে খোদার ধারণা ব্যক্তি বা গোত্রভেদে বিভিন্ন রূপ ছিল। তুলনা-মূলকভাবে বললে কোন কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করত, কেউ কেউ মৃত্তিকা, দণ্ড কিংবা পাথর পূজা করত; কেউ কেউ পরকালে বিশ্বাস করত, আবার কারও সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সিরীয়-ফিনিসীয়দের মতো প্রাক্-ইসলামী আরবদের কানন ছিল, দৈববাণীর জন্য বৃক্ষ ছিল, পুরোহিতবৃন্দ ছিল। লিঙ্গপূজা তাদের মধ্যে অজ্ঞাত ছিল না; স্বর্গীয় আপ্যায়নকারীদের মতো প্রজননক্ষম শক্তিসমূহ পাথর ও কাঠের তৈরী স্মৃতিস্তম্ভের তলায় পূজা লাভ করত। এখনকার

---

১. সু. ২ আ. ১—৬।

মতো তখনও মরুভূমির অবাধ্য অধিবাসীরা যে অদৃশ্য শক্তি দেশের উপর দিয়ে ঝটিকা প্রবাহিত করত কিংবা পথচারীকে বিভ্রান্ত করার জন্য মনোরম দৃশ্য জাগিয়ে তুলত তার ধারণা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞেয় ছিল না। এরূপ উচ্চতর উপাস্য, সবকিছুর প্রভুর[১] দুর্বোধ্য, অনভিজ্ঞাত ধারণা আরবজাহানে ভেসে বেড়িয়েছিল।

ইহুদীগণ যাদেরকে একত্ববাদী ধারণার মহান রক্ষক বলে ইতিহাসে সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, সম্ভবত এই ধারণা গঠনে সাহায্য ক'রে থাকবে। ধর্মীয় বিধান ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিমূলক উপাদান দ্বারা পরিপোষিত না হলে একটা জাতির চিন্তায় কি বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটতে পারে তা তারা নিজেরাই দেখিয়েছে।

ইহুদীরা বিভিন্ন সময়েও বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে আরবে প্রবেশ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই আগন্তুকদের বিভিন্ন দল, শরণার্থী বা ঔপনিবেশিকদের ধারণার মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। যারা ভেস্পাসিয়ান, ট্রাজান বা হাড্রিয়ানদের পূর্বে পলায়ন করেছিল তাদের চেয়ে অ্যাসিরীয় বা ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা বিতাড়িত লোকদের ধারণা অধিকতর ঈশ্বরে মানব-গুণাবলীর আরোপ-নির্দেশক কিংবা ঈশ্বরে মানব-আবেগসমূহের আরোপ-সূচক ছিল। যে সব বৈশিষ্ট্য ইসরাইলদেরকে তাদের নিজ জন্মভূমিতে পুনঃ পুনঃ পৌত্তলিকতার মধ্যে টেনে নামিয়েছিল যখন তাদের শিক্ষকগণ তাদের মধ্যে থেকে তাদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, তা তাদেরকে তাদের আরব ভাইদের পৌত্তলিকতা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ইবরাহিমের আল্লাহর ধারণার সঙ্গে তারা স্বাভাবিকভাবে উপাস্যের জড়াত্মক ধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল। তাই আমরা তাদেরকে কাবাগৃহের অভ্যন্তরে "ইবরাহিমের পাশে উৎসর্গের জন্য একটি ভেড়ার মূর্তি" নির্মাণ করতে দেখি।

পরবর্তী আগন্তুকদের মধ্যে শাম্মাইত ও জীলটগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাদের মধ্যে আইনের উপাসনা পৌত্তলিকতার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, আর ইহুদী পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ প্রায় উপাস্যের মতই শ্রদ্ধা দাবী করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে তারাই জনগণের অভিভাবক, আইন ও ঐতিহ্যের রক্ষক, "জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও দর্পণ যাতে আইনানুসারে জীবনের

---

১. শাহরিস্তানী : টাইলি প্রাক্—ইসলামী আরবদের ধর্মকে "সর্বপ্রাণবাদী বহু-দ্বৈতবাদ" বলে অভিহিত করেছেন।

সঠিক পন্থা সংরক্ষিত"।[১] তারা নিজেদেরকে "জাতির পুষ্প" বলে বিবেচনা করতেন এবং খোদার সঙ্গে যোগাযোগের দরুন তারা ভবিষ্যদ্বাণী করার অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন। বস্তুতঃ, জনগণও নিজেদের দ্বারা তারা আল্লাহর প্রধান অনুগৃহীত বলে বিবেচিত হতেন।[২] জোসফাস বলেন যে, মুসার প্রতি ইহুদীদের সম্মানবোধ এতই অধিক গড়িয়েছিল যে তারা তাঁকে খোদার পরেই সম্মান দিত এবং কায়নীয়া বংশের[৩] অন্তর্গত জাতীয় জীবন ও আইনের পুনঃপ্রবর্তক এজরার প্রতি এই সম্মান বিনিময় করেছিল।

পরন্তু, ইহুদী জনগণ সম্ভবত কখনও টেরাফিমের উপাসনা পরিত্যাগ করেনি—এক ধরনের পারিবারিক দেবতাদের উপাসনা—এ সব দেবতা মানুষের আকৃতিতে তৈরী করা হত এবং পারিবারিক দৈববাণীরূপে তাদের পরামর্শ প্রার্থনা করা হত কিংবা তাদেরকে অভিভাবক গৃহদেবতা হিসেবে সম্ভবত অধিকতর বিবেচনা করা হত।[৪] পৌত্তলিক আরবদের সংস্পর্শে এসে এই উপাসনা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকবে।

যখন যিশু জুডিয়ায় আবির্ভূত হলেন তখন একটি বংশ—জিহোভার উপাসকগণ আল্লাহর একত্ববাদ এবং ক্ষমতা ও করুণার মাধ্যমে বিশ্বপ্লাবী পরম ইচ্ছাশক্তির ধারণা গ্রহণ করেছিল। এমনকি এই বংশের লোকদের মধ্যেও সকল প্রয়াস সত্ত্বেও আল্লাহর ধারণা হয় পৌত্তলিক জাতিসমূহের সংস্পর্শে এসে পঙ্কিলতা প্রাপ্ত হয়েছিল নয় বিধর্মী দর্শনসমূহের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। এক পক্ষে চ্যাল্ডীয়-মাজীয় দর্শন ইহুদী ঐতিহ্যের উপর তার অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল, পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চিন্তাবিদেরা গ্রীক ও রোমান দার্শনিকদের মধ্যে মহান আদি কারণের ধারণার সূচনা করলেও আলেকজান্দ্রিয় চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন সব ধারণা সংযুক্ত করেছিল যা তাদের একত্ববাদী ধর্মমতের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

যিশু যখন তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন তখন হিন্দুদের মধ্যে অনেক দেবদেবীর পূজা হত; মাজো-যরথুস্ত্রবাদীগণ দুই ঐশী সত্তার ধারণা নিয়ে প্রভুত্ব অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছিল; গ্রীক, রোমান ও মিশরীয়দের

---

১. ডলিংজার, 'দি জেণ্টাইল এণ্ড দি জিউ' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮।

২. জোসফাস, 'এণ্টিকুইটিস' ১৭শ অধ্যায় ২৪। বলতে গেলে তারা ইহুদীদের ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৩. এজরা ৭.১০।

৪. জাজেস ১৮.১৪।

মন্দির বিভিন্ন উপাস্য-বিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল, আর তাদের নৈতিকতা উপাসকদের নৈতিকতারও নিম্নে অবস্থিত ছিল। এই ছিল সেকালের সভ্য-জগতের অবস্থা। যিশু তাঁর যাবতীয় স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়েও তাঁর অত্যুৎসাহী অনুসারীদের আরোপিত সকল প্রবঞ্চনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি কখনও নিজেকে "আল্লাহর পরিপূরক" কিংবা "ঐশী সত্তার অংশ" হিসেবে দাবী করতেন না।

এমন কি আধুনিক ভাববাদী খ্রীষ্টধর্ম অতীত যুগসমূহের অবতারবাদের ঐতিহ্য এখনও পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে মহান শিক্ষকের ইতিহাস থেকে যাবতীয় মানবিক উপাদান পরিহার করে তাঁর ব্যক্তি-সত্তাকে পৌরাণিক কাহিনীর জগাখিচুড়িতে পর্যবসিত করা হয়েছিল। 'এক শতাব্দীর তা দেয়ার ফলে' নিউ টেস্টামেণ্ট সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে অস্পষ্টতার কুজ্ঝটিকায় আবৃত করে ফেলেছিল। প্রতিদিন 'অনন্তের বুকে জাত কাল' শক্তি সংগ্রহ করেছিল এবং নিসের পরামর্শ সভায় তার আকৃতি ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছিল ও একটি ধর্মমতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

অনেক মানুষ সার্বজনীন পিতার দূরবর্তিতায় বিভ্রান্ত হয়ে মধ্যবর্তী পথে এক মানবিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে এবং তাঁকে তারা ঐশী বলে অভিহিত করে। উপাসনার নিকটবর্তী বস্তুর এই আবশ্যকতা আধুনিক খ্রীষ্টধর্মকে একটি আদর্শের নামকরণ ক'রে সেই আদর্শকে রক্ত-মাংসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে এবং তাকে মানব-ঈশ্বর বলে পূজা করেছে।

নাজারাতের প্রেরিত পুরুষ যে পৌনঃপুনিকতা সহকারে নিজেকে "আল্লাহর পুত্র" বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর ঐশীত্বের প্রমাণস্বরূপ নিজে আল্লাহর ন্যায় একই উপাসনা দাবী করেছিলেন তা 'ডিফেক্টস অব মডার্ণ ক্রিশ্চিয়ানিটি' গ্রন্থের মেধাবী (?) লেখক তা বিচার করছেন। যেভাবে খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও যুক্তিবাদীরা ব্যাখ্যা করেছেন যে যিশু নিজেকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন, তা আমরা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। ম্যাথু আর্নল্ড চূড়ান্তভাবে দেখিয়েছেন যে নিউ টেস্টা-মেণ্টের বিবরণ বহু দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য। যদি ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর প্রতি যে গুণাবলী আরোপ করা হয়েছে তিনি তা ব্যবহার করে-ছিলেন, তাতে কি প্রমাণিত হয় যে তিনি "পিতার একমাত্র জাত"? খ্রীষ্টান যুক্তিবাদীরা কি শোনেননি যে প্রাচ্যের বিখ্যাত সাধক আল্

হাল্লাজ যিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেছিলেন, বলেছিলেন "আনাল্ হক্ক"—"আমি সত্য" এবং ইহুদী সেন্‌হেড্রিমের মতো মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞগণ নিন্দনীয় বাক্যের জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল? বেচারা সরলহৃদয় সাধককে সুগভীর মরমী উপলব্ধি ব্যক্ত করার জন্য এভাবে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হল। বাবী সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে যে তাদের নেতা—অনন্ত জীবনের "ফটক", নিহত হননি, তাঁকে অলৌকিক উপায়ে স্বর্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। একথা কি বলা যেতে পারে যে যখন আবু মুঘিস আল্ হাল্লাজ[১] এবং বাব নিজেদের 'সত্য' ও 'স্বর্গের ফটক' বলেছিলেন, তখন তাঁরা কি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা ঐশী-সত্তার অংশ, আর যদি তাঁরা তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন তবে তাঁদের দাবী কি প্রমাণের সমকক্ষ? কিন্তু আমরা, পূর্বেই বলেছি যে যিশুর ধারণাসমূহকে তাঁর শিষ্যদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করলে তাঁর চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব এককভাবে অতিরঞ্জন দোষমুক্ত হয়। আমরা একথা অস্বীকার করি যে তিনি এমন উক্তি করেছেন যা তাঁর প্রতি আরোপিত দাবী প্রতিপন্ন করতে পারে। আল্লাহর "পিতৃত্ব" সম্পর্কীয় ধারণা সমগ্র মানবজাতিকে স্পর্শ করেছিল। সব মানুষই আল্লাহর সন্তান এবং তিনি সেই চিরন্তন পিতা[২] কর্তৃক প্রেরিত তাদের শিক্ষক। সুতরাং খ্রীষ্টানদের সম্মুখে মহত্তর দৃষ্টান্তই ছিল। নাজারাতের প্রেরিত পুরুষের শিক্ষা তাদেরকে উপাস্যের এক বিশুদ্ধতর ধারণায় উন্নীত করা উচিত ছিল। কিন্তু ছয় শত বছর ধরে তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে তাঁর বাণীর বিরোধী পুরাণ (বানোয়াট গল্পকথা) গড়ে উঠেছে যা তাঁকে খোদাতে পর্যবসিত করেছে। জগতের উপাসনার ক্ষেত্রে "দাস" প্রভুর স্থান দখল করেছে। অজ্ঞ জনসাধারণ নব্য পিথাগোরীয় মতবাদ, প্লেটো-বাদ, জুডিয়ো-হেলেনীয় দর্শনের সঙ্গে যিশুর শিক্ষার এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে যিশুকে খোদার অবতার বলে পূজা করত

[১] আবু মুঘিস ইবনে মনসুর, আল্ হাল্লাজ যৌবনকালেই মারা যান। তিনি ছিলেন নির্ভেজাল নৈতিকতা ও চরম সরলতার অনুশীলনকারী, দীনজনের বন্ধু, কিন্তু স্বপ্নবিলাসী ও অত্যুৎসাহী। 'বাব' ও বাববাদের জন্য গোবিনিউকৃত 'লা রিলিজি ান এটলা ফিলোসফিস ডান্স ল' 'এসিয়া সেণ্ট্রাল' এবং প্রফেসর ই. জি. ব্রাউনকৃত 'দি হিস্ট্রী অব দি বাব' গ্রন্থ দুখানা দেখুন।

[২] তখনকার খ্রীষ্টানদের মধ্যে পিতার ধারণা এমন বিকৃত হয়ে পড়েছিল যে ইসলামে খোদা সম্পর্কে 'পিতা' শব্দটির প্রয়োগ বর্জিত হয়।

কিংবা স্মৃতিচিহ্ন ও ধাতুতে খোদিত দেবীর মূর্তি, যা যিশুর নির্ভেজাল মাতার প্রতিবেদন ছিল, সেই আদিম উপাসনায় ফিরে গিয়েছিল।[১] কলিরিডিয়ানগণ কোন দিক দিয়েই গুরুত্বহীন গোত্র ছিল না; তারা এতদূর অগ্রসর হয়েছিল যে খ্রীষ্ট-ধর্মমন্দিরে কুমারী মেরীকে খোদা হিসেবে চালু করেছিল এবং তাকে ঈশ্বর বলে উপাসনা করত ও পাকানো পিঠা উৎসর্গ করত—এই পিঠার নাম ছিল 'কলিরিস', যা থেকে এই গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে। নিসের পরামর্শ সভায় যিশুর স্বরূপ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, সেখানে এমন লোক উপস্থিত ছিল যারা পিতা ঈশ্বর ছাড়া আরও দু'জন ঈশ্বর—খ্রীষ্ট ও কুমারী মেরীর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল।[২] কথিত আছে রোমান্টিকরা এখনও পর্যন্ত যিশুর মাতাকে ত্রিত্বের 'পরিপূরক' বলে অভিহিত করে।

কুসংস্কারের দীর্ঘ রজনীতে খ্রীষ্টানগণ নাজারাতের পয়গাম্বরের শিক্ষার সরলতা থেকে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যিশুর ধর্মের সঙ্গে প্রতিমূর্তি, সাধুসন্ত ও স্মৃতিচিহ্নের উপাসনা অবিচ্ছেদভাবে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। যে সব রীতি-নীতি তিনি বর্জন করেছিলেন, যে সব ক্ষতিকর জিনিস তিনি নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন সেসব একে একে তাঁর ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। যে পবিত্র ভূমিতে মহামান্য শিক্ষক বাস করে-ছিলেন, বিচরণ করেছিলেন তা অলৌকিকতা ও কল্পনার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং "জনগণের স্নায়ুমণ্ডলী বাধ্যবাধকতা ও বিশ্বাসের অভ্যাসের দ্বারা আড়ষ্ট ও অবশ হয়ে পড়েছিল"।[৩]

১. ইসাউরিয়ান নৃপতিগণ পরোক্ষভাবে ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক শতাব্দীর অধিক কাল খ্রীষ্টধর্মের ক্রম অধঃগতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, সর্বশক্তি নিয়োগ করে মহান শিক্ষক যে-পথ প্রদর্শন করেছিল সেই পথে তাকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইনি।

২. মোশেইম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২।

৩. মোশেইমের 'একলেসিয়াসটিক্যাল হিস্ট্রী' ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২। তুঃ হাল্লামের 'কনসটিটিউশনাল হিস্ট্রী অব ইংলণ্ড' ২য় অধ্যায়, পৃ. ৭৫। এই গ্রন্থ থেকে দেখা যাবে যে ইসলামের "যা কিছু ভাল" সবই ইহুদীধর্ম বা খ্রীষ্টধর্ম থেকে গৃহীত—এই উক্তি কতখানি সত্য। ডিউটশ বলেন, "মুহম্মদের ধর্মের মধ্যে যা কিছু ভাল তা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আরোপ করার একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশঙ্কা করি যে সৎ গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে এই মতবাদ সামঞ্জস্য-পূর্ণ নয়। কারণ মুহম্মদের সময়ে আরবের খ্রীষ্টধর্মের কথা যত কম বলা যায়

উপরে বর্ণিত অবান্তর অযৌক্তিক বিষয়গুলির বিরুদ্ধে মুহম্মদের জীবন নিয়োজিত হয়েছিল। বিশ্বের অধিপতি আল্লাহর গভীর সান্নিধ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যের বাণীতে এক দিকে মূর্তিপূজক আরব্য গোত্র-সমূহকে এবং অন্যদিকে অধঃপতিত খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্মের অনুসারীদেরকে মুহম্মদ আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি যথার্থই "ভাষার নিপুণ প্রয়োগ-কারী" হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কখনও প্রজ্ঞার সীমানা অতিক্রম করেননি এবং তাদের বিশ্বাসের ভয়ানক অসঙ্গতির দরুন তাদেরকে লজ্জা অনুভব করতে বাধ্য করেছেন। এরূপে আল্লাহর একত্ব-বাদের মহান প্রচারক মুহম্মদ বিশ্বের স্রষ্টার সাথে অন্যান্য বস্তু ও প্রাণীর শরীক স্থাপনের পশ্চাদমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে মহান সংগ্রামের অগ্রনায়ক হিসেবে ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছেন। কোরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মতো অনলবর্ষী আয়াতের প্রায়ই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়ঃ "তোমাদের প্রভু তো একজনই, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; তিনিই পরম দাতা ও দয়াময়। নিশ্চয়ই গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে—আর দিন ও রাতের আবর্তনে আর পানির উপর ভাসমান তরীসমূহ—যা মানুষের উপকারী জিনিসপত্র নিয়ে ভেসে বেড়ায়, আর আসমান থেকে আল্লাহ্ যে বারিধারা বর্ষণ করেন—তা-ই দিয়ে মরা মাটিকে বাঁচিয়ে তোলেন, আর তাতে যে সব চলমান জীব ছড়িয়ে রেখেছেন, বায়ুর গতি পরিবর্তনে, আর মেঘমালা, যা আসমান ও জমিনের মাঝখানে ভাসমান রাখা হয়েছে—এসব নিদর্শন তো জ্ঞানচর্চাকারী কওমের জন্যই। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া আরও কাউকে শরীক করেছে, আর তাদেরকে আল্লাহর মতোই ভালবাসছে।"[১] বিপথগামী লোকদের জন্য এই বাক্যসমূহ কতই না গভীর সহানুভূতির বাণী বহন করছে। পুনরায় দেখিঃ "তিনিই তো তোমাদেরকে বিদ্যুচ্ছটা দেখিয়ে থাকেন ভীতি ও আশা সঞ্চারের জন্য। তিনিই তো ঘনঘোর মেঘমালা থরে থরে সাজিয়ে রাখেন। বজ্র তাঁর প্রশংসায় আর ফিরেশতাগণ তাঁর ভয়ে পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তিনিই তো বজ্র পাঠিয়ে থাকেন আর যার উপরে ইচ্ছা হয় নিক্ষেপ করেন, অথচ

সম্ভবত হতই উত্তম·····এর পাশাপাশি এমন কি আধুনিক আমহারিক খ্রীষ্টধর্ম যার সম্পর্কে বিস্ময়কর বিবরণ আমরা রাখি তা বিশুদ্ধ ও সমুন্নত বলে প্রতীয়মান হয়।"—কোয়ার্টারলী রিভিউ, নং ২৫৪, পৃ. ৩১৫।

১. সূ. ২ আ. ১৬৩-১৬৫।

তারা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়াই করে যাচ্ছে।···সত্যের আহ্বান, সে তো তাঁরই জন্য। কিন্তু যারা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে থাকে তারা ওদেরকে কোনও বিষয়ে মোটেই সাড়া দেয় না। কিন্তু তাদের অবস্থা ঠিক সেই লোকটির মতোই যে নাকি হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে, আর ভাবছে ঃ এতেই পানি তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু, তা যে কোনও দিন তার কাছে মোটেই পৌঁছাবে না।”[১] তিনিই তো গগনমণ্ডল আর এই পৃথিবী সঠিকভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সুমহান সত্তা—ওরা যেগুলোকে শরীক ঠাওরাচ্ছে সে সবের তুলনায় অনেক মহান। মানুষকে তিনি শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন, তবু সে প্রকাশ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করল। আর চতুষ্পদ জন্তুদেরকে তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।···আর তাতে তোমাদের জন্য শানসওকাত ও মানমর্যাদা নিহিত রয়েছে যখন তোমরা সেগুলোকে সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়ে আন, আবার সকালবেলা যখন চরাতে নিয়ে যাও।···তিনিই ত তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন রাতদিন, চন্দ্র ও সূর্যকে—তারকাসমূহকে কাজে লাগানো হয়েছে তাঁরই হুকুমে। ···তিনিই তো সেই সুমহান সত্তা যিনি সাগরকে অনুগত করে রেখেছেন···আর তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে নৌকাগুলো পানির বুক চিরে কিভাবে এগিয়ে যায়।···যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।···তা-হলে যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি, যে সৃষ্টি করতে পারেন না তার সমান? তোমরা কি চিন্তা কর না? তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুনতে চাও, তাহলে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। একথা সত্য সুনিশ্চিত যে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল দয়াময়। আল্লাহ বেশ জানেন তোমরা যা কিছু গোপন কিংবা প্রকাশ করছ। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডেকে থাকে যারা কিছুই তো সৃষ্ট করতে পারেনি বরং ওদেরকেই তো তৈরী করা হয়েছে। তারা নিষ্প্রাণ—জীবন্ত নয়।”[২]

“আল্লাহ—তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, রক্ষা-কর্তা। তন্দ্রা ও ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান-জমিনের সবকিছুই একমাত্র তাঁরই। এমন কে আছে—যে নাকি তাঁরই অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? যা কিছু প্রকাশ্য—আর যা কিছু এখনও জানা যায়নি—সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে শামিল কোন বিষয়ের

১. সু. ১৩ আ. ১২-১৪।
২. সু. ১৬ আ. ৩-২০।

সবকিছু জানা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন, সে কথা আলাদা। তাঁর আসন—আসমান-জমিনের সব জায়গাই ঘিরে রয়েছে। এ দুটোর হিফাজত করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়…”[১] “তিনিই তো রাতকে দিনের পোশাক পরিয়েছেন যেন সে দৌড়ে চলে আসে। আর সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহতারকাসমূহ তাঁরই হুকুম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্ব ও যাবতীয় বিধান কি শুধু তাঁরই জন্য নয়? সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহতায়ালা বড়ই বরকতের মালিক।[২] “বলো, তিনিই একক আল্লাহ—তিনি চিরন্তন, স্ব-নির্ভর। তিনি কারুর পিতাও নন, আর কারুর পুত্রও নন। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই।” “সমুদয় প্রশংসা সারা জাহানের পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহর, যিনি পরম করুণাময় ও দয়াময়, যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে সরল সহজ পথ দেখাও—তাঁদেরই পথ যাঁদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের পথ নয়—যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট”[৩]…“বলো, আমি উষার পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাই তিনি যা কিছু তৈরী করেছেন সে সবের অনিষ্ট থেকে।” “তোমার উচ্চৈঃস্বরে বলার প্রয়োজন নেই, কেননা তিনি গোপন ফিস ফিস শব্দও এবং তার চেয়েও গোপন বিষয়ও জানতে পারেন। বলো—আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিকানা কার? বলো—আল্লাহর যিনি নিজের উপর করুণা বর্ষণ করেছেন।”[৪] “তাঁরই কাছে অদৃশ্যভাণ্ডারের চাবিসমূহ রয়েছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউ মোটেই জানে না। আর তিনিই জানেন—পানিতে আর স্থলভাগে যা কিছু রয়েছে। তাঁর অজ্ঞাতে পাতাগুলোর মধ্যে একটিও যে ঝরছে না। ঘন অন্ধকার মাটির ভেতরে যে দানবটি রয়েছে, সরস ও শুকনো এমন কোনও জিনিস নেই—সুস্পষ্ট কেতাবে যার উল্লেখ নেই। তিনিই তো রাতের বেলা তোমাদেরকে মরার মতো ফেলে রাখেন। দিনের বেলা তোমরা যা কিছু কর সে সবও তিনি ভাল করেই জানেন। তারপরে তিনি তোমাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। এভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পুরা করছেন। তারপরে তাঁরই মহান দরবারে তোমাদেরকে ফিরতে হবে এবং তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবেই দেখিয়ে দেবেন যা তোমরা করেছিলে।”[৫] নিশ্চয়ই

১. সূ. ২ আ. ২৫৫। ২. সূ. ৭ আ. ৫৪। ৩. সূ. ১১২ এবং সূ. ১।
৪. সূ. ১১৩। ৫. সূ. ৬ আ. ৫৯-৬০।

আল্লাহতায়ালাই যে বীজ ও কেন্দ্রীন ফুটিয়ে তোলেন, প্রাণহীন বস্তুর মধ্য হতে জীবন্ত বস্তুর বিকাশ ঘটান, আর জীবন্ত বস্তুর মধ্য হতে নিষ্প্রাণ বস্তু আলাদা করে ফেলেন। ইনি তো হচ্ছেন তোমাদের আল্লাহ। এরপরেও তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ? তিনিই তো ভোরের আলো ফুটিয়ে তোলেন। রাতকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য। সূর্য ও চাঁদকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের হিসাবের সুবিধার জন্য। এ হচ্ছে মহান প্রতাপশালী ও সুমহান জ্ঞানীর সুনির্ধারিত পরিমাণ।"[১]

"ইনিই তো হচ্ছেন তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর তো কোন মাবুদ নেই। সর্ব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা যে তিনিই। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনিই তো সব জিনিসের অধিকারী। তোমাদের চোখ দিয়ে তাঁকে অনুভব করা যায় না, কিন্তু তিনিই যে সব দৃষ্টি অনুভব করতে পারেন। তিনি তো সব রহস্যের খবর রাখেন।"[২]

"বলো, আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু—সবই যে শুধু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যই।"[৩]

"তুমি কি দেখতে পাও না যে আকাশ ও পৃথিবীর সমুদয় প্রাণী আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করে, আর পাখীও? প্রত্যেকেই তাদের উপাসনা প্রশংসা কীর্তনের পন্থা জানে। আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহর এখতিয়ারে এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন। আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব কার? তিনিই আল্লাহ! তিনি জীবিত করেন এবং তিনি মৃত্যু দান করেন।"[৪] "তিনি চিরজীবন্ত। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কাজেই তাঁকেই আহ্বান কর এবং তাঁরই নির্ভেজাল ইবাদত কর। সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রশংসা।...আমার প্রার্থনা, আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্ব-জাহানের প্রভুর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই।"[৫] "বলো—তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, আর তোমাদের জন্য কান, চোখ ও মন তৈরী করেছেন। তোমরা যে খুব কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক!...তিনিই তো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে এই দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে রেখেছেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দরবারে সমবেত করা

---

১. সূ. ৬ আ. ৯৬-৯৭। ২. সূ. ৬ আ. ১০৩-১০৪। ৩. সূ. ৬ আ. ১৬৩।
৪. সূ. ৭ আ. ১৫৮। ৫. সূ.

হবে।”[১] “হে আমার পালনকর্তা, আমাকে গোনাহগার অত্যাচারী কওমের শামিল করবেন না।”[২] “তিনিই তো সুমহান সত্তা—যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়ে দিয়েছেন চাদর হিসেবে; নিদ্রা তৈরী করে দিয়েছেন বিশ্রামের জন্য, আর দিন তৈরী করেছেন উঠে চলাফেরা করার জন্য।”[৩] “অসহায় অত্যাচারিত মানুষের ফরিয়াদে কে সাড়া দেন—যখন তাঁকে ডাকা হয় আর কষ্ট ক্লেশ দূর করে দেন এবং কেই বা তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন?”[৪] “যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও পরমজ্ঞানী: গোনাহ মাফকারী, তাওবা মঞ্জুরকারী.. ”[৫] “আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করব, যখন আল্লাহ সব কিছুর প্রভু?” আল্লাহ কাউকে সাধ্যশক্তির বেশী দায়িত্ব ন্যস্ত করেননি——যে যা অর্জন করেছে তাঁরই পুণ্য সে পাবে।”[৬]

“অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রভুর সন্নিকটে ফিরে যাবে এবং তোমরা যে বিষয়ে মতপার্থক্য পোষণ কর তিনি তা তোমাদের নিকট জ্ঞাত করাবেন। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে অবহিত, তিনি সুমহান, সুউচ্চ!...সবাই সমান তোমাদের মধ্যে যদি কেউ চুপিসারে কোনও কথা বলে কিংবা চিৎকার করে অথবা যদি কেউ রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কিংবা দিনের বেলায় কোথাও যায়।”[৭]

“আল্লাহ—তিনিই তো আসমান জমিনের জ্যোতি। তাঁর এই নূরের উপমা হল—ঠিক যেমন একটা তাকের উপর একটি প্রদীপ জ্বলছে। আর সেই প্রদীপটি একটি কাঁচের চিমনীর মধ্যে রয়েছে। আর তা যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। এই প্রদীপটি জ্বালা হয়েছে কল্যাণপূত জলপাই গাছের তেল থেকে—যে গাছ পূর্ব-পশ্চিম কোনমুখীই নয় আর তেল অগ্নিসংযোগ ছাড়াই উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করে। এ হল আলোর আলো—জ্যোতির জ্যোতি। আল্লাহ যাকে খুশি তাকে নিজের জ্যোতির দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন। মানুষের বুঝবার সুবিধার জন্য আল্লাহ উপমা ও রূপক ব্যবহার করেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

যেসব গৃহের মধ্যে আল্লাহতায়ালা আদেশ জারি রেখেছেন—যেন তাতে বুলন্দ করা হয়, স্মরণ করা হয় তাঁরই নাম। সেখানে যেন সকাল সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়।

---

১. সু. ৬৭ আ. ২৩-২৪। ২. সু. ২৩ আ. ৯৪। ৩. সু. ২৫ আ. ৪৭।
৪. সু. ২৭ আ ৬২। ৫. সু. ৪০ আ. ১-২। ৬. সু. ২ আ. ২৮৬।
৭, সু. ১৩ আ. ১০।

সেসব লোক—যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনার কাজ আল্লাহ-তায়ালার জিকর হতে গাফেল করতে পারে না, আর নামাজ কায়েম রাখা, জাকাত আদায়ের কাজেও বেখেয়াল করতে পারে না, তারা সেই-দিন সম্পর্কে খুবই সন্ত্রস্ত রয়েছে যেদিন মন ও চোখ উল্টে যাবে। যেন আল্লাহ পাক তাদেরকে পুরো পারিশ্রমিক দান করতে পারেন সে সব উত্তম কাজের, যা তারা করেছে। আর তাঁরই সাহায্যে ভাণ্ডার থেকে আরও কিছু বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ যাকে খুশি পর্যাপ্ত রুজি-রোজগার দান করেন।

আর যারা অবাধ্য হয়েছে—তাদের কাজ যেন মায়া মরীচিকা—যা দেখে পিপাসার্ত লোক পানি বলেই মনে করে, অথচ সে যদি তার কাছেও পৌঁছায়, তবুও সেখানে কিছুই পাবে না। অবশ্য আল্লাহকে সে নিজের কাছে পায়। আর তিনিই তার প্রাপ্য পুরোপুরি দান করবেন। আসলে আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব নিবেন।

কিংবা ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে গভীর সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গ-মালা—একটার উপর দিয়ে আরেকটা তরঙ্গ ধেয়ে আসছে, তার উপরে ঘন কাল মেঘ একটার উপর দিয়ে আরেকটা ছুটে বেড়াচ্ছে। তখন যদি সে নিজের হাত বের করে তবে সে তাও দেখতে পাবে না। আসলে যে কেউ এমন হবে যার জন্য আল্লাহ পাক আলো দান করেননি—তার জন্য কোথাও যে কিছুমাত্র আলো নেই।

আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ পাকই সেই মহান সত্তা—যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছে গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর বুকে যা কিছু রয়েছে। আর ডানা মেলে উড়ন্ত অবস্থায় পাখীগুলো প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্দেগীর পথ ও জিকরের পন্থা সম্পর্কে অবহিত রয়েছে। আর আল্লাহতায়ালা যে বেশ জানেন তারা যা কিছু করছে।

আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ কিভাবে মেঘমালাকে এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে আসেন। তারপরে সেগুলোকে মিলিয়ে দেন, আবার সেগুলোকে তিনি থরে থরে সাজিয়ে রাখেন। তারপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সেই মেঘমালার মাঝখান থেকে বৃষ্টিধারা ঝরছে। আর তিনিই তো আসমান থেকে কুয়াশার পাহাড় বর্ষণ করেন। যাকে খুশি তিনি তাই দিয়ে তাকে ঘিরে ধরেন, আর যাকে খুশি তা থেকে রেহাই দেন। তাঁর বিদ্যুৎ ঝলক এমনই তীব্র ও উজ্জ্বল যাতে মনে হয় এই বুঝি চোখ ঝলসে যাবে।

আল্লাহতায়ালাই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই জ্ঞানবানদের জন্য এতে চিন্তার বিষয় নিহিত রয়েছে।"[১]

সুরা 'আর্‌ রহমান' (করুণানিধান) যাকে ইসলামে 'আশীর্বচন' বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা প্রকৃতির সাক্ষের প্রতি হযরতের আবেদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

সূর্য ও চাঁদ হিসাবের জন্য; তারকাসমূহ লতাপাতা ও গাছপালা সবই যে তার আনুগত্য প্রকাশ করছে। তিনিই তো আসমানকে উঁচুতে তুলে রেখেছেন। আর তিনিই তুলাদণ্ড স্থির করে দিয়েছেন যেন তোমরা ওজনের ব্যাপারে কমবেশী না কর। তোমরা সঠিক ওজন কায়েম কর ন্যায়নীতি মোতাবিক—মাপে কিছু ঘাটতি কর না। তিনিই তো পশু-প্রাণীদের জন্যই পৃথিবীকে রেখে দিয়েছেন, তাতে ফল-পাকড়, খেজুর গাছ—যার খোসার উপরে আবরণ থাকে তাও রেখে দিয়েছেন। এমন শস্য যাতে ভুষি জন্মায়, আর সুন্দর সুগন্ধি ফুলও রেখে দিয়েছেন।...

তিনিই তো মানুষকে শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন আর জিনদেরকে আগুনের শিখা দিয়ে তৈরী করেছেন।...

তিনিই তো দুটো পূর্ব আর দুটো পশ্চিম দিকের পালনকর্তা। তিনিই তো দুই দরিয়াকে পরস্পর মিলিয়ে রেখেছেন। এ দুয়ের মাঝখানে আবরণ রয়েছে যাতে দুয়ের মধ্যে একটিও সীমা ছেড়ে যেতে না পারে। এ দু'য়ের তলা থেকে মুক্তা ও মানিক বের হয়।...

আর তাতে পাহাড়ের মতো উঁচু জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে—সে তো তাঁরই জন্য। তাতে যা কিছু রয়েছে—সবই যে বিলুপ্ত হবে। আর আপনারই মহান পালনকর্তার সত্তাই যে বাকী থাকবে—যিনি পরম প্রতাপশালী ও মহান সুজন।...গগনমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই যে তাঁর সান্নিধ্য পেতে চায় আর তিনি প্রতিটি মুহূর্ত ব্যস্ত রয়েছেন।

আপন পালনকর্তার নাম তো বড়ই বরকত মহিমাপূর্ণ যিনি প্রতাপ-শালী ও পরম অনুগ্রহশীল।"[২]

"প্রত্যেকটি মানুষের গলায় তার কাজকর্ম ঝুলিয়ে দিয়েছি। আর কিয়ামতের দিন তা কিতাবের আকারে বের করব তারই জন্য। আর তাও যে সে খোলা অবস্থাতেই পাবে।"[৩]

১. সু. ২৪ আ. ৩৫-৪৪। ২. সু. ৫৫ আ. ৫-২৯, ৭৮। ৩. সু. ১৭ আ. ১৩।

"আর শপথ এই মানুষের—আর যিনি তার অঙ্গাদি সুষম করেছেন। তারপর অনাচার থেকে বাঁচার এবং পরহিজগার হওয়ার মতো বুদ্ধি-বিবেচনা দান করেছেন। সেই তো নাজাত পেল—যে নিজেকে পাকপবিত্র করল। আর যে ধুলোমাটি লাগাল, সে তো ক্ষতিগ্রস্ত হল।"[১]—পরম করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কিছুমাত্র অসঙ্গতি দেখতে পাবে না। একটু চোখ তুলে দেখই না—কোথাও কোন ত্রুটি তোমার নজরে পড়ছে না কি? তারপরে বারবার তোমার চোখ বুলিয়ে যাও, সে তোমার কাছে ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে।[২] "যখন পৃথিবী নির্জীব ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে তিনি তাতে প্রাণসঞ্চার করেন; তেমনিভাবে তোমাদেরকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে।···আসমান জমিন তাঁরই হুকুমে সুস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে তোমাদেরকে যখন একবার ডাকা হবে দুনিয়ার বুক থেকে তখন তোমরা বেরিয়ে আসবে।"[৩]

"যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে; আর যখন তারকাগুলো নিভে যাবে। যখন পাহাড়-পর্বতগুলোকে ধূলিসাৎ করা হবে। আর যখন গর্ভবতী উটগুলো অকেজো হয়ে পড়বে; আর যখন বন্য জন্তুগুলোকে একত্র করা হবে। আর যখন সাগর আগুনে পরিণত হবে। আর যখন আত্মাগুলোকে আবার মিলানো হবে। আর যখন সেই কন্যাকে যাকে জীবিত মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ গোনাহের কারণে হত্যা করা হয়েছিল তোমাকে? আর যখন আমলনামার দফতর খোলা হবে। আর যখন আসমান অনাবৃত করা হবে। আর যখন জাহান্নামের আগুন তাজা করা হবে। আর যখন জান্নাত কাছে আনা হবে; তখন সে সবই জানতে পারবে যা সে নিয়ে এসেছে।"[৪] "···আপনি সেই (কিয়ামতের) মুহূর্ত সম্পর্কে জানেন কি? একমাত্র আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত আছেন। যারা কিয়ামতকে ভয় করে তাদেরকে উপদেশ দেওয়াই আপনার দায়িত্ব!" "···সেই অবশ্যম্ভাবী কি তা কে আপনাকে শিক্ষা দেবে? সামুদ ও আদ জাতি বিচার দিবসকে মিথ্যা জেনেছিল। তাদেরকে বিদ্যুৎ ও ভয়াবহ ঝটিকা ধ্বংস করেছিল।"

এত পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর করুণা সর্বব্যাপী: "দিনের আলোর শপথ আর রাতের কসম—যখন আবৃত করে। আপনার পালন-

---

১. সু. ৯১ আ. ৭-১০। ২. সু. ৬৭ আ. ৩-৪। ৩. সু. ৩০ আ. ২৪-২৫।
৪. সু. ৮১ আ. ১-১৪।

কর্তা আপনাকে এমনি ফেলে রাখেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও হননি। আসলে আখিরাতই আপনার জন্য উত্তম—পার্থিব জীবনের তুলনায়। আর শীঘ্রই আপনার পালনকর্তা আপনাকে যে সব জিনিস দেবেন যাতে আপনি খুশি হবেন। তিনি কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পাননি ? তাই তিনি আপনাকে আশ্রয় দান করলেন। আচ্ছা! আপনাকে তিনি পথ সম্পর্কে অজ্ঞ দেখে পথ দেখিয়ে দিলেন, আপনাকে দুঃস্থ অবস্থায় দেখে আপনাকে সমৃদ্ধি দান করলেন। সুতরাং আপনিও কোনও এতীমকে নির্যাতন করবেন না। আর নিজ পালনকর্তার নিয়ামতসমূহের কথা আলোচনা করতে থাকুন।"[১] "তাহলে কি তোমরা ভেবেছিলেঃ আমি তোমাদেরকে অযথা পয়দা করেছিলাম, আর তোমরা আমার দরবারে কিছুতেই ফিরবে না।…হে পালনকর্তা মাবুদ আমার, যদি আমরা ভুল করি ও পাপে নিপতিত হই, আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, আপনি দয়া করুন। আপনি তো সকল দয়াময়ের চেয়ে সেরা দয়ালু।"[২] "একজনের বোঝা অন্যে বইবে না। কোন সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ না করে আমরা কাউকে শাস্তি প্রদান করিনি।" দেখো, এই সুস্পষ্ট গ্রন্থ আমরা অবতরণ করেছি এক সৌভাগ্য রজনীতে মানুষকে সতর্ক করার জন্য।" "আপনাকে দুঃখভারাক্রান্ত করার জন্য এই গ্রন্থ আপনার নিকট নাযিল করিনি।"

এভাবেই এই বিস্ময়কর গ্রন্থের বর্ণনা চলেছে—এই গ্রন্থ মানুষের মহৎ অনুভূতির কাছে, তার আন্তর চৈতন্য ও তার নৈতিক বোধের কাছে আবেদন রেখেছে এবং পৌত্তলিক বিশ্বাসসমূহের বিশালতার প্রমাণ ও প্রকাশ করেছে। এমন অধ্যায় নেই বললেই চলে যেখানে আল্লাহর শক্তি-মত্তা, করুণা ও একত্বের বর্ণনা নেই। খ্রীষ্টান গ্রন্থকারগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছেন। ইসলামে আল্লাহকে সাধারণত দেখানো হয়েছে "দয়ামায়াহীন শাসক হিসেবে যিনি মানুষকে নিয়ে দাবারঘুঁটির মতো খেলছেন এবং টুকরো টুকরো অবদানের প্রতি কোন তোয়াক্কা না করেই তাঁর খেলার পরিকল্পনা করছেন।" এবার আমরা দেখব যে এ মূল্যায়ন সঠিক কিনা। ইসলামের আল্লাহ সর্ব-শক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা, ন্যায়বিচারক, বিশ্বজাহানের প্রভু, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যুর বিধায়ক, যাঁর হাতে রাজ্যসাম্রাজ্য ও অপ্রতিহত

---

১. সূ. ৯৩। ২. সূ. ২৩ আ. ১১৫, ১১৮।

ক্ষমতা; গৌরবময় সিংহাসনের মহান, সর্বশক্তিধর প্রভু। তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী দৃঢ়, সর্বোচ্চ, উৎপন্নকারী, প্রস্তুতকারক, পরিকল্পক, জ্ঞানী, ন্যায়বান, সত্যপরায়ণ, গণনায় ক্ষিপ্র, যিনি মানুষের কাজের বিন্দুবিসর্গ ভাল ও মন্দ সম্পর্কে ওয়াকেফাল এবং যিনি বিশ্বাসীর কোন পুরস্কারকে নিশ্চিহ্ন হতে দেন না। কিন্তু সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ রাজাধিরাজ, পবিত্র, শান্তিকামী, বিশ্বস্ত, তাঁর বান্দাদের অভিভাবক, এতীমের আশ্রয়-দাতা, বিপথগামীর পথ-নির্দেশক, যন্ত্রণা থেকে মুক্তিদাতা, পরিত্যক্তের বন্ধু, ব্যথিতের সান্ত্বনাদাতা; তিনি সকল কল্যাণের উৎস, তিনি দানশীল প্রভু; তিনি দয়ালু, শ্রবণকারী, সন্নিকটবর্তী। অনুকম্পাশীল, পরম দয়াবান, পরম ক্ষমতাশীল, মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা পাখীর ছানার প্রতি পাখীর ভালবাসার চেয়েও অধিকতর স্পর্শকাতর।

আল্লাহর করুণা কোরআন পাকের একটি মহত্তম আলোচ্য বিষয়। 'আররহমান'—দয়ালু, এই নামটি যা দিয়ে প্রতিটি সুরার শুরু এবং যা দিয়ে তাঁকে আহ্বান করা হয়, তা আল্লাহর সেই প্রেমের গভীর, সর্বব্যাপী বিশ্বাস ব্যক্ত করছে, যা ঐশী করুণা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছে।[১]

পূর্ববর্তী দুই পয়গাম্বরের অনুসারীগণের নৈতিক অধোগতি মহানবীকে পীড়া দিয়েছিল এবং খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা তাদের নবীদের সতর্কবাণীসমূহকে উপেক্ষা করে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতির অনুশীলন করেছিল তজ্জন্য তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন করেছিলেন। যে ধর্মীয় উন্মাদনা ইসারী ও জেরেমীয়দের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়েছিল তা অপর এক মহত্তর মানুষের হৃদয়ে পুনঃ প্রজ্বলিত হয়েছিল। তিনি প্রত্যাখান করেন সে-সব রীতি-নীতি; কিন্তু মানবজাতির অধঃপতনে যে বিলাপ, যে যন্ত্রণার ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হয় তার ঊর্ধ্বে ধ্বনিত হয় আশার বাণী।

আল্ কোরআন ইহুদীদেরকে "মিথ্যা দেবদেবী ও মূর্তিপূজা", যা পূর্বে উক্ত হয়েছে এবং এজরার স্মৃতির প্রতি অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য খ্রীষ্টানদেরকে যিশু ও তদীয় মাতার পূজা করার জন্য তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছে। "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে? তারাই তো গোমরাহীর সাথে তার বিনিময় করল। তারা চায়—আপনি যাতে সত্য পথ ছেড়ে বিপথেই এগিয়ে যান।"[২]

১. সু. ৩ আ. ১২৪; সু. ২৫ আ. ৫০; সু. ২০ আ. ৭১; সু. ৪২ আ. ৩ ইত্যাদি।
২. সু. ৯ আ. ৪৪।

“আবার ইহুদীরা বলে : উজায়ের নাকি আল্লাহর পুত্র। আর খ্রীষ্টানরা বলে : মসীহ হচ্ছে আল্লাহর পুত্র। এসব হল ওদের উদ্ভট কথাবার্তা যা ওদের মুখেই শোনা যায়।...তারা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের পাদ্রী-পুরোহিতদেরকেই পালনকর্তা প্রভুর আসনে বসিয়ে রেখেছে।... ওরা তো চায় : নিজেদের মুখের ফুঁৎকারেই আল্লাহর আলো নিবিয়ে ফেলবে।”[১] “ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ বলে : আমরা তো আল্লাহরই পুত্র ও তাঁরই বন্ধু।”[২] “যাঁদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে[৩] তাদের অনেকেই তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চান তোমরা ঈমান আনার পর... তোমরা নিয়মিত নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত দাও। তোমরা তোমাদের কল্যাণের যা কিছু করেছ তা তোমরা আল্লাহর কাছেই পাবে...। “তারা বলে : নিশ্চয়ই ইহুদী ও খ্রীষ্টান ব্যতীত অন্য কেউই বিহেশতে প্রবেশ করবে না...বলুন, তোমরা যদি সত্য বলে থাকো তবে প্রমাণ হাজির কর। না, তারা সত্য বলেনি, বরং যাঁরা আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সঠিক কাজ করে, তাঁরাই তাঁদের প্রভুর কাছে পুরস্কার পাবে।”[৪]

“শোন হে কিতাবধারিগণ! তোমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে মোটেই বাড়াবাড়ি কর না। আর আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া আর কিছুই বল না। নিশ্চয়ই মসীহ মরিয়মের ছেলে ঈসা। তিনি আল্লাহর রাসুল ও তাঁর বাণী যা মরিয়মের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাঁরই তরফ থেকে রুহ হিসেবে। সুতরাং তোমরা সবাই আল্লাহর উপর আস্থাবান হও আর তাঁর রাসুলের উপরেও। তোমরা একথা মোটেই বলো না তিনজন; এটাকে বাদ দাও...মসীহ তো একথায় কোনও রকম কুণ্ঠাবোধ করতেন না যে তিনি আল্লাহর বান্দা হিসেবে গণ্য হবেন।”[৫] “কারও পক্ষে এ কাজটা মোটেই সম্ভব নয়—আল্লাহ তাকে কিতাব, বিধান ও নবুয়্যত দান করবেন। আর সে মানব-সমাজকে বলবে : তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার বান্দা রূপে গণ্য হও। বরং তারা বলবে : তোমরা আল্লাহতায়ালা বনে যাও। কারণ, তোমরা কিভাবে শেখাচ্ছ আর তা নিজেরাও যে পড়ছ।”[৬]

নিম্নোক্ত আয়াতে এই ধরনের ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে যে অনুভূতি

---

১. সূ. আ. ৩০-৩২।
২. সূ. ৫ আ. ১৮।
৩. ইহুদী, খ্রীষ্টান ও জরথুস্ত্রবাদী।
৪. সূ. ৫ আ. ১০৫, ১০৬।
৫. সূ. ৪ আ. ১৭১,১৭২।
৬. সূ. ৩ আ ৭৯।

বিদ্যমান তা প্রদর্শিত হয়েছে : "তারা বলছে : করুণাময় আল্লাহর নাকি সন্তান-সন্ততি আছে। নিশ্চয়ই তোমরা এভাবে গুরুতর বিষয়ে জড়িয়ে পড়লে। যে কারণে হয়তো এখুনি আসমান ভেঙে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়বে, আর পাহাড়-পর্বত ধূলি-বিলুণ্ঠিত হবে। কারণ তারা করুণাময় আল্লাহর নামে সন্তান সন্ততিকে ডাকছে। অথচ তাঁর জন্য কোন সন্তান-সন্ততি মোটেই শোভা পায় না। আসমান জমিনের কোথাও এমন কেউ নেই যে নাকি করুণাময় আল্লাহর বান্দা হিসেবেই আসবে না।"[১]

কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট প্রচারক, যাঁর মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সত্যের প্রচার, অকল্যাণের সঙ্গে কল্যাণকে গুলিয়ে ফেলেননি। "কিতাবধারীদের মধ্যে সবাই সমান নয়; তাদের মধ্যে একদল রয়েছে—যাঁরা রাতের বেলায় সরল মনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে, তাঁরা সেজদা করে, আল্লাহর উপর ঈমান আনে, কিয়ামতে বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নেক কাজে তৎপর হয়—তাঁরাই তো সৎ লোক।"[২]

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পারস্পরিক ও পীড়াদায়ক হিংসা-বিদ্বেষ নেস্তোরীয় ও মনোফাইজাইটদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থহীন বিবাদ-বিসম্বাদ, বাইজানটাইন যাজকদের হৃদয়হীন ও হৃদয়-বিদারক বাকবিতণ্ডা, প্রায়ই নিম্নরূপ ভর্ৎসনা নিয়ে আসত :

"যিশু ও অন্যান্য নবীদের নিকট আমরা নিদর্শন প্রকাশ করেছিলাম; আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা এই বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে পড়ত না। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন।" "মানুষ এক জাতির অন্তর্ভুক্ত; আল্লাহ তাদের নিকট হুঁসিয়ারী ও সুসংবাদসহ রাসুল পাঠিয়েছেন, সব বিতর্কের মীমাংসার জন্য। তথাপি যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মতো কেউই গোলমাল করে না, কারণ তারা পরস্পর ঈর্ষা-বিদ্বেষে কণ্টকিত।" "হে আহলে কিতাবি, কেন ইবরাহিম সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা কর। তোমরা যা জান না সে সম্পর্কে কেন বিবাদ করছ?"

নূতন ধর্মব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির হৃদয়ে জীবনের সাধারণ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সত্যের জীবন্ত প্রত্যক্ষণ জাগ্রত করা। একজন প্রখ্যাত লেখকের ভাষায় "নূতন ধর্মমতের নৈতিক আদর্শ কর্তব্যের সাধারণ ধারণা এবং প্রেমের পরিচিত দৃষ্টান্তসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

১. সু. ১৯ আ. ৮৮-৯৩। ২. সু. ৩ আ. ১১৩-১১৪।

"নিশ্চয়ই এই সব জাতি[১] অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন—তাঁরা ছিলেন দূর অতীতের একটি দল—তাঁরা যা করেছেন তার ফল তাঁরাই পাবেন, আর তোমরাও নিজেদের কর্মফলেই ভুগবে। তাঁদের কাজ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।[২]..."প্রত্যেক মানুষ ভাল ও মন্দ যা করেছে তার জন্য পুরস্কার বা শাস্তি পাবে, আর আল্লাহ্ কাউকে তার শক্তির অতিরিক্ত বোঝা চাপাবেন না।" "যে নাকি পাকপবিত্র হওয়ার জন্য বিষয়-সম্পদ দান করে। আর তার উপরে অন্য কারুর এমন কোনও অনুগ্রহ নেই—যার বিনিময়ে এ কাজ করবে বরং সে তো শুধু নিজের মহামহিম পালনকর্তার সন্তুষ্টিলাভের আশা নিয়েই দান করে।"[৩]

"তাঁরাই অনুগৃহীত যাঁরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে গরীব, মিসকিন, এতীম ও কয়েদীদেরকে খাবার দিয়ে থাকে তাঁরই প্রেমে। আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহ্তায়ালার জন্যই খাবার দিচ্ছি। আমরা এজন্য তোমাদের কাছে মজুরি কিংবা কৃতজ্ঞতা কিছুই পেতে চাই নে।"[৪]

"একমাত্র আল্লাহর উপাসনা কর; আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী এতীম ও দীনদরিদ্র জনে দয়া করবে; মানুষের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গতভাবে কথাবার্তা বলবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে।" "পিতামাতাদেরকে সম্মান করবে; বিনয়াবনত চিত্তে প্রার্থনা কর: হে আমার প্রভু, তাদের প্রতি করুণা করো, যেভাবে তাঁরা আমাকে আমার অসহায় অবস্থায় প্রতিপালন করেছেন।" "বিগত দিনের নিষ্ঠুরতা, রক্তের প্রতিহিংসা ও শিশুহত্যা পরিত্যাগ কর এবং এক দেহের মতো একতাবদ্ধ হও।" "দান প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে যে ভাবেই করো না কেন, উভয়ই উত্তম।" "তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে দান করো সেইদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন প্রহরী কোন বন্ধু থাকবে না কিংবা কেউ সুপারিশ করার মতো থাকবে না।" "আপনি কি জানেন, সেই ঘাঁটি কেমন বস্তু? বন্দীকে মুক্ত করা, আর ক্ষুধার্ত আত্মীয়-স্বজন, এতীম বালক-বালিকা এবং বিনীত ফকিরদেরকে আহার্য দান করা। তারপরে তাদের দলে শামিল হও যাঁরা ঈমানদার ও সদয় আচরণকারী।"[৫] "আফসোস তাদের জন্য যারা দয়া প্রদর্শনের ভান করে এবং অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করে।" "ভর্ৎসনা কিংবা ক্ষতিসাধন করে তোমার দানকে নিরর্থক করো না।" ক্ষমাশীলতা ও দয়ার্দ্র

১. ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসাহক এবং তাদের গোত্রসমূহ।
২. সূ. ২ আ. ১৩৪।
৩. সূ. ৯২ আ. ১৮-২০।
৪. সূ. ৭৬।
৫. সূ. ৯০ আ. ১২-১৭।

বচন বিরক্তির সঙ্গে দান করার চেয়ে উত্তম।" "সুদ পরিত্যাগ কর।" "যে ব্যক্তি অপরকে দেখানোর জন্য তার ধনসম্পদ ব্যয় করে, তার দানের উপমা এমন যে একটি ছোট পাহাড় যার উপর সামান্য মাটি পড়ে আছে যেখানে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় তা শক্ত হয়। কিন্তু যাঁরা আল্লাহকে তুষ্ট করার জন্য এবং নিজেদের আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যয় করে তাদের কাজ পাহাড়ের উপর একটি বাগানের মতো যেখানে বৃষ্টি পড়ায় দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়; আর যদি বৃষ্টিপাত না হয় তবে সেখানে শিশির পড়ে।"

"লোকজনের মধ্যে ন্যায়বিচার অনুসারে মীমাংসা করুন। নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী কোন কাজ করবেন না, তা আল্লাহর পথ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে দেবে।"[১] "আল্লাহ অন্যের প্রতি যা দান করেন তাতে লোভ কর না।" "পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা নেই, বরং ধর্মনিষ্ঠা নিহিত রয়েছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সৎ কাজ করায়।" "সকল জিনিসের সদ্ব্যবহার কর; ন্যায় বিচার অনুসরণ কর এবং নির্বোধদের অনুসরণ করো না; যদি শয়তান তোমাকে অনিষ্টকর কার্যে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। "এতীমের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ কর না।...তোমরা নিজেদের ওয়াদা পূরণ কর এবং মাটির বুকে দর্পের সঙ্গে চলাফেরা কর না।"[২] "কন্যা সন্তানের জন্ম মানুষের মুখমণ্ডলে চিন্তার কালো রেখা ফুটিয়ে তোলে।...তোমরা নিজের সন্তান-সন্ততিকে মোটেই হত্যা কর না অভাবের তাড়নায়। আমি তো রুজি দান করি তাদেরকে আর তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ—একথা সত্য সুনিশ্চিত।"[৩] "তিনি তোমাদেরকে স্ত্রী দান করেছেন যাতে তোমরা প্রেম-প্রীতিতে বসবাস করতে পার।"

"গর্ভধারিণী মাতাকে সম্মান কর।" "তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যাবে না। কারণ সেটা তো বড়ই অশ্লীল ও খারাপ পথ।"[৪] "বিশ্বাসীদের উচিত তাদের চোখকে হিফাজত করা, আর মহিলাদের উচিত অন্য মহিলা ছাড়া অন্য কোন পুরুষের নিকট অলঙ্কারের প্রদর্শনী না করা।"

"জেনে রাখো যে পার্থিব জীবন একটি প্রতারণা বিশেষ, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বৃদ্ধি সেই চারাগাছের মতো যা বৃষ্টির পর বেড়ে উঠে এবং যা দেখে কৃষকের মনে আনন্দ হয়, তারপরে তা হলুদ হয়ে

১. সূ. ৩৮ আ. ২৬। ২. সূ. ১৭ আ. ৩৪, ৩৬, ৩৭।
৩. সূ. ১৭ আ. ৩১। ৪. সূ. ১৭ আ. ৩২।

শুকিয়ে যায়। পরকালে হয় আল্লাহর থেকে ভৎর্সনা ও শাস্তি কিংবা তাঁর থেকে ক্ষমা ও শান্তি। দুষ্ট কার্য কিংবা তার অনুরূপ কার্য পরিত্যাগ কর। যাঁরা পাপ অর্জন করেছে নিশ্চয়ই তারা তার ফল ভোগ করবে।"[১] "আর যাঁরা অনাবশ্যক কথা ও কাজ এড়িয়ে চলে, আর যাকাত আদায়ের মারফতে পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করে···আর যারা নিজেদের কাছে গচ্ছিত আমানত ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সতর্ক রয়েছে, আর যাঁরা তাদের নামাজ সম্পর্কে যত্নবান, তাঁরাই তো উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের।"[২] "মা বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাঁদের মধ্যে একজন কিংবা দু'জনই তোমাদের সামনে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তাহলে তাঁদের সাথে 'উহ্' শব্দটিও বলবে না, তাঁদেরকে মোটেই ধমক দেবে না, আর তাঁদের সাথে অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথেই কথা বলবে।"[৩] "আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও। অসহায় মিসকিন, বিদেশী পথিকের হক আদায় করে দাও। অপচয় করে সব উড়িয়ে দিও না।"[৪]

"আর নিজের হাত তুমি কাঁধের সাথে গুটিয়ে বেঁধে রেখ না। আবার একেবারে ছড়িয়ে দিও না। পরিণামে যেন তুমি ধিকৃত অবস্থায় বসে থাকতে বাধ্য না হও।"[৫] "আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, যেন তারা এমন কথাই বলে যা নাকি খুব ভাল।"[৬] "গর্হিত কাজকর্ম ও কথাবার্তার জবাবে উত্তম কথাবার্তা বলুন।"[৭] "আমিই তো কিয়ামতের দিন তুলাদণ্ডে সব-কিছু সঠিকভাবেই রাখব। কারও উপরে কিছুমাত্র জুলুম করা হবে না। যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, তবুও আমি তার হিসাব করব। হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে আমিই যথেষ্ট।"[৮] "তোমরা সবাই নিজেদের পালন-কর্তার দরবারে তওবা কর। তারপরে তোমরা সবাই তাঁর মহান দরবারে রুজু হও। একথা সত্য সুনিশ্চিত যে আমার পালনকর্তা বড়ই দয়াময়, প্রেমময়।"[৯] তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছেন: তোমরা সবাই আমাকে ডাকো—আমি তোমাদের আবেদন মঞ্জুর করব।"[১০] "আপনি বলে দিন—হে আমার বান্দাগণ! তোমরা শোন! তোমরা যারা নিজেদের উপরে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ—আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ থেকে তোমরা

১. সূ. ৬ আ. ১২১।
২. সূ. ২৩ আ. ৩-১১
৩. সূ. ১৭ আ. ২৩।
৪. সূ. ১৭ আ. ২৬।
৫. সূ. ১৭ আ. ২৯।
৬. সূ. ১৭ আ. ৫৩।
৭. সূ. ২৩ আ. ৯৬।
৮. সূ. ২১ আ. ৪৭।
৯. সূ. ১১ আ. ৯১।
১০. সূ. ৪০ আ. ৬০।

নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গোনাহ সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।"[১] "পাকপবিত্র বাণী ও নেক রুজী তাঁরই দরবারে উপনীত হয়—সেখানে তাকে তুলে নিয়ে যায়।"[২]

"আমার পালনকর্তা অশ্লীল কাজকর্ম হারাম করেছেন—চাই তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক, গোনাহের কাজ এবং অকারণ বাড়াবাড়ি।"[৩]

"তোমরা সবাই নিজেদের পালনকর্তাকে বিনয়ের সাথে ও চুপিসারে ডাকতে থাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। তোমরা দুনিয়ার বুকে ফিৎনা ফ্যাসাদ মোটেই সৃষ্টি কর না—তাতে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার পরে, তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং আশা নিয়ে ডাকতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত নেককার লোকদের কাছাকাছি রয়েছে।"[৪] "মানুষকে আমি আদেশ দিয়েছি যেন নিজেদের মা-বাবার সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করে। তার মা তাকে বড় কষ্ট ক্লেশের সাথে পেটে ধারণ করেছে, আর বড় নিদারুণ যন্ত্রণার সাথেই তাকে প্রসব করেছে। তার এই পেটে ধারণ করা এবং দুধ ছাড়ান—ত্রিশ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এমন কি সে যৌবনে উপনীত হয়, তারপরে যখন বয়স চল্লিশ বছর হয় তখন বলে : হে পালনকর্তা আমার, আপনি আমাকে চিরদিন এভাবে রাখুন—যেন আমাকে আর আমার মা-বাবাকে আপনার দেওয়া নিয়ামতের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আর আমি যেন নেক কাজ করতে পারি—যাতে আপনি খুশি হবেন। আর আমার সন্তান-দেরকেও আমার জন্য সামর্থ্যবান করুন। আমি আপনার দরবারে তওবা করছি এবং আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করছি।"[৫] "তাঁদের জন্যই শান্তি-পূর্ণ বাসগৃহ রয়েছে তাঁদেরই পালনকর্তার দরবারে। আসলে তাদের কাজকর্মে তিনিই তাঁদের সহযোগী।"[৬] "নির্বোধের মতোই যারা নিজেদের সন্তানগুলোকে হত্যা করেছে কিছুই না জেনে, আর আল্লাহ যে রুজী দান করেছেন তা যারা নিষিদ্ধ করে আল্লাহর উপর মিথ্যা চাপিয়ে যাচ্ছে তারা তো নিশ্চিত পথভ্রান্ত, আর তারা সত্য সনাতন পথে অনুগামীও নয়।"[৭]

১. সূ. ৩৯ আ. ৫৩। ২. সূ. ৩৫ আ. ১০। ৩. সূ. ৭ আ. ৩৩।
৪. সূ. আ. ৫৫-৫৬। ৫. সূ. ৪৬ আ. ১৫। ৬. সূ. ৬ আ. ১২৮।
৭. সূ. ৬ আ. ১৪১।

"যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পত্তি খরচ করে—তা যেন একটি বীজ—যা থেকে সা টি শীষ জন্মাল, আর প্রত্যেক শীষে একশ' করে দানা; আল্লাহ যাকে খুশি খুব বেশী বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিরাট ব্যাপ্তির অধিকারী ও সর্বজ্ঞ। যাঁরা নিজেদের ধনসম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, আর যা খরচ করেছে—পরে তা লোকের কাছে বলে বেড়ায় না, কিংবা পীড়া দেয় না। তাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিক তাঁদেরই পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাঁদের কোনও ভয় নেই, তাঁরা শোকার্ত হবে না। ন্যায্য কথা আর ক্ষমা—তেমন ছদকা খয়রাতের চেয়ে অনেক ভাল—যা নিয়ে পরে কষ্ট দেওয়া হয়।"[১]

"আল্লাহ কাউকে সাধ্যশক্তির বেশী দায়িত্ব ন্যস্ত করেননি। যে যা অর্জন করেছে তারই ছওয়াব সে পাবে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে গিয়ে থাকি, আমরা যদি ত্রুটি করে থাকি—সেজন্য আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! এমন ভারী কাজের হুকুম দেবেন না—যেমন আমাদের আগেকার লোকদের সাথে করা হয়েছিল। আমাদের উপরে এমন কোনও বোঝা চাপাবেন না, যা সামলানোর শক্তি আমাদের নেই। আমাদেরকে মাফ করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন।"[২] "যাঁরা ধৈর্যশীল, সত্য-সাধক, আদেশ পালনকারী, নেক কাজে খরচকারী, আর শেষ রাতে গোনাহ মাফ করিয়ে নেয়।"[৩] ...যাঁরা দান করে সমৃদ্ধি ও সাফল্যের সময়ে এবং যাঁরা তাদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং অন্যকে ক্ষমা করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদেব ভালবাসেন। [তাঁদের প্রভুর কাছে তাঁদের জন্য রয়েছে শান্তির আবাস][৪] "হে আমাদের পালনকর্তা। এখন আপনি আমাদের গোনাহ মাফ করুন, আমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দিন, আর নেক লোকদের সাথেই আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।"[৫] "তারপরে তাঁদেরই পালনকর্তা তাঁদের ফরিয়াদ কবুল করলেন: আমি তোমাদের নারী-পুরুষের মধ্যে কারও কোন কাজ বরবাদ করি না, তোমরা একজন অন্য জনের সন্তান।"[৬] "আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যাঁর বরাত দিয়ে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে থাক। আর নারীদেরকে সম্মান কর।"[৭]

১. সূ. ২ আ. ২৬১-২৬৩। ২. সূ. ২ আ. ২৮৬। ৩. সূ. ৩ আ. ১৬। ৪. সূ. ৩ আ. ১২৮। ৫. সূ. ৩ আ. ১৯৩। ৬. সূ. ৩ আ. ১৯৫ ৭. সূ. ৪ আ. ১।

"তোমাদের পিতা যাদেরকে বিয়ে করেছেন, তাদেরকে তোমরা বিয়ে কর না—তবে আগে যা হয়েছে সে কথা আলাদা। আসলে এ কাজটি নিশ্চয়ই বড় জঘন্য বেহায়পনা, মারাত্মক ও বদস্বভাবের ঘৃণ্য পথ।"[১]

"তোমরা এমন কোনও বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা কর না—আল্লাহ যে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে একে অন্যের তুলনায় উৎকর্ষ দান করেছেন।"[২]

"মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার কর, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে, এতীম মিসকিনদের সাথেও, প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা খুব কাছের তাদের সাথে, আর দূরের প্রতিবেশীদের সাথেও, মজলিসের সাথী যারা তাদের সাথেও, আর পর্যটনকারী ও যারা তোমাদের মালিকানা আমল-দখলে রেখেছে তাদের সাথেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহঙ্কারী লোক-দেরকে পছন্দ করেন না।"[৩] যে কেউ নেক কাজের সুপারিশ করবে সেজন্য তাতে তাঁর অংশ রয়েছে। আর যে কেউ খারাপ কাজের জন্য সুপারিশ করবে, সে জন্যেও তার একটা অংশ রয়েছে তাতে। আল্লাহ যে সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী।"[৪] "তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন! তোমরা সবাই ন্যায়বিচারের উপরেই কায়েম থেক আল্লাহতায়ালাব তরফ থেকে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, হোক না তা নিজেদের ব্যাপার কিংবা মা-বাবা অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপার—চাই সে গরীব কিংবা ধনী হোক, তাদের দু'জনার সাথে আল্লাহর যোগ-সম্পর্কই তো সবচেয়ে বেশী। তোমরা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুগত হয়ো না, যাতে তোমরা ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরে পড়বে।"[৫]

বৃহত্তর জগৎ ও অধিকতর অগ্রগতিসম্পন্ন মানবজাতির প্রেমের মহত্ত্ব, সত্য, পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার জন্য প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা—এ সবেব প্রতি সম্বোধিত মরুভূমির মহানবীর শিক্ষা কি ঈসায়ীদের হুঁশিয়ারী কিংবা "যিশুর কোমল আবেদনের" পর্যায়ে উন্নীত হয় না?

পৃথিবীর দীনদরিদ্র, এতীম, অনাথ-আতুর জন, হতভাগ্য পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত সন্তান তাঁর নির্জন চিন্তার সার্বক্ষণিক বিষয় ছিল। তিনি প্রায়ই ঘোষণা করতেন যে এতীমদেরকে সাহায্য করা, দরিদ্রদেরকে পরিচর্যা করা এবং বন্দীদেরকে মুক্ত করা মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, শুধু মানুষেরই প্রতি তাঁর অনুকম্পা ও ভালবাসা সীমিত ছিল না, ইতর প্রাণীও তাঁর সহানুভূতি ও কোমল হৃদয়ের অনুভূতির ভাগ পেয়েছিল।

১. সূ. ৪ আ. ২২। ২. সূ. ৪ আ. ৩২। ৩. সূ. ৪ আ. ৩৬।
৪. সূ. ৮ আ. ৮৫। ৫. সূ. ৪ আ. ১৩৫।

"একদা একজন লোক হযরতের নিকট আসল ; তার হাতে একটি পাখির বাসা। সে বলল, "হে রাসুল, আমি বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় পাখির ছানার আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমি সেগুলো ধরে আমার চাদরের মধ্যে নিলাম এবং ছানাগুলোর মা আমার মাথার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে লাগল ও কিচিরমিচির করতে লাগল।" হযরত বললেন, "তাদেরকে ছেড়ে দাও।" লোকটি যখন ছানাগুলোকে ছেড়ে দিল, তখন মা পাখিটা ছানাগুলোর নিকট গেল। হযরত বললেন, "তোমরা কি ছোট ছানাগুলোর প্রতি পাখির মায়ের ভালবাসা দেখে বিস্মৃত হচ্ছ? যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর নামেই শপথ করে বলছি : ছোটছানাগুলোর প্রতি মাতা যতটা স্নেহশীল, বান্দার প্রতি আল্লাহ তদপেক্ষা অধিক স্নেহশীল। যে জায়গা থেকে তাদেরকে নিয়ে এসেছ সেখানে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে এসো আর তাদের মাকে তাদের সঙ্গে যেতে দাও।" হযরত বলেন, "ইতর প্রাণী সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, যখন পশু আরোহণের উপযুক্ত তখনই তার উপর আরোহণ করবে, আর যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন আরোহণ করবে না। ভাষাহীন ইতর প্রাণীর মঙ্গল করার জন্য ও তাদেরকে পানি প্রদানের জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার রয়েছে।"

আল্ কোরআনে আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রাণীর জীবন ও মনুষ্যজীবন একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। কোরআন বলে, "পৃথিবীতে এমন প্রাণী কিংবা ডানার সাহায্যে উড্ডয়নশীল পাখি নেই যা তোমাদের কাছে একটি জাতির সদৃশ—তারা তাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।" খ্রীষ্টান জগৎকে মানুষের মনে পশুর প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য শত শত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। খ্রীষ্টান জাতিসমূহ পশুর প্রতি কোমলতা ও অনুকম্পা দেখানোর কথা ভাববার বহু পূর্বেই হযরত মুহম্মদ অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী ভাষায় মানুষের সেবক ইতরপ্রাণীর প্রতি মানুষের কর্তব্যের বিষয় ঘোষণা করেছিলেন। এই স্নেহশীলতা, কোমলতার উপদেশাবলী যা সুবাসিতভাবে ধর্মের মধ্যে স্থান পেয়েছিল তা ইসলাম জাহানে প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ কর্তব্য হিসেবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের ধর্মীয় মর্মবাণী

“আপনি জিজ্ঞাসা করুন : গগনমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সে সব কার জন্য। আপনি ঘোষণা করুন আল্লাহতায়ালার জন্য। তিনি নিজেই তো রহমতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।…(৬-১২)

“আপনি বলুন : এস তোমরা ! আমি পড়ে শোনাচ্ছি যা তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, যেন তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। মা-বাবার সঙ্গে তোমরা সদ্ব্যবহার অবশ্যই করবে। অভাব-অনটনের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তানসন্ততিকে হত্যা কর না। কারণ, আমি তো তোমাদেরকে রুজি দান করে থাকি, আর তাদেরকেও। তোমরা প্রকাশ্য কিংবা গোপন অশ্লীলতার কাছে যাবে না। তোমরা এমন কাউকে হত্যা কর না, আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তবে ন্যায় বিচারের কথা আলাদা… তোমরা এতীম অনাথদের সম্পত্তির কাছেও যাবে না। তবে কিনা সুন্দর মনোজ্ঞ পন্থার কথা আলাদা।…যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায়বিচার কায়েম রাখবে হোক না সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আল্লাহর সাথে যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা পূরণ কর। তোমাদেরকে এসব ব্যাপারে তাকীদ করছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। আর এই তো হচ্ছে আমার পথ যা সহজ সরল, সুতরাং তোমরা তা-ই অনুসরণ কর।” (৬-১৫২-১৫৪)

প্রকৃত ধর্মীয় মর্মবাণীর সংরক্ষণের জন্য মুহম্মদ তদীয় নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে কতিপয় বাস্তব দায়িত্ব সংযুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে (১) নামাজ, (২) রোজা, (৩) জাকাত ও (৪) হজ।

মানুষের এক সার্বভৌম সর্বব্যাপী শক্তির চেতনা, প্রকৃতির চিরন্তন বিরোধিতায় তার অসহায়তা, দানের অনুভূতি—সব মিলে সেই চিরজাগ্রত ও পরমকরুণাময় একের প্রতি তার হৃদয়প্লাবী কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের, অনুতাপ ও অনুনয়ের রসধারা প্রবাহিত হয়। যে সব রসানুভূতি মানবহৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়ে উঠে প্রার্থনা কেবল তারই প্রকাশ। এসব আবেগ এক উচ্চতর অগ্রগতির ফলশ্রুতি। যদি অনুনয়-বিনয়ে উদ্দেশ্য সাধিত না হয় তবে

আদিম বর্বর লোকে তার মূর্তির সমালোচনার আশ্রয় নেয়। যে সব ধর্মের আঙ্গিক উপাদান রয়েছে সে সব ধর্মের প্রত্যেকটি যে-কোন রূপে প্রার্থনার উপকারিতা স্বীকার করেছে। তবে অধিকাংশ ধর্মে নৈতিকতার পরিবর্তে ঐশী অলৌকিকতার প্রাধান্য; আবার কোন কোন ধর্মে নৈতিক ধারণা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

আদিম হিন্দু-প্রার্থনার মধ্যে দু'ধরনের ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল—আহুতি এবং প্রার্থনাসহ বলি। ধর্মীয় চিন্তার শৈশবে দেবতারা মানুষের মতই প্রবৃত্তি ও আবেশের অধীন বলে অনুমিত হত। সুতরাং মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের সময় দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য ও বলিদানের আবশ্যক হত। 'ঋক্‌বেদে'র প্রাচীন স্তোত্রে প্রায়ই এই ধারণা পাওয়া যায়। ধর্মীয় ধারণার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ অধিকতর প্রগতিশীল বা চিন্তাশীল মানুষের মনে সম্ভবত আহুতি ও বলির তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক রূপান্তর ঘটেছিল। কিন্তু পুরোহিত শ্রেণী যারা দাবী করত যে এক "গুহ্য উৎকর্ষ" একমাত্র রক্তের মধ্য দিয়ে সংক্রমণযোগ্য, তাদের প্রভাব জনসাধারণের মনের উপর এত অধিক শক্তিশালী হয়েছিল যে ব্রাহ্মণ্যবাদ আক্ষরিকভাবে একটি যাগযজ্ঞসম্পন্ন ধর্মমতে পরিণতি লাভ করেছিল। কঠিন ও অপরিবর্তনীয় সূত্র অনুযায়ী একমাত্র পুরোহিত এই যজ্ঞ পরিচালনা করতে পারত; তিনি 'মন্ত্র' আবৃত্তি করতেন এবং ধর্মীয় অনুভূতি বা উন্মাদনা ছাড়াই যন্ত্রের মতো আচারাদি পালন করতেন, আর যার জন্য পূজা করা হত সে নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করত। সামান্যতম ভুলভ্রান্তি পূজার সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দিত। তবে ভক্তিমূলক ভাব সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল না; থাকলে ভগবতগীতা'র মতো ধর্মগ্রন্থ রচিত হতে পারত না। কিন্তু সমগ্র জনসাধারণের জন্য উপাসনা পরিণত হয়েছিল এক বিশাল যাগযজ্ঞে, যার মূল্য নির্ভরশীল ছিল যতটা পরিচালক পুরোহিতের বিশেষণের উপর ততটা পূজাদাতা ব্যক্তির নৈতিক আচরণের উপর নয়। পুরোহিত শুধু আচার-বিধির উপকারিতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং পূজা উদযাপনের সময় নিয়মানুগ বিশুদ্ধতার দিকে খেয়াল রাখতেন।

মাজো-জরথুস্ত্রবাদী ও সেরিয়ানগণ প্রার্থনার পরিবেশের মধ্যে বাস করতেন। জরথুস্ত্রবাদীরা নাক পরিষ্কার করার সময়ে, নখ কিংবা চুল কাটার সময়ে, দিন ও রাতের আহার্য প্রস্তুত করার সময়ে, প্রদীপ জ্বালাবার সময়ে প্রার্থনা করতেন। প্রথমে ওরমুজদের, পরে স্বর্গমর্ত্য, প্রাকৃতিক

শক্তিনিচয়, তারকা, বৃক্ষ, সোমা বৃক্ষ[১] এবং প্রাণিসমূহের পূজা অনুষ্ঠিত হত। এই সূত্রগুলো বারোশ' বার[২] আবৃত্তি করতে হত। নৈতিক ধারণা অত্যল্প লোকের মধ্যেই উপস্থিত ছিল; আর তা জনসাধারণের মন থেকে নিখুঁতভাবে মুছে ফেলা হয়েছিল। অসাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন লোকেরা যে ধরনের আধ্যাত্মিক জীবন উপভোগ করত তাও ধর্মের বিধায়কদের একচেটিয়া ছিল। বিশেষ পবিত্রতার সীমারেখা পুরোহিত শ্রেণীকে সাধারণ লোক থেকে পৃথক করেছিল, আর সাধারণ লোকদের জন্য মহৎ ধরনের আধ্যাত্মিক সুখ ভোগের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। অরফিসিদের মতো মাজীদের মধ্যে দু'রকমের উপাসনা প্রচলিত ছিল, বরং উপাস্য বস্তু সম্পর্কে দু'ধরনের বোধ ছিল: এক হল গুহ্য বোধ যা বিশেষভাবে পুরোহিত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত ছিল, আর অন্যটি হল বাহ্য বোধ যাতে একমাত্র সাধারণ জনগণ অংশ গ্রহণ করতে পারত।[৩]

প্রার্থনা সম্পর্কে মুসার কানুনের কোন বিধান ছিল না। পুরোহিতদেরকে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ প্রদান এবং পশুশাবক উপহার দেওয়ার পারিবারিক পবিত্রতার উপর প্রার্থনা ও স্বীকৃতি সম্পর্কিত নির্ধারিত সূত্র ছিল, যখন পরিবারের পিতা আনুগত্যের সঙ্গে আইনের নির্দেশ পালন করার বলে ইসরাইলদের জন্য জিহোভার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন "যদিও তারা তাদের পিতার নিকটই শপথ নিতেন।"[৪] কিন্তু জনগণ ও ধর্মগুরুদের মধ্যে উপাস্য সম্পর্কে আধ্যাত্মিক ধারণার অগ্রগতি ও আপোষহীনভাবে প্রাকৃতিক বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ মতবাদের অবনতিতে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উপাসনার প্রকৃতি অনুভূত হতে শুরু হল। আইনের সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিতে ডলিঞ্জার বলেন যে, ঐতিহ্য ও প্রথাই শেষ পর্যন্ত ইহুদীদেরকে উপাসনার জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল।[৫] প্রত্যহ তিন

১. সংস্কৃত ভাষাভাষীরা 'সোমা' এবং জেন্দ বংশসমূহের লোকেরা 'হোমা' বা 'হাওমা' বলত।

২. ডলিঞ্জার, 'দি জেনটাইল এণ্ড দি জু', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮। 'জেন্দ আবেস্তা' বহু দেবদেবীর প্রতি প্রার্থনা, স্তোত্র ও আহ্বান ইত্যাদির এক জমকাল তথ্য-ভাণ্ডার। বাস্তবিকপক্ষে, এ সার্বজনীন পূজা অনুষ্ঠানাদির এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তুঃ ক্লার্কের। 'টেন গ্রেট রিলিজিয়ান'।

৩. রোলাণ্ড, 'ডিসারটেকাসিস্ মিসেলেনি' ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১, শাহারিস্তানী।

৪. ডিইট ২৬, ১২-১৫।

৫. ডলিঞ্জার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

ঘণ্টা কাল ন'টা, বারোটা ও তিনটায় প্রার্থনার জন্য ব্যয়িত হত। যা' হোক, আইন-নির্দেশকের নিকট থেকে কোনরূপ সদর্থক পূর্ব-দৃষ্টান্তের অনুপস্থিতিতে পুরোহিতদের পরিচালনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রার্থনাকে যান্ত্রিক করে তুলেছিল। যিশুর সময়ে ধর্মীয় কবজ বাঁধবার রীতি প্রচলিত ছিল, কোরআনে ইহুদীদেরকে তীব্র ভাষায় "খোদার প্রতীক বিক্রয়ের জন্য" নিন্দা করেছে।[১]

যিশুর শিক্ষা মানুষের ধর্মীয় উপলব্ধির বিকাশের এক পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিবেদন করেছিল, উপাসনার যথার্থ প্রকৃতি স্বীকার করেছিল। তিনি নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রার্থনার অনুশীলন পবিত্র করেছিলেন।[২] ধর্মগুরুর উপলব্ধির অনুসরণে প্রাথমিক পর্যায়ের শিষ্যগণ ধর্মনিষ্ঠা ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাসের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[৩] কিন্তু জনসাধারণকে পরিচালনা করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনুপস্থিতি এবং উপাসনার সংখ্যা, স্থায়িত্ব ও নামকরণের ব্যাপারে পুরোহিতদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব কালক্রমে ধর্মনিষ্ঠার অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাদেরকে নিষ্কর্মা করে তুলেছিল। সুতরাং ধর্মের বিধান ও বিবেকের ব্যাপারসমূহ মীমাংসার জন্য উপাসনা-গ্রন্থ প্রণয়ন, আচার-অনুষ্ঠান নির্ধারণ, পরামর্শসভা ও জনসভা আহ্বানের প্রয়োজন হয়ে পড়ত; আর সে কারণেই দেখা দিয়েছিল পরভোজী সন্ন্যাসীদের যান্ত্রিক উপাসনা এবং সপ্তাহের ছ'দিনের আধ্যাত্মিক পরিপোষণের অভাব মিটাতে সপ্তাহে একদিন গির্জা ও ভজনালয়ে জনগণের ভিড় হত; অধিকন্তু সে কারণেই "গির্জার উপাচার্য" যিনি প্রথমে ছিলেন শুধু জনগণের "খাদেম"[৪] তিনিই যিশু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রধান ব্যক্তিত্ব" হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন।

সপ্তম শতাব্দীতে এসব অনাচার ও অনিষ্ট এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল যখন আরবের নবী এক সংশোধিত ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। উপাসনার প্রতিষ্ঠায় মুহম্মদ আল্লাহর প্রতি মনুষ্য হৃদয়ের প্রেম ও কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দেওয়ার বাসনাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, আর প্রার্থনার সময়সূচী নির্ধারণ করে উপাসনার ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতাকে জোরদার করেছিলেন যার ফলে চিন্তা পার্থিব জগতে বিচরণের সুযোগ

১. সু. ২ আ. ৪২। ২. লুক, ৯, ১-৪।
৩. ইফিসিয়ান, ৬, ১৮; কল. ১, ১২। ৪. মোশেইন ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।

থেকে নিষ্কৃতি পায়।[১] ইসলামজাহানকে আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি-যোগিতার অনিষ্ট থেকে মুক্ত করার সময়ে সূত্রাবলী নিজের দৃষ্টান্ত ও অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র করেন এবং উপাসককে ব্যক্তিগতভাবে সর্বশক্তি-মান আল্লাহর সমক্ষে সর্বাপেক্ষা হৃদয়-নিঙড়ানো নিষ্ঠা ও বিনয় প্রকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করেন।

নৈতিক সমুন্নতি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধিকরণের উপায় হিসেবে উপাসনার মূল্য কোরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"আপনি পড়তে থাকুন—কিতাবের যে অংশ আপনার কাছে নাজিল করা হয়েছে। আর নামাজ কায়েম রাখুন। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহতায়ালার জিকরই তো সবার সেরা।"[২]

অনুনয়সূচক আয়াতসমূহের রূপ হযরতের দৃষ্টান্তের সাহায্যে পূত-পবিত্র হয়ে ইসলামের শিক্ষায় নৈতিক উপাদানের সৌন্দর্য প্রদর্শন করেছে :

"হে প্রভু, আমি তোমার নিকট মিনতি করছি যে তুমি আমাকে ধর্মের পথে দৃঢ় থাকতে ও ন্যায়পরায়ণতার পথে চলতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং প্রতিটি উত্তম পথে তোমার আরাধনা করতে সাহায্য কর; আমি তোমার নিকট নিষ্পাপ হৃদয়ের জন্য মিনতি করছি যে হৃদয় দুষ্টপথের দিকে ধাবিত না হয়। আমি তোমার নিকট সত্যবাদী হওয়ার জন্য এবং যে সদ্গুণ তুমি জান তা লাভ করার জন্য মিনতি করছি; আর প্রার্থনা করছি যে তুমি তোমার জ্ঞাত বদগুণ থেকে আমাকে রক্ষা কর এবং যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তুমি ওয়াকিফাল তা থেকে আমাকে ক্ষমা কর। হে আমার রক্ষাকারী, তোমাকে স্মরণ করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে, আমার শক্তির আতিশয্য নিয়ে তোমার আরাধনা করতে তুমি আমাকে সাহায্য কর। হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার উপর জুলুম করেছি, তুমি ছাড়া তোমার বান্দার বিচ্যুতি ক্ষমা করার কেউ নেই; তুমি তোমার প্রেম ও করুণার বলে আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর দয়া কর; নিশ্চয়ই তুমি ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমাকারী এবং তোমার বান্দার উপর করুণাবর্ষণকারী।"[৩]

১. তুঃ ওল্সনার, 'দ্যজ এফেক্টস দ্যলা রেলিজিয়াস দ্য মুহম্মদ', পৃ. ৬।
২. সূ. ২৯ আ. ৪৫। ৩. মিশকাত ৪র্থ খণ্ড, ১৮ অধ্যায়, বিভাগ ২, ৩।

অন্য ঐতিহ্যবাহী প্রার্থনা যা দাউদের প্রার্থনা বলে অভিহিত তা নিম্নরূপ : হে আমার প্রভু, আমাকে তোমার প্রেম দাও; আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি আমাকে সেই শক্তিদান কর; আর তুমি আমাকে এমন কাজ করবার শক্তি দাও যার বলে আমি তোমার ভালবাসা লাভ করতে পারি এবং নিজ পরিবার কিংবা ধনসম্পদ থেকে তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে প্রিয়তর করে তুলতে পারি।"[১]

খলিফা আলী (রাঃ)-র নিম্নোক্ত দু'টি মোনাজাত উচ্চতম ধর্মনিষ্ঠার নির্দেশক।

"আমার প্রভুর প্রতি যাবতীয় কৃতজ্ঞতা; তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য ও একমাত্র উপাস্য। আমার প্রভু শাশ্বত, নিত্য, প্রতি-পালক, প্রকৃত অধিপতি যাঁর করুণা ও শক্তি সমগ্র বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে আছে; তিনি জগতের নিয়ন্তা, সৃষ্টির আলো। তাঁর জন্যই সব উপাসনা, তাঁর সমীপেই সব আরাধনা; তিনি সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি থাকবেন। হে আমার প্রতি-পালক, তুমিই একমাত্র উপাস্য; তুমিই প্রেমময় ও ক্ষমাশীল প্রভু; তুমি যাকে খুশি তাকে ক্ষমতা দান কর; আর তুমি যাকে অবনমিত কর তাকে উন্নীত করার কেউ নেই। হে আমার প্রভু, তুমি শাশ্বত, সবকিছুর স্রষ্টা, সর্বজ্ঞাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তুমি সবকিছু জানো, তোমার করুণা সর্বব্যাপী; তোমার ক্ষমাশীলতা ও দয়া সর্বব্যাপী। হে আমার প্রভু, তুমি নির্যাতিতের সাহায্যকারী, সব মুশকিলের আসানদাতা, ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির সান্ত্বনাদাতা; তুমি তোমার বান্দাদের সাহায্য করার জন্য সর্বত্রবিরাজমান। তুমি সব গুপ্ত বিষয় অবগত আছ, সকল চিন্তার বিষয় জানো, সব সমাবেশে উপস্থিত থাক। তুমি আমাদের অভাব মোচনকারী, সব কিছুর প্রদাতা। তুমি দীনদরিদ্র ও অনাথ-আতুরের বন্ধু; হে আমার প্রভু, তুমি আমার আশ্রয় দুর্গ, তোমার আশ্রয়প্রার্থীদের তুমি আশ্রয়দাতা। তুমি দুর্বলের নির্ভরস্থল; পবিত্র আত্মা ও সত্যবাদীদের সাহায্যকারী। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার অবলম্বন, আমার সাহায্যকারী; যারা তোমার সাহায্য চায় তুমি তাদের সহায়ক......হে আমার প্রভু, তুমি আমার স্রষ্টা, আমি তোমার সৃষ্ট; তুমি আমার রাজন, আমি তোমার ভৃত্য; তুমি আমার সাহায্যদাতা, আমি তোমার ভিক্ষা-

---

১. তফসীরে জালালাইন পৃ. ২৮৮।

প্রার্থী। হে আমার প্রভু, তুমি আমার আশ্রয়দাতা ; তুমি আমার ক্ষমা-কারী, আমি পাপী, গোনাহগার। হে আমার প্রভু, তুমি চিরদয়াল, সর্বজ্ঞাতা, মহাপ্রেমিক ; আমি অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি, আমি তোমার কাছ থেকে জ্ঞান ও প্রেম যাচ্ঞা করছি। হে আমার প্রভু, তোমার সব জ্ঞান, সব প্রেম, সব করুণা আমার উপর বর্ষণ কর ; হে আমার প্রভু, আমার পাপ মাফ করুন, আর আপনার আশ্রয় নিতে দিন।"

"হে আমার প্রভু, তুমি চির-প্রশংসিত, চিরন্তন, তুমি চিরবিরাজমান, চিরস্থায়ী, চিরসন্নিকটবর্তী, সর্বজ্ঞাতা। তুমি আছ সকল হৃদয়ে, সকল আত্মায়, তুমি সর্বব্যাপ্ত ; তোমার জ্ঞান সকলের মনে বীজকণা রূপে বিরাজিত।" "তাঁর সদৃশ কিছু নেই, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তিনি চিরন্তন ; প্রশংসা সেই প্রতিপালকের প্রতি যাঁর করুণা প্রত্যেক পাপীর প্রতিও সম্প্রসারিত, তিনি তাকেও প্রতিপালন করেন যে তাঁকে অস্বীকার করে। আদি ও অন্ত তাঁরই এখতিয়ারে, সব জ্ঞান ও হৃদয়ের নিভৃত গোপন কথাও তাঁর এখতিয়ারে। তিনি নিদ্রাহীন, তন্দ্রাহীন, তিনি চিরপরায়ণ, তিনি চিরজাগ্রত। তিনি তাঁর মহান করুণায় আমাদের মারাত্মক পাপও ক্ষমা করেন—তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে ভাল-বাসেন। আমি আমার প্রতিপালকের সদাশয়তার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাঁর রাসুলের নবুয়্যতের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাঁর উপর তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।"[১]

একজন ইংরেজ গ্রন্থকার বলেছেন, "এটা ইসলামের অন্যতম গৌরব যে এর ভজনালয় হাত দিয়ে তৈরী নয়, এর অনুষ্ঠানসমূহ আল্লাহর দুনিয়ার যে কোন জায়গায় আকাশের নীচেয় অনুষ্ঠিত হতে পারে।"[২] প্রত্যেক স্থান যেখানে আল্লাহর আরাধনা অনুষ্ঠিত হয় তা সমভাবে পবিত্র। যখন নামাজের সময় উপস্থিত হয় তখন মুসলমান বাড়ীতে থাকুক কিংবা বাড়ীর বাইরে থাকুক সংক্ষেপে হলেও সে আন্তরিক অনুনয়সূচক সম্ভাষণের মাধ্যমে তার হৃদয়কে উজাড় করে দেয় ; নামাজের দৈর্ঘ্য দ্বারা তার মনোযোগ ক্লান্ত হয় না ; সর্বদা তার প্রার্থনার বিষয় আত্মনিবেদন, সব কল্যাণপ্রদাতার মহিমা ঘোষণা ও তাঁর করুণার উপর নির্ভরতা।[৩]

---

১. সাহিফা-ই-কামিলা।
২. হান্টার, 'আউয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' ; পৃ. ১৭৯।
৩. সূ. ২ আ. ১২৭, ২৩০ ইত্যাদি ; সূ. ৭ আ. ২০৪, ২০৫ ; সূ. ১৭ আ. ৭৯ ; সূ. ২০ আ. ১৩০ ; সূ. ৩০ আ. ১৬, ১৭ ইত্যাদি।

মুহম্মদের ধর্মব্যবস্থায় ধর্মনিষ্ঠা যে তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে খ্রীষ্টান জগৎ তা আদৌ উপলব্ধি করতে পারেনি। হাদীস যা অতীতের বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক দলিল, তা শত শত প্রমাণকারী সাক্ষ্যসহ লিপিবদ্ধ করেছে। কিভাবে হযরত নামাজের মধ্যে আবেগের উন্মাদনা নিয়ে ক্রন্দন করতেন, কিভাবে তাঁর-মহৎ চাচাত ভাই ও জামাতা নামাজের মধ্যে এত অধিক নিমগ্ন হয়ে যেতেন যে তাঁর দেহ অবশ হয়ে পড়ত।

মুহম্মদ-প্রচারিত ইসলাম ধর্ম পুরোহিতবাদকে স্বীকৃতি দেয় না, মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা বিশেষ সাধুতার কোন একচেটিয়া কর্তৃত্ব অনুমোদন করে না। প্রত্যেক আত্মা তার স্রষ্টার নিকট পুরোহিতের মধ্যস্থতা ছাড়াই উন্নীত হয়। কায়েমী স্বার্থ কর্তৃক উদ্ভাবিত কোন উৎসর্গ, কোন আনুষ্ঠানিকতা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক মানুষ নিজেই তার পুরোহিত,[১] মুহম্মদের ইসলাম ধর্মে কোন মানুষই অন্য মানুষের চেয়ে উচ্চ নয়।

ইউরোপীয় যুক্তিবাদীগণ মুসলিম-প্রার্থনার জটিল চরিত্র সম্পর্কে অভিযোগ আনয়ন করেছেন, কিন্তু কোরআনের ধর্মাচরণ পদ্ধতি সরলতা ও মিতাচারিতার ব্যাপারে বিস্ময়কর। এরমধ্যে ধর্মের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী, কলেমা, আবৃত্তি, নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজ অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এতে এসব সম্পাদনার নিয়মাবলী কদাচিৎ নির্ধারিত আছে। "নামাজ কায়েম করুন, দুপুরের নামাজ পড়ুন, আল্লাহর সামনে অবিচল মন নিয়ে দাঁড়ান; আর ধৈর্য ও নামাজ থেকে সাহায্য গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন"; কিন্তু নামাজ কিভাবে পালন করতে হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কোরআনে বলা হয়েছে: "যখন তোমরা প্রবাসে থাকবে তখন তোমরা নামাজ সংক্ষিপ্ত করবে এতে কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা মনে কর শত্রুরা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করা ব্যতীত আর সবই তিনি ক্ষমা করে থাকেন।"

যা হোক, হযরত নামাজের যথার্থ অনুশীলনের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম ও পদ্ধতি আরোপ করেছিলেন। সেই সঙ্গে নির্ভুলভাবে একথাও নির্দেশিত

১. কিতাবুল মুস্তাত্রাফ। হজের সময় বার্ষিক কোরবানী ও বৈরাম শুধুমাত্র স্মারক অনুষ্ঠান।

হয়েছে যে, অন্তর্যামী মানুষের অন্তরের আকুলতার প্রতি নজর দিয়ে থাকেন : "তোমরা যে কোরবানী দাও তার গোশত কিংবা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, বরং তোমাদের কাছ থেকে পরহিজগারি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে থাকে।[১] কোরআনে আরও বলা হয়েছে : "পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরালেই তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা হবে না, বরং ধর্মনিষ্ঠা হচ্ছে—যদি কেউ আল্লাহ, কিয়ামতের দিন, ফিরেশতাগণ, কিতাব ও নবীদের উপরে আস্থাবান হয়। আর তাঁরই প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও মুক্তিলাভের জন্য লোকদেরকে টাকা-পয়সা দান করে আর নামাজ কায়েম রাখে, জাকাত আদায় করে, অঙ্গীকার ঠিকমত পালন করে—আর অভাব, রোগ ও যুদ্ধের সময় যারা ধৈর্য ধারণ করে—এরাই তো সেই দল যারা সত্যনিষ্ঠ—আর এরাই তো পরহিজগার।"[২]

ঘোষিত হয়েছিল যে, "হৃদয়ের নিবেদন" ব্যতীত প্রার্থনার কোন মূল্য নেই, আর আল্লাহর বাণী যা বিশ্বমানবের নিকট প্রেরিত হয়েছে, কোন জাতি বিশেষের কাছে নয় তা হৃদয় ও কণ্ঠের সম্পূর্ণ সঙ্গতির মাধ্যমে অধ্যয়ন করা উচিত। খলিফা হযরত আলী বলেছেন যে, বোধ ব্যতীত ভক্তি নিরর্থক ও তা কোন আশিস বর্ষণ করে না।[৩] বিখ্যাত ইমাম আল্‌গাজ্জলী[৪] বলেছেন যে পবিত্র গ্রন্থ[৫] অধ্যয়নের সময় হৃদয় ও বুদ্ধি অবশ্যই একত্রে কাজ করা আবশ্যক ; কণ্ঠ শুধু শব্দ উচ্চারণ করে ; বুদ্ধি শব্দাবলীর অর্থ উপলব্ধি করে, আর হৃদয় কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সহায়ত করে।[৬] হযরত বলেছেন, "মানুষের ভক্তির এক ষষ্ঠমাংশ বা দশমাংশ আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না বরং তার মধ্যে যা সে বোধ ও প্রকৃত নিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে নিবেদন করে একমাত্র তাই গৃহীত হয়।"[৭]

খ্রীষ্টানদের মধ্যে দীক্ষা দান, মিশরীয়, ইহুদীয় বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পৌত্তলিক ধর্মসমূহের পুরোহিতদের বলিদানের মাধ্যমে নৈবেদ্য প্রদান ভক্তিমূলক বা ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য প্রারম্ভিক হিসেবে প্রয়োজন হত। এ থেকে দেখা যায় যে বাহ্য শুদ্ধিকরণের প্রতি বিশেষ ধরনের পবিত্রতা আরোপিত হত. মুহম্মদ নিজের দৃষ্টান্তে এই প্রাচীন ও হিতকর

১. সু. ২২ আ. ৩৭। ২. সু. ২ আ. ১৭৭। ৩. 'গুরুরার ওয়াদ্ দুর্‌রার'।
৪. ১০ম অধ্যায় দেখুন। ৫. আল্ কোরআন।
৬. দি কিতাবুল মুস্‌তাত্‌রাফ ১ম অধ্যায়।
৭. 'আবু দাউদ' ও 'নিসায়ী' হাদীস শরীফের বিবরণ :: মুয়াজ বিন্ জাবাল কর্তৃক বর্ণিত।

প্রথাকে পবিত্রতা দান করেন। আল্লাহর আরাধনার ক্ষেত্রে পবিত্রতা অপরিহার্য প্রারম্ভিক হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[১] সেই সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন যে বাহ্য বা দৈহিক পবিত্রতা সত্যকার ভক্তি বুঝায় না। তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছিলেন যে, হৃদয়ের পরিশুদ্ধি ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর সান্নিধ্য-লাভ করা যায়।[২]

ইমাম আল্ গাজ্জালী পরিষ্কারভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে যারা কেবল বাইরের বিশুদ্ধির জন্য উৎকণ্ঠিত এবং যাদের হৃদয় অহঙ্কার ও কপটতায় পরিপূর্ণ তাদের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে আল্লাহর নবী বলেছেন যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশুদ্ধকরণ হল হৃদয়কে সর্ববিধ নিন্দনীয় কামনা-বাসনা ও কপটতা থেকে, মনকে সর্ববিধ পাপাচার ও যে সব চিন্তা মানুষকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় তা থেকে পরিশুদ্ধ করা। (তুঃ কিতাবুল্ মুস্তাত্রাফ ১ম অধ্যায়, বিভাগ ১)

ইসলামের জন্মস্থানের স্মৃতিকে মুসলমানদের মনে জাগরূক রাখার জন্য মুহম্মদ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে নামাজের সময় মুসলমানদের উচিত গৌরবময় কেন্দ্র হিসেবে মক্কা অভিমুখে মুখ ফেরানো, কেননা মক্কাই দেখেছিল পুনরুজ্জীবিত ধর্মের আলোকের প্রথম ঝলকানি।[৩] পয়গাম্বরের সত্যকার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে তিনি একটি কেন্দ্রীয় স্থান নিরূপণের একত্রীকরণকারী ফলশ্রুতি দেখতে পেয়েছিলেন, যাকে কেন্দ্র করে তাঁর শিষ্যদের ধর্মীয় অনুভূতি জমায়েত হতে পারে এবং তদনুসারে নির্দেশ দান করেছিলেন যে বিশ্বের সকল মুসলমান কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়বে। "ইহুদীদের নিকট জেরুজালেম যেমন মুসলমানদের নিকট মক্কা তেমনি। শত শত বৎসরব্যাপী অনুষঙ্গের প্রভাব এ বহন করে চলেছে। এ মুসলমানদেরকে তার ধর্মের জন্মস্থানের ও হযরতের শৈশবের স্মৃতির দিকে নীত করে, এ তাকে পুরাতন ধর্ম ও নূতন ধর্মের সংগ্রাম, মূর্তিসমূহের অপসারণ ও এক আল্লাহর উপাসনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়;

---

১. সূ ৫ আ. ৬। কোরআন সার্বজনীনভাবে 'ওজুর' কথা বলেছে ; কিন্তু যেখানে পানি পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে স্নান বা ওজুর পরিবর্তে যে কোন ধরনের পরিচ্ছন্নতা অনুমোদন করেছে। স্বাভাবিকভাবেই স্নান বা ওজু সমাধার উপায় যা হযরতের অনুশীলন থেকে এসেছে তা নিয়ে ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেক আলোচনা ও মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছে।

২. সূ. ৭ আ. ২০৬।

৩. সূ. ২ আ. ১৩৯, ১৪৪ ইত্যাদি।

সর্বোপরি এ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়; যে তার মুসলমান ভাইয়েরা একই পবিত্র স্থানের অভিমুখীন হয়ে প্রার্থনা করছে, সে বিশ্বাসীদের এক বিরাট দলের একজন, একই বিশ্বাসের দ্বারা একত্রিত, একই আশা দ্বারা অনুপ্রাণিত, একই বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, একই স্রষ্টার প্রতি প্রণিপাতকারী। মুহম্মদ যখন ইসলামের ভজনালয়ের পবিত্রতা সংরক্ষিত করেছিলেন তা থেকেই বুঝা গিয়েছিল যে মানুষের ধর্মীয় আবেগের জ্ঞান সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফাল।[১] কিন্তু এই নিয়ম ধর্মনিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য শর্ত নয় একথা পূর্বোক্ত কোরআনের আয়াত থেকেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।[২]

সকল জাতির মধ্যেই কমবেশী উপবাসের প্রথা প্রচলিত আছে। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে প্রাচীন বিশ্বে এর সঙ্গে যে ধারণা জড়িত ছিল তা কোন ব্যতিক্রম ব্যতিরেকেই নিবৃত্তির চেয়ে নিগ্রহের। এমন কি ইহুদী ধর্মে আত্ম-ভর্ৎসনা বা আত্মত্যাগ হিসেবে উপবাসের ধারণা পরবর্তী-কালের। এসেনসিয়ানরা (পিথাগোরীয়দের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগের মাধ্যমে দূরপ্রাচ্যের কৃচ্ছ্রতাবাদের সঙ্গে তাদের পরিচয়) ইহুদীদের মধ্যে প্রথম, উপবাসের নীতির মধ্যে এই নৈতিক উপাদান উপলব্ধির ব্যাপারে অন্যান্য ধারণার মতো এই ধারণাও যিশু সম্ভবত তাদের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন।

যিশুর দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টধর্মের প্রথাকে পবিত্র করেছিল। কিন্তু উপবাস সম্পর্কে খ্রীষ্টধর্মের যে ধারণা তা সাধারণভাবে অনুশোচনা বা প্রায়শ্চিত্তের[৩] এবং আংশিকভাবে পূর্ববর্তী প্রথার।[৪] অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতো

---

১. স্টেনলী লেনপুল, 'সিলেকশানস ফ্রম দি কোরআন', ভূমিকা দ্রঃ।

২. সূ. ২ আ. ১৭৭।

৩. মোশেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১। মোশেম সুস্পষ্টভাবে বলেন যে উপবাস আদিতে "পশু শক্তি প্রতিরোধ করার, অনিষ্টকর শক্তির দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করার ও বিক্ষুব্ধ উপাস্যের ক্রোধ প্রশমনের সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় হিসেবে" বিবেচিত হয়ে আসছে—১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮।

৪. নিয়েণ্ডার বলেন; "খ্রীষ্টানদের সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক উৎসব একই মৌলিক ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে·····ক্রুশবিদ্ধ ও আবির্ভূত খ্রীষ্টকে অনুকরণ করার ধারণা থেকে।" পুনরায়, "যে সব খ্রীষ্টান তাদের কর্তব্যকর্মকে যুদ্ধে, মিলপিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে তুলনা করতে আগ্রহী ছিল তাদের নিকট এই উপবাস প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত করে "স্লেসনিজ" বলে অভিহিত হত যেন সেসব খ্রীষ্টের সেনা-বাহিনীর প্রহরীর দল।"—নিয়েণ্ডার, 'চার্চ হিস্ট্রী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৮, ৪০৯।

খ্রীষ্টানদের মধ্যেও ইচ্ছাকৃত দৈহিক রিপুদমন প্রায়ই ঘটত কিন্তু সেই সংযম বা রিপুদমনের প্রবণতা ছিল নিশ্চিতভাবে মানসিক ও দৈহিক শক্তির ধ্বংস এবং এক অস্বাভাবিক সন্ন্যাসের লালন। পক্ষান্তরে, ইসলামে উপবাস বা রোজার সঙ্গত লক্ষ্য হল সীমিত ও সুনির্দিষ্টকালের জন্য দিবা-ভাগে সমুদয় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা থেকে নিবৃত্তি এবং মানুষের মধ্যে পশু-শক্তির আতিশয্যকে এক স্বাস্থ্যকর পথে পরিচালনার মাধ্যমে প্রবৃত্তি-সমূহের মধ্যে সংযম আনয়ন করা। নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় দৈহিক নিগ্রহ ইসলামে নিরুৎসাহিত, এমন কি নিন্দিত। সক্ষম ও শক্তিশালী লোকদের জন্য দৈহিক সংযম আরোপ করে আত্মিক সংশোধনের উপায় হিসেবে রোজা প্রবর্তিত হয়েছে। দুর্বল, পীড়িত, প্রবাসী, শিক্ষার্থী (যিনি জ্ঞান অন্বেষণের পথে ব্যাপৃত।—জিহাদুল্ আকবর), ধর্মের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিক আর স্বাভাবিক দৈহিক পীড়ার অধীন নারীদের জন্য রোজা অপরিহার্য নয়। যারা স্মরণে রেখেছেন গ্রীক, রোমক, পারসিক ও ইসলাম পূর্ব আরবদের পেটুকতার কথা, তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও পাপাসক্তির আতিশয্যের কথা তারা এই উপবাস নিয়মের মূল্য অনুধাবন করবেন, আর উপলব্ধি করতে পারবেন যে কি বিস্ময়করভাবে মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য বিশেষভাবে অর্ধসভ্য মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এ নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

আল্ কোরআনে যেভাবে এই নিয়মের জ্ঞানবত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন : "তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন! তোমাদের জন্য 'ছিয়াম' (রোজা) ফরজ করা হয়েছে······যেন তোমরা পরহিজগার হতে পার। নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন মাত্র। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ থাকে, কিংবা বিদেশে সফরে থাকে, তবে পরে দিনের সংখ্যা পুরা করতে হবে, যার সঙ্গতি আছে তার জন্য ফিদ্‌য়া হচ্ছে—একজন গরীবের খোরাকী!······কিন্তু রোজা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।···আল্লাহ তোমাদের সুবিধাই চান।"[১]

আত্মসংযমের এই নিয়ম দিবাভাগে সীমাবদ্ধ; রাত্রিবেলায় প্রার্থনা আরাধনার বিরতির পর মুসলমানেরা পরিমিত পানাহারের ও আইনসঙ্গত-ভাবে অন্যান্য কাজের দ্বারা সুখভোগের মাধ্যমে দেহমনকে সঞ্জীবিত করতে পারেন। হযরতের মনোভাবের অনুসরণে ফকিরগণ নিশ্চিতভাবে নিয়ম

১. সূ. ২ আ. ১৮৩-১৮৫।

লিপিবদ্ধ করেন যে রোজার সময়ে দৈহিক সংযম যেমন অপরিহার্য, মন থেকে সমুদয় নীচ চিন্তা বর্জন করাও তেমনি অপরিহার্য।[১]

ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর কোন ধর্মই ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি আইন প্রণয়ন করে জাকাত প্রদান, বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ, এতীম ও নিঃসম্বলদের লালনকে পবিত্র করেনি।

প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টানদের মধ্যে দানোৎসব ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করত; কাজেই তাদের প্রভাব কেবল অনিয়মিত আকস্মিক হতে পারত। এটা ইতিহাসের বিষয় যে "দানোৎসব বা প্রেমোৎসব" প্রবর্তনের অল্পকাল পরেই এই অনিয়মিত কারণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২]

ইসলামের বিধান অনুসারে গরীব ও অসহায় প্রতিবেশীদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক মুসলমান তার সম্পদ থেকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করতে বাধ্য। এই পরিমাণ সাধারণভাবে চল্লিশভাগের এক ভাগ কিংবা সমুদয় বস্তু, অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যের ব্যবসায়ের লাভের ২½% ভাগ। কিন্তু জাকাত তখনি দেয় হবে যখন সম্পদ এক বিশেষ মূল্যের হবে[৩] এবং তা সমগ্র এক বছর ধরে ব্যক্তির অধিকারে থাকবে, কৃষিকাজে কিংবা পরিবহনে ব্যবহৃত পশুর জন্য জাকাত দেয় নয়। এছাড়া, রমজানের শেষে এবং ঈদুল্ ফিতরের দিনে যেদিন মুসলমানদের বাৎসরিক উপবাসের সমাপ্তি, নিজের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য, যে মেহমান সারা রমজান মাসে রোজা থেকে ইফতার করে তার জন্য গম, বার্লি, খেজুর, মনক্কা, চাল কিংবা যে কোন শস্য অথবা তার মূল্য ফিতরা হিসেবে দিতে হয়।

---

১. কিতাবুল মুস্তাত্রাফ, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ বিভাগ।

২. নিয়েণ্ডার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০ ; মোশেম ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬। আমি একথা বলতে চাই নে যে এটাই একমাত্র রূপ কথার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টানদের দানশীলতা প্রকাশ পেয়েছিল। বিধবা, দরিদ্র ও এতীমদের লালন পালনের বিষয়টি ইসলামে যেমন জোর দেওয়া হয়েছে খ্রীষ্টধর্মেও তেমনি জোর দেওয়া হয়েছে। এমন কি যিশু যে ঐশী দানশীলতা শিখিয়েছিলেন তা তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে বিশেষ পরিচর্যা লাভ করেছিল। যাদের হাতে তিনি আমানত রেখে গিয়েছিলেন। দানশীলতার উপকারিতা লাভের জন্য "তিন কড়ি (অর্থাৎ ষাট বছর) পর্যন্ত এক ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে থাকবার ও সন্তান প্রতিপালনের অধিকার বিধবার ছিল। তুঃ ব্লাণ্টের 'হিস্ট্রী অব দি ক্রিশ্চিয়ান চার্চ', পৃ. ২৭।

৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তির বিশটি উট না থাকে তবে তার জন্য জাকাত ফরজ নয়।

মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ঐতিহ্য বা রেওয়াজ অনুযায়ী জাকাত-ফিতরা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি হল: (১) দরিদ্র ও উপজীবিকাহীন, (২) যারা জাকাত আদায় ও বণ্টনে সাহায্য করে, (৩) যে সব দাস স্বাধীনতা পেতে চায় অথচ সেজন্য তার সঙ্গতি নেই, (৪) যে অধমর্ণ তার ঋণ শোধ করতে অক্ষম, (৫) সফরকারী ও আগন্তুক।[১] জাকাতের কথা কোরআনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে।[২] কিন্তু ইসলামের গৌরব নিহিত রয়েছে, যিশু[৩] খ্রীষ্টের সুন্দর অনুভূতিকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে রূপান্তরিত করায়।

যে বুদ্ধিমত্তা ইসলামে মক্কা ও কাবাগৃহে বার্ষিক হজব্রত পালনের কাল নন্দিত প্রথা প্রবর্তিত করেছিল তা মুহম্মদের ধর্মের মধ্যে গোষ্ঠীগত বিভাগ সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব ভাব সঞ্চারিত করেছিল। সমগ্র মুসলিম জাহানের দৃষ্টি সেই কেন্দ্রীয় স্থানে নিবন্ধ হয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে স্বর্গীয় উদ্দীপনা জাগিয়ে রেখেছিল, যা অন্ধতমসার সেই শতাব্দীতে পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল। এখানেও প্রত্যাদিষ্ট আইনবেত্তার বুদ্ধিমত্তা আইনের নেতিবাচক অংশে, অধ্যাদেশকে আবশ্যিক করার শর্তাবলীর ক্ষেত্রে চির উজ্জ্বল: (১) বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতার পরিপক্কতা, (২) নিখুঁত স্বাধীনতা, (৩) হজব্রত উদযাপন উপলক্ষে পরিবহন ও আহার্যের খরচ বহনের ক্ষমতা, (৪) তীর্থযাত্রীর অনুপস্থিতিতে যথোপযুক্তভাবে তার পরিবারের ব্যয় সংকুলানের ক্ষমতা, (৫) যাত্রার সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা।[৪]

বিভিন্ন ধরনের আহার্যের বৈধ বা অবৈধ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে প্রায়শ ব্রাহ্মণ্যবাদের মতো কড়াকড়ি খুঁটিনাটি বিধি প্রচলিত থাকায় ইসলামের মহান শিক্ষককে তাঁর শিষ্যদেরকে মাঝে-মাঝে উপদেশ দিতে হয়েছিল যে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সব খাদ্যই বৈধ। "আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু হালাল ও উত্তম রুজী দান করেছেন তাই তোমরা ভক্ষণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর যার উপরে তোমরা ঈমান এনেছ।"[৫] আল্ কোরআন আরও ঘোষণা করে যে "আমার প্রতি যা

---

১. জামাউল্ তিরমিজি "জাকাত" অধ্যায়; জামাতা আব্বাসী; কোয়েনী 'ড্রয়িট মুসলমান'। আরও দ্রঃ 'মাবসুত'।

২. সু. ২ আ ২৬৭, ২৭০, ২৭১ ইত্যাদি।

৩. ম্যাথু ২৫, ৩৫, ৩৬।

৪. 'রাদ্দুল মোহ্‌তার', 'হজ' অধ্যায়; কোয়েরী, 'ড্রয়িট মুসাল্‌মান' ১ম খণ্ড, 'মাবসুত'।

৫. সু. ৫ আ. ৮৮।

কিছু নাজিল করা হয়েছে তার মধ্যে ভক্ষণকারীদের জন্য নিষিদ্ধ দেখি না এছাড়া যা স্বাভাবিকভাবে মরে বা রক্তমোক্ষণে মারা যায়, শূকরের মাংস, কারণ তা ঘৃণ্য এবং যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবেহ করা হয়। "এ পঞ্চম সুরাতে বিশদভাবে বলা হয়েছে, এই সুরা মূর্তিপূজক আরবদের বিভিন্ন ধরনের বর্বর ও পৌত্তলিক প্রথার বিরুদ্ধেও বিঘোষিত হয়েছে।" স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ কিংবা রক্তক্ষরণের ফলে মৃত পশু, শূকরের মাংস এবং যা কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা হয়[১], গলা টিপে মারা হয়, আঘাত দিয়ে হত্যা করা হয় কিংবা পড়ে যাওয়ার ফলে মারা যায়। অথবা শিং দিয়ে গুঁতা দেওয়ার ফলে মারা যায়, যেসব পশু হিংস্র প্রাণীর দ্বারা ভক্ষিত হয় যতক্ষণ না তোমরা মৃত্যুর জন্য আঘাত দাও, আর যা সেই পাথরের[২] উপর উৎসর্গ করা হয়,—এসব তোমাদের জন্য হারাম। আর নিহত জন্তু নিচয়কে তীরে ছিঁড়ে বাটোয়ারা করা তোমাদের জন্য গর্হিত।[৩] তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু দেওয়া হয়েছে তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৪]

১. পৌত্তলিক আরবগণ আহার্যের জন্য কোন জন্তু হত্যা করার সময় তাদের দেবী-দের নামে উৎসর্গ করত।

২. উৎসর্গ-পাথর কাবা গৃহের চারিদিকে অথবা প্রবেশ পথে স্থাপিত উৎসর্গ-পাথরের উপরে নৈবেদ্য মূর্তির জন্য প্রদত্ত হত।

৩. সু. ৫ আ. ৩।

৪. কোন কোন জিনিস গুণগতভাবে মানুষের নিকট ঘৃণ্য যেমন-মাংসাশী প্রাণী, শিকারী পাখী, সর্প ইত্যাদির মাংস ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন হত না। ভারতে প্রচলিত, হিন্দুদের নিকট থেকে ধার-করা ধারণা হল যে মুসলমানদের উচিত নয় খ্রীষ্টানদের খাদ্য গ্রহণ করা —এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভ্রমাত্মক এবং কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের (সু. ৫ আ. ৫) শিক্ষার বিপরীত: "আজকে তোমাদের জন্য উত্তম জিনিস হালাল করা হল, আর আহলে কিতাবদের খাবার তোমাদের জন্য, আর তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল করা হল।" বায় সম্পর্কে মুহম্মদের নিয়মাবলী, নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা, আমরা স্মরণ করতে পারি যে সেগুলো কাল ও জাতির অস্থায়ী পরিস্থিতির জন্য প্রযুক্ত হয়েছিল। সে পরিস্থিতি অন্তর্হিত হওয়ার ফলে এসব আইনের প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্হিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামের প্রত্যেকটি নিয়ম অপরিহার্যভাবে অপরিবর্তনীয়—এরূপ অনুমান করা মানব-প্রজ্ঞার ইতিহাস ও বিবর্তনের প্রতি অন্যায় করা। এ প্রসঙ্গে *ইবনে খালদুনের বাণী আমাদের গভীর বিবেচনার দাবী রাখে, "কেবল*

খ্রীষ্টান সমাজের অভিশাপ মদ্যপান ও জুয়া, যাবতীয় অমার্জিত ও নীচ স্বভাবের অনিষ্ট এবং সব ধরনের আতিশয্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

আরবের নবীর শিক্ষা সহজতর কিংবা মনুষ্য-প্রজ্ঞার অগ্রগতির সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যে গুটিকয়েক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন সমাজের বিশেষ স্তরসমূহে প্রধানত নিয়মশৃঙ্খলা ও একানুবর্তিতা সংরক্ষণ ছিল তার উদ্দেশ্য; তবে সেগুলো মোটেই অনমনীয় প্রকৃতির ছিল না। পীড়িত অবস্থায় কিংবা অন্যান্য কারণ উপস্থিত হলে তিনি নিয়ম-লঙ্ঘন অনুমোদন করেছিলেন। কোরানে বলা হয়েছে "আল্লাহ তোমাদের জন্য বিভিন্ন জিনিস সহজ করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।" তিনি যেসব আইন বলবৎ করেছিলেন সেগুলো হয় মদিনার প্রধান প্রশাসক হিসেবে তাঁর নিকটে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব হিসেবে প্রদত্ত হয়েছিল নতুবা সুস্পষ্ট অনিষ্টকর প্রথাকে দূরীভূত করা বা সংশোধন করার জন্য প্রদত্ত হয়েছিল। হযরত-প্রচারিত ইসলামে এমন কোন আচার স্বীকৃত হয়নি যা এক আল্লাহর চিন্তা থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে নিতে পারে; ইসলামে এমন কোন নিয়ম নেই যা অগ্রগতিশীল মানবজাতির বিবেককে শৃঙ্খলিত করতে পারে।

ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থা কোরআনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হয়েছে: "আপনি বলুন: এস তোমরা! আমি পড়ে শোনাচ্ছি যা তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন যেন তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক না কর। মা-বাবার সঙ্গে তোমরা সদ্ব্যবহার অবশ্যই করবে। অভাব অনটনের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা কর না। কারণ, আমি তো তোমাদেরকে রুজি দান করে থাকি, আর তাদেরকেও।

মনোযোগী পর্যালোচনা ও বেশ স্থায়ী প্রয়োগের ফলেই আমরা সত্য আবিষ্কার করতে পারি, ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে সতর্ক রাখতে পারি। যথার্থপক্ষে, যদি আমরা অভিজ্ঞতাসহকারে মৌলিক নীতিসমূহ, বিশেষ সভ্যতার প্রকৃতি কিংবা মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক পারিস্থিতির তোয়াক্কা না করে শুধু ঐতিহ্যবাহী বিবরণীতে পরিতৃপ্ত হই; যদি সুদূর অতীতের লোকেরা আমাদের মতো যে সব অভাব বোধ করেছে তা বিচার না করি, যদি আমরা বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা না করি, তবে আমরা আদৌ ভ্রান্তি থেকে নিস্তার পাব না এবং সত্যের পথ হারিয়ে ফেলব।"—'প্রলেগোমেনিস দ্য ইবনে খালদুন'; ম দ্য স্লেন 'প্রিমিয়ার পার্টি' পৃ. ১৩।

তোমরা প্রকাশ্য কিংবা গোপন অশ্লীলতার কাছে যাবে না। তোমরা এমন কাউকে হত্যা কর না, আল্লাহ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তবে ন্যায়বিচারের কথা আলাদা···তোমরা এতীম-অনাথদের সম্পত্তির কাছেও যাবে না। তবে কিনা সুন্দর মনোজ্ঞ পন্থার কথা আলাদা।···যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায়বিচার কায়েম রাখবে হোক না সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আল্লাহর সাথে যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা পূরণ কর। তোমাদেরকে এ সব ব্যাপারে তাকীদ করছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। আর এই তো হচ্ছে আমার পথ যা সহজ সরল, সুতরাং তোমরা তাই অনুসরণ কর।"[১] পুনরায়, "তারাই অনুগৃহীত যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে আর তাদের প্রভুর প্রতি সানুনয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যারা নিয়মিত জাকাত প্রদান করে, যারা তাদের পবিত্রতা রক্ষা করে আর যারা তাদের আমানত ও চুক্তি রক্ষা করে চলে···নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়বিচার করতে ও কল্যাণকর কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আত্মীয়-স্বজনদের প্রাপ্য অংশ দিতে নির্দেশ করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে পাপ, অন্যায় কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেছেন।"

একজন খ্রীষ্টান লেখকের ভাষায়, "ধর্ম ও জাকাত বাহ্য প্রথা ও সদর্থক অনুষ্ঠানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; এই ত্রুটিপূর্ণ পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে রাখার জন্য এসব অপরিহার্য।"[২] সেই অনুযায়ী মুহম্মদ তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে কতিপয় আচার সংযুক্ত করেছিলেন মানবজাতির সার্বজনীনতার ধারণাকে অধিকতর বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য। যিশু স্বয়ং দুটি প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন: দীক্ষা ও পবিত্র নৈশ আহার"।[৩] যদি তিনি দীর্ঘজীবী হতেন তবে সম্ভবত তিনি আরও কয়েকটি প্রথা যোগ করতেন। একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করতেন তবে তাঁর শিক্ষাকে তিনি আরও সুসংহত করতেন। এই মৌল ত্রুটির জন্য ধর্মের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা কল্পে যথার্থরূপে পরামর্শ সভা ও সমাবর্তন আহ্বানের মূল কারণ হয়েছে। যখন প্রজ্ঞা ও স্বাধীন চিন্তার ফলে ধর্মের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সামান্য উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। যিশুর কর্মসূচী অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। অপর একজন শিক্ষাগুরুর জন্য নৈতিকতার নিয়মাবলী প্রণালীবদ্ধ করার কাজ সংরক্ষিত ছিল।

---

১. সু. ৬ আ. ১৫২-১৫৪।
২. মোশেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪।
৩. প্রাগুক্ত।

আমাদের স্রষ্টার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিবেকের ব্যাপার; কিন্তু আমাদের সহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অবশ্যই সদর্থক নিয়মের ব্যাপার। আর আইনের ভাষায় বলা যায় মানুষের পারস্পরিক কর্তব্য বলবৎকরণের জন্য ধর্মের চেয়ে উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ আর কি হতে পারে। ধর্ম "মনোনীত প্রচারকগণ" কর্তৃক উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতার বিষয় হিসেবে শুধু বিবেচিত হবার নয়, কিংবা স্বাপ্নিক মনের বিশেষ চরিতার্থতা সম্পর্কে কোন অদ্ভুত মতবাদ হিসেবেও বিবেচিত হবার নয়। ধর্মকে জীবনের নীতি হিসেবে বুঝা উচিত; পূর্ণতা যা আমাদের অস্তিত্বের লক্ষ্য তার দিকে মনুষ্যত্বকে উন্নীত করা ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে ধর্ম একটা সুনিয়মতান্ত্রিক ভিত্তির উপর নৈতিকতার মৌলিক নীতিসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করে, সামাজিক বাধ্যতাবোধ ও মানবিক কর্তব্যসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, যা প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ বিকাশের সৎ সামঞ্জস্যবিধানের সাহায্যে আমাদেরকে সেই পরিপূর্ণ সত্তার সন্নিকটবর্তী করে—আমরা বলি এমন ধর্মই আমাদের সর্বোচ্চ বিবেচনা ও শ্রদ্ধার দাবী রাখে। মুহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এর মধ্যে মানুষের প্রজ্ঞা ও নৈতিক উপলব্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল এক্ষণিক ও সার্বজনীন[১] ধর্মসমূহের উজ্জ্বলতম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। এ শুধু মানুষের অগ্রগতির সত্যকার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সদর্থক নৈতিক নীতিসমূহের সমষ্টি নয়, বরং "কতিপয় নীতির প্রতিষ্ঠা, কতিপয় প্রবণতার শক্তিশালীকরণ, কতিপয় মেজাজের কর্ষণ, যা দেশ-কালের চিরপ্রবহমান সংকটের ক্ষেত্রে বিবেককে প্রয়োগ করতে হয়"। ইসলামের মহান প্রচারক আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রতীক হিসেবে হাজার উপায়ে বিশ্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে প্রচার করেছেন। "তোমরা কিভাবে চিন্তা কর যে তোমরা যখন তাঁর সামনে থাকবে তখন তিনি তোমাদেরকে জানবেন, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি তোমাদের ভালবাসার মাধ্যমে?"[২] "তোমরা কি তোমাদের স্রষ্টাকে ভালবাস? তবে প্রথমে তোমাদের সঙ্গীসাথীদেরকে ভালবাস।"[৩] "তোমরা কি তোমাদের প্রভুর সান্নিধ্য আশা কর? তবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে

---

১. এই শব্দগুলি ব্যবহারের ব্যাপারে ক্লার্কের 'টেন গ্রেট রেলিজিয়ান্স' ১ম অধ্যায় দেখুন।

২. মিশকাত, খণ্ড ২২, ২৩; অধ্যায় ২৫, ২৬।

৩. কাস্তালানীর কমেন্টারী অন দি সহীহ বোখারী ১ম অংশ, পৃ. ১০।

ভালবাস; তোমাদের জন্য যা ভালবাস, তা তাদের জন্যও ভালবাস; তোমাদের জন্য যা বর্জন কর, তাদের জন্যও তা বর্জন কর; তোমরা নিজের জন্য যা করতে চাও তাদের জন্যও তা কর।" তিনি অপবিত্রতার জঞ্জাল, কপটতার নীচতা, আত্মপ্রবঞ্চনার অধার্মিকতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি অভ্রান্ত ভাষায় সত্য, দানশীলতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের মহার্ঘতা সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন।

সর্বকালের ও সকল জাতির ক্ষেত্রে ইসলামিক নীতিসমূহের বিস্ময়কর উপযোগিতা, প্রজ্ঞার আলোকের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সঙ্গতি, আর মনুষ্যহৃদয়ের সহজাত মৌলিক সত্যকে ঘিরে আবেগময় অজ্ঞতার ছাপ ফেলে এমন রহস্যঘন মতবাদের অনুপস্থিতি—এ সব প্রমাণ করে যে ইসলাম আমাদের সত্তার ধর্মীয় বৃত্তির সাম্প্রতিক বিকাশের প্রতিবেদন। যারা এর কতিপয় নৈতিক শিক্ষার ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপেক্ষা করেছেন তারা মনে করেছেন যে এসব নীতির আপাতদৃষ্ট কঠোরতা কিংবা চিন্তার বর্তমান পন্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা ইসলামের সার্বজনীনতার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এই সব নিয়ম ও শিক্ষার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে সামান্য অনুসন্ধান করলে তথ্য-পরীক্ষায় একটু বেশী নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলে এদের যে অস্থায়ী চরিত্র প্রতিপাদন করবে তা বর্তমান যুগের চাহিদা ও কুসংস্কারের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মাবলম্বীদের অন্ধতার ফলে ইসলামের উদারতা, ব্যাপ্তি এবং যাবতীয় নৈতিক মতবাদের প্রতি সহনশীলতা নিতান্তই বিভ্রান্ত, বিকৃত হয়ে পড়েছে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়েছে।

কোরআন ঘোষণা করেছে: "যারা ঈমান এনেছে, তারা মুসলমান, ছাবেয়ী কিংবা নাসারা হোক না কেন, যারা আল্লাহর উপরে ও কিয়ামতের দিন সম্পর্কে আস্থাবান আর যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্যে কোনও ভয় নেই, আর তারা শোকার্ত হবে না।"[১]

একই মনোভাব একই ভাষায় পঞ্চম সুরাতে পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে; আর শত শত আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলাম "মুক্তি" শুধু মুহম্মদের অনুসারীদের প্রতি সীমিত রাখেনি:—"আমি তোমাদের সকলের জন্য একটা করে শরীয়ত ও ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছি। আল্লাহ যদি ইচ্ছা

১. সু. ৫ আ. ৬৯। এই শিক্ষাসমূহের মনোভাবকে আসালাসীয় ধর্মমতের মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করুন।

করতেন, তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একটিমাত্র উম্মতে পরিণত করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন তা দিয়ে। সুতরাং সবাই তোমরা নেক কাজে তৎপর হও। আল্লাহর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের মধ্যে যা নিয়ে বিরোধ ছিল, এভাবেই তার বিবরণ তোমাদের কাছে বাতলে দেওয়া হল।"[১]

পৃথিবীর যে সব ধর্ম মানবজাতির বিবেককে শাসন করেছে তাদের মধ্যে একমাত্র মুহম্মদের ইসলাম সেই দুটি ধারণাকে সমন্বিত করেছে যা বিভিন্ন যুগে মানুষের আচরণের প্রধান উৎস প্রদান করেছে—মানুষের মর্যাদার চেতনা যা প্রাচীন দর্শনে অত্যধিক শ্রদ্ধেয় হয়েছিল, এবং মানবিক পাপের ধারণা যা খ্রীষ্টান যুক্তিবাদীদের কাছে অতীব প্রিয় ছিল। মানুষকে একমাত্র তাঁর কাজের দ্বারা বিচার করা হবে—এই বিশ্বাস মুসলমানকে আত্মোৎসর্গ ও সার্বজনীন বদান্যতায়; আল্লাহর প্রভুত্ব, করুণা, প্রেম ও সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্মুখে আত্মবিনম্রতায় এবং সেসব বীরোচিত গুণে পরিচালিত করে যা এই আপত্তি তুলেছে যে ইসলামের গুণাবলী স্টোরিক্যাল[২] জীবনের পরীক্ষায় ধৈর্য, আত্মনিবেদন ও দৃঢ়চিত্ততা। এই বিশ্বাস তাকে স্নায়বিক উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাঁর বিবেককে প্রশ্ন করতে যে সব উদ্দেশ্য তাকে প্ররোচিত করে[৩] সেগুলো সন্দেহের চোখে দেখতে, আর ইষ্ট-অনিষ্ট, ভালমন্দের বিরোধে নিজেকে অবিশ্বাস করতে. সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রেমিক আল্লাহর উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে।

কোন কোন ধর্মে কর্তব্য-নির্দেশক নৈতিক শিক্ষাসম্মত এত অধিক বাস্তবতাবর্জিত, এত অধিক মনুষ্য-প্রকৃতির জ্ঞানের অভাবসূচক এবং যা অত্যুৎসাহীদের স্বপ্নময় অস্পষ্টতায় এত অধিক ভরপুর যে তা বাস্তব-জীবনের সংগ্রামে শুধু নিরর্থক।[৪] ধর্মের ব্যবহারিক চরিত্র, প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডে মানুষের সাধারণ সম্পর্কের উপর তার স্থায়ী প্রভাব, জনসাধারণের উপর তার শক্তি ও ধর্মের সার্বজনীনতা বিচারের প্রকৃত

---

১. সূ. ৫ আ. ৫৮। তুঃ সূ. ২৯ আ. ৪৬ : সূ. [illegible] আ ২৩, সূ. ৩৯ আ. ৪১ ; সূ. ৪০ আ. ১৩ ইত্যাদি।

২. ক্লার্ক, 'টেন গ্রেট রেলিজিয়ান্স' পৃ. ৪৮৪।

৩. 'হোসাইন ওয়িজ'-এর 'আখলাক' তুলনীয়।

৪. তুঃ এম. আর্নেষ্ট হ্যাভেটের 'লা ক্রিশ্চিয়ানিসিম এত্ স্য অরিজিনিস' নামক মূল্যবান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের মন্তব্য। ভূমিকা দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৯।

মাপকাঠি। কোন ধর্মের প্রকৃতির স্বীকৃতির জন্য আমরা ব্যতিক্রমধর্মী মননের শরণাপন্ন হই না। আমরা জনসাধারণের মধ্যেই ধর্মের স্বরূপ খুঁজে পেতে চাই। আমরা যেসব প্রশ্ন স্বভাবত উত্থাপন কার সেগুলো হল: ধর্ম কি মানুষের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে? তা কি তাকে উন্নত করে? তা কি তার অধিকার ও কর্তব্যের ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করে? ধর্মের বাণী দক্ষিণ সাগরদ্বীপের লোকদের কাছে নিয়ে গেলে কিংবা কাফরারীয়দের মধ্যে প্রচার করলে তা কি তাদের জীবনকে উন্নত অথবা অবনত করে? ইসলাম ধর্মে সর্বাধিক বুদ্ধিবাদী বাস্তবতার সঙ্গে উচ্চ ভাববাদের সমন্বয় ঘটেছে। ইসলাম মনুষ্য-স্বভাবকে উপেক্ষা করেনি, বাস্তব জীবনের সীমানার বাইরে সর্পিল পথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেনি। অন্যান্য ধর্মব্যবস্থার মতো এর লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণতার নিরঙ্কুশ আদর্শের দিকে মানবতার উন্নয়ন; মনুষ্য-স্বভাব তার এই অস্তিত্বে যে নিখুঁত নয়—এই সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করেছিল বা অর্জন করার প্রয়াস পায়। যদিও ইসলাম বলে না যে, "যদি তোমার ভাই তোমার এক গালে আঘাত করে অন্য গালটি তাকে এগিয়ে দাও", যদি এ স্বেচ্ছাকৃত অন্যায়কারীর অন্যায়ের সমপরিমাণ শাস্তি অনুমোদন করে,[১] তবু এ আন্তরিকভাবেও বিভিন্ন মেজাজে ক্ষমা ও মহানুভবতার অনুশীলন, অনিষ্টের প্রতিদান হিসেবে কল্যাণ সাধনের শিক্ষা দিয়ে থাকে। কোরআনে বলা হয়েছে: "তার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর পথে আহ্বান করে ও নেক কাজ করে।...সৎ ও অসৎ কাজ, ভাল ও মন্দ কিছুতেই সমান নয়। আপনি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই তা এড়িয়ে চলুন।"[২] আবার বিহেশত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন: "যারা সম্পদে ও বিপদে দানখয়রাত করে, যারা তাদের রাগ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ দয়াশীলদের ভালবাসেন।"[৩]

এসব মহৎ নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন মিথ্যা ভাবাবেগের কারাগারে সযত্নে রক্ষিত নয়। হযরতের প্রকৃত অনুসারীদের নিকট এগুলো জীবনের

১. সু. ২২ আ. ৩৯, ৪০। থোনিসেন মন্তব্য করেছেন যে, মুহম্মদ প্রভৃত অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য স্বেচ্ছাকৃত অন্যায়কারীর শাস্তি অনুমোদন করেছেন, একথা সর্বদা অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। 'লা হিস্ট. দু ড্রয়িট ক্রিমিনেল অ্যজ পিউপলস এন্সিয়েন্স' ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

২. সু. ৪১ আ. ৩৩, ৩৪।

৩. সু. ৪২ আ. ৩৭।

সক্রিয় মৌল নীতি। বিস্মিত বংশধরদের বিমুগ্ধ প্রশংসার জন্য ইতিহাস অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে দুঃখকষ্টের ভেতর ধৈর্যশীলতার অনেক দৃষ্টান্ত সংরক্ষণ করেছে। দুর্দশার মধ্যে যখন অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই তখন সংযত ক্ষমার অনুশীলন সুদিনে ক্ষমা করার চেয়ে সহজতর। কারবালার মহান শহীদ হযরত হোসাইন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদিন যখন তিনি রাতের আহারে বসেছেন তখন ঝলসান উষ্ণ পাত্রের আধেয় একটি ভৃত্য তাঁর উপরে ফেলে দিয়েছিল ও তা তাঁর পায়ের উপরে পড়েছিল। এতে সে কোরআনের আয়াত "বিহেশত তাদের জন্য যারা তাদের রাগ দমন করেছে" আবৃত্তি করল। হোসাইন উত্তর দিলেন "আমি রাগান্বিত হইনি।" ভৃত্যটি আবৃত্তি করে চলল, "আর যাঁরা মানুষকে ক্ষমা করে"। হোসাইন বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।" তখন ভৃত্য এই বলে আয়াতটি শেষ করল "আল্লাহ দয়াশীল ব্যক্তিকে ভালবাসেন।" হোসাইন উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম আর চারশত দিনার তোমাকে দিলাম।"[১]

'কাশ্শাফ' গ্রন্থের প্রণেতা এভাবে ইসলামী শিক্ষার সারবস্তুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন : "যিনি তোমাদেরকে বিতাড়িত করেছেন তাঁকে পুনরায় অন্বেষণ কর ; তাঁকেই দাও যিনি তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন; তাঁকে ক্ষমা কর যিনি তোমাদের ক্ষতি করেছেন ;[২] কারণ আল্লাহ ভালবাসেন যে তোমরা তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁর পূর্ণতার বীজ প্রোথিত কর।"[৩]

আকাঙ্ক্ষার বিশুদ্ধতায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ের চেয়ে অধিকতর সুন্দর কিছু হতে পারে কি : "আর তাঁরাই করুণাময় আল্লাহর বান্দা যাঁরা দুনিয়ার বুকে ধীর পায়ে চলাফেরা করে। আর মূর্খরা যখন তাঁদেরকে কিছু বলে তখন তাঁরা বলে : ছহি সালামতেই থাক। আর যারা রাত্রি

১. সেল তাঁর কোরআনের অনুবাদের তৃতীয় অধ্যায়ের একটি টীকায় এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং গিবসও ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তবে উভয়েই ভুলবশতঃ হোসাইনের ভ্রাতা হাসানের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে হোসাইনী মিরাট সংস্করণ পৃ. ১৯৯।

২. আবু দারদ কর্তৃক বর্ণিত হযরতের উপদেশের সঙ্গে এর তুলনা করুন : 'মিশকাত', ৪র্থ খণ্ড' অধ্যায়—১, বিভাগ—২ 'মুস্তত্রাফ'-এর 'ক্ষমা'-র উপর সমগ্র অধ্যায়।

৩. জামাকশারী (কাশশাফ) মিশর সংস্করণ প্রথমাংশ, পৃ. ২৮০।

অতিবাহিত করে নিজেদের পালনকর্তার জন্য সিজদায় দাঁড়িয়ে থেকে।...আর যাঁরা খরচপত্রের বেলায় অপব্যয় করে না মোটেই, আর কার্পণ্যও করে না, বরং তাঁরা মাঝামাঝি এক সহজ পথ বেছে নেয়। আর যাঁরা মাবুদ হিসেবে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে না। আর তাঁরা এমন কোন লোককে হত্যা করে না—যা নাকি আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন, তবে কিনা সংগত কারণ ব্যতীত। আর তাঁরা মোটেই ব্যভিচার করে না...যাঁরা মিথ্যা অপকর্মের শরীক হয় না, আর যদি খেলাধূলা বাজে কাজকর্মেব মধ্যে এসে পড়ে তাহলে অত্যন্ত ভদ্রভাবে এড়িয়ে চলে যায়।...আর যাঁরা দোওয়া করতে থাকে : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের স্ত্রী ও পুত্র পরিজনদের দিয়ে আমাদের চোখের শান্তি দান করুন, আর আমাদেরকে পরহিজগারদের নেতা বানিয়ে দিন।' তাঁরাই তো সেই দল যাদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে বালাখানা দান করা হবে—কারণ তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তাঁরা সেখানে সালাম ও সংবর্ধনা লাভ করবেন। সেইখানে তাঁরা চিরকাল বাস করবেন বিশ্রাম ও থাকবার জায়গা হিসেবে তা যে কতই না সুন্দর।"[১]

এই হল মুহম্মদের ইসলাম। এ "শুধু একটা ধর্মমত নয়, এ হল বর্তমানে নির্বাহীতব্য একটি জীবনচেতনা"—ঐশী প্রেম সার্বজনীন বদান্যতা ও আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্য ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত যথার্থ কর্ম-সম্পাদন, যথার্থ চিন্তন ও যথার্থ কথনের একটি ধর্ম। ইসলামের আধুনিক পণ্ডিতগণ তাদের রাসুলের মহিমা যতই নিষ্প্রভ করুন না কেন (এবং আধুনিক মুহম্মদীয় মতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর একখানা বিশালকায় গ্রন্থও রচিত হতে পারে), তবু যে ধর্ম ধর্মনিষ্ঠা (পরহিজগারি) এবং "কাজের মাধ্যমে যৌক্তিকতা প্রতিপাদন"[২] প্রমূর্ত করে তোলে তা মানবপ্রেমিকদের স্বীকৃতির উপযুক্ত।

"সান্নিধ্য কি পেতে চাও আল্লার
তবে হও নির্ভেজাল আর পরহিজগার।"

১. সু. ২৬ আ. ৬৩-৭৬।
২. মি. কটার মরিসন তাঁর 'সার্ভিস অব ম্যান' গ্রন্থে এই মতবাদ মানবতার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

জালালউদ্দীন রুমী বলেন ঃ

তোমার মধ্যে খেলছে কেবল
দুই রকমের দুই-আমি
একটা চলে আঁধার পথে
অন্যটা যে ঊর্ধ্বগামী।
আঁধার পথের বন্যটারে
রেখে দাও ঐ এক পাশে
চালাও এবার স্বর্গ-শকট
উড়ুক তা আজ আকাশে।

বর্তমান জীবন ভাবী জীবনের শস্যক্ষেত্র। হৃদয়ের তদ্‌গতচিত্ততা নিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করা, সমুদয় শক্তি নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার পরিপূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছবার প্রয়াস ইসলামের মূলনীতি। প্রকৃত মুসলমান একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান, কেননা তিনি যিশুর নবুয়্যতকে স্বীকার করে এবং তিনি যে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন তা কার্যে পরিণত করার জন্য প্রয়াস পান। তবে কেন একজন প্রকৃত খ্রীষ্টান সেই প্রচারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন না যিনি তাঁর পূর্ববর্তী প্রচারকদের শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন? তিনি কি বিপথগামী শক্তিসমূহকে প্রগতির পথে পরিচালিত করেননি?

যিশুর পুত্রত্বের ধারণা ছাড়া খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। মূলের দিক দিয়ে উভয় ধর্মই এক ও অভিন্ন; উভয়ই মানবজাতির মধ্যে সক্রিয় একই আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের ফলশ্রুতি। একটি ছিল ইহুদী ও রোমকদের হৃদয়হীন জড়বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অন্যটি হল আরবদের মর্যাদাহানিকর পৌত্তলিকতা, তাদের হিংস্র, বর্বর প্রথা ও নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। খ্রীষ্টধর্ম একটি সুগঠিত সরকারের অধীনে একটি অধিকতর স্থিতিশীল ও সভ্যলোকদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল, কাজেই এই ধর্মকে তুলনামূলকভাবে মৃদু অনিষ্টের সহিত প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল। ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল যুযুধান গোত্র ও বংশের লোকদের কাছে, ফলে তাকে স্বার্থপরতা ও প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। প্রাচ্যের দিকে খ্রীষ্টধর্মের অগ্রগতি ব্যাহত করেছিলেন একজন কৃষ্টিবান অথচ অদ্ভুত চরিত্রের লোক, যদিও তিনি জন্মসূত্রে ইহুদী, শিক্ষার দিক দিয়ে আলেকজেন্দ্রিয় গ্রীক। তবে তিনি গ্রীস ও রোমে এই ধর্ম বহন করেছিলেন। সেখানে শত শত বছর ধরে

পৌত্তলিক সভ্যতা দানা বেঁধেছিল, খ্রীষ্টধর্ম সেখানে নূতন ধারণা ও মতবাদের জন্ম দিয়েছিল। যে মুহূর্তে খ্রীষ্টধর্ম তার জন্মস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছিল তখনি তা খ্রীষ্টানত্ব হারিয়েছিল। এ ধর্ম পলের ধর্ম হয়ে দাঁড়াল, যিশুর ধর্ম হারিয়ে গেল। প্রাচীন পৌত্তলিকতার সর্বমন্দির ধসে পড়ছিল। গ্রীক ও আলেকজেন্দ্রিয় দর্শন রোমানজগতকে অবতাররূপী খোদা স্বীকৃতির জন্য প্রস্তুত করেছিল—সার্বভৌম স্রষ্টার অধীনস্থ খোদা, অনন্তের বুকে জাত কালপুরুষ; পলের খ্রীষ্টধর্মে এই ধারণা আসন গেড়ে বসেছিল। আধুনিক ভাববাদী খ্রীষ্টধর্ম যা সদর্থক ধর্মের চেয়ে দর্শনের বাহুল্য তা ছিল বহু শতাব্দী সঞ্চিত প্রাক্-খ্রীষ্টান ও খ্রীষ্টানোত্তর সভ্যতার ফল। ইসলাম এমন এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে, এমন সামাজিক ও নৈতিক অবস্থাসমূহের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল যা ছিল সম্পূর্ণরূপে আলাদা। এর বিরুদ্ধে অধঃপতিত খ্রীষ্টধর্ম যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তা যদি এ ভাঙত এবং পৃথিবীর উচ্চতর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এর পথ করে নিত তবে অপেক্ষাকৃত কম মার্জিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এর যে অবস্থা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থা পর্যবেক্ষকের কাছে হাজির হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবহমান নদীর মতো এই দুটি ধর্ম যে দেশের ভেতর প্রবেশ করেছিল সে দেশবাসীর প্রকৃতি অনুযায়ী সেখানে ফলোৎপাদন করেছে। মেক্সিকোবাসীরা, যারা ক্যাক্টাস পত্রের দ্বারা নিজেদের শরীরে আঘাত করে নিজেদের শাস্তি দেয়, পৌত্তলিক দক্ষিণ আমেরিকানগণ যারা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত—তারা কোন অর্থেই আদৌ খ্রীষ্টান নয়। তাদের এবং আধুনিক খ্রীষ্টান চিন্তাবিদদের মধ্যে এক বিরাট ফাঁক রয়েছে। ইসলাম যেখানে মার্জিত ও প্রগতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেখানে সে প্রগতিশীল প্রবণতাসমূহের সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে, সভ্যতার অগ্রগতিকে সহায়তা করেছে, ধর্মকে আদর্শায়িত করেছে।[১]

অশিক্ষিত ও অমার্জিত লোকদের উপর স্থায়ী হিতকর প্রভাব

---

১. যে ধর্ম আলী (রাঃ)-র বীরোচিত ধর্মনিষ্ঠা, জাফর সাদিক (রাঃ)-র মৃদু শান্তভাব, মূসা (রাঃ)-র পবিত্রতা ও ধৈর্য ফাতিমা (রাঃ)-র ঐশী পবিত্রতা, রাবিয়া (রহঃ)-র সাধুতা জন্ম দিতে পেরেছে, যে ধর্ম ইবনে সিনা, আল্‌বেরুণী, ইবনে খালদুন, সানায়ী, জালালউদ্দীন রুমী, ফরিদউদ্দীন আত্তার, ইব্‌রাহিম আদহাম এবং এ ধরনের শত শত লোক তৈরী করতে পেরেছে সে ধর্মের মধ্যে আশান্বিত হওয়ার প্রত্যেকটির উপাদান রয়েছে।

বিস্তার করার জন্য "নির্দেশসমূহ ও নিষেধাজ্ঞাগুলোর" ক্ষেত্রে ধর্মটিকে মুখ্যত সদর্থক হওয়া চাই। উচ্চতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বাইরের কোন নির্দেশ ছাড়াই তাদের সঙ্গীসাথীদের প্রতি কর্তব্যের ধারা হৃদয়ঙ্গম করা প্রায়ই সম্ভব। তারা আল্লাহর সঙ্গে যোগ-যুক্ত এবং তাদের সত্তার সঙ্গে পরিণতপ্রাপ্ত ন্যায়-অন্যায়, সত্যতা-পবিত্রতার চেতনার দ্বারা পরিচালিত। প্লেটো ও এরিস্টটল কখনো সেমিটিক প্রত্যাদেশের আলোক পাননি, কিন্তু তাঁরা মহান পয়গাম্বরদের মতো সুস্পষ্ট ভাষায় জগতবাসীকে নৈতিকতার সর্বোচ্চ নীতিসমূহ শুনিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর বাণী শুনেছেন এবং তাঁদের চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে উন্নীত হয়েছেন।

যদি সদর্থকরূপে সম্বোধিত না হয় এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণসহ বিধি-সমূহ প্রণীত না হয় তবে অজ্ঞতা বা বর্বরতায় নিমজ্জিত জনসাধারণের কাছে, অমার্জিত ও মাতাল লোকদের জন্য নৈতিক নির্দেশাবলী কোন অর্থ বহন করে না। কোন ধর্মের নৈতিক দিক তাদের অনুভূতি বা আবেগের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে না; আর দার্শনিক ধারণাসমূহ তাদের মন, প্রাত্যহিক আচরণ কিংবা জীবনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

তারা নৈর্ব্যক্তিক নীতিসমূহের উপর বক্তৃতার তুলনায় কর্তৃত্ব ও নজীরের দ্বারা অনেক বেশী পরিচালিত হয়। শুধু স্বশ্রেণীভুক্ত সঙ্গীসাথীদের প্রতি তাদের সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের জন্যই নয় বরং তাদের স্রষ্টার সহিত সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের জন্যও, যে সম্পর্ক ঐসব নিয়মের অনুপস্থিতি বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক, তাদের আবশ্যক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের সাফল্য এবং বিশ্বে তার দ্রুত ও বিস্ময়কর বিস্তৃতির কারণ এই ছিল যে মনুষ্য-প্রকৃতির এই প্রয়োজনটি ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছিল। যুযুধান গোত্র ও ধর্মমতসমূহের জগতে, যেখানে অনুশীলনের পরিবর্তে কথাই অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ইসলাম সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশের আকারে নির্দেশাবলী ঘোষণা করেছিল। যে নৈতিক ও সামাজিক ভরাডুবির মধ্যে ইসলামের জন্ম হয়েছিল তাতে তার লক্ষ্য ছিল এক সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তির উপাসনার একত্রীকরণ এবং তার দ্বারা মানুষকে কর্তব্য পালনের প্রতি আহ্বান করা, একমাত্র যা আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ দেখিয়েছিল। নিম্নস্তরের জাতিসমূহকে সামাজিক নৈতিকতার উচ্চস্তরে উন্নীত করে ইসলাম জগৎ সমক্ষে সদর্থক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছিল। আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে সে

মানুষকে মিতাচারিতা, সংযম, বদান্যতা, ন্যায়বিচার ও সাম্য শিক্ষা দিয়েছিল। মানুষে মানুষে সাম্য-নীতির স্বীকৃতি ও তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা চিন্তার একই পর্যায় চিত্রিত করেছিল যা গ্যালিলির উপকূলে অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। এমন কি, সর্বোচ্চ তন্ময়তার মুহূর্তেও ইসলামের মহান শিক্ষক ব্যক্তিগত শক্তির উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতার কথা বিস্মৃত হননি, যা অর্থনৈতিক বৈষম্য উৎপন্ন করে।

আফসোস! ইসলামের পরবর্তী দিনের প্রচারকদের জন্য দলগত অনিষ্টকর প্রভাব প্রকৃত ধর্মের পুষ্পমুকুল ও সত্যকার ভক্তিমূলক মনোভাবকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

একজন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক• খুব জোরের সঙ্গেই ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং এ দুয়ের পার্থক্যের মধ্যে বিভ্রান্তির[১] ফলে যে অনিষ্টসমূহ দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কেও বলেছেন। যা খ্রীষ্টধর্মে ঘটেছে তা ইসলামেও ঘটেছে। অনুশীলন প্রচারের প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে, আনুষ্ঠানিকতা আন্তরিক ও বিশ্বস্ত কাজ—কল্যাণ করার জন্য ও আল্লাহর প্রেমের জন্য মানবজাতির কল্যাণ সাধনের স্থান দখল করেছে। উন্মাদনা নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভক্তি তাৎপর্যহীন বাক্যে পর্যবসিত হয়েছে। যে ঐকান্তিকতা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব ইতর প্রাণীর চেয়ে কোন দিক দিয়েই উত্তম নয়—যথার্থ কর্ম ও যথার্থ চিন্তন অনুপস্থিত। বর্তমানের মুসলমানগণ অক্ষরের হতাশ প্রেমে প্রকৃত মনোভঙ্গী উপেক্ষা করেছে। মহান শিক্ষক কর্তৃক প্রচারিত আদর্শ অনুসারে জীবননির্বাহ না করে, উত্তম কাজে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করে, পরহিংসার না হয়ে আল্লাহকে ভাল না বেসে এবং তাঁর প্রেমে তাঁর সৃষ্টিকে ভাল না বেসে তারা সুবিধাবাদ ও বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের দাসে পরিণত হয়েছে। এটা স্বাভাবিক ছিল যে মহান শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসার কারণে তাঁর প্রাথমিক শিষ্যবৃন্দ তাঁর জীবনের সাধারণ পদ্ধতিকে অপরিবর্তনীয় করে তুলেছে, একটা সুখদুঃখময় জীবনের সাময়িক ঘটনাগুলোকে পরিশ্রুত করে তুলেছে, একটি শিশু সমাজে সেদিনের সাধারণ সংকটের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা নিয়ম-কানুনগুলোকে হৃদয়পটে এঁকে নেবে। কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, প্রজ্ঞার সার্বভৌমত্বের মহত্তম সংরক্ষক, যে মানুষটি ঘোষণা করেছিলেন যে বিশ্বজগৎ নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত ও

১. প্রফেসর মমারি, 'ডিফেক্টস অব মডার্ণ ক্রিশ্চিয়ানিটি'।

চালিত, যে প্রাকৃতিক নিয়মের অর্থ প্রগতিশীল বিকাশ, তিনি কোনদিন ভেবেছিলেন যে, যে-অধ্যাদেশসমূহ এক অর্ধ-সভ্য গোষ্ঠীর অস্থায়ী প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকবে—এ কথা অনুমান করা ইসলামের নবীর প্রতি অন্যায় করা।

বিরামবিহীন সামাজিক ও নৈতিক ঘটনাবলীসহ এই প্রগতিশীল জগতের প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ শক্তি কারও ছিল না কিংবা তাঁর নিকট মঞ্জুরীকৃত প্রত্যাদেশ সম্ভাব্য সকল ব্যাপারের সমাধান দিতে পারবে না—ঈদৃশ কথা তাঁর চেয়ে অধিক কেউ জানত না। যখন মোয়াজ ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন হযরত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কোন আইনের দ্বারা তিনি ঐ প্রদেশ শাসন করবেন। মোয়াজ উত্তর দিলেন, "কোরআনের আইনের সাহায্যে।" "কিন্তু যদি তুমি সেখানে কোন নির্দেশ না পাও?" তিনি উত্তর করলেন, "রাসুলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি কাজ করব।" "কিন্তু সেখানেও যদি তুমি কিছু না পাও?" "তিনি উত্তর করলেন, "আমি আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে করব।" হযরত তাঁর শিষ্যের এই উত্তর সানন্দে অনুমোদন করলেন এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের জন্যও একই নীতি অনুমোদন করলেন।

মহান শিক্ষক তাঁর সময়ের সংকটাবলী সম্পর্কে, যে জাতির সহিত তাঁকে উঠা-বসা চলাফেরা করতে হয়েছিল তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফাল ছিলেন। এই জাতি সামাজিক ও নৈতিকতার চরম নৈরাশ্যের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তঃদৃষ্টি এবং উদার দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং কেউ বলতে পারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন আকস্মিক ও অস্থায়ী নিয়মসমূহ স্থায়ী ও সাধারণ নিয়মসমূহ পৃথকীকৃত হবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "তোমরা এমন একটা যুগে বাস করছ যখন, যদি তোমরা আদিষ্ট বিষয়ের এক-দশমাংশও বর্জন কর তবে তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এরপর, এমন সময় আসবে যখন, কেউ যদি এখনকার আদিষ্ট বিষয়ের এক-দশমাংশও পালন করে তবে নাজাত পাবে।"[১]

আমরা পূর্বেই মন্তব্য করেছি যে, মুসলমান জাতির উপর যে অনিষ্ট-

১. এই সহী হাদিসটি আবু হোরায়রা বর্ণিত এবং 'তিরমিজী শরীফে' সংরক্ষিত, এটি 'মিশকাত' শরীফের 'বাবোল্‌ এয়্‌ তে ছামে বিল্‌ কিতাবে ও ওয়াস্‌ সুন্নাত'-এ পাওয়া যাবে।

কর প্রভাব পড়েছে তা মহান শিক্ষকের শিক্ষাসমূহের ত্রুটির জন্য নয়। কোন ধর্মেই ইসলামের চেয়ে বিকাশের অধিকতর আশাবাদ নেই, কোন ধর্মমতই এর চেয়ে বিশুদ্ধতর নয় কিংবা মানবজাতির প্রগতিধর্মী দাবী-সমূহের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মুসলমান সম্প্রদায়গুলোর বর্তমান নিশ্চল অবস্থার মূলে রয়েছে প্রধানত একটি ধারণা যা সাধারণভাবে মুসলমানদের মনের উপর স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে : ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রাথমিক পর্যায়ের ফকিহ বা আইনবেত্তাদের সময়েই নিঃশেষ হয়েছে, আধুনিক-কালে তার অনুশীলন পাপ, মুহম্মদের গোঁড়া অনুসারী হিসেবে মুসলমানের পক্ষে উচিত ইসলামের চারটি মযহাবের যে কোন মযহাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং নবম শতাব্দীতে অধ্যুষিত ফকিহদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিজেদের বিচারবুদ্ধি বর্জন করা এবং বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনের প্রতি দৃকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করা।

সুন্নীদের মধ্যে এটা সাধারণ বিশ্বাস যে চারজন ইমাম[২] থাকার পর হযরতের আইনকানুন ব্যাখ্যার জন্য অপর কোন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। মুসলমানগণ বর্তমানে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে খতিয়ে দেখা হয় না। এ সব বিশেষজ্ঞ আইনবেত্তারা বহু শতাব্দী পূর্বে যে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছিলেন তা আজও সমভাবে প্রযুজ্য বলে মনে করা হয়। শিয়াদের মধ্যে আকবরী সম্প্রদায়ের লোকেরা "আইনের ব্যাখ্যাতাদের" নির্দেশের বাইরে তাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে রাজী নয়। হযরত প্রজ্ঞাকে মানববুদ্ধির সর্বোচ্চ ও মহত্তম বৃত্তি হিসেবে পবিত্র বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের মযহাবের নেতাগণ ও তাঁদের অন্ধ অনুসারীরা বিচারবুদ্ধির অনুশীলনকে পাপ ও অপরাধ বলে গণ্য করেছেন।

যেমনি খ্রীষ্টানদের মধ্যে তেমনি তা মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত। বর্তমানে মুসলমান সমাজের এক বৃহদংশের জীবন ও আচরণ মহান শিক্ষা-গুরুর শিক্ষাসমূহের দ্বারা কম নিয়ন্ত্রিত এবং 'মুযতাহিজ ও ইমামদের' মতবাদ ও মতামতের দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত, যারা প্রত্যেকে নিজেদের জ্ঞানানুসারে হযরতের নিকট প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে মতামত গঠন করেছেন। যেমন জনতার অন্তর্গত লোকগুলো একজন প্রচারকের বক্তৃতা শ্রবণ করে

২. আবু হানিফা, শাফেয়ী, মালিক ও ইবনে হাম্বল

থাকে যিনি সুউচ্চ স্থান থেকে বিশাল সমাবেশের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে থাকেন এবং তদীয় সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এক বিরাট অংশ উপেক্ষা করে থাকেন, তেমনি তারা শুধু তাদের সাক্ষাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তাঁর বাণীর ব্যাপকতর অর্থ এবং তিনি যে শ্রোতাদের সম্বোধন করেছিলেন তাদের স্বভাব হৃদয়ঙ্গম না করেই তাঁর বাণীসমূহ মানবিক সমস্যা ও মানবিক প্রগতি সম্পর্কে তাদের সীমাবদ্ধ ধারণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। শিক্ষাগুরুর শিক্ষাসমূহের সার্বজনীনতা বিস্মৃত হয়ে, তাঁর প্রাণশক্তির সহায়তা ব্যতীত, তাঁর জীবনের প্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে হযরত তাঁর প্রতিভার শীর্ষদেশ থেকে সমগ্র মানবতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা অস্থায়ী বিষয়কে চিরস্থায়ী বিষয়ের সহিত, বিশেষকে নির্বিশেষের সহিত মিশিয়ে ফেলেছেন। খ্রীষ্টানজগতের পুরোহিতদের মতো বহু মুসলিম আইনবেত্তা (দু'একজন নয়) রাজাবাদশাহ ও অত্যাচারী শাসকদের ভৃত্য ছিলেন, আর তাদের দাবী শিক্ষাগুরুর শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। আইন-কানুন উদ্ভাবিত হয়েছিল, তত্ত্ব তৈরী করা হয়েছিল, ঐতিহ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং শিক্ষাগুরুর বাণীর উপর রং চড়ানো হয়েছিল, যাঁর বাণীর সহিত তাদের মনোভঙ্গীর মিল ছিল না। সুতরাং অধিকাংশ আইন-কানুন যা এখন ধর্মের বিশেষজ্ঞদের বিবেককে শাসন করছে কদাচিৎ তা কোরআনের সুস্পষ্ট ও সদর্থক ঘোষণাসমূহ থেকে অনুমিত বরং সেগুলোর অধিকাংশ যে সব আইন-ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থে মুসলিম জাহান পরবর্তী শতাব্দীসমূহে প্লাবনের মতো হাবুডুবু খেয়েছিল তা থেকে অনুমিত। একজন ইংরেজ গ্রন্থকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "হিব্রুরা যেমন তালমুদদের অনুকূলে পেণ্টাটিউককে নির্বাসিত করেছিল, মুসলমানেরা তেমনি হাদিস ও বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোরআনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।" তিনি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত করেছেন, "আমরা একথা বুঝাতে চাই না যে, কোন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা হত যে তাঁর ধর্মগ্রন্থ কি তবে সে 'কোরআন' ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের নাম করত; কিন্তু আমরা বুঝাতে চাই যে বাস্তবে কোরআন তার বিশ্বাস বা অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। খ্রীষ্টানজগতের মধ্যযুগে 'নিউ টেস্টামেণ্ট' নয়, টমাস একুইনাসের 'সাম্মা-থিয়োলোজিয়া' ধর্মের বিশুদ্ধতার প্রশ্নের মীমাংসা করত না। বর্তমান সময়ে গোঁড়া ধর্মযাজকরা কি সাধারণভাবে সুসমাচারে, খ্রীষ্টের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের ধর্মমত আহরণ

করেন? সম্ভবত যদি তারা আদৌ কোন দলিল উল্লেখ করেন, তবে গির্জার 'প্রশ্নোত্তরিকা' তাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে; যদি তারা বিশেষভাবে সন্ধানী প্রবণতার লোক হন তবে উনচল্লিশটি অনুচ্ছেদ তাদের যাবতীয় সংশয়ের নিরসন করবে। তথাপি তারা বলবেন যে তাদের ধর্ম সুসমাচার থেকে গৃহীত হয়েছে এবং যে মাধ্যমের সাহায্যে তা পরিস্রুত হয়েছে তা প্রকাশ করবেন। ঠিক সেই একই পথে আধুনিক মুহম্মদীয় ধর্ম গঠিত হয়েছে এবং যা মুসলমানেরা বিশ্বাস ও অনুশীলন করেন তার এক বৃহদংশ কোরআনের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক সিস্‌টেম, প্রত্যেক মযহাবের মধ্যে অগ্রগতির বীজ রয়েছে, এবং যদি এখন সেই অগ্রগতি বন্ধ হয় তবে তা আইনবেত্তাদের ত্রুটি নয়। এ শিক্ষাগুরুর শিক্ষার প্রাণশক্তির অনুধাবনের অভাব-জ্ঞাপক, এমন কি মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের মনোভাবেরও অজ্ঞতা-নির্দেশক।[১]

পাশ্চাত্য জগতে সংস্কার আন্দোলন রেনেসাঁর দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং ইউরোপের উন্নতি শুরু হল যখন সে পাদরীদের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলল। ইসলামের ক্ষেত্রেও শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা সংস্কারের পূর্বগামী হবে; ধর্মীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন শুরু হওয়ার পূর্বে মননকে অবশ্যই প্রথম দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত হতে হবে। যা বহু শতাব্দীব্যাপী আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও 'সামঞ্জস্য' মতবাদের ফল। যে বাহ্যানুষ্ঠান উপাসকের হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করে না তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে; বাহ্যানুষ্ঠানকে অন্তরের অনুভূতির অধীন করতে হবে; আর নৈতিকতার শিক্ষা গঠনশীল মনের উপর মুদ্রিত করে দিতে হবে। একমাত্র তখনি আমরা ইসলামের নবীর কর্তব্যের নীতি-সমূহের ক্ষেত্রে যে প্রেরণা ও শিক্ষা দিয়েছেন তা আশা করতে পারব। যখন একথা স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, ঐশী বাণী যে কোন ভাষাতে ভাষান্তরিত করলে তার ঐশী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারায় না এবং যে কোন ভাষাতে আল্লাহকে আহ্বান করলে তা তাঁর কাছে গ্রহণীয় হয়, তখন ইসলামের

---

১. সিরিয়ার মুহম্মদ আমিনের 'রাদ্‌দুল মুহতার' এবং শেখ যাদেহর 'মাজমুল আনহার', 'মুলতেকা' ও 'হেদায়া'র মতো অগ্রগামী—'কোক' অথবা ব্লাকস্টোনের মতের উপর 'এল্ডন' বা 'ম্যান্সফিল্ড'-এর মত এরূপ। উদার ও উদারপন্থী প্রবণতার ক্ষেত্রে শেখ মূর্তাকার মতামত সংকীর্ণমনা আত্মকেন্দ্রিক মুহাকিকের মতামতের চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে অবস্থিত। দাসত্ব মনোভাবসম্পন্ন আকবারী পূর্ববর্তীদের চেয়ে পরবর্তীদের অধিক পছন্দ করেছেন।

সংস্কারের আরম্ভ। হযরত নিজে তাঁর বিদেশী শিষ্যদেরকে তাদের মাতৃভাষায় উপাসনার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১] তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় অন্যান্যদেরকে তাদের নিজস্ব উপভাষায় আবৃত্তি করবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে কোরআন সাতটি ভাষায় নাজিল হয়েছিল।

ইসলামের আদিকালে এটা একটা সর্বসম্মত মত ছিল যে উপলব্ধি ছাড়া ভক্তি নিরর্থক। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বিবেচনা করতেন যে 'নামাজ' ও 'খুতবা' যে কোন ভাষায় আবৃত্তি করা আইনসঙ্গত ও বৈধ।[২] আবু হানিফার শিষ্য, আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত তাঁদের গুরুর মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি আরবী না জানে, তবে সে যেকোন ভাষাতে তার ভক্তি প্রকাশ করতে পারে।[৩]

যাহোক, তবে যেখানে সম্ভব ও অনুশীলনক্ষম সেখানে আরবীতে নামাজের আবৃত্তি সংরক্ষণ করা উচিত—এর পশ্চাতে একটি বড় ও শক্তিশালী কারণ রয়েছে। তা হল এটি হযরতের ভাষা ছিল এজন্য নয়, বরং এ হল ইসলামের ভাষা এবং সারা জাহানের মুসলমানদের অনুভবের ঐক্য বিধায়ক এ ভাষা। এই ঐক্য ছাড়া আর কোথায় এর অধিকতর শক্তি নিহীত?

টীকা—১

মুহম্মদের বায়নিয়ামক নিষেধাজ্ঞাসমূহ দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—গুণগত এবং পরিমাণগত। পানাহার ও এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ে আতিশয্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পরিমাণগত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আংশিকভাবে বিশেষ অর্ধ-বর্বর সুখবাদ যা নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত, সিরীয় ও পারসিকদের সংস্পর্শে আসার

---

১. সলমন ফার্সী, যাকে হযরত আলী সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিলেন, ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যাঁকে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

২ 'জওয়াহিরুল আখলাতি', 'দুর্রুল্ মুখতার', 'বাবোস্ সালাত' ('নামাজ' অধ্যায়)। এই মতবাদ 'তাজনিসে'ও প্রদত্ত হয়েছে। তাহত্বওয়াই বর্ণনা করেছেন যে ইমামের মত প্রামাণ্য ও অনুস্মরণীয়। দুর্রুল্ মুখতারের ভাষ্যকার ফার্সীতে নামাজ পড়ার বৈধতা স্বীকার করেছেন।

৩. বর্তমান যুগের উলেমাগণ এর এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, যখন কোন উপাসক আরবী উচ্চারণে অক্ষম তখন সে অন্য ভাষায় তা আবৃত্তি করতে পারে। এই ব্যাখ্যার অসঙ্গতি সুস্পষ্ট।

ফলে আরবদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছিল এবং আংশিকভাবে সেসব পরিস্থিতি যার আভাস আল্ কোরআনে প্রদত্ত হয়েছে—এই দুয়ের কারণে এসব নিষেধাজ্ঞা এসেছে। শূকরের মাংস সম্পর্কে শর্তহীন নিষেধাজ্ঞা, যা গুণগত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত তা স্বাস্থ্যগত কারণে উদ্ভূত হয়েছিল বলে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে যতদিন পর্যন্ত পশুটির প্রকৃতি না বদলায় এবং বর্তমানের মতো এই পশুর মাংস ভক্ষণের ফলে রোগ উৎপন্ন হওয়া অব্যাহত থাকে। নৃত্য সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞা দেবদেবীর জন্য আরোপিত নৃত্য সম্পর্কে প্রযুজ্য হয়েছিল, যা পৌত্তলিক আরবগণ অ্যাশটোরেথ মলচ ও বালের উদ্দেশ্যে সিরীয়-ফিনিসীয় উপাসনা উদযাপন করত।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে পরকালের ধারণা

"শোন হে পরিতৃপ্ত আত্মা! নিজ পালনকর্তার দিকে চলো এবার। তুমি তাঁর উপরে সন্তুষ্ট, আর তিনিও তোমার উপরে খুশি রয়েছেন। তাই তো তুমি এবারে আমার বান্দাদের দলে শামিল হও, আর আমার জান্নাতেই তুমি প্রবেশ কর।" (সু. ৮৯ আ. ২৭-৩০)

অন্যান্য বিষয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী এত সাধারণভাবে ভাবী অস্তিত্ব—আমাদের প্রকৃতির নশ্বর অংশ থেকে জীবন্ত নীতির বিচ্ছেদের পরবর্তী অস্তিত্বের ধারণা গ্রহণ করেছে যে তা এমন একটি বিশ্বাসে পর্যবসিত হয়েছে যে এ আমাদের অস্তিত্বের অন্যতম মৌল উপাদান। বিভিন্ন মানবপরিবার ও গোত্রসমূহের শৈশবের সাথে যুক্ত তথ্যাবলী অধিকতর সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ভাবী জীবন বা অস্তিত্বের ধারণা মানবমনের স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি।

বন্য অসভ্য মানুষ পৃথিবীতে যে জীবন নির্বাহ করত তা থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন ধারণা তার ছিল না। সে মৃত্যুকে জীবনের অবসান বলে মনে করত। তারপর এমন একটি স্তর এল যখন মানুষ সেই বর্বর অবস্থাকে অতিক্রম করল, তার কামনা-বাসনা আর জাগতিক মৃত্যুর রজ্জুতে বাঁধা থাকল না। এখানকার অস্তিত্বের অবসানের পর আর এক অস্তিত্বের প্রত্যাশা করতে লাগল। কিন্তু এমন কি এই স্তরেও প্রাত্যহিক জীবনের কানন থেকে অমরতার ধারণা উদ্ভূত হয়নি। তখন মৃত্যু-পরবর্তী জীবন ছিল এই জাগতিক জীবনেরই শুধু বিস্তার। মৃত্যুর পরবর্তী ধারাবাহিক জীবনের এই ধারণা অধিকতর বিস্তৃত ক্ষেত্রের জন্য মানবত্মার অদ্যাবধি নির্জ্জান কামনা-বাসনা থেকে বিকশিত করতে হয়েছিল, যেখানে প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদ অসভ্য ও সভ্য সকলের নিকট সমান বেদনাদায়ক হলেও তা আবার পুনর্মিলনে পর্যবসিত হবে।

সত্বর মানুষ পরবর্তী স্তরে পৌঁছল, মানুষ বিশ্বাস করতে লাগল, বর্তমান জীবনের সুখ-দুঃখ জীবনের সব নয়, সব হতে পারে না; পরে অন্য

জীবন আসবে কিংবা অন্য জীবন আছে যেখানে সে তার কার্যানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করবে।

এখন আমরা একটা নীতি, একটি নিয়মে পৌঁছলাম। ভাবী জীবনের ধারণাকে বিকশিত করতে মানুষের চিন্তা আর দূরে অগ্রসর হয়নি। নাস্তিক দার্শনিক কোন নূতন আবিষ্কার করেননি, কোন নূতন অবস্থার নির্দেশ করেননি। তিনি শুধু আমাদের অসভ্য পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন, যাদের দৃষ্টি এই জীবনের প্রতি নিবদ্ধ।

এটা উত্তমরূপে প্রমাণিত তথ্য যে ঐ সব ধারণা যা ব্যক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন স্তরের নির্দেশ করে তা শুধু একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতির মধ্যে উপস্থিত নয়, উপরন্তু একই জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত বিকাশ অনুসারে বিভিন্ন সংযোগের মধ্যেও উপস্থিত।

কথিত আছে যে মিশরীয়গণ সর্বপ্রথম ভাবী জীবন সম্পকীয় মতবাদ স্বীকার করেছিলেন কিংবা অন্ততঃপক্ষে এরূপ মতবাদের উপরে মানুষের আচরণকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১] পুনর্জন্মের ধারণার সাথে তারা পুরস্কার ও শাস্তির ধারণা যোগ করেছিলেন। মানুষ সমাধিতে গমন করে শুধু পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য। পুনরুজ্জীবন লাভের পর জননের নীতি, যাবতীয় জিনিসের স্বয়ম্ভূ কারণ সূর্যের সহিত নবজীবনে পদার্পণ করে। সূর্যের মতো মানুষের আত্মা অমর বিবেচিত হয়েছিল এবং তা একই তীর্থভ্রমণ সমাপ্ত করত। যাবতীয় দেহ নিম্নতর জগতে নেমে আসত তবে তাদের সবার জন্য পুনর্জন্ম নিশ্চিত হত না। মৃত ব্যক্তিদেরকে ওসিরিস ও তার চল্লিশজন পরামর্শদাতা বিচার করতেন। যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হত তাদের ভাগ্যে জুটত বিনাশ। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পরিশুদ্ধ করে চরম শান্তির নিলয়ে প্রবেশ করান হত; ওসিরিস তাদেরকে নিজের সঙ্গী হিসেবে তাদেরকে সুস্বাদু আহার্য দ্বারা আপ্যায়ন করতেন।[২]

আমরা স্বভাবত আশা করতে পারি যে মিশরে ইসরাইলদের দীর্ঘ অবস্থান তাদের মধ্যে পুরস্কার ও শাস্তির সহগামী ধারণাসহ পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা দিয়েছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ মোসাইজম (যে

১. রলিনসন, 'হিস্ট্রী অব এনসিয়েন্ট ইজিপট' ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৩।

২. তুঃ লেনরমেণ্ট, 'এনসিয়েন্ট হিস্ট্রী অব দি ইস্ট' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১০-৩২২; এবং আলজার, 'হিস্ট্রী অব দি ডকট্রিন অব এ ফিউচার লাইফ' পৃ. ১০২।

শিক্ষা এই নামে চলেছে) বর্তমান জীবন থেকে স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বের অবস্থা স্বীকার করে না। যে কিলককে কেন্দ্র করে মুসায়ী আইনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা পরিচালিত তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক পুরস্কার ও শাস্তি।[১] এসব আইনের প্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত। পুনরুত্থান সম্পর্কীয় মতবাদ ও তৎসম্পর্কীয় ধারণাসমূহ যা পরবর্তী ইহুদীধর্মে দানিয়েল ও ইযেকেলের লেখায় ব্যক্ত হয়েছে তা সুস্পষ্টরূপে জরথুস্ত্রবাদ থেকে উদ্ভূত বিজাতীয় সৃষ্টির ফসল। বিদেহী আত্মার বাসস্থানের বর্ণনা—পাপী ও পুণ্যবান সকলের বাসস্থান, যা তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের লেখায় পাওয়া যায় তা হিব্রুজাত বলে প্রতীয়মান হয় না। পরলোকে মানুষ আল্লাহর প্রশংসা-কীর্তন করতে কিংবা তাঁর প্রেম ও করুণার কথা স্মরণ করতে পারে না[২] এটা ছায়ার জগৎ, পৌত্তলিকদের পরলোকে ইহুদীদের পরলোকের প্রতিলিপি, যাতে আত্মা বিষণ্ণ, নিষ্ক্রিয়, আরামহীন অস্তিত্ব নির্বাহ করে—জগতে তাদের প্রিয়জনরা কেমন রয়েছে তা জানতে পারে না, শুধু তাদের নিজস্ব অবস্থার জন্য পরিতাপ করে।[৩]

কিন্তু পরবর্তী ইহুদীধর্ম পরজীবন সম্পর্কে প্রবল বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। ঐতিহ্য পুণ্যবানদের শান্তির নিলয় কিংবা অভিশপ্তদের ভীতির কারাগার হিসেবে বর্ণনায় পঞ্চমুখ।[৪] জরথুস্ত্রবাদ এভাবে হিব্রুজাতির উপর দু'ভাবে ক্রিয়া করেছিল। এই মতবাদ তাদের মধ্যে পরলোক সম্পর্কে বিশুদ্ধতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক ধারণা বিকশিত করে তুলেছিল, কিন্তু পরবর্তী মাজো-জরথুস্ত্রবাদ, যা চ্যাল্ডীয় মতবাদের সৃষ্টি, পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির জড়াত্মক ধারণাসমূহের সঙ্গে ইহুদী পুরোহিতদের ধারণাসমূহকে প্রবলভাবে রঞ্জিত করেছিল।[৫] প্রাচ্যের আর্যজাতিসমূহের মধ্যে দৃশ্যমান মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কীয় মতবাদ সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। আর্যজাতির একটি শাখায় পরজীবন হয় চিরন্তন জন্মান্তরবাদ—জন্মমৃত্যুর

---

১. তুঃ আলজার, 'হিস্ট্রী অব দি ডকট্রিন অব এ ফিউচার লাইফ', পৃ. ১৬৭, মিলম্যান, ''ক্রিশ্চিয়ানিটি ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১, ১৫২।

২. "সাম" ৬, ৫।

৩. 'জব' ১৪, ২২ ; তুঃ ডালিনজার ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯ ; আলজার 'হিস্ট্রী অব দি ডকট্রিন অব ফিউচার লাইফ' পৃ. ১৫১, ১৫২।

৪. মিলম্যান ; 'হিস্ট্রী অব ক্রিশ্চয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪২।

৫. আলজার যে অধ্যায়ে পরবর্তী ইহুদীধর্মের উপর পারসিক ধর্মব্যবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ করেছে তা দেখুন।

বিরামহীন চক্র, অথবা দীর্ঘ নবিশির পর অসীমের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, অথবা সীমাহীন অতল দেশ অথবা অস্তিত্বহীনতায় পর্যবসিত হয়েছিল।[১] অন্য একটি শাখায় এই মতবাদ পুরস্কার ও শাস্তির ক্রম-বিন্যস্ত স্তরের রূপে আবরিত, যে অর্থে একজন আধুনিক খ্রীষ্টান বা মুসলমান বিচারকে বুঝে থাকেন। মাজো-জরথুস্ত্রবাদীরা প্রথম থেকেই দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নন। বার্ণ-উফ ও অন্যান্যদের সঙ্গে ডালিঞ্জার বিশ্বাস করেন যে, এই ধারণা যথার্থরূপে জরথুস্ত্রীয় নয়; যদি এই ধারণা হিব্রুদের নিকট থেকে গৃহীত হয়ে না থাকে, তবে তা পরবর্তী বিকাশের ফল।[২]

যাহোক, প্রায় আরবের নবীর সময়ে পারসিকদের পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে প্রবল ও উন্নত ধারণা ছিল। জেন্দ-আবেস্তার যতটুকু আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা স্পষ্টভাবে পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভেন্দিদাদ ও বান্দেশের জরথুস্ত্রবাদ আবেস্তার বিশ্বাসসমূহের উপর ধারণা সম্প্রসারিত করেছে এবং এই ধর্মমত অনুসারে, মানুষের মৃত্যুর পর দৈত্যরা তার দেহের অধিকার গ্রহণ করে, তা সত্ত্বেও তৃতীয় দিনে তার চেতনা ফেরে। যে সব আত্মা জীবদ্দশায় মন্দ-শক্তির কুমন্ত্রণায় চলেছে তারা মৃত্যুর পর তৃতীয় রাতের পরের দিন, যে চাইনবাদের বিভীষিকাপূর্ণ সেতু পার হওয়ার জন্য পরিচালিত হবে তা পার হতে পারবে না। সৎ লোকেরা সহজে সে সেতু পার হয়ে যাবে, তারা ইয়াজাতাস (আধুনিক ফার্সীতে ইজাদ) কর্তৃক পরিচালিত হবে; তারা বিহেশতে প্রবেশ করে ওরমুজদ ও আমশাসপান্দের আলয়ে প্রবেশ

---

১. এতদসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যসমাজের পুরোহিতরা সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক কল্পনার স্পষ্টতা নিয়ে নরকের বিভীষিকা ও স্বর্গের সুখবৈভবের চিত্র এঁকেছেন। শাহ্‌রিস্তানীর গ্রন্থে আরব্য পণ্ডিতের বৌদ্ধ মতবাদসমূহের মূল্যায়ন নির্দেশক বিবরণের উল্লেখ আছে।—পৃ. ৪৪০।

২. আলজার প্রাথমিক পর্যায়ের জরথুস্ত্রবাদীরা যে দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত, সে বিষয়ে অনুমান করার শক্তিশালী কারণসমূহ প্রদান করেছেন। যে চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে মাজো-জরথুস্ত্রবাদীরা মৃতদেহকে বিবেচনা করত তা থেকে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করার কোন যুক্তি নেই। খুব সম্ভব এই বিতৃষ্ণা মানিকয়দের প্রভাবজাত; দেখুন আলজার, পৃ. ১৩৮। মুহম্মদের সময়ে পারসিকগণ যে বিতৃষ্ণা নিয়ে মৃতদেহকে বিবেচনা করত তা ডালিঞ্জারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।—২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

করবে যেখানে তারা স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে হুর-ই-বিহেশত বা স্বর্গের অপসরীদের সঙ্গসুখ ও অন্যান্য সব ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করবে। দুষ্টগণ সেতুর উপরে নিপতিত হবে কিংবা দোজখে নীত হবে, সেখানে দেবাজরা তাদের উপর নির্যাতন করবে। শাস্তির ভোগকাল নির্ধারণ করবেন ওরমুজদ, কিছু কিছু পাপীকে তাদের বন্ধুদের প্রার্থনা ও সুপারিশের ফলে ক্ষমা করা হবে। জগতের ধ্বংসের প্রাক্কালে একজন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি জগদ্বাসীকে অন্যায় ও পাপাচার থেকে পরিত্রাণ করবেন, শান্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন—জরথুস্ত্র মিলেনিয়াম, স্বর্গের ওরমুজদ রাজত্ব কায়েম হবে।[১] অতঃপর এক সার্বজনীন পুনরুত্থান ঘটবে, যখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়দের পুনর্মিলন ঘটবে। মিলনের আনন্দের পর ভাল ও মন্দের মধ্যে ঘটবে বিচ্ছেদ। পাপীদের যাতনা হবে ভয়াবহ। নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণা ও মনস্তাপে কাতর হয়ে আহরিমান চাইনবেদের উপর-নীচে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। একটি ধূমকেতু নিপতিত হয়ে পৃথিবীটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। পাহাড় গলে যাবে এবং তরল পদার্থের মতো প্রবাহিত হতে থাকবে। সকল মানুষ এই ভীষণ প্লাবনের মধ্যে প্রবাহিত হবে এবং পূতপবিত্র হয়ে উঠবে। এমন কি আহরিমান পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে এবং দোজখ পূতপবিত্র হবে। তখন থেকে মন্দর চির অবসান ঘটবে এবং সকল মানুষ চিরস্থায়ী আনন্দের মধ্যে বসবাস করবে।

এ হল সেই ধর্মটির সার-সংক্ষেপ যা সেমিটিক ধর্মসমূহকে বিশেষ করে মুহম্মদের উদারপন্থী ধর্মকে অভ্রান্তভাবে প্রভাবিত করেছে।

যখন নাজারাতের যিশুর আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় সেই সময়ে ফিনীশীয় ও অ্যাসিরীয়দের কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছে। হেলেনীয় রোমকরা তখন জগৎ শাসন করছিল, তবে বিজয়ী ও পুনরুজ্জীবিত মাজো-জরথুস্ত্র-বাদ প্রাচ্যে তাদেরকে প্রতিরোধ করেছিল।

ইহুদীরা চিরতরে তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল। এক ঘৃণ্য চাটুকার

---

১. শাহরিস্তানী এই প্রেরিত পুরুষের নাম দিয়েছেন উশিযারবেক (কিউরটন সং পৃ. ১৮৮); কিন্তু পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থকারদের মতে তাঁর নাম মোসিয়োশ, যাঁর পূর্বে আরও দু'জন প্রেরিত পুরুষ এসেছেন যাঁদের নাম ওমচেদার বামী ও ওমচেদারমাহ্। (ডালিঞ্জার, ৫ম, ২, পৃ. ৪০১।) দ্য ম্যাসী তাঁর নাম দিয়েছেন পাশুতান (মুর ডিভ্ এণ্ট দ্য লা পার্সি, পৃ. ৯৫।)

ডেভিডের সিংহাসনে বসেছিল। সেলুসিডের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী শাসক তার অবাধ্যতার মনোভাব দমন করে রেখেছিল। দেশ, ধর্মমত ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রত্যেক জাতির মতো ইহুদীরাও তাদের ভাগ্য যতই বিড়ম্বিত হতে লাগল তারা ততই এই আশায় অনুপ্রাণিত হতে লাগল যে গাইডিওন বা ম্যাক্কাবিয়াসের মতো কোন স্বর্গপ্রেরিত পয়গাম্বর তাদের পূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের বহু অত্যাচারীকে পদাঘাত করতে তাদেরকে সমর্থ করবেন।[১] তাদের দেশ-প্রেমিক জ্ঞানীরা যে মসিহের আবির্ভাবের কথা উজ্জ্বল রঙরেখায় এঁকে-ছিলেন তা এক সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—ইসরাইলদের রাজত্বের পুনরুদ্ধার, প্রাচ্যে মাজো-জরথুস্ত্রবাদী ও চ্যাল্ডীয় এবং প্রতীচ্যে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে, সমাজের কতিপয় শ্রেণীর মধ্যে (বিশেষ করে তাদের মধ্যে যাদের মধ্যে হেরোডের হেলেনীয় প্রবণতাসমূহ ইসরাইলীদের বক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে) ব্যক্তিগত মসিহে বিশ্বাস হয় ক্ষীণ ও অস্পষ্ট ছিল, নয় অসভ্য জনসাধারণ থেকে শুধুমাত্র প্রতিধ্বনি ছিল। কিন্তু মিলম্যান সুন্দরভাবে মন্তব্য করেছেন যে, এই সময়ে প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে মসিহের আবির্ভাবের জমকাল অথচ বিভ্রান্তিকর রূপ দিয়েছিল, যাবতীয় জিনিসের যুগপৎ পুনরুত্থান, মৃতের পুনরুত্থান এবং মসিহের রাজত্ব সম্পর্কে ধারণা গঠন করেছিল। এসব হঠাৎ ঘটে যাবে কিংবা ঘনিষ্ঠভাবে একটার পর একটা ঘটবে।[২] ডেভিডের বংশ থেকে মসিহের আবির্ভাব হবে, তিনি গোত্রসমূহের বিক্ষিপ্ত বংশধর-দেরকে একত্রিত করবেন, তাদের ঘৃণ্য বিদেশী শত্রুদের তাড়াবেন ও ধ্বংস করবেন। মসিহের অধীনে একটা পুনরুত্থান ঘটবে, তবে সেই গোত্রের পুণ্যবানদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে।[৩]

---

১. এটা অপরিহার্য নয়, যেমন আলজার অনুমান করেছেন যে, যেহেতু ইহুদীগণ এসব জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাদের মধ্যে এলিজা বা অন্য কোন প্রেরিত পুরুষের পুনরার্বিভাবের প্রতীক্ষা করেছিল, কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে তারা আত্মার দেহান্তরে বিশ্বাস করত।

২. মিলম্যান, 'হিস্ট্রি অব ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

৩. জগতে ধর্ম ও আইনশৃঙ্খলার পরিত্রাণকারী ও সংস্কারক সম্পর্কে জরথুস্ত্রবাদী ধারণা এবং ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত 'মসিহ' বা ত্রাণকর্তার ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়ে সামান্য বলতে গেলেও তা বিস্ময়কর। এটা নিশ্চিত যে ইহুদীরা জরথুস্ত্রবাদীদের কাছ থেকে এই ধারণা আহরণ করেছিল ; আর তাদের

এসব উন্মাদনা ও অস্পষ্ট আকিঞ্চনের মধ্যে চিরস্থায়ী জীবন ও পরকালের শান্তির আশা বিস্ময়করভাবে মিশ্রিত হয়েছিল। বাহ্যত্রাণ বিষয়ক চরম নৈরাশ্য ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রত্যাশা জনগণের মধ্যে এমন অবস্থা বিকাশের দিকে সবসময়ে ঝোঁক দেয়। একদল লোক পশুশক্তির তিক্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিস্বরূপ অপার্থিব রাজত্ব, ঐশী কর্তৃপক্ষের অধীনে শান্তি ও নিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আশা করত, অপর দল বিদেশী ও পৌত্তলিকদের রক্তে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য একই বা এক জাতীয় উপায় আশা করত।[১]

যে ঐতিহ্য-বিবরণীতে যিশুর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা এত বর্জন ও নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে যে বর্তমানে আদৌ বলা সম্ভব নয় কোনটা তাঁর বাণী কোনটা তাঁর বাণী নয়।[২] যদি আমরা ঐতিহ্যগুলো যেভাবে পাওয়া গেছে সে ভাবেই গ্রহণ করি আর অন্যান্য

দুর্দিনে তারা স্পষ্ট ভাষায় তার বিকাশ সাধন করেছিল। কিন্তু আমি প্রবলভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি যে মোসিওসের ধারণা, তাঁর প্রেরিত তত্ত্বের ধারণা যাই হোক না কেন, পারসিকদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল যখন তারা বিদেশী শাসনের অধীনে দুর্দশা ভোগ করছিল, তবে সেই বিদেশী শাসকরা সেমিটিক অ্যাসিরীয় বা গ্রীক ম্যাসিডোনিয় তা বলা শক্ত। যে দেশে তাঁর আবির্ভাবের দৃশ্য পরিকল্পিত হয়েছিল তা ম্যাসীর মতে খোরাসানের কাঙ্গুদেজ, ডালিঞ্জারের মতে কানসোয়া—এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে পারসিকগণ তাদের দুর্দিনের দিনে সাহায্য ও পরিত্রাণের জন্য প্রাচ্য, বিশেষ করে "সূর্যের দেশে"র দিকে নজর দিয়েছিল।

১. দুর্বোধ্য হলেও আধুনিকদের মতো ক্রীষ্টাডেলফিয়ান সম্প্রদায়।

২. মিলম্যান স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে যিশুর কার্যাবলী ও বাণীসমূহ সম্পর্কে ঐতিহ্য খ্রীষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল, দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষ দিকের আগে তা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে নি। ('হিস্ট্রী অব্‌ ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬) কাজেই অনিবার্যভাবে খ্রীষ্টান সুসমাচারের প্রাচীন সংগ্রাহক ও রূপদাতাগণ কিংবা মিলম্যানের বিবেচনায়, অমার্জিত ও সরল ঐতিহাসিকগণ, ঐতিহ্যের গ্রহণের ব্যাপারে অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকটা বিষয় নির্বিচারবাদী ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিলেন। "যদি কোন বর্ণনা বা পুঁথি সুর ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাঁদের পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার সঙ্গে মিলত, তবে তাঁরা বাহ্য প্রমাণাদিকে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলে মনে করতেন; আর যদি তা তাঁদের কাছে সন্তোষজনক মনে না হত তবে তার মূলে যতই প্রমাণ থাক না কেন তা ভ্রমাত্মক বলে বর্জিত হত।"

ধর্মীয় দলিলসমূহ আমরা যে ভিত্তির উপর বিবেচনা করি সেই ভিত্তির উপর গ্রহণ করি (তাদের প্রকৃত মনোভঙ্গী উপেক্ষা না করে অথচ নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসীদের মতো অলৌকিক অর্থ না খুঁজে), তবে আমরা দেখতে পাই যে এইসব ঐতিহ্য বিবরণীতে সর্বত্র নূতন ব্যবস্থার অব্যবহিত আবির্ভাব, "স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব" যিশুর মনে এতই প্রাধান্য পেয়েছিল যে অন্যান্য বিষয় সেই ধারণার আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। মানব-পুত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, আল্লাহর রাজত্ব সন্নিকটবর্তী; প্রত্যেকটি আশাব্যঞ্জক শব্দের প্রধান প্রসঙ্গ এরূপ।[১] যে সমাজ ও সরকারকে নাজারাতে প্রেরিতপুরুষ ত্রুটিপূর্ণ ও অনিষ্টকর দেখতে পেয়েছিলেন তা পরিবর্তন করা এই স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশ্য ছিল। কোন কোন সময় তাঁর বাণী শিষ্যদেরকে এই সিদ্ধান্তে পরিচালিত করত যে, নূতন শিক্ষাগুরু দরিদ্র ও অভুক্তদেরকে গৌরব ও সুখৈশ্বর্যে পরিচালিত করার জন্য জন্মেছেন। কাঙ্ক্ষিত খোদায়ী রাজত্বে তারাই হবে "অনুগৃহীত" এবং প্রধান উপাদান, কেন না ধনী ও স্বচ্ছল লোকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়ানক ভাষায় নিন্দাবাদ আরোপিত হয়েছে।[২] কখনো কখনো খোদায়ী রাজত্ব বলতে বুঝানো হয় মসিহের আবির্ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত দিব্যদৃষ্টি বা দৈব স্বপ্ন। কোন কোন সময় আল্লাহর রাজত্ব বলতে বুঝায় আত্মার জগৎ এবং আসন্ন পরিত্রাণ হল এই পার্থিব অস্তিত্বের বন্ধন থেকে কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি। এসব ধারণা একই কালে যিশুর মনে যুগপৎভাবে হাজির হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।[৩] শক্তিশালী দলের প্রচণ্ডতা ও ধর্মান্ধতা এবং রোমান শকুনি দলের শক্তি যে কোন অব্যবহিত সামাজিক পরিবর্তন অসম্ভব করে তুলেছিল। বর্তমান উন্নতির সব আশা তিরোহিত হয়েছিল,

---

কাজেই যিশুর বাণী ও কর্মের সঙ্গে বিপুল বিষয়বস্তু অবচেতনভাবে সংযুক্ত হয়েছিল। এ বিষয়ে অতিরঞ্জনের প্রত্যেক বর্জনসহ সেলসাসের সাক্ষ্য চূড়ান্তভাবে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—তিনি বলেন যে খ্রীষ্টানগণ তাদের ঐতিহ্য-বিবরণী প্রণয়ন ও পুনর্বিন্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন। (অরিজিন সি. সেলসাস, ii ২৭). স্যার উইলিয়ম মুয়ির কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কানুন ৩, পৃ. ৬১, ১ম খণ্ড (লাইফ অব মোহমেট)।

১. ম্যাথু, ৪, ১৭, ১০, ৭ ইত্যাদি।

২. লুক ৬, ২০। ম্যাথুতে "দুর্বলচেতা" উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু লুকের সরলতর বিবৃতি যাবতীয় পরিস্থিতি বিচারে অধিকতর সত্য বলে মনে হয়।

৩. রেনান, 'ভাই অ জেসাস' পৃ. ২৮২।

এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবাইকে পেয়ে বসেছিল। যিশু অনুভব করেছিলেন যে বর্তমান অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে না এবং মানব-জাতির পুনরুত্থান আসন্ন,[১] যখন তিনি ঐশী পোশাকে সজ্জিত হয়ে, ফিরেশতা ও নির্বাচিত শিষ্য পরিবৃত হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় স্বর্গের মেঘের মধ্যে আবির্ভূত হবেন।[২] মৃতেরা তাদের সমাধি থেকে উঠবে এবং মসিহ বিচারে বসবেন। ফিরেশতাগণ বিচারের রায় কার্যকরী করবেন। তিনি নির্বাচিতদেরকে জগতের সূচনা থেকে প্রস্তুত আনন্দদায়ক আবাসে পাঠাবেন। এবং পাপীদেরকে চিরস্থায়ী দোজখে প্রেরণ করবেন যেখানে শয়তান চিরস্থায়ী দোজখে ও তার দূতগণ,[৩] ক্রন্দন ও দন্তঘর্ষণ করবে। নির্বাচিত ব্যক্তিরা সংখ্যায় কম হবে,[৪] তাদের আলোকিত প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে তারা ইসরাইল জাতির পিতা দলপতি ও প্রেরিত পুরুষগণ[৫] কর্তৃক আয়োজিত সান্ধ্যভোজে যোগদান করবেন এবং তাতে যিশুও অংশগ্রহণ করবেন।[৬]

---

১. ম্যাথু ১৯, ১৮। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যিশু স্বয়ং দৈহিক পুনরুত্থান এবং পরকালের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রায়ই তাঁর রাজ্যের "অনুগৃহীত"দের কথা বলতেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে পানাহার করতেন। *চারজন শিষ্যের নামে প্রচলিত প্রাথমিক ঐতিহ্য* সতর্কতামূলক নির্বাচনের ফলে খুবই সীমিত ; পরবর্তী ঐতিহ্যবাদীরা স্বর্গ ও নরকের বর্ণনাকে প্রলম্বিত করেছেন, জমকাল কল্পনায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, যা প্রত্যাদেশ *হিসেবে চলেছে। (রেভ্. ২১, ৮-২১, ২২, ১, ২)। ছেলেমানুষিতে খ্রীষ্টান* ঐতিহ্যবাদীরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে কম যান না। জনের পোষকতায় ইরেনিয়াস কর্তৃক সরবরাহকৃত ঐতিহ্যে যিশু বলেছেন বলে ঘোষিত হয়েছে : "এমন দিন আসবে যখন এমন সব দ্রাক্ষাবৃক্ষ থাকবে. যার প্রত্যেকটি বৃক্ষে *দশহাজার ডাল থাকবে, আর তার প্রত্যেকটি ডালে* আবার দশহাজার মগডাল থাকবে, আর এ সব ডালের প্রত্যেকটিতে দশহাজার পল্লব থাকবে এবং প্রত্যেকটি পল্লবে দশহাজার থোকা আঙুর থাকবে এবং প্রত্যেকটি আঙুর *টিপলে ২৭৫ গ্যালন মদ পাওয়া যাবে, যখন মানুষ* এসব পবিত্র ডালার একটি ধরবে তখন অন্য একটি ডালা চেঁচিয়ে বলবে, 'আমি উত্তম ডালা আমাকে নিন, আমার দ্বারা প্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন ইত্যাদি।

২. ম্যাথু, ১৬, ২৭ ; ২৪, ৩০, ৩১ ; ২৫, ৩১ ইত্যাদি।

৩. *রেভ্., ২০, ১২, ১৩ ; তু: জরথুস্ত্রবাদীদের সঙ্গে তুলনীয়।*

৪. ম্যাথু, ২৫, ৪১।

৫. ম্যাথু, ৮, ১১ ; লুক ১৩, ২৮ ; ২২, ৩০।

৬. *ম্যাথু, ২৬, ২৯।*

যিশুর দ্বিতীয় আগমন ও মানবজাতির পুনরুত্থানসহ নূতন রাজত্বের অভিষেক বেশী দূরে নয়—একথা শিক্ষাগুরুর নিজের কথা থেকেই প্রতীয়মান হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর শ্রোতাদেরকে আল্লাহর রাজত্বের আগমন এবং বর্তমান জীবনের কর্ম ও জরুরী বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি ব্যবস্থার নিতান্ত অসারতার কথা প্রতিপন্ন করেছিলেন।[১]

যুগের পরিস্থিতিজাত মানসিকতার[২] সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাগুরুর বাণী তাঁর শিষ্যদের মনমগজে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং সকলেই সুস্পষ্ট প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করেছিল সেই স্বর্ণোজ্জ্বল শতাব্দী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর আক্ষরিক সংঘটনে যা মানবজাতির ইতিহাসে আদৌ সমকক্ষ নয়।

"যদি খ্রীষ্টানদের প্রথম যুগের লোকদের গভীর ও অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস ছিল। তবে সে বিশ্বাস এই ছিল যে জগতের ধ্বংস আসন্ন এবং যিশুর মহান প্রত্যাদেশ সত্বর সংঘটিত হচ্ছে।[৩] একমাত্র যখন ক্রিশ্চিয়ান ধর্মব্যবস্থা নিয়মিত সংগঠনে পরিণত হয়, যিশুর শিষ্যরা ইহুদি জগতের সীমানা অতিক্রম করে তাদের ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করেন এবং স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের কথা বিস্মৃত হন, তখন তারা গ্রীক ও রোমানদের জীবনব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাদের ধর্মমতের সীমানা অরণ্য থেকে আগত অগণিত বর্বরদের মধ্যে সম্প্রসারিত করেন। তারা যিশু ও তাঁর মাতাকে তাদের আদি বাসস্থানের উপাস্য ওদিন ও ফ্রেয়ারের অন্য অংশ বলে মনে করত।

কিন্তু খ্রীষ্টান-জগৎ স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের আগমনের উত্তেজনার এবং নাজারাতের মহান প্রেরিত পুরুষের বাইবেলীয় আবির্ভাব সম্পর্কীয় প্রচণ্ড প্রত্যাশার জোয়ার-ভাঁটায় প্রায়ই আন্দোলিত হত। যা হোক, খোদায়ী রাজত্বের ধারণা কালপ্রবাহে ও চিন্তার অগ্রগতির ফলে হয় আধ্যাত্মিক রূপ নিয়েছে নয় তো মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছে কিংবা যেখানে এই ধারণা আছে সেখানে তা বিশ্বাসীর ব্যক্তি-মনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। ইহুদী, মাজো-জরথুস্ত্রবাদী ও খ্রীষ্টানগণ সকলেই

---

১. ম্যাথু, ১০, ২৩; মার্ক ১৩, ৩০,; লুক ১৩, ৩৫; ম্যাথু ৬, ২৫-৩৪, ৭, ২২।

২. যে কঠোর শব্দ যিশু তাঁর বংশের লোকদের প্রতি প্রয়োগ করেছেন তা লক্ষ্য করুন।

৩. *রেনান, 'লাইফ অব জেসাস', পৃ. ২৮৭। তুঃ মিলম্যান, 'হিস্ট্রী অব ক্রিশ্চিয়ানিটি'* ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন। আদিম মুসাইজম সম্পর্কীয় অমার্জিত ধারণা প্রধানত চ্যাল্ডীয়-জরথুস্ত্রবাদী মতবাদসমূহ থেকে অনুমিত অধিকতর সুনির্দিষ্ট ধারণাসমূহকে পথ করে দিয়েছিল। আমরা জানি কিভাবে পারসিকদের মধ্যে প্রাচীন পাহাড়-পূজা, প্রাথমিক শিক্ষকদের সরল সহজ শিক্ষা ব্যাবিলনীয় যাদুকরদের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে স্তরভিত্তিক পুরস্কার ও শাস্তির জটিল ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল—কিভাবে চ্যাল্ডীয় দর্শন মাজো-জরথুস্ত্রবাদের অন্তঃস্থলে প্রবেশ লাভ করেছিল। খ্রীষ্টের পার্থিব রাজত্বের অব্যবহিত আগমনের সুস্পষ্ট বিশ্বাসসহ আদিম খ্রীষ্টধর্ম চ্যাল্ডীয়, মাজো-জরথুস্ত্রবাদী ও আলেকজেন্দ্রিয় উৎস থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিল। আর এসব প্রাচীন ধারণাসমূহের মধ্যে বিপুল রদবদল ঘটিয়েছিল। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও জরথুস্ত্রবাদী সকলেই কমবেশী ভাবী অস্তিত্বের পার্থিব পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি নিবিষ্ট ছিল।

পুরোহিততন্ত্র পরিপুষ্ট লৌকিক খ্রীষ্টীয় ধারণা—মুহম্মদ নারীজাতির আত্মা অস্বীকার করেছেন—এ ধারণা এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে নস্যাৎ হয়ে যায়। ইসলামের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের কলঙ্ক উদ্ভাবিত হয়েছিল। কিন্তু পয়গাম্বর ইবরাহিম (আঃ) তাঁর শিষ্যদেরকে হুরীসহ যে জৈবিক বিহেশতের ও স্তরভিত্তিক আনন্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে ধারণা এখনও বিদ্যমান। এ অজ্ঞতা ও পুরাতন ধর্মান্ধতার নিদর্শন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মধ্যবর্তীকালের সুরাসমূহে, শিক্ষাগুরুর ধর্মীয় চেতনার পরিপূর্ণভাবে লাভ হওয়ার পূর্বে, যে সময়ে মরুভূমির সাধারণ লোকদের বোধগম্য ক'রে নীতি-নির্ধারণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল তখন জরথুস্ত্রবাদী, সেবীয় ও তালমুদীয় ইহুদীদের মধ্যে ভাসমান কল্পনা থেকে অনুকৃত স্বর্গ ও নরকের বাস্তবধর্মী বর্ণনা পার্শ্বচিত্র হিসেবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল—তারপর আসল সত্যকার বস্তু—বিনয়াবনত প্রেমপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। হুরীদের ধারণা জরথুস্ত্রদের থেকে প্রাপ্ত, বিহেশতের ধারণাও।[১] কিন্তু দোজখে শাস্তির তীব্রতা সম্পর্কীয় ধারণা তালমুদীয় বর্ণনা নিঃসন্দেহে বাস্তবধর্মী, কোন কোন জায়গায় প্রায়শ ইন্দ্রিয়জ ; তবে এসব বর্ণনা কামুকতাপূর্ণ কিংবা মুহম্মদ বা তাঁর কোন অনুসারী কিংবা অতি উগ্র আক্ষরিক অর্থকারী শিষ্যগণ এটা এভাবে গ্রহণ করেছেন বললে তা নিন্দার্হ হয়ে দাঁড়ায়। যে মদিরা কাউকে "নেশাগ্রস্ত করে না" এবং

---

১. ফারসীতে 'ফিরদাউস' মানে স্বর্গ।

যে সব "পরিচারিকা নিকটবর্তী হয় না" তা ইন্দ্রিয়সুখ প্রতিবেদন করে বলে আদৌ বলা চলে না।

পরলোক সম্পর্কে ইসলামের প্রধান ধারণা এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, পরলোকের জীবনে প্রত্যেক মানুষকে তার ইহ-জীবনের কাজের হিসাব দিতে হবে এবং স্রষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-নির্বাহের উপর নির্ভর করবে তাদের ব্যক্তিগত সুখ বা দুঃখ। তথাপি তাঁর করুণা ও অনুকম্পা অপরিসীম এবং সমভাবে সকলের উপর বর্ষিত হয়। এটা হল কেন্দ্রীয় স্তম্ভ যাকে কেন্দ্র করে ইসলামের পারলৌকিক জীবন সম্পর্কীয় যাবতীয় মতবাদ আবর্তিত। এটা হল ইসলামের একমাত্র মতবাদ সম্বন্ধীয় বিষয় যা সকলকে বিশ্বাস করতে হয়, মেনে নিতে হয়। অন্যান্য উপাদান যা যুগের বিভিন্ন বংশ ও জাতির ভাসমান ঐতিহ্য থেকে বিধৃত ও সমন্বিত তা শুধু অতিরিক্ত। আমাদের বিচার-বিবেচনা থেকে পরলোকের পুরস্কার ও শাস্তির ধারণার মধ্যে যে আত্মগত জিজ্ঞাসা সম্পৃক্ত হয়ে আছে তা বাদ দিলে আমরা বলতে পারি যে, পারলৌকিক জীবনের যাবতীয় ধারণার মধ্যে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এসব ধারণা পৃথিবীর মানব-শিক্ষাগুরুদেরকে ব্যক্তি ও জাতির আচরণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার প্রদান করেছে। যদিও প্রত্যেক ধর্মে কমবেশী পরবর্তী ভাবী জীবনের হিসাব-নিকাশের এই মৌল নীতির বীজ রয়েছে, তথাপি সব ধর্মই জনসাধারণের উন্নয়নের নিরবচ্ছিন্ন মাধ্যম হিসেবে এর স্বরূপ অনুধাবনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সুকৃতির জন্য সুকৃতি একমাত্র উচ্চতর বিকাশসম্পন্ন মনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আর সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্ন ও অশিক্ষিত লোকদের জন্য কমবেশী বোধগম্য নিয়ন্ত্রণ সবসময়েই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ-সব নিয়ন্ত্রণের স্বরূপের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মূর্তিমান ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছদে ভূষিত না করে কিংবা পারলৌকিক সুখ-দুঃখের বর্ণনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সূচিত না করে মানবজাতির সাধারণ বোধের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক সুখ কিংবা আধ্যাত্মিক দুঃখের ধারণা দেওয়া প্রায়শ সম্ভব নয়। দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষায় ব্যক্ত নয়, এমন বিমূর্ত ধারণা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে; এ ধরনের উক্তি ও ধারণাসমূহ এক সময়ে খুবই প্রতিপত্তি পেয়েছিল তবে স্বপ্নবিলাসীদের একটা সীমাবদ্ধ পরিবৃত্তের বাইরে কোন প্রভাব বিস্তার না করেই তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আর এসব স্বপ্নবিলাসীরা তাদের চিন্তার অস্পষ্টতার জগতে বাস করত।

মুহম্মদ সে-যুগ অধ্যুষিত শুধু কতিপয় ভাববাদী চিন্তাবিদদের প্রতি তাঁর আবেদন রাখেননি, পরন্তু প্রত্যেক ধরনের জড়বাদের মধ্যে নিমজ্জিত তাঁর চতুষ্পার্শ্বের বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন রেখেছিলেন। সকলের বোধের সঙ্গেই তিনি খাপ খাইয়েছিলেন। বর্বর বুভুক্ষু আরবদের কাছে নদীর পরিস্রুত বিশুদ্ধ পানি, কিংবা দুগ্ধ ও মধুপূর্ণ বিহেশতের চেয়ে আর কি অধিকতর মনোরম বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে অথবা বেশুমার ফল, পর্যাপ্ত গাছপালা, ফুল, অফুরন্ত প্রাচুর্যের স্বর্গের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য আর কি হতে পারে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখবর্জিত স্বর্গসুখ তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এটা সেই বাদানুবাদের বিষয় যা মুসলিম জাহান সানায়ী ও গাজ্জালীর মতো অভিমত পোষণ করে যে, বৃক্ষ, নদী, সুন্দরী অপ্সরাসহ সুন্দর অট্টালিকার উল্লেখের মাধ্যমে পার্থিব সুখের বর্ণনার মূলে গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে এবং আল্লাহর সন্নিধানে আত্মার আধ্যাত্মিক সন্দর্শনেই প্রকৃত আনন্দ নিহিত রয়েছে, যখন মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে যে অন্তরাল রয়েছে তা বিদীর্ণ হবে এবং যখন আত্মায় স্বর্গীয় মহিমা প্রকাশের সময় দৈহিক, পার্থিব আবরণ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এ ব্যাপারে তারা কোরআন ও সহীহ্‌ হাদিসের বর্ণনা সমর্থন করেন। মুহম্মদ বলেছেন, "আল্লাহর সবচেয়ে অনুগৃহীত বান্দা হবেন সেই ব্যক্তি যিনি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর প্রভুর সন্দর্শন লাভ করবেন—এমন আনন্দ যা দেহের সর্ববিধ আনন্দকে অতিক্রম করবে যেমন করে সমুদ্রের জলরাশি এক বিন্দু ঘর্মকে অতিক্রম করে।" একদা বন্ধু আবু হোরায়রার সঙ্গে আলোচনা কালে হযরত বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর উত্তম বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস বানিয়েছেন যা কেউ দেখেনি, যা কেউ শোনেনি, যা কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি।" তারপর তিনি কোরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত আবৃত্তি করলেন "কেউ জানে না—এসব লোকের চোখ জুড়ানোর জন্য যা কিছু অদৃশ্য ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে তারা যে কাজ করছে তারই পারিশ্রমিক হিসেবে।"[১] অন্য একটি হাদিসে[২] উল্লিখিত আছে যে, উত্তম লোকেরা আল্লাহর মহানন্দময় সন্দর্শন লাভ করবে, যে বিষয়ে কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লেখ আছে বলে হযরত বলেছেন : "আল্লাহ যে শান্তির নিকেতনের দিকেই আহ্বান করছেন।"……যারা নেক

১. সু. ৩২ আ. ১৭ ; মিশকাত ২৩তম খণ্ড, ১৩ শ অধ্যায়, বিভাগ ১।
২. সোয়াহিব থেকে।

কাজ করেছে তাদের জন্যই তো কল্যাণ—তাছাড়া আরও পর্যাপ্ত সব রয়েছে।"[১]

কোরআনের উক্তিসমূহের উপদেশমূলক প্রকৃতির বিষয়ে এই চিন্তা-গোষ্ঠী প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের উপর তাঁদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছেন: "তিনিই তো আপনার কাছে কিতাব নাজিল করেছেন, যার একাংশ আদেশসূচক আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, তা হচ্ছে কিতাবের মূল অংশ। অপর অংশ হচ্ছে রূপক ও বিবিধ অর্থপূর্ণ আয়াত।"[২]

অপরদল পরলোকের আনন্দবেদনাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মগত বলে মনে করেন। তারা বলেছেন যে, অতিমাত্রায় মানসিক যাতনা যেমন দৈহিক যাতনার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি উচ্চতর মানসিক আনন্দও যে কোন ইন্দ্রিয় সুখের চেয়ে অনেক অনেক বেশী আনন্দদায়ক। কোরআনের বর্ণনায়, দৈহিক মৃত্যুর পর ব্যক্তি-আত্মা বিশ্ব আত্মায় "প্রত্যাবর্তন করে," যে আনন্দ-বেদনার চিত্র সুস্পষ্ট ভাষায়, প্রত্যাদিষ্ট শিক্ষক এঁকেছেন জনগণের সত্যোপলব্ধির জন্য তা হবে মানসিক ও আত্মগত। এই গোষ্ঠীর মধ্য থেকে মুসলিম জাহানের বেশ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মরমী-বাদী চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটছে।

অপরদল—এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল—কোরআনের সব বর্ণনার আক্ষরিক সমাপ্তিতে বিশ্বাস করে।

এসব বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশের চেষ্টা না করে পারলৌকিক পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক কোরআনিক ধারণা সম্পর্কে এবার আমাদের বিশ্বাসের বর্ণনা দিতে পারি।

কোরআনকে সতর্কতার সঙ্গে অধ্যয়ন করলে আমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে যিশুর ধর্মীয় চেতনার বিকাশ যেরূপ হয়েছিল মুহম্মদের মানসিক বিকাশও একই প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয়েছিল। মুহম্মদ ও যিশুখ্রীষ্ট দু'জনই শুধু জগতের ঐতিহাসিক যুগ-অধ্যুষিত শিক্ষক এবং সে কারণে আমরা দু'জনের সম্পর্কে একসঙ্গে আলোচনা করছি। এই বিকাশ যিশুর মধ্যে কত বিরাট রূপ ধারণ করেছিল তা তাঁর পার্থিব জীবনের

১. সু. ১০ আ. ২৬। এখানে জামাকশারী (কাশ্‌শাফ) মিশর সং ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪ দেখুন। তিনি বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিন্তাগোষ্ঠীর মতামত আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে মুশ্‌হাব্বাহাম ও জাবরিয়াদের মতবাদ উল্লেখ করেছেন।

২. সু. ৩ আ. ৫।

শেষপ্রান্তে স্বর্গরাজ্যের আদর্শীকৃত ধারণা থেকেই শুধু সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না, বরং অ-ইসরাইলদের প্রতি তাঁর ধারণার পরিবর্তন থেকেও প্রতীত হয়। প্রথমে[১] তিনি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিলেন; পরে ধর্মীয় চেতনা অধিকতর বিকশিত স্তরে তাঁর মনে বিশ্বজনের জন্য ব্যাপকতর সহানুভূতি জাগরিত হয়েছিল।[২]

যেমন ঘটেছিল যিশুর ক্ষেত্রে তেমনি ঘটেছিল মুহম্মদের ক্ষেত্রে।

কোরআনের যে সব অধ্যায়ে বিহেশতের জমকাল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা রূপক বা আক্ষরিক হোক, সে অধ্যায়গুলো সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে মক্কায় নাজিল হয়েছিল। সম্ভবত ধর্মীয় চেতনার শৈশবে মুহম্মদ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ভাসমান ঐতিহ্যের কিছু কিছু বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আত্মার ব্যাপক জাগরণে, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে গভীরতর যোগ স্থাপনের ফলে তাঁর চিন্তাধারার যা কিছু পার্থিব ভঙ্গী ধারণ করেছিল তা আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হল। শুধু কালপ্রবাহে ও তাঁর ধর্মীয় চেতনার বিকাশের ফলেই নয় বরং তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিক ধারণার অগ্রগতির ফলশ্রুতিতেও শিক্ষাগুরুর মনের অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। সুতরাং পরবর্তী সুরাসমূহে আমরা পার্থিব ও অপার্থিব, দৈহিক ও আত্মিক বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। "নদীর জলসিক্ত" উদ্যানসমূহ, চিরস্থায়ী আবাস,[৩] প্রাচুর্য ও মিলন, বিশুষ্ক, ছায়াহীন ও জলহীন মরুভূমির বুভুক্ষু সন্তানদের কাছে খুবই মনোরম লেগেছিল যারা নিজেদের সঙ্গে ও নিজেদের চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। —এসব এখনও সুন্দর সুন্দর উপমার ভিত্তিভূমি। কিন্তু অনুগৃহীতদের আনন্দ তাঁদের স্রষ্টার সম্মুখে চিরন্তন শান্তি ও সদিচ্ছার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে দেখান হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে: "আর পরহিজগার মুত্তালিকগণকে বাগিচা ও নহরধারায় ঘিরে থাকবে। তোমরা এখানে প্রবেশ কর। এখানে সুখেশান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস কর। তাদের মনে যে সব আবিলতা থাকবে, সেসব আমিই দূরে করে দেব। আর তারা ভাই ভাই

---

১. ম্যাথু. ১০, ৫, ১৫, ২২-২৬।

২. ম্যাথু. ২৮, ১৯ ইত্যাদি; স্ট্রসের 'নিউ লাইফ অব্‌ জেসাস্‌' (১৮৬৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬।

৩. সু ১৩ আ. ৩৪; সু. ৪৭ আ. ১৬, ১৭।

রূপে একে অন্যের সামনা-সামনি[1] আসনে বসে থাকবে। সেখানে তাদের কোন ক্লেশ হবে না, আর সেখান থেকে তাদেরকে বের করাও হবে না।"[2]

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদের চেয়ে ধারণা বা উপমার ক্ষেত্রে মহত্তর বা অধিকতর মহিমাব্যঞ্জক আর কি হতে পারে কিংবা ইহজীবন ও পরজীবনের স্বরূপ সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ বহনকালে হযরতের মনে বিশ্বাসের উত্তম ধারণা এর চেয়ে আর কি হতে পারে: "তিনিই তো তোমাদেরকে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করিয়ে থাকেন। এমন কি তোমরা যখন নৌযানে আরোহণ করে থাক, তখন মন্দমধুর হাওয়ায় ভর করে যাত্রীদেরকে নিয়ে এগোতে থাকে, আর তোমরা তাতে খুশী হও। কিন্তু যখনই দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে, আর চারদিক থেকেই উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসতে থাকে; এবারে তারা দুর্যোগে পড়েছে। তাই তারা একান্ত মনে নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহকে ডাকে, আর তাঁরই ইবাদত করতে থাকে। আর বলে, ইয়া আল্লাহ! আপনি যদি এই বিপদ থেকে রেহাই দান করেন, তাহলে আমরা আপনার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ হব। কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখন তারা দুনিয়ার বুকে অযথা গোলমাল সৃষ্টি করে থাকে; শোন, হে মানবজাতি! তোমাদের দুষ্কৃতির পরিণাম তোমাদের উপরই বর্তাবে। পার্থিব জীবনের সম্পদ তোমরাই ভোগ করে নাও। তারপরে আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসতে বাধ্য হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব, তোমরা যা কিছু করছিলে। এই পার্থিব জীবন, তো সেই পানির মতই, যা আমি আসমান থেকে ঝরিয়ে থাকি; তারপরে দুনিয়ার লতাপাতা, গাছপালা তার সাথে মিশল। যা মানুষ আর জীব-জন্তুগুলো খেয়ে থাকে। এমন কি দুনিয়ার বুক তাতে সুন্দর শ্যামলিমায় সুশোভিত হয়ে উঠল আর দুনিয়ার বাসিন্দারা ভাবতে লাগল: তারাই তো এসবের মালিক। এসবের উপরে তাদেরই কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু আমার নির্দেশ যখন দিনে কিংবা রাতে এসে পৌঁছায়, তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সে জায়গা দেখে কেউ বলতে পারবে না যে গতকালও এখানে কি ছিল। যারা চিন্তাশীল, জ্ঞানী তাদের জন্যই তো এমন বিস্তারিতভাবে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি। আল্লাহতায়ালাই যে শান্তির আবাস-ঘরের দিকেই ডাকছেন। আর যাকে খুশী সরল সত্য সনাতন পথ দেখিয়ে

---

১. শান্তি ও সদিচ্ছাপূর্ণ হৃদয়ে।

২. সূরা ১৫ আ. ৪৫-৪৮।

থাকেন।[১] যারা নেক কাজ করেছে তাঁদের জন্যই তো কল্যাণ—তাছাড়া আরও কিছু রয়েছে। তাঁদের চেহারায় কালিমা থাকবে না। তাঁরাই তো জান্নাতের বাসিন্দা—সেখানেই তারা চিরকাল বাস করবে। আর যারা অন্যায় অমঙ্গল অর্জন করেছে, তাদের পারিশ্রমিক হচ্ছে ঠিক কাজের পরিমাণ মোতাবিক।[২] তাদের চেহারায় অপমানের কালিমা ছেয়ে থাকবে। আল্লাহতায়ালার কবল থেকে তাদেরকে রক্ষা করার মতো কেউ থাকবে না। তাদের চেহারার কালিমা—যেন ঘনঘোর রাতের এক টুকরো আঁধার দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে।"[৩]

নিম্নের আয়াতসমূহের চেয়ে আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতর আর কি আছেঃ "যাঁরা আল্লাহতায়ালার ওয়াদা সঠিকভাবে পালন করেন, আর কোন ওয়াদা মোটেই ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ যাঁদেরকে মিলিয়ে রাখার জন্য আদেশ দিয়েছেন তা যাঁরা মিলিয়ে রাখেন আর নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে চলেন, আর খারাপ হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে যাঁরা সন্ত্রস্ত। আর যাঁরা ধৈর্যধারণ করেছেন নিজেদের পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে, আর নামাজ কায়েম রেখেছেন, আর নেক কাজ দ্বারা অন্যায় অসৎ কাজ দূর করেন—এঁরাই তো হচ্ছে সেই দল—যাঁদের জন্য আখিরাতে বাসগৃহ নির্দিষ্ট রয়েছে—বসবাসের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ যেখানে তাঁরা প্রবেশ করবেন আর তাঁদের বাপ দাদা স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে যাঁরা নেককার হবেন তাঁরাও। আর ফিরেশতাগণ প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হবেন আর বলবেন, "তোমাদের উপরে শান্তি হোক, যা নিয়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে—তাই তো আখিরাতের এই উত্তম গৃহ।"[৪]

মুহম্মদের পারলৌকিক জীবনের চিত্র ইন্দ্রিয়জ—এই মতবাদ যে নিতান্তই অসত্য তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইসলামের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার যে বিশুদ্ধতার উপর তাঁর

---

১. বায়যাবী "যাকে খুশী" বাক্যাংশটিকে "যারা অনুতপ্ত" অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। (পৃ. ৬৭, টীকা ১, অধ্যায়—৪)। তুঃ জামাকৃশারা (কাশ্‌শাফ)।

২. লক্ষ্য করুন, পুণ্যের পুরস্কার মানুষের কাজে ঠিক অনুপাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং তার প্রাপ্য পুরস্কারের অনেক বেশী হবে। কিন্তু পাপের শাস্তি সম্পূর্ণরূপে আনুপাতিক হবে।

৩. সুরা ১০, আ. ২৩-২৭।

৪. সু. ৮ আ. ২০-২৪। আগাগোড়া জামাকশারীর (কাশ্‌শাফ) আলোচনা করুন।

জীবন-নীতির ভিত্তি তা দেখানোর জন্য কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত উদ্ধৃত করে আমরা এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানব : "শোন, হে পরিতৃপ্ত আত্মা, নিজ পালনকর্তার দিকেই চলো এবারে। তুমি তাঁর উপরে সন্তুষ্ট, আর তিনিও তোমার উপরে খুশী রয়েছেন। তাই তো তুমি এবারে আমার বান্দাদের দলে শামিল হও। আর আমার জান্নাতেই তুমি প্রবেশ কর।"[১]

---

১. সু. ৮৯ আ. ২৭-৩০।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

"ইসলামী জীবনব্যবস্থায় কোন জবরদস্তী নেই।" সু. ২ আ. ২৫৬

"যারা ঈমান এনেছে, তারা মুসলমান, ইহুদী, ছাবেয়ী কিংবা নাসারা হোক না কেন, যারা আল্লার উপরে ও কিয়ামতের দিন সম্পর্কে আস্থাবান আর যারা নেক কাজ করেছে, তাদের জন্যে কোনও ভয় নেই, আর, তারা শোকার্ত হবে না।"—সু. ৫ আ. ৬৯

যে অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে আরবের নবীর প্রচারিত ধর্ম বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছিল তা ধর্মের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা। বহু শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টধর্ম এখানে সেখানে সুপ্ত ছিল, যতদিন পর্যন্ত এ ধর্ম বহুলাংশে পৌত্তলিকতাকে গ্রহণ ও পরিপাক করেনি, যতদিন পর্যন্ত একজন অর্ধ-পৌত্তলিক নৃপতি রাজাজ্ঞা নিয়ে এর সাহায্যে এগিয়ে আসেননি ততদিন পর্যন্ত এ ধর্ম পৃথিবীর ধর্মসমূহের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ইসলাম ধর্মের প্রচারকের মৃত্যুর ত্রিশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে ইসলাম আসন গেড়ে বসেছিল। এক শতাব্দী যেতে না যেতে হিরা পর্বতের গুহায় উচ্চারিত বাণী তিনটি মহাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। সম্রাট সিজার ও খসরু আরবে প্রচারিত নব্য গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মরুভূমির সন্তানগণ তাঁদের সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছিল। ইসলামের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও জনসাধারণের মনের উপর তাঁর বিস্ময়কর প্রভাব এই অভিযোগের জন্ম দিয়েছিল যে তরবারীর ধর্ম হিসেবে ইসলাম তরবারীর দ্বারা প্রচারিত ও সমর্থিত হয়েছিল। এই বিবৃতির মধ্যে কোন সত্যতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য আমরা ইসলামের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত পরিস্থিতি ও তথ্যসমূহ পরীক্ষা করে দেখার প্রস্তাব দিচ্ছি।

হযরতের মদিনায় আগমনের সময়ে আস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় বহু বৎসরব্যাপী মারাত্মক সংঘর্ষের পর কেবল এক অন্তঃসারশূন্য শান্তিচুক্তিতে উপনীত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে পূর্বের চেয়ে প্রবলতর শত্রুতাসহ

পুনরায় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রত্যেকটি সম্ভাবনা উপস্থিত ছিল। ইহুদীরা জাবালার হত্যাকাণ্ডের পর মদিনার আরবদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। তারা দ্রুততার সঙ্গে তাদের শক্তির পুনরুদ্ধার ঘটাচ্ছিল এবং প্রকাশ্যে তাদের পৌত্তলিক স্বদেশবাসীদেরকে তাদের মসীহের প্রতিশোধের কথা বলে শাসাচ্ছিল, আর নির্ধারিত সময়ে মসীহের আবির্ভাব প্রত্যাশা করছিল। যেসব পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের মধ্যে কোরাইশদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক তাদেরকে মদিনার বিরুদ্ধে সকল হিংস্রতা নিয়ে সুগঠিত করা হল। যে মুহূর্তে হযরত মদিনাবাসীদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন সে সময়ে যেসব উপাদান নূতন ধর্মের সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মক্কার যেসব শিষ্য সাহসিকতার সাথে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং যাঁরা শিক্ষাগুরুর জন্য ও তাঁদের কাছে আনীত আলোকের জন্য সর্বহারা হয়েছিলেন আর নির্বাসন ভোগ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় স্বল্প ও শক্তিতে দুর্বল। তাঁর মদিনার শিষ্য সংখ্যাও অধিক ছিল না; আর তারা গোত্রগত হিংসা-বিদ্বেষের ফলে পরস্পর বহুধা বিভক্ত ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র মদিনার সিংহাসনের অভিলাষী একজন প্রভাবশালী দলপতির নেতৃত্বে মদিনার অভ্যন্তরে পৌত্তলিকদের সঙ্গে কাজ করছিল।[১] ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে বিদ্বেষ ও প্রচণ্ডতার সহিত, অনিষ্টকর-নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে সবদিক দিয়ে হযরতকে বাধা দিচ্ছিল। কোরাইশরা তাঁর জীবননাশের হুমকি দিয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর হৃদয় দমেনি, যখন অন্যান্যদের অস্তিত্ব তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর পার্শ্বে সম্মিলিত বিভিন্ন উপাদানকে একটা সামাজিক সংগঠনে পরিণত করার কাজে লেগে গেলেন। প্রাচীন গোত্রগত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য তিনি সালিশ নিযুক্ত করলেন; আস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের পার্থক্য দূর করলেন। তিনি ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তাঁর ক্ষুদ্র গণপ্রজাতন্ত্রের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন এবং সব বিশ্বাসীর মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে একজন ইহুদী, সেবীয় কিংবা খ্রীষ্টান যখন আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং ন্যায়নিষ্ঠভাবে কাজ করে, তখন তার জন্য কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। যে জাতি নিকৃষ্টতম পৌত্তলিকতার গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছিল যে জাতির দ্বিতীয় স্বভাব ছিল

১. এ বিষয়ে প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে।

রক্তমোক্ষণে তিনি সেই জাতিকে শিখিয়েছিলেন পবিত্রতা ও সত্যনিষ্ঠা, আত্ম-সংযম, উদারতা ও দেশপ্রেম। তিনি বলেছিলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার অধিকারের প্রতিদান দেয় আল্লাহ তার দোষ স্খলন করেন।" "যে ব্যক্তি ভাল কাজে মানুষের মধ্যস্থতা করে সে তদ্দ্বারা লাভবান হয়, আর যে মন্দ কাজে মধ্যস্থতা করে সে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি ভোগ করবে।"[১]

যখন তিনি তাঁর জাতিকে মানবতাবাদী করার এই ঐশী দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন, তাদেরকে অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উন্নীত করছিলেন, হীনমন্যতা থেকে পরিশুদ্ধ করছিলেন, তখন তিনি নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা পরায়ণ শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তারা তাঁর জীবননাশ ও ধর্মের উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। কোরাইশদের ভাষায় পূর্বপুরুষদের ধর্মপরিত্যাগকারী, মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বৈপ্লবিক মতবাদসমূহের বীজ বপন করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে-ছিলেন। সম্মিলিত আরব অবশ্যই এসব বিকৃত মস্তিষ্ক অত্যোৎসাহীদের নিশ্চিহ্ন করত যাঁরা অদৃশ্য আল্লাহর জন্য ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদ জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর উপাসনায় অত্যন্ত নিয়মানুগ ছিল, প্রেম, দানশীলতা ও মহানুভবতার সাধারণ কর্তব্যে, চিন্তা ও কার্যের পবিত্রতায় খুবই কঠোর ছিলেন। মদিনায় আগমনের পর থেকেই মুহম্মদের ভাগ্য তাঁর জাতি, যাঁরা তাঁকে তাদের মধ্যে আহ্বান করেছিলেন ও বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁদের সকলের ভাগ্যের সঙ্গে একসঙ্গে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। তাঁর বিনাশের অর্থ ছিল তাঁর পাশে যাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সকলেরই বিনাশ। দুশমন ও বিশ্বাসঘাতক পরিবেষ্টিত সমগ্র আরবদেশ জাতীয় দেবদেবীর সংরক্ষক কোরাইশদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নব্য মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হল, মুসলমানেরা অস্ত্রধারণ না করলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। শত্রুরা তাদের উপর নিপতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একথা মুসলমান-দের নিকট বিঘোষিত হয়নি: "কাফিররা বিশ্বাসীদের রক্তের সম্পর্ক কিংবা চুক্তিকে শ্রদ্ধা করে না; যখন তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তোমাদেরকে আক্রমণ করে। তোমরা তোমাদেরকে রক্ষা বা হিফাজত করবে; আবার আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করছে, কিন্তু তাদেরকে প্রথমে আক্রমণ কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[২] মুসলমানদের কাছে

---

১. সূ. ৪ আ. ৮৫। ২. সূ. ২ আ. ১৯০।

প্রতিরোধ আত্মসংরক্ষণের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। আক্রান্ত হলে হয় তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নতি স্বীকার করবে নতুবা যুদ্ধ করবে। তারা দ্বিতীয় বিকল্পটি পছন্দ করেছিল এবং দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর শত্রুদের বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইহুদীদের তীব্র শত্রুতা, পবিত্রতম অঙ্গীকারের পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন, অবিরাম রাজদ্রোহিতা, পৌত্তলিকদের নিকট মুসলমানদেরকে বার বার প্রতারিত করা স্বভাবত কঠিন শাস্তিতে পর্যবসিত হয়েছিল। দুর্বল ও ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য এটা অত্যাবশ্যক ছিল প্রতিহিংসামূলক শাস্তির চেয়ে প্রতিরোধাত্মক হুঁশিয়ারী হিসেবে।

একথা অনুমান করবার অধিকার আমাদের নেই যে, যেহেতু জগতের কিছু সংখ্যক মহান শিক্ষক যাঁরা বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হয়েছেন, বিরোধী অবস্থার চাপে নতি স্বীকার করেছেন ও শাহাদৎ বরণ করেছেন, যেহেতু অন্যান্য শিক্ষক তাঁদের চিন্তায় অবাস্তব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছেন, যেহেতু স্বপ্নবিলাসীরা জন্মেছেন, আশাবাদীরা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছেন, কাজেই মুহম্মদ তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে এবং তাঁর দায়িত্ব-ভার সম্পাদনের পূর্বেই জগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে ও যে সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এসেছিলেন তাকে বলির শিকার হতে দিতে রাজী হননি, বর্তমান যুগে যাকে 'ধারণা' বলা হয় তার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য।

আসুন আমরা মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সঙ্গে নিজ নিজ ধর্ম প্রচারার্থে ইহুদী, খ্রীষ্টানদের এমনকি মৃদুস্বভাব পারসিকদের ভয়াবহ যুদ্ধের আলোচনা করি। ইহুদীদের ক্ষেত্রে আক্রমণ ও উচ্ছেদ সাধন ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। বরং কাউকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য তাদেরকে অভিসম্পাত দেওয়া হত।

প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টানদের ক্ষেত্রে নাজারাতের প্রেরিত পুরুষ কর্তৃক প্রচারিত আত্মসমর্পণের তত্ত্ব ক্ষমতার অহমিকার মধ্যে সত্বর বিস্মৃত হল। সেদিন থেকে যেদিন থেকে খ্রীষ্টধর্ম একটি স্বীকৃত শক্তি, একটি সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে সেদিন থেকেই তা আক্রমণাত্মক ও নির্যাতনমূলক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থকার যিশুখ্রীষ্ট ও মুহম্মদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অঙ্কন করেছেন। যাঁরা যিশুর ঈশ্বরত্বের বিশ্বাস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত তাঁরা হযরত কর্তৃক ব্যবহৃত তদীয় জাতির পুনরুত্থানের 'পার্থিব' উপায়—কথাটির মধ্যে

"শয়তানি অনুভাবনা" স্বীকার করেছেন, পক্ষান্তরে অনুরূপ উপায়ের অ-প্রয়োগ (সম্ভবত ব্যবহারের জন্য সুযোগের অভাবজনিত)-কে নাজারাতের প্রেরিত পুরুষের ঐশীত্বের নির্দেশক হিসেবে দেখেছেন। আমরা যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদন করব যে, এধরনের তুলনা অশোভন, কারণ তা এমন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত যা শুধু ইতিহাসেই মিথ্যা নয়, বরং মনুষ্য-চরিত্রের ক্ষেত্রেও মিথ্যা।

যিশু খ্রীষ্ট ও মুহম্মদের জীবনের পরিস্থিতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। নবুয়্যতের স্বল্পকালের পরিসরে যিশুর প্রভাব প্রধানত নিম্নস্তর ও অশিক্ষিত শ্রেণী থেকে আগত অল্পসংখ্যক শিষ্যদের মধ্যেই মাত্র সীমিত ছিল। তাদের পথ-নির্দেশের জন্য ব্যবহারিক নিয়মাবলী তাঁর প্রয়োজন হওয়ার মতো তাঁদের শিষ্যগণ সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার বা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবশালী হওয়ার পূর্বে, কিংবা হয় আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য নয় কোন শক্তিশালী ধর্মমতে নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে তারা কোন সংগঠন গড়ে তোলার পূর্বে, তিনি পুরোহিত শ্রেণীর নিষ্প্রাণ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদের মাধ্যমে যে ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিলেন তারই শিকারে[১] পরিণত হয়েছিলেন—এক দুর্ধর্ষ জাতির চিরস্থায়ী বিদ্বেষের খপ্পরে পড়েছিলেন। স্থায়ী আইন-কানুন শাসিত একটি জাতির মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা নিশ্চিত যে অবস্থা তা যিশুর শিষ্যদের ছিল না ; তাঁর অনুসারীদের পক্ষে একটি সুগঠিত দলে শৃঙ্খলিত হওয়ার সুযোগ আসেনি ; শিক্ষাগুরুও ব্যবহারিক গঠনমূলক নৈতিকতার নিয়মাবলী প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করেননি। যখন সম্প্রদায় সম্প্রসারিত হয়েছিল যখন নব্য-প্লেটোনিক জ্ঞানে সুশিক্ষিত একজন পণ্ডিত গুরুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও সরলতা ধ্বংস করেছিল, তখনি কেবল আইন-প্রণয়নের অভাব অনুভূত হয়েছিল।

যিশুর মতো মুহম্মদও তাঁর প্রচারক ও সংস্কারক জীবনের শুরু থেকেই তাঁর জাতির শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সূচনাতে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাও ছিল নিতান্ত নগণ্য। তাঁর পূর্বেও বহু লোক

১. আমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত মতামত অনুসারে লিখছি—তাঁর যুগে প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে মুহম্মদ বিশ্বাস করতেন যে যিশু অলৌকিক উপায়ে অন্তর্হিত হয়েছিলন,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টানদের সাধারণ ঐতিহ্যের দরবারে তথাকথিত বাইবেলায় নষ্টিক ঐতিহ্য বিরোধী হলেও উভয় দিকেই সমান ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা রয়েছে।

পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন এবং অন্তরাত্মার বাণী শুনে-ছিলেন। তিনিও করুণা, দানশীলতা ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন।

মুহম্মদ এমন এক জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন যারা বর্বর প্রথার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, যারা যুদ্ধকে জীবনের অভীষ্ট মনে করত—এমন একটি জাতি যারা গ্রীক ও রোমকদের জড়াত্মক ও অবমাননাকর প্রভাব থেকে যেমন বহুদূরে ছিল, তাদের মানসিক প্রভাব থেকেও তেমনি বহুদূরে ছিল। তাঁর ঘোষণাসমূহ প্রথমে ঘৃণা, পরে প্রতিহিংসা গ্রহণের মনোভাব আনয়ন করেছিল, যা'হোক তাঁর শিষ্য সংখ্যায় ও শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল ; সর্বশেষে মদিনাবাসীদের আমন্ত্রণ তাঁর মহান কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করল। যে মুহূর্ত থেকে তিনি মহত্ত্বতার সঙ্গে প্রদত্ত আশ্রয় গ্রহণ করলেন, যে মুহূর্ত থেকে তিনি তাদের প্রশাসক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক হওয়ার জন্য আহুত হলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাদের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য একসূত্রে বাঁধা হয়ে গেল ; তখন থেকে পৌত্তলিক ও তাদের মিত্রশক্তির শত্রুতা মুসলমানদের অতন্দ্র প্রহরার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটিমাত্র শহরকে আরবদেশের অগণিত গোত্রের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছিল। এ ধরনের পরি-স্থিতিতে মুসলিম প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রায়ই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ত।

আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তি যা নাজারাতের মহান প্রেরিত পুরুষের[১] হৃদয়ে কথা হয়ে উঠেছিল যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের সংরক্ষণের হাতিয়ারের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন, সেই একই প্রবৃত্তি, প্রচণ্ড শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মজলুম মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধারণে বাধ্য করেছিল।

মৃদু করুণা ও শক্তির মাধ্যমে ক্রমশঃ আরব্য গোত্রসমূহের সমস্ত বিচ্ছিন্নদলসমূহ এক আল্লাহর উপাসনার দিকে আনীত হল। তারপরে দেশে শান্তি স্থাপিত হল। এমন এক জাতির মধ্য থেকে তিনি উদ্ভূত হয়েছিলেন, যারা পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে উগ্রতম, যারা পূর্বের মতো এখনও প্রচণ্ড ও আবেগপ্রবণ, যারা তাদের মরুভূমির সূর্যের মতো উত্তপ্ত স্বভাবসম্পন্ন। মুহম্মদ এমন জাতির মধ্যে আত্মসংযম ও আত্মোৎসর্গের অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন, যা পূর্বে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়নি।

মুহম্মদের আবির্ভাবকালে আন্তর্জাতিক বাধ্যতাবোধ ছিল অপরিজ্ঞাত।

---

১. লুক ২২, ২৫৬ :

যখন এক জাতি বা এক গোত্র অন্য জাতি বা গোত্রের উপর আক্রমণ চালাত তখন সামর্থ্যবান লোক নিধন হত, নির্দোষ লোক বন্দীত্ব প্রাপ্ত হত, গৃহদেবতা চুরি যেত।

রোমকদের আইনব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তের শত বছর সময় লেগেছিল; তাদের আইন যথেষ্ট ব্যাপক ও ধারণার[১] দিক থেকে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তারা আন্তর্জাতিক নৈতিকতা বা মানবতার প্রতি কর্তব্য কুত্রাপি উপলব্ধি করতে পারেনি। পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহকে পর্যুদস্ত করার জন্যই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করত। যেখানে তারা সফলকাম হত সেখানে তারা জনগণের উপর তাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে চাপিয়ে দিত। সন্ধির পবিত্রতা ছিল অজ্ঞাত; সুবিধামত চুক্তি সম্পাদিত ও লঙ্ঘিত হত। তাদের দৃষ্টিতে অন্য জাতির স্বাধীনতার সামান্যতম গুরুত্বও ছিল না।[২] খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্তনে এর প্রচারক ও ব্যাখ্যাতাদের মতবাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাধ্যতাবোধ সম্পর্কে কোন পরিবর্তনই দেখা যায়নি। যুদ্ধ পূর্বের মতো বর্বরোচিত ও ধ্বংসাত্মক ছিল; বন্দীকারীরা নির্দয়ভাবে জনগণকে দাসত্বে আবদ্ধ করত। কোন দলের সর্দারের লক্ষ্যের উপযোগী হলেই চুক্তি সম্পাদিত কিংবা লঙ্ঘিত হত। খ্রীষ্টধর্ম কখনো আন্তর্জাতিক নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করার দাবী করত না এবং তার অনুসারীদেরকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল।

আধুনিক চিন্তাবিদেরা এটাকে খ্রীষ্টান জীবনব্যবস্থার বাস্তব ত্রুটি, যে অসম্পূর্ণ অবস্থার মধ্যে এই ধর্ম পরিত্যক্ত হয়েছিল সে অবস্থা স্বাভাবিক মনে করার পরিবর্তে তা সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। মানব-প্রজ্ঞার এ এক অদ্ভুত বিকৃতি। কাজেই, যা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথোচিত বলে বিবেচিত তা জাতির ক্ষেত্রে অনুচিত বলে বিবেচিত এবং বিপরীতক্রমেও তা সত্য। ধর্ম ও নৈতিকতা, দুটি রূপান্তরযোগ্য পদ আইনের জগৎ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ধর্মবাষ্টি মানুষের বন্ধন নিয়ন্ত্রণের দাবী রাখে, বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক উপেক্ষা করে। এরূপে ধর্ম স্রেফ ভাবাবেগ, উচ্ছ্বাস প্রবণতার বিষয় কিংবা বিতর্ক সভায় পারস্পরিক গুণকীর্তনে

---

১. সেমিটিক মানবগোষ্ঠীর সঙ্গত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলব যে রোমের অধিকাংশ বড় আইনবিজ্ঞানী সেমিটিক বংশোদ্ভূত—ফিনিসীয়, সিরীয় বা কার্থেজীয়।

২. তুঃ ডলিঞ্জার 'দি জেনটাইল এণ্ড দি জিউ'।

পর্যবসিত হয়, অবশ্য কোন কোন সময় তা দার্শনিক নৈতিকতার মর্যাদায় উন্নীত হয়।

জাতিকে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে এবং জাতির জন্য এক মানদণ্ড, আর ব্যক্তির জন্য অন্য মানদণ্ড নেই—এই সত্যের স্বীকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে আন্তর্জাতিক বাধ্যতাবোধের ভিত্তি। কেননা ব্যষ্টি নিয়ে যেমন জাতি, জাতি নিয়ে তেমনি মানবতা; কাজেই জাতিসমূহ ও তাদের পারস্পরিক কর্তব্যবোধ কোনভাবেই ব্যক্তি-মানুষের পারস্পরিক কর্তব্যবোধ থেকে পৃথক নয়।[১]

একথা সত্য যে, পাশ্চাত্যে লাতিন গির্জার অভ্যুদয় এবং রোমের বিশপের ক্ষমতার অপরিহার্য সম্প্রসারণ লাতিন খ্রীষ্টান জগতে কিছু পরিমাণে আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধের সূচনা করেছিল। কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে রোমের গির্জার সমর্থকদের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল; তা কোন বিশেষ উপলক্ষে গ্রীক খ্রীষ্টানদের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে মঞ্জুর হত। অবশিষ্ট বিশ্ব শর্তহীনভাবে এরূপ দায়িত্বের হিতকারিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। "ধর্মের নামে দুর্বল জাতিসমূহের উপর আক্রমণের ভিত্তিও যথার্থ প্রতিপাদন করা হত ধর্ম তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও দাসত্ব বরণে বাধ্য করত।" প্রত্যেকটি নীতি লঙ্ঘন গির্জা কর্তৃক শুদ্ধিকৃত হত; চরম পাপের ক্ষেত্রে পোপ কর্তৃক পাপস্খালন অপরাধীর স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে দিত। গির্জার পরিপূর্ণ অনুমোদনে শার্লামেঙ্গের প্রথম বলিসমূহ থেকে শুরু করে আমেরিকার নিরাপরাধ বংশসমূহের ধ্বংস ও দাসত্বে পরিণত করণের মধ্যে মানবজাতির আন্তর্জাতিক কর্তব্য ও দাবীর এক অবিরাম লঙ্ঘন কাজ করে এসেছে। দানশীলতার মৌল নীতিসমূহের প্রতি নিতান্ত অবমাননা যিশুর সেই সব শিষ্যের প্রতি নির্যাতন নিয়ে এসেছিল, যারা গির্জা থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তাভাবনার সাহস করত।[২]

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত উদ্ভবের ফলেও অবস্থার কোন হেরফের ঘটেনি। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ ও পারস্পরিক নির্যাতন একটা ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। হাল্লাম বলেছেন, "সংশোধিত গির্জার মারাত্মক মৌলিক

---

১. তুঃ ডেভিড উর্কুহার্ট-এর প্রবন্ধ: 'এফেক্টস অব দি কনটেম্পট অব ইন্টার‌ন্যাশনাল ল' "দি ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট", ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

২. তুঃ মিলম্যানের 'লাতিন ক্রিশ্চিয়ানিটি', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২ এবং লেকির 'হিস্ট্রী অব র‍্যাশন্যালিজম ইন্ ইউরোপ', অধ্যায়—"পার্সেকিউশান"।

পাপ হল নির্যাতন, যা একজন সৎ লোকের ধর্মের প্রতি আগ্রহ ততটা কমিয়ে দেয় যতটা তার অধ্যয়ন অগ্রসর হয়।"[১]

কিন্তু যত বেশী হোক না বিভিন্ন নবজাত গির্জা পরস্পর ভিন্ন মতাবলম্বী ছিল অথবা রোমের গির্জা থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী ছিল ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে, তবে খ্রীষ্টান-জগতের বহির্ভূত সকল জাতির স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্নে সম্পূর্ণ অভিন্ন মতাবলম্বী ছিল।[২]

পক্ষান্তরে, ইসলামের প্রাণধর্ম বিচ্ছিন্নতার বিরোধী। তুলনামূলকভাবে এক সংস্কৃত যুগে যখন জগৎ নৈতিক ও সামাজিক তমসায় আচ্ছন্ন ছিল। তখন মুহম্মদ সাম্যের যে সব নীতি প্রচার করেছিলেন তা অন্যান্য মতে শুধু অর্ধ-উপলব্ধ হয়েছে, এবং তিনি যে সব আইন জারি করেছিলেন তা বিস্তৃতি ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে যে কোন ধর্মের আইনের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। একজন সমর্থ লেখক বলেছেন, "ইসলাম তার ধর্ম পেশ করেছিল, জোরপূর্বক বলবৎ করেনি; আর সে-ধর্ম গ্রহণের ফলে বিজেতা ও বিজিত একই অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল; বিজিত রাজ্যসমূহ সে সব অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছিল যা মুহম্মদের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক বিজেতা বিজিতদের উপরে আরোপ করত।"

ইসলামের আইনে বিবেকের স্বাধীনতা ও উপাসনার স্বাধীনতা মুসলিম রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। "ধর্মে কোন জোরজুলুম নেই"[৩] কোরআনের এই আয়াত ইসলামে অনুসৃত সহনশীলতা ও উদারতার নীতির সাক্ষ্য দেয়। "যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তবে সবাই একসঙ্গে বিশ্বাসী হত।" "তোমরা কি তাদেরকে

১. হাল্লামের 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রী অব ইংলণ্ড' ১ম খণ্ড, অধ্যায়—২, পৃ. ৬২। লেকি বলেছেন যে, যখন কাল্‌ভিন 'ত্রত্ব' সম্পর্কে তাঁর মতামতের জন্য সারভিটাসকে পুড়িয়ে মেরেছিল, তখন তার কাজ সব প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায় সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন মেলাঙ্কথন, বলিঙ্গার ও ফাবেল এই অপরাধ উন্মাদনার সঙ্গে অনুমোদন করে লিখেছেন; বেজা একটি বিস্তৃত গ্রন্থে একে সমর্থন করেছেন। লেকির 'হিস্ট্রী অব র‍্যাশনালিজম' ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯। ক্যাথলিক ডিসেণ্টার ও নন-কনফরমিষ্টদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ফৌজদারী আইন পড়লে যে কোন পক্ষপাতহীন ব্যক্তি মর্মাহত হবেন।

২. গ্রোটিয়াস, সম্ভবত ইউরোপের আন্তর্জাতিক আইনের প্রবর্তক, আদর্শগতভাবে মুসলমানদেরকে ইউরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে অধিকার মঞ্জুর করেননি।

৩. সূ. ২ আ. ২৫৭ (মদনী সূরা)।

বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে যেখানে বিশ্বাস শুধু আল্লাহর নিকট থেকে আসে ?" "যারা তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে তাদের সঙ্গে লেগে থাক ; তোমার হৃদয়ের কাছে তুমি সত্য হও, যারা তোমার প্রতি মন্দ করে তাদের প্রতি কল্যাণ কর"—যে শিক্ষকের জীবন-নীতি এগুলো, সেই শিক্ষককে ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতার দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে এই উক্তিগুলো শক্তিহীন অত্যোৎসাহীর কিংবা বিরোধী শক্তির চাপে আড়ষ্ট কোন দার্শনিক স্বপ্নাবিলাসীর নয়। এই বাক্যাবলী এমন এক ব্যক্তির মুখনিঃসৃত যিনি তখন শক্তির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছেন, যিনি যথেষ্ট শক্তিশালী ও সুগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান, যিনি তাঁর বিখ্যাত তরবারীর সাহায্যে তাঁর মতবাদ বলবৎ করতে সমর্থ।

রাজনীতির মতো ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সহনশীলতার বাণী প্রচার করেছে যতদিন পর্যন্ত তারা শক্তিহীন ও দুর্বল রয়েছে। যে মুহূর্তে তারা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছে, এমন শক্তি যার সাহায্যে তারা যাদের অতিক্রম করতে চায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, তখন সহনশীলতা জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করেছে। সিজারের সিংহাসনে কনস্ট্যান-টাইনের আরোহণের ফলে খ্রীষ্টধর্ম নিগ্রহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু সেই সময় থেকে এমন রীতির ধর্মীয় নির্যাতন শুরু হয়, নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে যা একমাত্র ইহুদীদের নির্যাতন-পদ্ধতির অনুরূপ। লেকি বলেছেন, "যে মুহূর্ত থেকে কনস্ট্যানটাইনের অধীনে গির্জা দেওয়ানী ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন থেকেই ইহুদী, ধর্মত্যাগী ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের সাধারণ নীতি অনুমোদিত ও কার্যকরী করা হয়।"[১] তাদেরকে নির্মমতার কারুকার্যসহ নির্যাতন করা হত। তাদেরকে ধীর-প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করা হত যাতে তারা চিন্তা করতে পারে যিশুর ধর্মে উদারতা ও মানবতা কেমন। প্রত্যেক 'ফাদার' নির্যাতনের পবিত্রতা সম্পর্কে লিখেছেন। গির্জার অন্যতম প্রধানতম সেন্ট, "কোমলতম ও অতুলনীয় ধর্মনিষ্ঠার অধিকারী" নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের স্বপক্ষে যুক্তি সরবরাহ করেছেন। ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আসুরিক যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ধর্মসংস্কারক নেতাদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে উৎসাহিত করার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করেনি[২]—ধর্মের

১. তুঃ হাল্লামের 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রী অব ইংলাণ্ড, ১ম খণ্ড, অধ্যায়—৩, পৃ. ৯৮।

২. বিংশ শতকের সুবৃহৎ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে, যাতে খ্রীষ্টজগতের বড় বড় জাতি

নামে ও "যিশুর মহিমা কীর্তনের" জন্য ধর্মত্যাগী ও পৌত্তলিকদের নির্মূল করণের ব্যাপারে অনুমোদন দিতে ইতস্ততঃ করেনি। এ সবের খ্রীষ্টানী মানবতা অথবা জাতিসমূহের আইন কিংবা এখনকার কালা আদমীদের উপর কোন দাবী ছিল না। পঞ্চদশ শতকে পোপ একটি বিশেষ সনদ প্রদান করলেন যার ফলে সার্বভৌম ক্ষমতাসহ পর্তুগীজ ও স্পেনিশদেরকে অ-খ্রীষ্টান জগৎ প্রদান করা হল, অধিবাসীদেরকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে যেভাবেই তারা তা করুক না কেন। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করছে কিরূপ উদারতার সাথে এই অনুমতি পরিকল্পিত হয়েছে। নির্যাতন ও অ-খ্রীষ্টান-দের প্রতি আচরণ সম্পর্কে সমুদয় নির্মম মতবাদগুলো অন্যায়ভাবে যিশুর বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রভু কি বলেননি "খ্রীষ্টধর্মের ছায়াতলে আসতে তাদেরকে বাধ্য কর"?

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিজয়ের মুহূর্তে, যখন আরবের নবী মক্কার প্রাচীন উপাসনালয়ে প্রবেশ করলেন ও মূর্তিসমূহ ধ্বংস করলেন, তখন তিনি ক্রোধে বা ধর্মীয় উন্মত্ততায় নয়, বরং করুণায় বলেছিলেন, "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত"। তিনি দরিদ্র ও দুর্বলদেরকে আশ্রয় প্রদান ও পলাতক দাসদেরকে মুক্তিদানসহ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন।

মুহম্মদ সহনশীলতার কথা শুধু প্রচারই করেননি তিনি তা আইনের মধ্যে রূপ দিয়েছিলেন। সব বিজিত জাতিকে তিনি উপাসনার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্য নামমাত্র কর প্রদান করা হত।[১] কর দেওয়া একবার সাব্যস্ত হলে তাদের ধর্মের কিংবা বিবেকের স্বাধীনতার সঙ্গে যে কোন প্রতিবন্ধকতা ইসলামী আইন-এর সরাসরি লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হত।[২] এতখানি কি অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে বলা যায়? তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তরিতকরণ মুহম্মদের মানস-প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং ধর্মমত সম্পর্কে ঝগড়া ফ্যাসাদ করা তাঁর কাছে ঘৃণার ছিল। পুনঃ পুনঃ তিনি স্বোচ্ছাসে বলেছেন, "তোমরা যে বিষয় জান না তা নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ কর কেন? উত্তম কাজে পরি-পূর্ণতা লাভ করার চেষ্টা কর; তোমরা যখন আল্লাহর সকাশে ফিরে যাবে

নিয়োজিত ছিল, ধর্মীয় নেতাগণ উভয়দিকে প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির জন্য।

১. এই কর জিজিয়া কর নামে পরিচিত।—অনুবাদক।

২. "ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

তখন তিনি তোমাদের বলে দেবেন যাতে তোমরা মতপার্থক্য প্রকাশ করেছিলে।”

এখন আমরা হযরতের যুদ্ধগুলোর পরীক্ষায় ফিরে যাব। আমরা দেখেছি যে মুহম্মদের নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ পৌত্তলিকদের আক্রমণাত্মক ও প্রচণ্ড শত্রুতার ফলে সৃষ্ট, এবং মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য তা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মুতার যুদ্ধ ও তবুক-অভিযান—বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আদিম প্রতিবাদ—এর মূলে ছিল গ্রীকরা একজন মুসলমান দূতকে হত্যা করেছিল। সম্ভবতঃ আমরা শুনতে পারতাম না যে ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচারিত, যদি মুসলমানেরা প্রাচ্যের খ্রীষ্টানদেরকে এই হত্যার জন্য শাস্তি প্রদান না করত। মুতার যুদ্ধ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল; তবুকের অভিযান সম্পূর্ণরূপে রক্ষণাত্মক ছিল (হিরাক্লাইটাসের বাহিনীসমূহকে প্রতিরোধ করার জন্য এই যুদ্ধ আয়োজিত হয়েছিল), হযরতের জীবদ্দশায় এই আন্তর্জাতিক অপরাধের শাস্তি হয়নি; কিন্তু তাঁর অনুসারীরা একথা বিস্মৃত হননি, এবং তারা এর সমুচিত শাস্তি দিয়েছিল।

গ্রীক সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি খ্রীষ্টান জগতের এক বৃহদাংশের সঙ্গে মুসলমানদেরকে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে টেনে এনেছিল। এছাড়া, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু সার্বভৌমত্বের অধীনে প্রদেশ-সমূহের গভর্ণরদের অস্বাভাবিক অবস্থায় মুসলিম প্রধানদের পক্ষে তাদের কোনও একজনের সঙ্গে শান্তি-সন্ধি স্থাপন করে এ ধরনের অবস্থার অবসান ঘটানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একজনকে পর্যুদস্ত করে তার সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পূর্বেই আরেকজন এমন শত্রুতামূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল যার ফলে তার শাস্তি প্রদানের জন্য মুসলমানেরা বাধ্য হল। কাজেই একবার তারা যে কার্যক্রমে প্রবেশ করেছিল তার পরিণতিতে প্রায় সমগ্র খ্রীষ্টান-জগতের সঙ্গে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।[১]

---

১. উর্কুহার্টের ‘ইসলাম এজ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম’ দেখুন। আমি একথা বোঝাতে চাই না যে মুসলমানেরা কখনো আক্রমণাত্মক মনোভাব বা অর্থলিপ্সা দ্বারা প্ররোচিত হয়নি। এ ধরনের বিবৃতি দেওয়া মনুষ্যস্বভাবের চরম অজ্ঞতার নির্দেশক হবে। এটা কদাচিৎ সম্ভব যে, তাদের শত্রু ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধনের পর ও পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও তারা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং আইনের আওতার মধ্যে ছিল। আমি এবিষয়ে আমার চক্ষু বন্ধ করছি না

যেমন খ্রীষ্টানদের মধ্যে তেমনি মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম প্রায়ই উচ্চ অভিলাষী প্রধানদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ওজর হিসেবে কাজ করেছে। খ্রীষ্টান আইনজ্ঞ ও পাদরীদের ন্যায় মুসলমান যুক্তিবিদেরা জগতকে দু'টি এলাকায় ভাগ করেছেন—'দারুল হার্ব' এবং 'দারুস্ সালাম'—পৌত্তলিক জগৎ ও খ্রীষ্টান জগতের অনুরূপ। যেসব মৌল-নীতির উপর অ-মুসলিম দেশের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ভরশীল তা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টান লেখকগণ আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে যে উদারতা দেখিয়েছেন তার চেয়ে অনেক, অনেক গুণ বেশী উদারতা মুসলমানেরা দেখিয়েছেন। একমাত্র সাম্প্রতিককালেও অবস্থার চাপে অ-খ্রীষ্টান রাষ্ট্র "জাতিসঙ্ঘে" যোগদানের অনুমতি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, মুসলিম আইনবিজ্ঞানীরা যুদ্ধাবস্থা ও শান্তি-অবস্থার মধ্যে তফাত করেছেন। কাজেই 'দারুল হার্ব'[১] বলতে সেইসব দেশকে বুঝাচ্ছে, যার সঙ্গে মুসলমানেরা যুদ্ধরত রয়েছে, আর যেসব দেশের সঙ্গে তারা শান্তি চুক্তিতে অবস্থান করছে তা হল 'দারুল আমান'[২]। 'হার্বী', দারুল হার্বের অধিবাসী, তারা সহজ ও স্বাভাবিক অর্থে বিদেশী। সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া কোন হার্বীর ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার নেই। কিন্তু একবার সে যখন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (আমান) প্রাপ্ত হয় তা কোন দীনতম মুসলমানের কাছ থেকে হোক না কেন, তখন সে এক বৎসরের জন্য অবমাননার হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। নির্ধারিত সময় শেষ হলে সে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য। 'দারুল আমানে'র অধিবাসী 'মুস্তামিন' নামে পরিচিত। নিরাপত্তা চিরকালের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য হতে পারে। যতদিন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বলবৎ থাকবে, ততদিন মুস্তামিনের আচরণ তার দেশের চুক্তির শর্তানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত

যে খ্রীষ্টানদের মধ্যে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে মুহম্মদের শিষ্যদের মধ্যেও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। তবে এসব যুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবীরূপে বংশগত। কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যে নির্যাতন চালান হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই কারণোদ্ভূত। মুহম্মদের বংশধর আলী ও ফাতিমার সন্তানদের প্রতি উমাইয়া বংশের যে নির্যাতন তা মুহম্মদ ও হাশেমীদের প্রতি কোরাইশদের পুরাতন বিদ্বেষজাত।—এ আমি পরে দেখাচ্ছি।

১. আক্ষরিক অর্থে—যুদ্ধের দেশ।

২. আক্ষরিক অর্থে—শান্তির দেশ।

হবে।[১] মুস্তামিনরা তাদের নিজেদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তারা কর প্রদান থেকে মুক্ত ছিল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।

আক্রমণাত্মক মনোভাব কখনও সেই বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় না যা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মসহ জাতির আইনের মধ্যে স্থান লাভ করে। মুহম্মদের শিষ্যগণ তাদের শক্তির প্রাচুর্যের মধ্যেও তাদের শত্রুদের বলতে সদা প্রস্তুত ছিল : "আমাদের সঙ্গে সব শত্রুতা বন্ধ কর এবং আমাদের মিত্র হয়ে যাও, আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব ; কিংবা আমাদেরকে কর দাও আমরা তোমাদের যাবতীয় অধিকার নিশ্চিত করব ও রক্ষা করব ; কিংবা আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর। আমরা যে সব অধিকার ভোগ করি তোমরাও তাই ভোগ করবে।"

মুহম্মদের যে প্রধান প্রধান নির্দেশের উপর মুসলমানদের যুদ্ধ-নীতির ভিত্তি স্থাপিত তা জ্ঞানবত্তা ও মানবতার নির্দেশক, তা ইসলামের জীবন ব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত করেছে। "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে আল্লাহর ধর্মের জন্য লড়াই কর ; কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করো না (প্রথমে আক্রমণ করে), কারণ আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না··· যদি তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে তবে তাদেরকে হত্যা কর। যদি তারা বিরত হয় তাহলে একমাত্র শিরক ছাড়া তাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে শত্রুতা নেই।"[২]

পারস্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা পরিস্থিতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। মুনাজির—অর্ধ-আরব রাজবংশ—যারা পারস্যের সম্রাটের ছত্রছায়ায় রাজত্ব করত, তারা রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিরোধী হলেও ধর্ম ও স্বার্থের বন্ধনে বাইজানটাইনদের মিত্র ছিল। গ্রীকদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম বিরোধ স্বাভাবিকভাবে মুনাজিরদের প্রজা, হিরা-বাসীদের উপর প্রতিক্রিয়া করেছিল। হিরাইতিদের রাজ্যসমূহ এক বিশাল অংশে বিস্তৃত ছিল—পশ্চিমে ইউফ্রেতিসের তীর থেকে, ইরাকের মরুভূমি নিয়ে ঘাসানিয়া আরবদের পশুচারণভূমি পর্যন্ত ; এই ঘাসানিয়াগণ বাইজানটাইনদের বশ্যতা স্বীকার করত।

পারসিকদের অধীনে হিরার অবস্থা অগাস্তাস বা তাইবেরিয়াসের অধীনে জুডিয়ার অবস্থার অনুরূপ। মুসলিম অভিযানের উপক্রমকালে

---

১. এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (আমান) শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের জন্য দিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত তুর্কীয় সম্পদসমূহের ধ্বংস সাধন করেছিল।

২. সূ. ২ আ. ১৮৬ তুঃ ২৬৭।

একজন মনোনীত পারসিক শাসনকর্তা এই অঞ্চল শাসন করতেন। কিন্তু খসরুর বিদ্বেষের ফলে একজন মার্জবান। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে মুন.জরদের উত্তারিকারীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, যে মার্জবানদের প্রজাগণ আজকের তাদের বংশধরদের মতোই নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল। তারা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে লুণ্ঠন কার্য চালাত এবং এইভাবে তারা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ল। একজন শাসকের অধীনে এক শক্তিশালী সরকার, হযরতের মৃত্যুর পর যাযাবরদের বিদ্রোহ দমন করে যা দ্বিগুণ সংহত ও দৃঢ়ীভূত হয়েছিল, তার পক্ষে এক ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অধীন রাজ্যের অপমান নীরবে সহ্য করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। মুসলিম বাহিনী হিরা আক্রমণ করল; 'মার্জবান', পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদাইনে পালিয়ে গেল এবং আরব প্রধান এক প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই খালিদবিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল।

হিরা অভিযান মুসলমানদেরকে খসরুর সাম্রাজ্যের দ্বার-প্রান্তে নিয়ে এল। বিদ্রোহাত্মক হত্যা ও নির্মমতা চিহ্নিত দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের যুগ পার হয়ে পারস্য ইয়েজদেজার্দের মধ্যে একজন শক্তিশালী শাসক পেয়েছিল। এই নৃপতির নির্দেশক্রমে পারস্যের সেনাপতি মুসলমানদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য এক বিপুল বাহিনী আনয়ন করল। মহান ওমর তখন মদিনার খলিফা; ইয়েজদেজার্দের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাকে কতকগুলো স্বাভাবিক শর্ত জানালেন যার মাধ্যমে যুদ্ধ এড়ান যেতে পারত। এসব শর্ত হল ইসলাম গ্রহণ যার মাধ্যমে শাসানিয়া সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক পঙ্কিলতার ফলে যে নিম্নস্তরে নেমে গেছে তার থেকে সংশোধন হওয়া; যাবতীয় করের গুরুভার ও উপরি পাওনা[1] হ্রাস যা জাতির জীবনীশক্তি শুষে নিয়েছিল; আর মুহম্মদের কানুন অনুযায়ী ন্যায়বিচার অনুষ্ঠান, যে কানুন অনুসারে সকল মানুষে পদমর্যাদা নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সমান। বিকল্প প্রস্তাব হল সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব প্রদান। পারস্য সম্রাট অবজ্ঞাভরে এ সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হল। মাদাইন বিজয়ের পর খলিফা নির্দেশ জারী করলেন যে কোন অবস্থাতেই মুসলমানেরা

---

১. জমির আয়ের এক দশমাংশ, এবং গরীবের জন্য প্রত্যেক মানুষের সম্পত্তির শতকরা আড়াই ভাগ সঞ্চিত করতে হবে যার বণ্টনের ভার নৃপতি ও তার অফিসারদের এখতিয়ারে থাকবে।

পূর্বদিকে তাইগ্রিস নদী অতিক্রম করতে পারবে না এবং এই নদী চিরতরে পারস্য সাম্রাজ্য ও আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা হিসেবে কাজ করবে। এই ভিত্তির উপর সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। ইরান মেসোপটেমিয়া হারানোর জন্য উত্তেজিত হয়েছিল এবং পারসিকদের বারংবার বিশ্বাস-ভঙ্গের জন্য নেহাবন্দের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেসরার ক্ষমতা অপূরণীয়ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল; তার অনেক পারিষদ ও পুরোহিতদের একমাত্র স্বার্থ ছিল বিশৃঙ্খলা ও জুলুমের রাজত্ব চালু রাখা—তারা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল—তিনি অপর দারিউসের মতো আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। জাতি স্বাধীনভাবে মুসলমানদেরকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বাগতম জানিয়েছিল।[১] তাইগ্রিস থেকে এলবুর্জ এবং এলবুর্জ থেকে ট্রানসোকসিয়ানা পর্যন্ত মুসলমানদের অগ্রগমন ভারতে ব্রিটিশের অগ্রগমন থেকে স্বতন্ত্র ছিল না এবং মূলীভূত কারণও একরূপ ছিল।

মুহম্মদের ধর্মে পারসিকদের সাধারণ ধর্মান্তরকরণ প্রায়শ ইসলাম ধর্মের অসহিষ্ণু চরিত্রের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ধর্মান্ধতায় এমন কি বিশেষজ্ঞরাও ভুলে যান যে পরিস্থিতির মধ্যে মুসলমানেরা ঐ দেশে প্রবেশ করছিলেন। জনগণের ভেতর থেকে ধর্মীয় জীবনের যাবতীয় নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল; জনসাধারণ উৎসন্ন পুরোহিততন্ত্র ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ অভিজাততন্ত্র নিকৃষ্ট মন্দের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েছিল। মাজদাকীয় ও ম্যানীকীয় বিরুদ্ধ মতবাদ সমাজ-সংগঠনের প্রত্যেকটি স্তম্ভকে শ্লথ করে দিয়েছিল। কেসরা আনওশিরওয়ান কিছুকালের জন্য সমাজের সর্বপ্লাবী ভাঙন রোধ করেছিলেন মাত্র।

ফল হল এই যে যখনি মুসলমানেরা আইন-শৃঙ্খলার পূর্বদূত হিসেবে সে দেশে প্রবেশ লাভ করেছে তখনি জনসাধারণ এক যোগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পারস্য ইসলামের প্রতি চির অনুরক্ত হয়েছে।[২]

---

১. দারিউসের মতো ইয়াজদেজার্দ তার নিজের লোক কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন (ম্যাকমিলান ১৯২১) দেখুন।

২. মুসলমানেরা যে মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন তার সাক্ষ্য হিসেবে গিবন থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি আমরা পেশ করছি: "পারস্যের শাসনব্যবস্থা জনশক্তি, গবাদি ও ফলসম্ভারের জরিপের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হত; এই স্মারক নির্দেশক, যা খলিফার সতর্কতার সাক্ষ্য বহন করে, প্রত্যেক যুগের দার্শনিকদের উপদেশ দান করে থাকবে।"—'ডিক্লাইন এণ্ড ফল্ অব রোমান এম্পায়ার' ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৭। আরও দেখুন সুয়ুতির 'তারিখুল খোলাফা' (খলিফাদের ইতিহাস)।

একজন নিরপেক্ষ তথ্য বিশ্লেষণকারী এখন মূয়িরের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্যে কি পরিমাণ সত্য নিহিত আছে তা নিজেই বিচার করতে সমর্থ হবেন: "ইসলামের স্থায়িত্বের জন্য তার আক্রমণাত্মক পন্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, সার্বজনীন স্বীকৃতির দাবী অন্ততঃপক্ষে সার্বজনীন প্রভুত্বের দাবী তরবারির সাহায্যে বলবৎ হয়েছিল।"[১] প্রত্যেক ধর্ম বিশেষ স্তরে তার প্রচারকদের প্রবণতার দিক দিয়ে আক্রমণাত্মক হয়েছে। ইসলামের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়েছে, তবে বলপূর্বক কোন সময় এ ধর্ম ধর্মান্তরিতকরণে অগ্রসর হয়েছে অথবা অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অধিকতর আক্রমণাত্মক হয়েছে—এ কথা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে হবে।[২]

ইসলাম আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল এবং ভবিষ্যতেও একই কারণে অস্ত্র ধারণ করবে। কিন্তু ইসলাম কোনদিনই কোন নৈতিক বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবাদের সঙ্গে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়নি; কখনও জুলুম করেনি, কখনও সরকারী তদন্ত স্থাপন করেনি। এ কখনও মতানৈক্যকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার কোন উপায় উদ্ভাবন করেনি, মানুষের বিবেককেও গলাটিপে মারবার বা বিরুদ্ধ মতবাদকে নির্মূল করবার কখনও কোন চেষ্টা পায়নি। ইতিহাসের প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে খ্রীষ্টের গির্জা যখন সর্বাপেক্ষা অভ্রান্ত হিসেবে ভাণ করেছে তখন সে "নির্দোষ মানুষের যতটা রক্তপাত করেছে জগতের কোন প্রতিষ্ঠান ততটা করেনি"; যে সব নরনারী খ্রীষ্টের গির্জা পরিত্যাগ করেছিল কিংবা যারা শুধু অন্য ধর্মমতের স্বপক্ষে তাদের অগ্রাধিকার ব্যক্ত করেছিল তাদের ভাগ্য কম নিষ্ঠুর ছিল না।[৩] ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম চার্লস আইন করে সব ধর্মত্যাগীর জীবন ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। অগ্নিদগ্ধ করা ও ফাঁসী দেওয়া, জিহ্বা তুলে ফেলে দেওয়া ও বিকৃত করা ছিল গোঁড়া খ্রীষ্ট-ধর্ম পরিত্যাগ করার স্বাভাবিক শাস্তি। ইংলণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টধর্ম গৃহীত হওয়ার পর প্রেস্‌বিটেরিয়ান পুরোহিতদেরকে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন রাজার অধীনে বন্দীদশা ভোগ করতে হত, তাদের গায়ে উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়ে দাগ দেওয়া হত, তাদের অঙ্গচ্ছেদন করা হত, তাদেরকে

১. মূয়র, 'লাইফ অব মুহম্মেট', ৩য় খণ্ড, পৃ ২৫১।

২. তুঃ নেবুরের ও ডেস্‌ক্রিপশান দ্য লা অ্যারাবিয়া'।

৩. সপ্তদশ শতকে একজন তরুণ বলেছিলেন যে তার মতে মুহম্মদ মন্দ লোক ছিলেন না, এ কথার জন্য তার ফাঁসী হয়েছিল।

কষাঘাত করা হত এবং পিলোরিতে[১] শাস্তি দেওয়া হত। স্কটল্যাণ্ডে তাদেরকে পর্বতের উপরে অপরাধীদের মতো শিকার করা হত ; মূল থেকে কান উপড়িয়ে ফেলা হত ; উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের গায়ে ছাপ দেওয়া হত ; হেচকা টানে বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে তাদের আঙ্গুলগুলো ছিঁড়ে ফেলা হত ; এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তাদের পায়ের হাড়গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হত। মেয়েলোকদেরকে প্রকাশ্যে রাস্তায় বেত্রাঘাত করা হত। ক্যাথলিকদের উপর নির্যাতন চালান হত, তাদের ফাঁসীতে ঝুলান হত। অ্যানাব্যাপটিস্ট ও অ্যারিয়ানদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। কিন্তু অ-খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট, গোঁড়া ও অ-গোঁড়া সকলেই সম্পূর্ণরূপে একমত ছিল। মুসলমান ও ইহুদীরা খ্রীষ্টান জগৎ-বহির্ভূত ছিল। ইংলণ্ডে ইহুদীদের উপর জুলুম করা হত, তাদেরকে ফাঁসী দেওয়া হত। স্পেনে মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে মারা হত। খ্রীষ্টান ও ইহুদী, খ্রীষ্টান ও "বিধর্মীদের" মধ্যে বিবাহ হলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত ; বাস্তবিক ভয়ানক ও ভীতিব্যঞ্জক শাস্তির অজুহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি এখনও খ্রীষ্টান আমেরিকায় খ্রীষ্টান শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে বিবাহ করলে নিগ্রো যুবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব এমনি হয়েছে।

অদ্যাবধি যেখানে বৈজ্ঞানিক চিন্তা নূতন আত্মিক চেতনার সঞ্চার করেনি, যেখানে প্রকৃত সংস্কৃতি দানা বাঁধতে পারেনি, সেখানে বিচ্ছিন্নতা ও অসহিষ্ণুতার মনোভাব, ইসলামের প্রতি যাজকীয় বিদ্বেষ গ্রন্থে, সংবাদ-পত্রের আক্রমণে, ব্যক্তিগত কথোপকথনে, জাতীয় বক্তৃতার মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। নির্যাতনের মনোভঙ্গী, খ্রীষ্টধর্মে কোনদিনই মরেনি ; এটা সবসময়ে সুপ্ত থেকেছে প্রথম ধর্মান্ধের স্পর্শমাত্রই জ্বলে উঠেছে।

এই ছবি থেকে এবার ইসলামী জগতের দিকে ফিরে তাকানো যাক। গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম সমান দুর্ধর্ষতার সঙ্গে ইহুদী ও নেস্তোরীয়দের উপর জুলুম করেছিল—যেসব মানুষের বংশধর খোদার অবতারকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, এবং যেসব লোক তাঁর মায়ের আরাধনা প্রত্যাখ্যান করেছিল—ইসলাম উভয় দলকেই আশ্রয় দান করেছিল। যখন খ্রীষ্টান ইউরোপ ডাইনি ও ধর্মত্যাগীদের পুড়িয়ে মারছিল এবং ইহুদী ও "বিধর্মীদের" হত্যা করছিল তখন মুসলিম নৃপতিরা তাদের অ-মুসলিম প্রজাদের সাথে বিবেচনা ও

---

১. এক প্রকার কাঠের তৈরী যন্ত্র—যাতে মাথা ও হাত প্রবেশ করানোর জন্য গর্ত থাকত।—অনুবাদক

সহনশীলতার সঙ্গে আচরণ করছিলেন। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নাগরিক সাম্রাজ্যের পরামর্শদাতা। প্রত্যেক ধর্মনিরপেক্ষ কার্যালয় মুসলমান এবং তাদের জন্য সমানভাবে খোলা ছিল। ইসলামের নবী নিজেই খ্রীষ্টান, হিব্রু কিংবা জরথুস্ত্র নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের বিবাহ বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কারণে বিপরীতক্রম অনুমোদিত হয়নি; মুসলিম তুর্কী ও পারস্য তাদের খ্রীষ্টান প্রজাদের প্রতি তাদের বৈদেশিক দায়িত্ব অর্পণ করত। খ্রীষ্টান-জগতে ধর্মের পার্থক্য অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, ইসলাম জাহানে তা হয়েছে দৈবাৎ। উর্কুহার্ট বলেন, "খ্রীষ্টানদের কাছে ধর্মের পার্থক্য যথার্থই যুদ্ধের ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়েছিল এবং তা শুধু দুঃসময়ে ও ধর্মান্ধদের মধ্যেই নয়।" ধর্মের নামে শার্লাম্যাঙ্গ কর্তৃক স্যাকসন, ফ্রিজীয় ও অন্যান্য জার্মানীয় গোত্রসমূহের লোকনিধন। হাজার হাজার নির্দোষ নারী-পুরুষকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা, এরিয়ান, পলিসিয়নি আলবিজিনিশ ও হুগনটদের বীভৎস হত্যাকাণ্ড, মাজাদিবার্গ ও রোম-লুণ্ঠনের ভীতি, তিরিশ বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে শুরু করে ক্যালভিনিষ্টদের স্কটল্যাণ্ড ও লুথারিয়ান ইংলণ্ড অবধি অসহিষ্ণুতা ও ধর্মান্ধতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। যিশুর নামে আমেরিকার নির্দোষ বংশসমূহের সর্বাত্মক নির্মূলকরণের চেয়ে অধিকতর হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কিছু হতে পারে কি?

বলা হয়েছে যে, আক্রমণাত্মক ইসলামই মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব অনুপ্রবিষ্ট করেছে। ধর্মের নামে জাষ্টিনিয়ানের হত্যাকাণ্ড এবং খ্রীষ্টান ক্লোভিসের বিভীষিকাপূর্ণ যুদ্ধসমূহ মুহম্মদের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল।

পুনরায় খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধা ও মুসলমান ধর্মযোদ্ধাদের আচরণের তুলনা করুন। যখন খলিফা ওমর ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেম জয় করেন, তখন তিনি প্যাট্রিয়ার্ক সোফরোনিয়াসের সঙ্গে একই গাড়িতে পাশাপাশি বসে শহরের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিলেন। নামাজের সময় যখন উপস্থিত হল তখন ঘটনাক্রমে তিনি রিসারেকশান গির্জায় ছিলেন, কিন্তু সেখানে নামাজ আদায় করতে অসম্মতি জানান এবং কনস্ট্যানটাইনের গির্জার সিঁড়ির উপরে নামাজ সমাধান করেন। আর এ বিষয়ে তিনি প্যাট্রিয়ার্ককে বলেছিলেন, "যদি আমি ওখানে নামাজ পড়তাম তবে পরবর্তীকালে মুসলমানেরা আমার দৃষ্টান্তের অনুকরণের আভায় সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করতে পারত।' কিন্তু খ্রীষ্টান

ক্রুসেডারদের অবরোধকালে ছোট ছোট ছেলেদের মস্তক দেওয়ালের সঙ্গে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হত; শিশুদেরকে অট্টালিকার ফোকরের উপর নিক্ষেপ করা হত; মানুষকে আগুনে ঝলসানো হত; কোন কোন লোকের পেট চিরে দেখা হত তারা সোনা গিলতে পেরেছে কিনা; ইহুদীদেরকে তাদের ধর্মমন্দিরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হত। প্রায় ৭০,০০০ হাজার লোককে এভাবে হত্যা করা হয়েছিল এবং পোপের প্রতিনিধিকে এই বিজয়োৎসবে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল।"[১] যখন সালাদীন এই শহর পুনর্দখল করেছিলেন, তখন তিনি খ্রীষ্টানদের সকলকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে টাকা পয়সা ও আহার্য দিয়েছিলেন এবং নিরাপদে প্রস্থান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[২]

ইসলাম আত্মারক্ষার তাগিদে অস্ত্রধারণ করেছিল; খ্রীষ্টধর্ম চিন্তার স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার টুঁটি টিপে মারার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল। কনস্ট্যানটাইনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে এই ধর্ম পাশ্চাত্য জগতের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তখন থেকে এই ধর্মের পক্ষে শত্রুদের থেকে ভয় পাওয়ার কিছুই ছিল না। যে মুহূর্ত থেকে এই ধর্ম প্রভুত্ব অর্জন করল সেই মুহূর্ত থেকেই এই ধর্মের প্রকৃত বিছিন্নতাবাদী চরিত্র বিকশিত হল। যেখানে খ্রীষ্টধর্ম জয়ী হয়েছে সেখানে অন্য কোন ধর্ম নির্যাতন ব্যতিরেকে অনুসৃত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে, মুসলমানেরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে চেয়েছে শান্তি ও সৌহার্দ্যের অকপট নিশ্চয়তা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামান্য কর, আর পরিপূর্ণ সমতা—সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য ইসলাম গ্রহণ।

---

১. ড্রেপার, 'হিস্ট্রী অব্ দি ইনটেলেকচুয়াল ডেভালোপমেণ্ট অব্ ইউরোপ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২২।

২. পূর্ণ বিবরণের জন্য 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসিনস' পৃ. ৩৫৬, দেখুন।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামে নারীর মর্যাদা

"মায়ের পদতলে বিহেশত।" —আল্ হাদিস।

সামাজিক বিবর্তনের বিশেষ স্তরসমূহে বহু বিবাহ, অধিকতর যথার্থ-ভাবে বললে, কতিপয় নারীর সঙ্গে একটি পুরুষের মিলন ছিল এক অনিবার্য অবস্থা। প্রায়ই সংঘটিত গোত্রীয় যুদ্ধ ও তার ফলস্বরূপ পুরুষ জনশক্তির বহুল হ্রাস, নারী-জনসংখ্যার পরিমাণগত প্রবৃদ্ধি, এতদসঙ্গে দলপতির সার্বভৌম ক্ষমতা এমন প্রথার জন্ম দিয়েছিল যা আমাদের প্রগতিশীল যুগে সঠিকভাবেই একটি অসহনীয় অনিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রাচীনকালে সকল প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে বহু বিবাহ একটি স্বীকৃত বিধি। রাজকীয় লোকদের দ্বারা এই বিধির অনুশীলন সর্বত্র ঐশী মর্যাদায় অভিষিক্ত হত এবং জনগণের কাছে তার -.নুসরণ পূতপবিত্র বলে পরিগণিত হত। হিন্দুদের মধ্যে বহু বিবাহ উভয় দিক থেকে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিডীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয় ও পারসিকদের মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে একজন পুরুষ কয়জন নারীকে বিবাহ করতে পারবে সে বিষয়ে কোন বাধা-বন্ধকতা ছিল না। এমন কি আধুনিক যুগেও একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যে কয়টি স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় তার অধিকার তার রয়েছে। মুসার আবির্ভাবের পূর্বে ইসরাইলীদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, তারা একজন হিব্রু স্বামী কয়টি স্ত্রীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে সে বিষয়ে কোন সীমা-নির্ধারণ না করেই এই প্রথা অনুসরণ করত। পরবর্তীকালে জেরুজালেমের তালমুদগণ স্বামীর পক্ষে যথাযথভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণের শক্তির উপর স্ত্রী-গ্রহণের সংখ্যা নির্ধারিত করেছিল। যদিও ইহুদি পুরোহিতরা উপদেশ দিতেন যে চারিটির অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে না, তবু কেরাত্তিগণ তাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং তারা সীমা-নির্ধারণের বৈধতা স্বীকার করতেন না। ধর্ম পারসিকদেরকে বহু বিবাহের জন্য উৎসাহিত করত।[১]

সিরীয়-ফিনিসীয় জাতিসমূহের মধ্যে, যাদেরকে ইসরাইলরা

---

১. ডলিঞ্জার 'দি জেণ্টাইল এণ্ড দি জিউ', পৃ. ৪০৫, ৪০৬।

দেশান্তরিত, পর্যুদস্ত বা ধ্বংস করেছিল, বহু বিবাহ পশুত্বে পরিণত হয়েছিল।[১]

থ্রেসীয়, লিডীয় ও পেলাসগীয় জাতিসমূহ যারা ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা অত্যন্ত অতিরিক্ত মাত্রায় চালু ছিল এবং অন্যান্য স্থানের অনুশীলনকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল।[২]

প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সভ্য ও সংস্কৃতিমনা এথেন্সবাসী-দের ভেতর স্ত্রী পণ্যবিশেষ, যা অন্যের কাছে বিক্রয়যোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য এবং উইলযোগ্য। নারীকে অনিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হত; তবে গৃহের পারিপাট্য ও সন্তান উৎপাদনের জন্য নারী ছিল অপরিহার্য। একজন এথেন্সবাসী যে কোন সংখ্যক স্ত্রী রাখতে পারত। ডেমোসথিনিস তার জনগণের তিন শ্রেণীর স্ত্রীর বিদ্যমানতায় গৌরব বোধ করত, যাদের মধ্যে দু' শ্রেণীর হল আইনগত এবং অর্ধ-আইনগত স্ত্রী।[৩]

স্পার্টার অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষরা বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত একাধিক স্ত্রী রাখতে যদিও অনুমতি প্রাপ্ত হত না; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি পেত, প্রায় সর্বদাই পেত।[৪]

যে বিশেষ অবস্থাসমূহের ভেতর দিয়ে রোমান রাষ্ট্র মূলতঃ কায়েম হয়েছিল সে কারণেই সম্ভবতঃ এই রাষ্ট্রের সূচনাকালে আইনসঙ্গতভাবে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত হতে পারেনি। সেবাইনদের লাম্পট্যের ঐতিহাসিক সত্যতা যাই হোক না কেন, এই ঐতিহ্যের অস্তিত্বই সেসব কারণের সত্যতা প্রতিপন্ন করে যা রোমানদের আদিম আইন প্রণয়নে সাহায্য করেছিল। সাধারণভাবে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে এবং বিশেষভাবে এট্রাসক্যানদের মধ্যে বহু বিবাহ একটি বিশেষ অধিকারমূলক প্রথা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতালীর বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে বহু যুদ্ধবিগ্রহ ও অভিযান এবং তার সাফল্যের পরিণতি হিসেবে বিলাস-পূর্ণ অভ্যাস রোমানদের মধ্যে বৈবাহিক পবিত্রতাকে একটি কুখ্যাত বস্তুতে পরিণত করেছিল। বাস্তবিক বহু বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়নি কিন্তু

১. লেভি. ১৮, ২৪।
২. 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সিলি', প্রবন্ধ "ম্যারেজ", ডলিঞ্জার, 'দি জেণ্টাইল এণ্ড দি জিউ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩।
৩. ডলিঞ্জার, 'দি জেণ্টাইল এণ্ড জিউ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩—২৩৮।
৪. গ্রোটে, 'হিস্ট্রী অব গ্রীস' ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৬।

"কার্থেজ-বিজয়ের পর রোমের তত্ত্বাবধায়কগণ একটা স্বাধীন ও ঐশ্বর্য-শালী প্রজাতন্ত্রের সাধারণ সুযোগ-সুবিধাসমূহ প্রত্যাশা করত, আর তাদের কামনা বাসনা পিতা ও প্রেমিকদের আবদারের মাধ্যমে চরিতার্থ হত।"[১] বিবাহ সত্বর বিশৃঙ্খল উপপত্নী সংরক্ষণের অজটিল ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্র অনুমোদিত উপপত্নী সংরক্ষণ প্রথা স্বীকৃত অনুষ্ঠানের শক্তি অর্জন করেছিল। নারী স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের মধ্যকার শ্লথ বন্ধন, বারংবার স্ত্রী পরিবর্তন বা হস্তান্তর প্রকৃতপক্ষে অন্য নামে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলনকে সূচিত করে।

ইতিমধ্যে গ্যালিলির তীরে প্রচারিত আদি খ্রীষ্টধর্মের মতবাদসমূহ সমগ্র রোমান জগতে বিস্তৃরিত হতে শুরু করেছিল 'এসেনিসে'র প্রভাব যিশুর শিক্ষার মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক ইচ্ছা যুক্ত হয়ে তা নাজারাতের প্রেরিত পুরুষকে সাধারণভাবে বিবাহপ্রথা নিরুৎসাহিত করতে চালিত করেছিল, যদিও তিনি কোনভাবে কখনও বিবাহের অনুশীলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি।

জাষ্টিনিয়ানের আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহুবিবাহ প্রথা কম বেশী সুস্পষ্টভাবেই জমজমাট ছিল। কিন্তু দেওয়ানী আইনের মধ্যে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা জনগণের নৈতিক ধারণার মধ্যে কোন রূপান্তর ঘটাতে পারেনি এবং আধুনিক সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হওয়া পর্যন্ত বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথম বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্যান্যরা মারাত্মক আইনগত অযোগ্যতার অধীনে ভুগত। অধিকার ব্যতিরেকে, প্রথম স্ত্রীকে আইন যে রক্ষাকবচ দান করত তা ছাড়া, তারা তাদের স্বামীদের খেয়ালখুশির দাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের সন্তান-সন্ততি জারজ হিসেবে অভিহিত হত, তাদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত এবং সমাজচ্যুত হিসেবে পরিগণিত হত।

অসম পদমর্যাদাসম্পন্ন ও নেঙা বিবাহ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত ছিল না। যাজক সম্প্রদায় ও তাদের চিরকৌমার্য পালনের অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়ে একাধিক বৈধ বা অবৈধ মিলনে লিপ্ত হত। ইতিহাস চূড়ান্তভাবে প্রমাণ দেয় যে সম্প্রতিকালের পূর্বে বহু বিবাহ প্রথা বর্তমান কালের মতো নিন্দনীয় ছিল না। সেন্ট অগাস্টাইন[২] স্বয়ং এর মধ্যে

১. গিবন, 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান এমপায়ার', ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৬।
২. সেণ্ট অগাস্টাইন, লিব, ২ কণ্ট 'ফাউস্ট' অধ্যায় ৪৭।

যথার্থ অনৈতিকতা বা পাপ দেখতে পাননি বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, যে দেশে বহুবিবাহ একটি আইনানুমোদিত অনুষ্ঠান সেখানে এ কোন অপরাধ নয়। হাল্লাম বলেছেন যে জার্মান সংস্কারকগণ সেদিন ষোড়শ শতাব্দীতেও সন্তান না হওয়া ও অনুরূপ অন্যান্য কারণে প্রথমা স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহের বৈধতা স্বীকার করেছিলেন।

বহু বিবাহের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত অনৈতিকতা নেই এবং যিশু সম্পূর্ণরূপে বা স্পষ্টভাবে প্রথাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি—কোন কোন পণ্ডিত একথা স্বীকার করে বলেন যে এক অর্থে বর্তমান একবিবাহ প্রথা সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে খ্রীষ্টধর্মের উপর হয় জার্মানিক নয় হেলেনিক—রোমান ধারণার প্রভাবজাত।[১] পরবর্তী মতবাদ বাস্তবতা ও ইতিহাসের বিরোধী এবং তা প্রশংসার যোগ্য নয়। জার্মানদের সম্পর্কে তাদের এক বিবাহ বিষয়ক অভ্যাস ও প্রথা এক বা দুই জন রোমানদের অসমর্থিত সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে বিশ্বাসহীন সাক্ষী যারা তাদের নিজেদের স্বার্থে তথ্য চাপা দিত। এতদ্ব্যতীত আমরা অবশ্যই স্মরণ রাখব যে উদ্দেশ্যে ট্যাসিটাস তাঁর 'ম্যানারস অব দি জার্মানস' (জার্মানদের আচরণ) লিখেছিলেন। নিজ জাতির লোকদের স্বেচ্ছাচারিতার উপর এটা ছিল তার স্পষ্ট আক্রমণ, রোমানদের শৈথিল্যের সঙ্গে বর্বরদের কাল্পনিক গুণাবলীর বৈসাদৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল রোমে উত্তম ধারণার জন্ম দান করা। আবার যদি আমরা অনুমান করি যে ট্যাসিটাস সঠিক, তবে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত জার্মানদের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে বহু বিবাহের অভ্যাসের দরুন কি কারন নির্দেশ করতে পারি?[২]

আদিতে রোমানদের মধ্যে যে প্রথাই বিদ্যমান থাক না কেন এটা সুস্পষ্ট যে প্রজাতন্ত্রের পরবর্তী সময়ে ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আরম্ভকালে বহু বিবাহ প্রথা অবশ্যই একটি প্রথা হিসেবে স্বীকৃত হয় অথবা অন্ততঃপক্ষে অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। রাজাজ্ঞা দ্বারা এর অস্তিত্ব অনুমিত, এর অনুশীলন স্বীকৃত, ফলে এর সার্বজনীনতার সঙ্গে এর বিরোধ বেধেছিল। প্রিটোরিয়ান রাজাজ্ঞা অনিষ্টের প্রতিকারে কিংবা জনমতের প্রবাহ পরিবর্তনে কতদূর সফল হয়েছিল তা চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট

---

১. এম. বার্থেলিমি সেণ্ট হিলেয়ার এরূপ মত পোষণ করেন যে এক-বিবাহ প্রথা হেলেনীয় ও রোমান উৎস থেকে খ্রীষ্টধর্মের উপর আগত।

২. তুঃ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সিলি' 'ম্যারেজ' (বিবাহ) অধ্যায়।

হনোরিয়াস ও আর্কেডিয়াসের অনুশাসন থেকে এবং কনস্ট্যানটাইন ও তাঁর পুত্র যাদের বহু স্ত্রী ছিল তাঁদের অনুশীলন থেকে প্রতীয়মান হয়। সম্রাট দ্বিতীয় ভ্যালেন্টিনিয়ান নির্দেশ দিলেন যে, ইচ্ছা করলে তাঁর সাম্রাজ্যের সব প্রজা বহু স্ত্রী বিবাহ করতে পারে; সে যুগের যাজকতন্ত্রের ইতিহাস থেকে এটা প্রতীয়মান হয় না যে বিশপ ও খ্রীষ্টীয়ান গির্জার প্রধানেরা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি জানিয়ে ছিলেন।[১] এছাড়াও পরবর্তী সকল সম্রাট বহুবিবাহ প্রথার অনুশীলন করেছিলেন এবং জনগণ তাঁদের অনুসরণ করার ব্যাপারে উদ্যমহীন ছিল না।

আইনের এই অবস্থা জাষ্টিনিয়ানের শাসনকালের পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। তখন জীবনধারণের শৈল্পিক অগ্রগতি ও বিবর্তনের তের শত বৎসরের নিবিষ্ট প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা এমন আইনসমূহের ঘোষণায় পর্যবসিত হয়েছিল যা তাঁর খ্যাতিহীন রাজত্বের উপর কৃত্রিম আলোকপাত করেছিল। কিন্তু অন্ততঃ সরাসরিভাবে এই আইনসমূহের খ্রীষ্টধর্মের কাছে কোন ঋণ ছিল না। জাষ্টিনিয়ানের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ছিলেন একজন নিরীশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক। এমন কি জাষ্টিনিয়ানের জারিকৃত বহু বিবাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞা যুগ-প্রবণতা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়নি। আইনটি চিন্তার অগ্রগতি নির্দেশ করেছিল; কতিপয় চিন্তাবিদের কাছে এর প্রভাব সীমিত ছিল; জনগণের নিকট এ ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্লক্ষ্য পত্র।

ইউরোপের পশ্চিমাংশে বর্বরদের বিরাট অভ্যুত্থান এবং যেসব লোকের মধ্যে তারা বসতি স্থাপন করেছিল তাদের সঙ্গে নৈতিক ধারণা-সমূহের সংমিশ্রণ নর ও নারীর সম্পর্ক নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছিল। বর্বরদের কিছু কিছু আইন বহু বিবাহের প্রতিকারের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছিল।[২] কিন্তু নীতির চেয়ে দৃষ্টান্ত উত্তম। নৃপতিগণ বহু বিবাহ প্রথার যে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন তা সত্বর জনগণ অনুকরণ করেছিল।[৩] এমন কি যাজক সম্প্রদায় গির্জা কর্তৃক চিরকৌমার্যের অনুমোদন সত্বেও বিশপ কিংবা তাদের

১. তুঃ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সিলি' 'ম্যারেজ' অধ্যায় এবং 'ডেভেনপোর্ট', অ্যাপোলজী ফর মহমেট'।
২. থিয়োডোরিকদের আইনের মতো। কিন্তু সে আইন বাইজান্টাইনদের প্রগতি-শীল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।
৩. মারোভিনজিয়ান ও কার্লোভিনজিয়ান নৃপতিদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রসঙ্গে 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্‌স' পৃ. ৬২৬ দেখুন।

জেলা-প্রধানের সরল অনুমতি নিয়ে বহু সংখ্যক নেঙা স্ত্রী রাখার প্রথার সুযোগ গ্রহণ করত।[১]

খ্রীষ্টান লেখকগণ সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে নিন্দনীয় যে ভুলভ্রান্তি করেছেন তা হল এই যে তারা অনুমান করেন যে মুহম্মদ হয় বহু বিবাহ প্রথা গ্রহণ করেছেন নয় তা বৈধ করেছেন। তিনি একে পরিচিত করেছেন —এই পুরাতন ধারণা যেসব লোক পোষণ করেছিল তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং এ ব্যাপারটি এতদিনে বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি এই প্রথা গ্রহণ করেছিলেন ও বৈধ করেছিলেন—এই অভিমত সাধারণ লোকে ও খ্রীষ্টান-জাহানের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি এখনও পোষণ করে থাকে। এর চেয়ে অধিকতর কোন মিথ্যা বিশ্বাসই হতে পারে না।

মুহম্মদ শুধু তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেই নয় প্রতিবেশী দেশসমূহের লোকদের মধ্যেও বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে দেখতে পেয়েছিলেন, যেখানে এই প্রথার সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত দিকের কতিপয় নজির ফুটে উঠেছিল, খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের বিধিসমূহ বাস্তবিক এই অমঙ্গলসূচক অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয়নি। বহু বিবাহ প্রথা অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল এবং হতভাগ্য নারীরা, প্রথমা স্ত্রী যে সময়ের অগ্রাধিকার অনুসারে মনোনীত সে ছাড়া, সকলেই মারাত্মক আইনগত অযোগ্যতার অধীনে দুর্দশা ভোগ করেছিল।

মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদের সময়ে পারস্যে নৈতিক অধঃপতন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। বিবাহ সম্পর্কে কোন স্বীকৃত বিধি ছিল না অথবা কোন বিধি থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হত। কোন পুরুষ কয়জন স্ত্রী রাখতে পারবে জেন্দ-আবিস্তায় কোন নির্দিষ্ট বিধি না থাকায় পারসিকগণ অনেকগুলি উপপত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও বহুসংখ্যক নিয়মিত বিবাহিত স্ত্রী রাখত।[২]

প্রাচীন আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছাড়া শর্ত-সাপেক্ষ ও অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। নৈতিকতার এসব শ্লথ ধারণা-সমূহ উপদ্বীপের সমাজব্যবস্থার উপর নিদারুণ ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

---

১. তুঃ হাল্লামের 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রী অব ইংলণ্ড, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭ এবং টীকা 'মধ্যযুগ' পৃ ৩৫৩।

২. ডলিঞ্জার, 'দি জেণ্টাইল এণ্ড দি জিউ' ১ম খণ্ড, পৃ ৪০৬।

মুহম্মদ যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা নারীজাতির মর্যাদার ক্ষেত্রে বিপুল ও বিশিষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছিল। ইহুদী ও অ-যাযাবর আরবদের মধ্যে নারীর অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। হিব্রু কুমারীগণ তাদের পিতৃগৃহেও ভৃত্যের অধিকতর মর্যাদা পেত না; নাবালিকা অবস্থায় তাদের পিতা তাদেরকে বিক্রি করতে পারত। পিতার মৃত্যু ঘটলে পুত্রসন্তানেরা তাদের ইচ্ছানুসারে কন্যাদেরকে হস্তান্তর করতে পারত। কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না; তবে কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলেই তার উপর উত্তরাধিকার বর্তাত।[১] স্থায়ী বাসিন্দা পৌত্তলিক আরবগণ প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের পঙ্কিল দূষিত সভ্যতার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে নারী শুধু অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত; সে তার স্বামী কিংবা পিতার সম্পত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল এবং কোন ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকারসূত্রে তার পুত্রসন্তানদের নিকট হস্তান্তরিত হত। সুতরাং বৈমাত্রেয় পুত্রের সঙ্গে বিমাতার প্রায়শঃ মিলন ঘটত, যা পরবর্তীকালে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এটা 'নিকাহ্ উল মেক্ত' (লজ্জাজনক বা ঘৃণিত বিবাহ) বলে চিহ্নিত হত। ইয়েমেনের অর্ধ-ইহুদী, অর্ধ-সেবীয় গোত্রসমূহের মধ্যে স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।[২]

প্রাক্-ইসলামী যুগে নারীজাতির প্রতি আরবদের বিতৃষ্ণা ছিল। তারা কন্যা সন্তানদের অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত। এই ভয়াবহ প্রথাটি কোরাইশ ও কিন্দাহ গোত্রের লোকদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল। মুহম্মদ অনলবর্ষী ভাষায় এই প্রথার বর্জন করেন এবং প্রাচীন যুগের অন্যান্য জাতির মতো তাদের দেবতাদের কাছে সন্তান বলিদানের প্রথাকে কঠিন-ভাবে নিষিদ্ধ করেন। এই অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

পারস্য ও বাইজান্টাইন উভয় সাম্রাজ্যে নারীজাতি অত্যন্ত নীচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। যে ধর্মান্ধ অত্যোৎসাহী ব্যক্তিরা, পরবর্তীকালে খ্রীষ্টান জগতে সেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন তারা নারীদের বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। নিজেদের অপরাধসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা একথা বিস্মৃত হয়েছেন যে নারীজাতির মধ্যে তারা যে অনিষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন

১. নাম. ৩, ১৭।
২. লেনরম্যান্ট, এনসিয়েন্ট হিস্ট্রী অব দি ইষ্ট, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮

তা তাদের নিজেদের পক্ষপাতদুষ্ট মনেরই প্রতিফলন, এ এমন একটা সময়ের কথা যখন সর্বত্র সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ছিল, যখন এতদিন ধরে যা কিছু সমাজ কাঠামোকে ধরে রাখছিল তা পরিবর্তিত হচ্ছিল, যখন আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল যে অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে পূর্বতন ব্যবস্থা ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে এবং তা অচল। এমন সময় হযরত মুহম্মদ তাঁর সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের নবী তাঁর ধর্মের অন্যতম অপরিহার্য শিক্ষা হিসেবে বলবৎ করেছিলেন "নারীর প্রতি সম্মান"। আর তাঁর শিষ্যবৃন্দ তদীয় বিখ্যাত কন্যার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তাঁর জাতির প্রতিনিধি-রূপে আহ্বান করতেন "খাতুনে জান্নাত" বলে। "ফাতিমাতুজ্ জোহরা"[১] নারীজাতির মধ্যে যা কিছু ঐশী তারই রূপায়ণ, যা বিশুদ্ধ, যা সত্য এবং যা পবিত্র তারই প্রমূর্ত রূপ—মনুষ্য-ধারণার মহত্তম ধারণা। বহু নারী তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে তাদের গুণাবলীর উৎকর্ষের মাধ্যমে তাদের নারীত্বের পবিত্রতা সাধন করেছেন। কে তাপসী রাবেয়া ও তাঁর সমমর্যাদার হাজার হাজার মুসলিম নারীর কথা শোনেনি?

আরবের নবী যে বিধি-বিধান ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে তিনি শর্ত সাপেক্ষ বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন; অস্থায়ী বিবাহ যা প্রথমে মৌন সম্মতি লাভ করেছিল তৃতীয় হিজরীতে এমন কি তাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।[২] মুহম্মদ তাঁর জীবনব্যবস্থায় নারীদেরকে এমন সব অধিকার প্রদান করেছিলেন যা তারা এর পূর্বে কোনদিন পায়নি; তিনি তাদেরকে এমন সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন যা কালের অগ্রগতির সঙ্গে অধিকতর পরিপূর্ণতার সঙ্গে মূল্যায়িত হবে। সমুদয় আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও ভূমিকা পালনে তিনি নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

১. 'খাতুনে জান্নাত'—স্বর্গের সম্ভ্রান্ত মহিলা, 'ফাতিমাতুজ্ জোহরা'—আলোর মহিলা।

২. শিয়া মুসলিমদের একটি অংশ অস্থায়ী বিবাহকে আইনসঙ্গত মনে করেন। যে-সব মুজতাহিদ এই মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন তাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা পোষণ করেও আমি একথা বিবেচনা করতে পারি না যে কালোত্তীর্ণ করে এ ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে কিংবা যে নৃপতিদের অধীনে এসব আইনজীবী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তাঁদের উপযোগী হয়েছে। এসব আইনজীবীদের প্রণীত অনেক মতবাদের মধ্যে যে তাদের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে তা প্রত্যাক্ষ করতে কেউ ব্যর্থ হবে না।

করেছেন। তিনি একই সঙ্গে সর্বোচ্চ সংখ্যার সীমা নিরূপণ ক'রে এবং সকলের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ আচরণ অপরিহার্য ক'রে বহুবিবাহ-প্রথার মধ্যে সংযম আনয়ন করেছেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে কোরআনের মধ্যে যে অনুচ্ছেদে একই সময়ে সর্বোচ্চ চারটি বিবাহের অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে তার অব্যবহিত পরে এমন একটি আয়াত এসেছে যা পূর্ববর্তী আয়াতের তাৎপর্যকে তার স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত সীমায় এনে দিয়েছে। "তোমরা ছুটো, তিনটা কিংবা চারটা বিবাহ করতে পার, কিন্তু তার অধিক নয়।" এর পরবর্তী আয়াত ঘোষণা করে "কিন্তু তোমরা যদি তাদের সকলের সঙ্গে সমভাবে ও ন্যায়পরায়নতার সাথে আচরণ করতে না পার, তবে তোমরা একটি-মাত্র বিবাহ করবে।" কোরআনের শিক্ষায় 'আদল' (ন্যায়বিচার) শব্দটিতে যে অর্থ আরোপিত হয়েছে তার অর্থবাহী এই অনুবিধির আত্যন্তিক গুরুত্ব মুসলিম জাহানের মহান চিন্তাবিদেরা বিস্মৃত হননি। 'আদল' শুধু আহার, বাসস্থান বস্ত্র ও অন্যান্য পারিবারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সমান আচরণ বুঝায় না, পরন্তু প্রেম-প্রীতি ও সমীহের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ সমান আচরণ বুঝায়। যেহেতু অনুভূতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা অসম্ভব। কাজেই কোরআনিক ব্যবস্থা যথার্থই নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল। হিজরী তৃতীয় শতকে সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছিল।[১] আল্‌ মামুনের রাজত্বকালে প্রথম মুতাজিলা পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে বিকাশপ্রাপ্ত কোরআনিক আইনাবলী এক বিবাহের অনুশীলনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। যদিও উন্মাদ ধর্মান্ধ মোতাওয়াক্কিল তাদের শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করেছিল তথাপি সর্বত্র, সব অগ্রগামী মুসলিম সমাজে এই বিশ্বাস জোরদার হয়ে উঠছিল যে বহু বিবাহ প্রথা যেমন মুহম্মদের শিক্ষার বিরোধী তেমনি তা সভ্য সমাজ ও যথার্থ কৃষ্টির সাধারণ অগ্রগতির বিরোধী।

এই তথ্য অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে পরিস্থিতির উপর বহুবিবাহ প্রথা নির্ভরশীল। বিশেষ কালে, সমাজের বিশেষ পরিস্থিতিতে

---

১. 'দি রাদ্দ-উল্‌ মুহতার' সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, "কোন কোন বিশেষজ্ঞ (মুতাজিলা) অভিমত পোষণ করেন যে 'আদল' প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে সাম্য বুঝায়, কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁরা নাফ্‌কাহ্‌র ক্ষেত্রেই সমান আচরণকে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা আইনের ভাষায় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের কথা বুঝায়।"

বহু বিবাহ প্রথার অনুশীলন সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল—অনাহার বা নিতান্ত নিঃস্বতা থেকে নারীজাতির সংরক্ষণ করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। যদি বিবরণী ও পরিসংখ্যান সত্য হয় তবে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বিরাজমান নীতিহীনতার বিরাট অংশ পরিপূর্ণ দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত হয়। আবিব হুক ও লেডী ডাফ গর্ডন উভয়েই মন্তব্য করেছেন যে সাধারণভাবে পরিস্থিতির চাপেই প্রাচ্যে জনগণ বহুবিবাহ প্রথা অনুশীলনে বাধ্য হয়।

চিন্তার অগ্রগতি, জগতের চিরপরিবর্তনশীল অবস্থার ফলে বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্হিত হয়। বহু বিবাহের অনুশীলন হয় ভেতরে ভেতরে প্রত্যাখ্যাত হয়, নয় তো স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কাজেই মুসলিম দেশসমূহে যেখানে প্রথমে বহুবিবাহ প্রথার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সেখানে তা অন্তর্হিত হচ্ছে, বহু স্ত্রী সংরক্ষণের রীতি অনিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়েছে, এবং একটি প্রথা হিসেবে হযরতের শিক্ষার পরিপন্থীরূপে দেখা দিয়েছে। আর যেসব দেশে সামাজিক অবস্থা স্বতন্ত্র, উন্নত সমাজের মতো নারী জাতির নিজেদের সাহায্যে যেখানে নিজেরা করতে অক্ষম সেখানে বহু বিবাহ প্রথা অবশ্যই চালু থাকতে বাধ্য। সম্ভবত এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, যেহেতু সংগঠনের স্বাধীনতা কূটতার্কিক পার্থক্যের অবকাশ প্রদান করে, কাজেই বহু বিবাহ প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এক অসম্ভব ব্যাপার। এই আপত্তির জোর আছে। একথা আমরা স্বীকার করি। যেসব মুসলিম ইসলামী শিক্ষা থেকে এর প্রতি আরোপিত দোষ স্খালন করতে ও অগ্রসরমান সভ্যতার সঙ্গে পা ফেলে চলতে ইচ্ছুক এ আপত্তি তাদের গভীর বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে আইনের স্থিতিস্থাপকতা এর উদারতা ও উপকারিতার মাপকাঠি। কোরআনের আইনের উৎকর্ষ এটাই। এ সবচেয়ে কৃষ্টিবান সমাজ ও সবচেয়ে স্বল্প সভ্য সমাজের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। এ প্রগতিশীল মানবসমাজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে না, আর একথাও বিস্মৃত হয় না যে পৃথিবীর বুকে এমন জাতি ও সম্প্রদায় রয়েছে যাদের মধ্যে এক-বিবাহ একটা সাংঘাতিক অনিষ্ট বলে প্রমাণিত হতে পারে। যা' হোক, বহু বিবাহের বিলোপ যতটা কঠিন কাজ বলে কল্পিত হয় ততটা কঠিন নয়। মুসলিম সমাজের উপর যে অনিষ্টকর প্রভাব পড়েছে তা সেই যাজকীয় মতবাদের জন্য যা ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত রায়ের অনুশীলনকে নিষিদ্ধ করেছে। সেদিন সুদূর নয় যেদিন মহানবীর বাণীর

প্রতি আবেদন মীমাংসা করে দেবে যে মুসলমান সমাজ মুহম্মদ (দঃ)-কে অনুসরণ করবে না সেই সব যাজকদেরকে অনুসরণ করবে ; যারা নিজেদের খামখেয়ালী চরিতার্থ করার জন্য কিংবা খলিফা ও সুলতান যারা তাঁর অনুগত সেবক তাদের, স্বেচ্ছাচারমূলক নির্দেশ পালন করার জন্য শিক্ষা-গুরুর নামের অপব্যবহার করেছে ইউরোপ সেই একই প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়েছে। মুহম্মদের ধর্মের প্রতি যাজকীয় অভিসম্পাত উচ্চারিত না করে ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত ইসলাম কিভাবে যাজকতান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে তা লক্ষ্য করা ইউরোপের উচিত ছিল। একবার যখন পুরাতন ধারণার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ ঘটে তখন প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের আইনবিজ্ঞানীদের পক্ষে সে দেশের মধ্যে প্রামাণ্য নীতির বলে বহুবিবাহ প্রথা নিরসন করা সহজ হয়। কিন্তু এরূপ পরিণত অবস্থার ধারণা সম্পর্কে সাধারণ প্রগতি এবং হযরতের শিক্ষার সম্যক উপলব্ধি থেকেই শুধু আসতে পারে। বহুবিবাহ প্রথা অন্তর্হিত হচ্ছে কিংবা শীঘ্রই অন্তর্হিত হবে নতুন আলোকে যার প্রেক্ষাপটে তাঁর বাণী অধীত হচ্ছে।

পূর্বেই মন্তব্য করা হয়েছে যে প্রত্যেক স্তরেই মুহম্মদের জীবন-ব্যবস্থার সংগতি ধর্মপ্রবর্তকের জ্ঞানবত্তার পরিচয় বহন করে। অনুন্নত সমাজে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে হযরত কর্তৃক আরোপিত রক্ষাকবচ কোনক্রমেই অনিষ্ট হিসেবে নিন্দিত হওয়ার নয়। অন্ততঃপক্ষে এ নারীর বহু বিবাহের প্রথা, অভ্যাস ও জীবন প্রণালীর চেয়ে অধিকতর বাঞ্ছিত। এই প্রথা যাবতীয় নৈতিক সংযমের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের নজীর। কৃষ্টির যতই অগ্র-গতি হচ্ছে বহুবিবাহ প্রথা থেকে উদ্ভূত কুফল ততই উপলব্ধ হচ্ছে এবং এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা ততই বোধগম্য হচ্ছে। আমরা একথা বলতে মোটেই প্রস্তুত নই যে ভারতে মুসলমানেরা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বড় একটা উপকৃত হয়েছে, যাদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি একটা আইন অনুমোদিত প্রথা। তাদের নৈতিক ধারণা শিথিল হয়েছে ; মানবিক মর্যাদা ও অধ্যাত্ম বিশুদ্ধতা অধঃপতিত হয়েছে ; 'হেতারায়' শ্রেণী মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সমভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। তথাপি কিছু দৃশ্যমান সংকেত রয়েছে যা আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে যে, আল্লাহর আলোক যা সপ্তম শতাব্দীতে আরবদেশকে জাগ্রত করেছিল তা তাদের হৃদয়ের উপর পতিত হবে এবং তারা বর্তমানে যে অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবে। মুতাজিলা চিন্তা-বিদেরা তাদের বিশ্বাস অনুসারে কঠোরভাবে এক-বিবাহের পক্ষপাতী ;

তাদের মতে পূর্ববর্তী চুক্তি বহাল থাকাকালে দ্বিতীয় মিলন আইন নিষিদ্ধ করে। অন্য কথায়, মুতাজিলা বিবাহ প্রত্যেক দিক দিয়ে এক-বিবাহ প্রথার শর্তাবলী পূরণ করে "একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সারা জীবনের জন্য স্বেচ্ছাকৃত মিলন হিসেবে"।

এমনকি প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটা বড় দল বহুবিবাহ প্রথাকে আইন-বিগর্হিত বলে বিবেচনা করত। যে অবস্থাসমূহের প্রেক্ষিতে প্রাচীনকালে এই প্রথা অনুমোদিত হত তা হয় অন্তর্হিত হয়েছে নতুবা তা বর্তমানে উপস্থিত নেই।

বাস্তবিকপক্ষে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে মানুষের অনুভূতি নৈতিক বিশ্বাস হিসেবে না হলেও সামাজিক বিশ্বাস হিসেবে দৃঢ়তর হচ্ছে এবং এই অনুভূতির সঙ্গে মিলে অনেক বাইরের পরিস্থিতি ভারতীয় মুসলমান-দের ভেতর থেকে এই প্রথা নির্মূল করার কাজে এগিয়ে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের রেজিষ্ট্রী দলিলে এই মর্মে একটি শর্ত সংযুক্তি প্রথা হিসেবে চালু হয়েছে যে প্রথম বিবাহচুক্তি বলবৎ থাকাকালে বিবাহ-ইচ্ছুক স্বামী তার দ্বিতীয় বিবাহ করার কথিত অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন লোক বর্তমানে বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হোক কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে হোক একপত্নীক। শিক্ষিত শ্রেণী যারা তাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত এবং অন্যান্য জাতির বিবরণের সঙ্গে তাদের ইতিহাসের তুলনা করতে সমর্থ তাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা অননুমোদিত। পারস্যে জনগণের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র বহু বিবাহের বিতর্ক-মূলক বিলাসিতা উপভোগ করে।[১] এটা আন্তরিকভাবে আশা করা যায় যে বহুপূর্বে মুসলমান আইনজ্ঞদের সাধারণ বিতর্ক সভা প্রামাণ্য কর্তৃত্বের সঙ্গে ঘোষণা করবেন যে দাসপ্রথার মতো বহুবিবাহ প্রথা ইসলামী আইনে অপ্রীতিকর।

এবার আমরা মুহম্মদের বিবাহের বিষয়ে আলোকপাত করব। পরিস্থিতির অজ্ঞতার দরুন ও মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত সততার অভাবে অনেকে ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের একটি ভিত্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর খ্রীষ্টান আক্রমণকারীরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন

১. কর্ণেল ম্যাকগ্রেগরের মতানুসারে শতকরা মাত্র দু'জন লোক বহু বিবাহ প্রথার অধীন।

যে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহুবিবাহ করে আইন সমর্থন করে না এমন সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং প্রেরিতপুরুষের পক্ষে উপযুক্ত নয় এমন চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞান এবং পরি-স্থিতির অধিকতর সঠিক মূল্যায়ন তাঁকে আত্মতুষ্ট একজন কামুক প্রমাণ না করে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে যখন তিনি পুরাতন গোষ্ঠীপতি—প্রথানুসারে বিবাহিত স্ত্রীদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেছিলেন অথচ নিজে দরিদ্র ও সম্বলহীন ছিলেন, তখন তিনি চটুল নয় এমন চরিত্রের আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে মানবিকতার দিক থেকে তাঁর উদ্দেশ্যসমূহের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ "মহান আরব্য পুরুষের" বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগসমূহের অসত্যতা ও অনুদারতা প্রতিপন্ন করবে। যখন মুহম্মদের বয়স মাত্র পঁচিশ, যখন তিনি যৌবনের প্রারম্ভে, তখন তিনি খাদিজাকে বিবাহ করেন যিনি বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বিবাহের পর থেকে পঁচিশ বৎসর কাল পর্যন্ত খাদিজার সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক জীবন অখণ্ড, বিশ্বস্ততা ও শান্তির সূর্যকরোজ্জ্বল আভায় অতিবাহিত হয়েছিল। পৌত্তলিকগণ যে সব নিন্দাবাদ ও নির্যাতন তাঁর উপর স্তূপীকৃত করেছিল তাতে খাদিজা ছিলেন তাঁর একমাত্র সাথী, সমব্যথী ও সাহায্যকারী। খাদিজার মৃত্যুকালে মুহম্মদের বয়স হয়েছিল একান্ন বৎসর। তাঁর দুশমনগণ একথা অস্বীকার করতে পারেন না বরং তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে এই দীর্ঘকালের মধ্যে তারা তাঁর চরিত্রে একটিমাত্র কলঙ্কও দেখতে পান না। খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি কোন বিবাহ করেননি যদিও তিনি পছন্দ করলে জনমত তা অনুমোদন করত।

খাদিজার মৃত্যুর কয়েক মাস পর এবং তায়েফ থেকে অসহায় ও নির্যাতীত হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সাকরানের বিধবা পত্নী সওদাকে বিবাহ করেন। সাকরান ইসলাম গ্রহণ কবেছিলেন এবং পৌত্তলিকদের নির্যাতন এড়ানোর জন্য আবিসিনিয়ায় পলায়ন করতে বাধ্য হন। সাকরান নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তার স্ত্রী সহায়সম্বলহীন অবস্থায় নিপতিত হন। দেশের প্রথানুসারে বিবাহই ছিল একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে ধর্মগুরু তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীর বিধবা স্ত্রীকে নিরাপত্তা ও সাহায্য দিতে পারতেন। উদারতা ও মানবিকতার প্রত্যেকটি মূলনীতি মুহম্মদকে এ ব্যাপারে তাঁর হস্ত প্রসারিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। নতুন ধর্মের জন্য তার স্বামী জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, ধর্মের জন্য তিনি গৃহ ও দেশ ত্যাগ করেছিলেন ; তার স্ত্রী নির্বাসনে সাথী ছিলেন এবং নিঃসম্বল অবস্থায়

মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। দীনহীনা স্ত্রীলোকের একমাত্র সাহায্য করার উপায় বিবাহ হওয়া, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের সম্বল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও মুহম্মদ সওদাকে বিবাহ করেন।

ওসমান আবু কুহাফার পুত্র আব্দুল্লাহ পরবর্তীকালে ইতিহাসে আবু বকর নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন মুহম্মদের সবচেয়ে একজন অনুগত অনুসারী। হযরতের ধর্মে প্রথম দীক্ষিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। মুহম্মদের প্রতি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও অবিচল অনুরাগের দিক দিয়ে তিনি প্রায় আলীর সঙ্গে তুলিত হতে পারেন।

আবু বকরের (যাকে আমরা এই নামে যথাযথভাবে অভিহিত করতে পারি) আয়েশা নাম্নী অল্পবয়স্কা একটি কন্যা ছিল। তাঁর জীবনের একমাত্র বাসনা ছিল, যিনি তাকে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছেন সেই হযরত ও তাঁর মধ্যে যে অনুরাগ বিদ্যমান, সেই অনুরাগকে তিনি চিরস্থায়ী বন্ধনে বেঁধে দেবেন মুহম্মদের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে। তখন কন্যার বয়স মাত্র সাত বৎসর ; তবে দেশের প্রথা অনুসারে এই ধরনের বিবাহ-বন্ধন স্বীকৃত ছিল। ভক্তের ঐকান্তিক অনুরোধের ফলে নাবালিকা কুমারী হযরতের স্ত্রীত্বে বরিত হয়।

হিজরতকারীদের মদিনায় উপস্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা সেকালের আরবদের জীবনযাত্রার উপর প্রভূত আলোকপাত করে। যারা আরবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—"অহঙ্কার, যুদ্ধ-প্রিয়তা, বিশেষ সম্মানবোধ এবং অদ্ভুত ক্ষমতার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ধৈর্য সম্পর্কে অবহিত আছেন তাঁরা ঘটনাটির পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবেন। বাটন বলেছেন, এমন কি এখনও "ব্যক্তির মধ্যে কথা কাটাকাটি বেদুঈনদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" ওমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় খলিফার পদে বরিত হয়েছিলেন তাঁর একটি কন্যা ছিল নাম হাফসা। এই সদাশয়া মহিলা বদরের যুদ্ধে তাঁর স্বামীকে হারান। তাঁর মেজাজ ছিল তাঁর পিতার মতই উগ্র। এ কারণে তাঁর আর বিবাহ হয়নি। বিবাহ-ইচ্ছুক হযরতের অনুসারীবৃন্দ তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। এটা কন্যার পিতার উপর কটাক্ষের সামিল ছিল। এই নিন্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি আবু বকরকে তাঁর কন্যার পানিগ্রহণের প্রস্তাব দেন এবং আবু বকর রাজী না হওয়ায় ওসমানকে তিনি প্রস্তাব দেন। ওসমানও এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এটা একটা প্রত্যক্ষ অবমাননার সামিল ছিল। ওমর

ক্রোধান্বিত হয়ে অভিযোগ করার জন্য মুহম্মদের সমীপে অগ্রসর হন। যে কোন প্রকারে হোক তাঁর সম্মানের অনুকূলে একটা মীমাংসা হওয়া চাই। কিন্তু আবু বকর ও ওসমান কেউই হাফসার মেজাজ সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। এ বিবাদ আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যতই হাস্যকর মনে হোক না কেন, তখন তা বিশ্বাসীদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে বিভ্রান্তির আবর্তে টেনে আনার জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত এই সংকটাবস্থায় মুসলমান জাতির প্রধান কন্যাটিকে বিবাহ করে পিতার ক্রোধ প্রশমিত করেন। আর জনগণ এটা শুধু অনুমোদনই করেনি, এতে তারা উৎফুল্লও হয়েছিল।[১]

হিন্দ উম্মে সালমা. উম্মে হাবিবা ও জয়নব উম্মুল মাসাকিন[২] হযরতের এই তিন স্ত্রীও বিধবা ছিলেন; তারা পৌত্তলিকদের শত্রুতার ফলে তাদের স্বাভাবিক সংরক্ষকদের হারিয়েছিলেন এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন হয় তাদের তত্ত্বাবধানে অক্ষম ছিলেন নয় অনিচ্ছুক ছিলেন।

মুহম্মদ তাঁর অনুরক্ত বন্ধু ও মুক্ত-দাস জায়েদকে বিবাহ দিয়েছিলেন

---

১. হযরতের পরিবারে নেগ্রাস কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রদত্ত কপটিক মহিলা সম্পর্কে হাফসা ও মুহম্মদের মধ্যে পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে মুয়ির, স্পেঙ্গার ও ওসবোর্ন কিছুটা লোলুপতার প্রলেপ দিয়ে যে গল্প বলেছেন তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও বিদ্বেষপ্রসূত। যে হাদিসটি কোরআনের সকল সম্মানিত ভাষ্যকার প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যা কোন উমাইয়া বা আব্বাসিয়া ইন্দ্রিয়-পরায়ণ নৃপতির সময় উদ্ভাবিত ও দুর্বলতম প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তা-ই এসব সমালোচক হযরতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লুব্ধভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। কোরআনের যে আয়াত এই কাহিনীর উদ্দিষ্ট বলে অনুমিত হয়েছে বাস্তবিক তা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিস্থিতির নির্দেশ করেছে। শৈশবে মুহম্মদ যখন তাঁর চাচার মেষ চরাতেন তখন মধুপানের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল। জয়নব প্রায়ই এই মধু সরবরাহ করতেন। হাফসা ও আয়েশা তাঁকে মধুপান থেকে বিরত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং তিনি আরো মধুপান করবেন এই মর্মে তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন। তাদের কাছে এই অঙ্গীকার করার পর তাঁর মনে এই চিন্তা উদয় হল যে তিনি এমন কিছু অবৈধ করেছেন যার মধ্যে অবৈধ কিছুই নেই, শুধু স্ত্রীদেরকে তুষ্ট করার জন্য এরূপ করছেন। এই দুর্বলতার জন্য তাঁর বিবেক তাঁকে পীড়া দিল। তখন কোরআনের এই আয়াত নাজিল হল: "হে নবী, আপনার স্ত্রীদেরকে তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তা নিষিদ্ধ বলছেন কেন?"

২. "দরিদ্রের মাতা", বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য তিনি এরূপ কথিত হতেন।

আরবের দুটি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত উচ্চ শ্রেণীর মহিলা জয়নবের সঙ্গে। উচ্চ বংশে জন্ম ও খুব সম্ভব সৌন্দর্যের জন্য মুক্তদাসের সঙ্গে তার বিয়েতে তিনি খুশি হতে পারেননি। পারস্পরিক বিতৃষ্ণা শেষ অবধি ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। সম্ভবত স্বামীর দিক থেকে এই বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পেয়েছিল জয়নবকে একবার দেখে মুহম্মদের মুখ থেকে নিঃসৃত কয়েকটি কথা বারবার উচ্চারণের ফলে, যা নারীদেরই জানা আছে কিভাবে তা করতে হয়।

তিনি কয়েকবার জায়েদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং জয়নবের অনাবৃত মুখ-দর্শন করে আজকের মুসলমানেরা কোন সুন্দর ছবি ও প্রস্তর মূর্তি দেখে যেরূপ বলে থাকে তেমনি স্বোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন "হৃদয়ের অধিপতি আল্লাহর জন্য সর্ববিধ প্রশংসা।"

যে শব্দগুলি স্বাভাবিক প্রশংসার খাতিরে বলা হয়েছে তা জয়নব তার স্বামীর কাছে প্রায়ই উচ্চারণ করেছে এটা প্রতিপন্ন করার জন্য যে এমন-কি হযরতও তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে তা তার মনস্তাপ বৃদ্ধি করেছে। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তিনি আর তার স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করবেন না; আর এই দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে তিনি হযরতের সমীপে গমন করলেন এবং তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার সংকল্পের কথা জানালেন। হযরত তাকে প্রশ্ন করলেন: "তুমি কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েছ?" জায়েদ উত্তর করলেন, "না। কিন্তু আমি আর তার সঙ্গে বসবাস করতে পারব না।" হযরত তাকে আদেশের সুরে বললেন, "বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে দেখাশোনা কর, তার সঙ্গে ভাল আচরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর কারণ আল্লাহ বলেছেন 'তোমাদের স্ত্রীদের' প্রতি সদাচরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর।" কিন্তু জায়েদ তার সংকল্পে অবিচল এবং হযরতের আদেশ সত্ত্বেও তিনি জয়নবকে পরিত্যাগ করলেন, জায়েদের আচরণের মুহম্মদ দুঃখিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে তিনিই এদুটি প্রতিকূল আত্মার মধ্যে বিবাহ-বন্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

জয়নব জায়েদের নিকট থেকে তালাক সংগ্রহের পরে থেকে তাকে বিবাহ করার জন্য মুহম্মদকে সানুনয় অনুরোধ চালিয়ে যেতে লাগল, আর যতদিন পর্যন্ত সে হযরতের অন্যতম মহিষীতে পরিণত না হল ততদিন পর্যন্ত শান্ত হল না।[১]

---

১. তাবারি (জোটেনবার্গের অনুবাদ) ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮। এই বিবাহ পৌত্তলিক-দের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। তারা বিমাতা ও শাশুড়ীকে বিবাহ

হযরতের অপর এক স্ত্রীর নাম ছিল জুয়াইরিয়া। সে বণী মুস্তালিক গোত্রের প্রধান হারিসের কন্যা এবং তাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পরিচালিত অভিযানকালে তাকে বন্দী অবস্থায় আনয়ন করা হয়। সে তার গ্রেফতারকারীর সঙ্গে একটি চুক্তি করল নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তার স্বাধীনতা কিনে নেওয়ার জন্য। সে মুহম্মদকে তার নির্দিষ্ট অর্থ হিসেবে আবেদন করল ও তৎক্ষণাৎ তার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। এই করুণার স্বীকৃতি ও তার স্বাধীনতা দানের জন্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে সে মুহম্মদকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিল এবং বিবাহ হয়ে গেল। যখন মুসলমানেরা এই সম্বন্ধের খবর শুনতে পেল তখন তারা তাদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে বণী মুস্তালিক এখন হযরতের আত্মীয় এবং তাদের সঙ্গে আমরা তদ্রূপ আচরণ করব। প্রত্যেক বিজয়ী তাদের বন্দী-দের মুক্তি প্রদান করল, এরূপে শত শত পরিবার তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেল এবং মুহম্মদের সঙ্গে জুয়াইরিয়ার বিবাহকে মুবারকবাদ জানাল।[১]

ইহুদী রমণী সফিয়াকে খয়বারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুসলিমেরা বন্দী হিসেবে এনেছিল। তাকেও মুহম্মদ উদারতার সঙ্গে মুক্ত করে দিয়ে-ছিলেন এবং তার সনির্বন্ধ অনুরোধের জন্য তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করেছিলেন।

মায়মুনাকে মুহম্মদ মক্কায় বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তার আত্মীয়া ও পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে ছিল তার বয়স। এই বিবাহ দীন আত্মীয়ার অবলম্বন হিসেবেই শুধু কাজ করেনি, অধিকন্তু এ ইসলামের জন্য লাভ করে-ছিল দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব—ইবনে আব্বাস এবং ওহোদের দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধে কোরাইশ অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ও পরবর্তীকালে গ্রীক-বিজেতা খালিদ বিন ওয়ালিদ।

করত। তারা দত্তক পিতা কর্তৃক দত্তক পুত্রের (জায়েদ এক সময় মুহম্মদের ধর্মপুত্র হিসেবে বিবেচিত হত) বিবর্জিত স্ত্রীকে বিবাহ করাকে নিন্দনীয় কাজ হিসেবে দেখত। দত্তক সন্তান গ্রহণ প্রকৃত রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করে বলে, যে ধারণা জনগণের ছিল সেই ভ্রম নিরসন করে কোরআনের ৩৩তম অধ্যায়ে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াতগুলি আদিম সমাজে প্রচলিত নিয়ম—কাউকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী বলে ডাকলে তৎ সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না বা নাকচ হয়ে যায়—দত্তক পুত্র বা কন্যার সঙ্গে বিবাহ হতে পারে এই ভ্রম নিরসন করে। হযরতের পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর হল জায়েদ কোনদিন তার গুরুর প্রতি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৭২৯।

এরূপ ছিল মুহম্মদের বিবাহের বৈশিষ্ট্য। কতিপয় বিবাহের সম্ভবতঃ পুত্র-সন্তান লাভের ইচ্ছা থেকে জন্ম লাভ করে থাকবে, কেননা তিনি দেবতা ছিলেন না এবং স্বাভাবিকভাবে পুত্র উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে থাকবেন। তিনি শত্রুদের আরোপিত অবজ্ঞাসূচক ডাকনাম এড়িয়ে যাওয়ার কামনাও পোষণ করে থাকবেন।[১]

কিন্তু ঘটনা যেরূপ তাকে সেভাবে নিলেও আমরা দেখতে পাই যে এইসব বিবাহ যুযুধান গোত্রসমূহকে একত্র করতে ও তাদের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য বিধানে সহায়ক হয়েছিল।

বংশবিরোধের রেওয়াজ আরব পৌত্তলিকদের মধ্যে জোরদার ছিল; রক্তক্ষয়ী বিবাদ গোত্রের ভাগ্য নির্ধারণ করত। এমন পরিবার ছিল না যারা রক্তক্ষয়ী কলহে লিপ্ত ছিল না, এবং প্রায়ই পুরুষ সদস্যরা নিহত হত। ফলে নারী ও শিশুরা দাসত্বে পর্যবসিত হত। মুসা তাঁর লোকদের মধ্যে এই বংশবিরোধ বিদ্যমান দেখতে পেয়েছিলেন (সব জাতির মধ্যে ক্রম-বিকাশের বিশেষ স্তরে এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল); তিনি এ রেওয়াজ দূর করতে অসমর্থ হয়ে একে পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈধ করেন। প্রয়োগিতব্য প্রতিকারসমূহের গভীরতর ধারণা নিয়ে মুহম্মদ বিভিন্ন বিরোধী পরিবার ও শক্তিশালী গোত্রসমূহকে পরস্পর এবং তাঁর নিজের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করেন। তাঁর নবুয়্যতের কার্যকালের শেষের দিকে আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে আজ থেকে সব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটল।

প্রাচীনকালের মহান ধর্মগুরুদের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে উদ্দেশ্য মুহম্মদকে বহুস্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণে পরিচালিত করেছিল এবং যা অসহায় বা বিধবা

বর্বরোচিত তিক্ততার কারণে হযরতের শত্রুরা তাঁর প্রতি তাঁর শেষ পুত্রের মৃত্যুর পর 'আবতার'—এই ডাক নাম আরোপ করেছিল। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল "যার লেজ কাটা গেছে" হিন্দুদের মতো প্রাচীন আরবদের মধ্যেও পুত্রসন্তানকে দেবতাদের করুণার ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং যে ব্যক্তি পুত্রসন্তান রেখে না যেত তাকে বিশেষভাবে অভাগা বলা হত। অতএব হযরতের প্রতি এই তিক্ত শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোরআন, সু. ১০৮ (তফসীরে কাশ্‌শাফ দেখুন)। এছাড়া পৌত্তলিক আরবগণ তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত। মুহম্মদ এই প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ও জলন্ত ভাষায় নিন্দা করেন, তুঃ কোরআন সু. ১৭ আ. ৩৪ ইত্যাদি।

নারীদেরকে অন্য কোন উপায়ের অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকবার সুযোগ প্রদান করেছিল তা পক্ষপাতযুক্ত ও কপট শত্রুদের ঈর্ষাপরায়ণতা বিকৃত করেছে। তাদেরকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে মুহম্মদ একমাত্র উপায়ে, যা সে যুগ ও জনগণ সম্ভব করেছিল, তাদের পুনর্বাসন করেছিলেন।

পাশ্চাত্যে লোকে বহুবিবাহকে স্বতঃভাবেই অনিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করে ; আর তার অনুশীলনকে অবৈধই মনে করে না। বরং স্বেচ্ছাচারিতা ও নীতিহীনতার ফল বলে মনে করে। তাঁরা ভুলে যায় যে এসব প্রথা কালের অবস্থা ও প্রয়োজনের সৃষ্টি। তারা ভুলে যায় যে হিব্রু-জাতির মহান ধর্মগুরুগণ, যাদেরকে সমুদয় সেমিটিক ধর্মমতের অনুসারীরা নৈতিক শানশওকতের দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন, তাঁরা এত অধিক পরিমাণে বহুবিবাহ প্রথার অনুশীলন করেছেন যা আমাদের আধুনিক যুগে বৈধকৃত নীতিহীনতার পরিণতি বলে মনে হয়। আমরা তাদের রেওয়াজ বা আচরণকে সম্ভবত অজিজ্ঞাসিত যেতে দিতে পারি না, যদিও কালনন্দিত পুরাণ তাকে পবিত্র আভায় রঞ্জিত করেছে। কিন্তু আরবের নবীর বেলায় আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তাঁর বৈবাহিক ক্রিয়াগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে।

সম্ভবতঃ একথা বলা যেতে পারে যে কোন প্রয়োজন হযরতকে প্ররোচিত করেনি বহুবিবাহের মতো একটি অনিষ্টকর প্রথাকে অনুশীলন করতে বা অনুমোদন করতে, আর তার পক্ষে এটা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত ছিল। যিশুখ্রীষ্ট এটা উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রথা অন্যান্য অনেক প্রথার মতো সম্পূর্ণ অনিষ্টকর নয়। অনিষ্ট একটি আপেক্ষিক পদ। একটি কাজ বা একটি প্রথা মুখ্যতঃ ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক ধারণার সঙ্গে নিতান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু জাতির ধারণার অগ্রগতি ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে অনিষ্টকর প্রবণতায় পর্যবসিত হতে পারে এবং কালক্রমে তা সরকার কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হতে পারে। ধারণা যে প্রগতিশীল তা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু রীতি-নীতি প্রথা ধারণার অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল এবং এসব অবস্থানুযায়ী ভাল বা মন্দ, মঙ্গল বা অমঙ্গল হিসেবে চিহ্নিত হয় কিংবা এ সব বিবেক—"কালের মনোভঙ্গী" অনুসারে ভাল বা মন্দ, মঙ্গল বা অমঙ্গল চিহ্নিত হয়—এই সত্য ভাসাভাসা চিন্তাবিদেরা প্রায়ই উপেক্ষা করেছেন।

আদিম খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসের একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিবাহের প্রতি তার নিন্দা বা বীতরাগ। বিবাহ নিকৃষ্টতার শর্ত হিসেবে

আর শিশুর জন্ম অমঙ্গল হিসেবে বিবেচিত হত। সন্ন্যাস জগৎ থেকে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী মনকে তুলে নিয়েছিল; অপেশাদার যাজককে হয় বিবাহ করতে দেওয়া হত না নতুবা একবারের অধিক বিবাহ করতে দেওয়া হত না। এই অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আংশিকভাবে ধর্মগুরুর দৃষ্টান্তর ফল এবং আংশিকভাবে বিভিন্ন অবস্থা যা আদিম খ্রীষ্টীয় সংগঠনের উপর চেপে বসেছিল তার ফল।

নাজারাতের প্রেরিত পুরুষের এসেন সম্প্রদায়ের সাধুপুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রব, খোদার রাজত্বের অব্যবহিত আবির্ভাব সম্পর্কীয় জীবন্ত প্রত্যাশা যেখানে সব সম্পর্কের অবসান ঘটবে এবং তাঁর নবুয়্যতের কার্য-কালের সত্বর পরিসমাপ্তি—এসব বিবাহ সম্পর্কীয় তাঁর নিন্দার ব্যাখ্যা দেয়, আমরা আরও যোগ করতে পারি তিনি কখনও বিবাহ অবস্থায় প্রবেশ করেননি তা সুস্পষ্ট করে তোলে। ব্যাপটিষ্টদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং তিনি নিজে একজন এসেন, এ তাঁর স্বল্পস্থায়ী ও সর্বাপেক্ষা করুণ জীবনেতিহাসের উপর আলোকপাত করে। নারীজাতির প্রতি পলের প্রবল অথচ দুর্বোধ্য বিতৃষ্ণা ধর্মগুরুর বাণীর সঙ্গে মিলে গিয়েছিল, আর নর-নারীর পবিত্রতম বিবাহ-বন্ধন একটি পাপাচার এবং এই অমঙ্গলকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে—এই এসেনিক ধারণা ধর্মের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সন্তান উৎপাদন ও মানুষের "জৈব ক্ষুধার" পরিতৃপ্তি এক-মাত্র লক্ষ্য বলে বিবাহকে মনে করা হত। আর অদ্যাবধি অধিকাংশ খ্রীষ্টান গির্জার বিবাহ পরিচালনা এই আদিম ধারণার পোষকতা করে। এই ধারণা খ্রীষ্টধর্মের ললাটে খোদিত হয়ে গেছে এবং এখনও এই প্রভাব স্থায়ী হয়ে রয়েছে যেখানে মানবকল্যাণমুখী বিজ্ঞানের প্রভাবে তা স্থানচ্যুত হয়নি। ধারণাটি এই : যে ব্যক্তি কোন দিন বিবাহ করেনি সে ব্যক্তি যে বিবাহ করে কলুষিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক উৎকৃষ্ট। ভারতের ভস্মমাখা যোগীপুরুষ, সাধারণভাবে প্রাচ্যের মাদুরপরিহিত কৃচ্ছ্রতাসাধনকারী সাধুপুরুষ ও বৌদ্ধপুরোহিতগণ ছিলেন অবিবাহিত। তাদের মতে, "গৃহ ও পরিবারের সমুদয় প্রেমবন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়, এবং একক জীবনযাপন না করতে পারলে অনন্তের উপলব্ধি সম্ভব নয়।" প্রাচ্য নষ্টিকবাদ ও কৃচ্ছ্রতাবাদের মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে কৌমার্য-প্রথা প্রবেশ লাভ করে। যিশুর "অবিবাহিত অবস্থাকে" কেউ কেউ তাঁর ঐশীত্বের প্রমাণ বলে মনে করেন, আবার কেউ কেউ জগতের সমুদয় ধর্মগুরুর উপর তাঁর অপরিমেয় শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলে মনে করেন।

আমাদের মতে, যিশু ও মুহম্মদের মধ্যে তুলনা বা বৈসাদৃশ্য যেভাবে খাড়া করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অমূলক এবং নৈতিক আদর্শের ভ্রান্ত মূল্যায়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিখুঁত জীবন সেক্ষেত্রে সমুদয় পারিবারিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ নির্বাসনকে বুঝাত। নিশ্চয়ই এই মতবাদ স্বভাবের বিকৃতি এবং তা মানবজাতির ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। তা যদি না হবে তবে হযরতের প্রতি কেন এই কুৎসা, যিনি যিশুর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন? এটা কি তিনি একাধিক বিবাহ করেছিলেন সে জন্য? আমরা এসব বিবাহের তাৎপর্য প্রতিপন্ন করেছি, আমরা অন্ততঃ দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এসব কাজের মধ্যে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ হিসেবে দাড় করানো হয়েছে।

এবার অমূর্ত দিক থেকে তাঁর বিবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। কেন মূসা একাধিক বিবাহ করেছিলেন। তিনি কি এরূপ করার জন্য নৈতিক ছিলেন কিংবা কামুক হয়ে গিয়েছিলেন? কেন দাউদ নবী, "যিনি ছিলেন খোদার পছন্দসই বান্দা" অগণিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন? এর উত্তর অত্যন্ত সহজ—প্রত্যেক যুগের নিজস্ব মানদণ্ড রয়েছে। এক সময়ে যা উপযোগী অন্য সময়ে তা উপযোগী নয় এবং আমাদের উচিত নয় বর্তমানের মাপকাঠি দিয়ে অতীতের মূল্যায়ন করা। আমাদের আদর্শ তার কাল-সীমার মধ্যে নিজ মানদণ্ড অনুযায়ী সত্য-নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব হারায়নি। আমরা কি যিশুকে ব্যর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অবাস্তববাদী বলে কিংবা মূসা ও দাউদকে নিষ্ঠুর ইন্দ্রিয়বাদী অভিহিত করে ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারব, কেননা একজনের মন প্রত্যাশিত স্বর্গরাজ্যের অস্পষ্ট চিন্তায় ভরপুর ছিল এবং অন্যদের জীবন বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল? উভয় ক্ষেত্রেই আমরা ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হব; একজনের উচ্চাশা, অন্যান্য-দের কৃতকার্যতা—সবই ঐতিহাসিক তথ্য এবং তা তাদের কালোপযোগী। এটা একজন প্রেরিত পুরুষের সত্যতম বৈশিষ্ট্য যে তিনি তাঁর সর্বোচ্চ মেজাজে উন্নীত হলেও অনাগতের প্রত্যাশায় জীবনধারণের ব্যাপারে দৃষ্টি হারান না। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই মানবজাতির ক্রমবিকাশকে প্রতিবেদন করে থাকেন। যিশু কিংবা মুহম্মদ কেউই অস্তিত্বশীল সমাজকে তাৎক্ষণিকভাবে মুছে ফেলতে পারতেন না কিংবা সমুদয় জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিলোপসাধন করতে পারতেন না। যিশুর মতো মুহম্মদ যেখানে আদেশ জারী করা আবশ্যক নয় সেখানে যুগের

চাহিদা মেটানোর জন্য "তাঁর অনুসারীদের হৃদয়ে নীতি প্রোথিত করে দিয়েছিলেন, যা সময় আসলে দূরীকরণের ভূমিকা পালন করবে"।

মুহম্মদ যে সুযোগ-সুবিধা নিয়েছিলেন তা তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন—এই উক্তি সম্পর্কে এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, এ কথা অজ্ঞাতপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিযরতের কয়েক বছর পরে মদিনায় বহুবিবাহের উপর সীমা আরোপিত হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে যে ব্যবস্থা তা একজন কামুকের সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে একজন আত্মসচেতন আত্মসমীক্ষকের সচেতনভাবে আরোপিত ভার ছিল। তাঁর সমুদয় বিবাহচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল বহুবিবাহের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পূর্বে এবং এই প্রত্যাদেশের সঙ্গে অন্য একটি প্রত্যাদেশ নাজিল হল যার ফলে তাঁর থেকে সব সুবিধা কেড়ে নেওয়া হল। যখন তাঁর অনুসারীরা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি প্রাপ্ত হল (আইনের শর্তাধীন) এবং হযরতের প্রকাশ্য নিন্দা সত্ত্বেও অদ্যাবধি তারা যে সুবিধা এখনও ভোগ করে আসছে—তালাকের পর নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত ; কিন্তু তাঁর বেলায় তিনি যে সব স্ত্রীদেরকে ভরণপোষণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন তাদের কাউকে তালাক দিতে পারতেন না কিংবা অন্য কোন বিবাহ করতে পারতেন না। এটা কি "সুযোগ" গ্রহণ ছিল কিংবা তাঁর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের জন্য এটা কি অনুকম্পাসম্মত ব্যবস্থা ছিল না—আর তাঁর প্রত্যাদিষ্ট কার্যে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এটা কি পূর্ণাঙ্গ আত্মত্যাগের প্রত্যাদেশ ছিল না ?

তালাকের বিষয়টি ভ্রান্তধারণা ও বিতর্কের ফলপ্রসূ উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে আর এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন হতে পারে না যে তালাকের ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপারে কোরআনিক আচরণ-বিধি "অন্যান্য কিতাবের বিধির তুলনায় অধিকতর মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রসূত"।

পুরাকালের জাতিসমূহের মধ্যে তালাকের ক্ষমতা বিবাহ আইনের অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে ; এই অধিকার কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী লিঙ্গের অর্থাৎ পুরুষের জন্য সংরক্ষিত ছিল ; কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর তালাক দেওয়ার অধিকার ছিল না।

সভ্যতার অগ্রগতি ও ধারণার ক্রমবিকাশের ফলে নারীজাতির অবস্থার আংশিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ফলে তারা তালাকের সীমাবদ্ধ অধিকার লাভ করেছিল যা স্বাধীনভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে

ছিল না, রোমক সম্রাটদের অধীনের যে সুবিধার ভেতর দিয়ে বিবাহচুক্তি সম্পাদিত ও বাতিল হত তা পর্যন্ত প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

প্রাচীন হিব্রু আইনের অধীনে যে কোন কারণে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত এবং তার ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারমূলক ও খাম-খেয়ালী ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কোন কারণেই স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী তালাক দাবী করতে পারত না।[১]

পরবর্তীকালে শামামাইতরা তালাকের পরিচালনার উপর কতিপয় শর্ত আরোপ করে কিছু পরিমাণে তালাক-প্রথার সংস্কার সাধন করেছিল। কিন্তু হিলেল সম্প্রদায় আদিম কঠোরতার সঙ্গে আইনটির পোষকতা করেছিল।

হযরতের আবির্ভাব কালে আরবের ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে হিলেলাইত মতবাদ প্রধানত সক্রিয় ছিল এবং স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ পৌত্তলিকদের মতো তাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

এথেন্সবাসীদের মধ্যেও প্রাচীন ইসরাইলীদের মতো স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রত্যাখান করার অধিকার ছিল অবাধ।

রোমকদের মধ্যে আদিকাল থেকেই তালাক প্রথার আইনগত বৈধতা স্বীকৃত হয়েছিল। 'দ্বাদশ টেবিলে'র আইনসমূহ তালাক অনুমোদন করেছিল। রোমান জাতির প্রশংসাকারীরা যেরূপ বর্ণনা করেছেন তাদের মহানগরী প্রতিষ্ঠার পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত তারা এই আইনের সুযোগ-সুবিধা নেয়নি, এর কারণ এই ছিল না যে তারা অন্যান্য জাতির চেয়ে অধিকতর দৃষ্টান্তমূলক ছিল, বরং এই কারণে যে বিষপ্রদান, মদ্যপান ও জারজ সন্তান বিনিময় করার জন্য স্বামী-স্ত্রীকে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারত। কিন্তু তালাকের জন্য স্ত্রীর আবেদনপত্র পেশ করার ক্ষমতা ছিল না;[২] যদি সে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করত তবে তার এই দুঃসাহসের জন্য তাকে সাজা পেতে হত। কিন্তু গণপ্রজাতান্ত্রিক রোমে প্রায়ই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটত; এটা ছিল নৈতিকতার দ্রুত অবক্ষয়ের ফলশ্রুতি।

আমরা পুরাকালের সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো জাতিকে নির্বাচিত করেছি যাদের চিন্তাধারা আধুনিক চিন্তাধারা, আধুনিক জীবন ও আধুনিক কর্ম-ধারার উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে

---

১. একস. ২১, ২; ডিউট. ২১, ১৪, ২৪, ১; তুঃ ডলিঞ্জারের 'দি জেনটাইল এণ্ড দি জিউস; ২য় খণ্ড পৃ. ৩৩৯-৩৪০, আর সেগুনের 'উক্‌জোর্ হিব্রুইকা'।

২. ডলিঞ্জার—'দি জেন্টাইল এণ্ড দি জিউ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫।

রোমানদের আইন নারী জাতির অবস্থার উন্নতি ও পুরুষের সমপর্যায়ে উন্নীত করার প্রগতিশীল মনোভাব-নির্দেশক। এ যতখানি মানব-চিন্তার অগ্রগতির ফল ততখানি বাহ্য কারণের অগ্রগতিরও ফল।

"যিশুর উপদেশের মধ্যে যে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ রয়েছে তা আইন-প্রণেতাদের জ্ঞানবত্তার দাবীর কাছে যে কোন ভাষ্যের ক্ষেত্রে নমনীয়।"[১] আমরা বেশ অনুমান করতে পারি যে, যে সময়ে যিশু উচ্চারণ করেছিলেন আল্লাহ যা সংযুক্ত করেছেন কোন মানুষ যেন তা বিচ্ছিন্ন না করেন", তখন তাঁর পক্ষে নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোতকে ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ধারণা ছিল না এবং তিনি তাঁর বাণীর মূল প্রবণতা অনুধাবনের জন্য থামেননি। পরবর্তী আইন যা অবৈধ যৌনসংগমকে[২] (অনূদিত শব্দ ব্যবহার করে) বৈধ বিবাহ-বিচ্ছেদের একমাত্র শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তা থেকে একথা পর্যাপ্তরূপেই নির্দেশিত হয় যে পরিস্থিতির গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।[৩] কিন্তু পরবর্তী আইন প্রণেতাদের "বুদ্ধিমত্তা" একটি নিয়মের প্রতি অন্ধভাবে সীমিত থাকেনি যা সম্ভবতঃ একটি উদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের নিরিখে বিধিবদ্ধ হয়েছিল ও মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। নিয়মটিকে একটি মহৎ মনোভাবের পোষণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে একে তালাকের নমুনামূলক

১. গিবন—ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার, ৪র্থ খণ্ড (২য় সং.) পৃ. ২০৯।
২. ম্যাথু. ২৯, ৯।
৩. খ্রীষ্টানদের দু'টি সুসমাচার কারণ উল্লেখ করেনি কেন যিশু তাঁর অনুসারীদেরকে স্ত্রী-"প্রত্যাখ্যান করতে" অনুমতি প্রদান করেছেন (মার্ক ১০, ১১ এবং লুক ১৬; ১৮)। যদি এই দুটি সুসমাচারের বিবরণকে ম্যাথুর নামে প্রচারিত সুসমাচারের চেয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচনা করা হয় তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, যিশু মহৎ আবেগ প্রচার করেছেন এবং নৈতিকতার উচ্চনীতি মুদ্রিত করেছেন, কিন্তু তাঁর বাণীকে অপরিবর্তনীয় ও সদর্থক আইন হিসেবে বিবেচনা করা হোক এটা ইচ্ছে করেনি কিংবা নীতিহীনতা ও অধর্মে বর্ধমান জোয়ারকে প্রতিরোধ করা ব্যতীত অন্য কোন ধারণাও তাঁর ছিল না। সেণ্ডেন মনে করেন যে, একটি চাতুর্যপূর্ণ উত্তর দিয়ে যিশু চেয়েছিলেন "শামাই" বা "হিশাম" সম্প্রদায়ের কাউকেই দোষারোপ না করে এড়িয়ে যেতে। উজোর হেব্রাইকা, ১, ৩, সি. ১৮-২২, ২৮, ৩১। তুঃ গিবনের গ্রীক শব্দ 'পোরনেইয়া' যার ইংরেজী ভাষান্তর 'অবৈধ যৌন সংযোগে' তার উপর মূল্যবান টীকা।

আইন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং খ্রীষ্টান দেশসমূহে বিভিন্ন যুগের অগণিত শর্তাবলী এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আপত্তি তোলে।

আরবদের মধ্যে স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণে তারা মানবতা বা ন্যায়বিচারের কোন তোওয়াক্কা করত না। মুহম্মদ বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথাকে চরম অননুমোদনের দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং প্রথার অনুশীলনকে সমাজের ভিত্তি ধ্বংসকারী বলে বিবেচনা করেছেন।[১] তিনি বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, দাসকে মুক্ত করার চেয়ে অন্য কিছুই আল্লাহকে অধিক পরিতৃপ্ত করে না, আর বিবাহ-বিচ্ছেদের চেয়ে অন্য কিছুই তাঁকে অধিক অসন্তুষ্ট করে না। যা'হোক সমাজের তৎকালীন অবস্থায় প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা সম্ভব ছিল না। তাঁকে একটি অসংস্কৃত ও অর্ধ-বর্বর জাতির মানসিকতাকে উচ্চতর বিকাশের পথে চালিত করতে হয়েছিল যাতে যথাসময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হতে পারে। প্রথাটি একটি অবিমিশ্র অমঙ্গল ছিল না; তিনি সেই অনুযায়ী স্বামীকে কতিপয় শর্তাধীনে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদকারী দু'টি দলকে নির্দিষ্ট সময় দান করেছিলেন যার মধ্যে তারা একটা সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেতে পারে ও বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যদি সমন্বয়ের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয় একমাত্র তখনই তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ কার্যকর হল বলে ঘোষিত হবে। দাম্পত্য বিরোধের ক্ষেত্রে দুই বিরোধী দলের মনোনীত সালিশদের মাধ্যমে তিনি মীমাংসায় পৌঁছানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

যার চেয়ে পাশ্চাত্যের কোন লেখকই মুহম্মদের আইনসমূহের উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করেননি সেই এম. সেডিলটের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ রয়েছে বর্তমান বিষয়ের উপর :

"বিবাহ-বিচ্ছেদ (তালাক) অনুমোদিত হত কতিপয় আনুষ্ঠানিকতার অধীন যা অনুমতি দিত দ্রুত গৃহীত বা সুচিন্তিত নয় এমন সিদ্ধান্ত বাতিল করতে। এক এক মাসের ব্যবধানে পর পর তিনটি ঘোষণা একে অপরি-বর্তনীয় করতে অপরিহার্য ছিল।"[২]

প্রাচ্য আইনের ইতিহাসে মুহম্মদের সংস্কারসমূহ এক অভিনব পথ

---

১. কোরআন : সূ. ২ আ. ২২৬।

২. সেডিলট, 'হিস্টোয়ার ডুজ অ্যারাবশ' ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫।

পরিবর্তন। তিনি স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ক্ষমতার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ আনয়ন করেন; তিনি সঙ্গত কারণের ভিত্তিতে নারীদেরকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা দান করেন এবং তাঁর জীবনের শেষের দিকে তিনি সালিশ বা বিচারকের মধ্যস্থতা ছাড়া স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতার অনুশীলন বস্তুতঃ নিষিদ্ধ পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন "সমুদয়, অনুমোদিত বস্তুর মধ্যে আল্লাহর কাছে 'তালাক' বিবাহ-বিচ্ছেদ সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য", কারণ এটা দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তির প্রতিবন্ধক এবং সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত লালন-পালনের পথে বাধাস্বরূপ। প্রাচীন প্রথার প্রতি কোরআনের সামান্য সম্মতি থাকলেও তা আইনবেত্তার ঘোষণার আলোকেই প্রণিধানযোগ্য। যখন একথা আমরা মনে রাখি যে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আইন ও ধর্ম কত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর বাণীর প্রভাব অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাভাবিকভাবেই, স্বামী কর্তৃক আনীত প্রস্তাব ও বিচারকের মধ্যস্থতা ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিচারকদের এক বৃহৎ প্রভাব-শালী দলের মতে স্ত্রীর ব্যভিচারের মতো অনিবার্য অপরাধ ছাড়া স্বামী দ্বারা আনীত তালাক যথার্থই নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। অপর দল, প্রধানতঃ মুতাজিলারা 'হিফামুশ শারা'র অনুমোদন ব্যতিরেকে তালাক অনুমোদনযোগ্য বা আইনসঙ্গত বলে বিবেচনা করেন না। তাঁরা অভিমত পোষণ করেন যে, যে ধরনের দৃষ্টান্ত বিবাহ-বিচ্ছেদকে যৌক্তিক প্রতিপন্ন করতে পারে এবং তালাককে নিষিদ্ধ শ্রেণী থেকে দূরীভূত করতে পারে শুধু তা-ই নিরপেক্ষ বিচারক কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়া উচিত। তাদের মতের সমর্থনে তারা হযরতের পূর্বোদ্ধৃত বাণী ও নির্দেশের বরাত দেন যে বিবাহিত দু' পক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে তাদের মতপার্থক্যের মীমাংসার জন্য সালিশ নিযুক্ত হওয়া উচিত।

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী মযহাবসমূহ এবং শিয়াদের এক সংখ্যা-গরিষ্ঠদল 'তালাক' অনুমোদিত বলে অভিমত পোষণ করেন, যদিও তাঁরা কারণ ব্যতীত বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতার ব্যবহারকে অবৈধ বলে বিবেচনা করেন।

'তালাক বেআইনী' এই বাক্যের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ বর্ণনার পর 'রাদ্দুল মাহতার' বলেন, "নিঃসন্দেহে তালাক নিষিদ্ধ, তবে কতকগুলি,

বাইরের কারণে এ 'মুবাহ' (অনুমোদিত) হয় এবং যেসব বিচারক একে যথার্থই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এটা তাদের মত-সমর্থিত অর্থ।"

যদিও "ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা" অস্থায়ী অনুমতিকে সদর্থক নিয়ম বলে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষাগুরুর আরোপিত অনেক সমতা নীতিসমূহ উপেক্ষা করেছেন, তথাপি আইনবেত্তাদের লিপিবদ্ধ নিয়মসমূহ গির্জার প্রাঙ্গণে বিকশিত সর্বাপেক্ষা নিখুঁত রোমান আইনের নিয়মসমূহের তুলনায় নারীদের প্রতি অধিকতর মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত।[১] আইন-প্রণেতাদের মতে স্ত্রীও মন্দ আচরণ, যথোপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন ও অন্যান্য অনেক কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করতে পারে ; কিন্তু যদি সে বিবাহ-বিচ্ছেদের সমর্থনে অত্যন্ত ভাল ও শক্ত কারণ না দেখাতে পারে, তবে সে তার ফায়সালা বা যৌতুক হারাবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যখন বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বামীর তরফ থেকে উদ্ভূত হয় (পরিষ্কার অবিশ্বাস ব্যতিরেকে), তখন তাকে বিবাহের সময় স্থিরীকৃত সমুদয় দেনা শোধ করতে হয়।[২]

---

১. মিলম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮, ৩৬৯।

২. মি. সেডিলট আরও বিশেষ শর্ত সম্পর্কে বলেছেন যা (সুন্নী মজহাব অনুযায়ী) পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ দিয়ে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়—এ এমন একটি অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ পদক্ষেপ যা বিচ্ছেদকে অধিকতর বিরল করে তোলে। মূয়ির এমন একটি শর্তকে অপরিহার্য করায় মুহম্মদকে নিন্দা করেছেন (৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬)। তিনি উপেক্ষা করেছেন যে আরবদের মতো একটি গর্বিত, বিদ্বেষপরায়ণ ও অনুভূতিশীল জাতির জন্য এরূপ একটি শর্ত একটি প্রবলতম প্রতিষেধকের কাজ করেছিল। তিনি যে প্রবাদ বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন তা সেই ব্যক্তির দুর্নাম দেখানো উচিত ছিল যার সঙ্গে তা জড়িত ছিল, যে তার স্ত্রীকে এমন একটি "অবমাননাকর পরীক্ষার" মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করে। আমার ভয় হয়, মুহম্মদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার জন্য মূয়ির বিস্মৃত হয়েছেন যে এই শর্ত ইহুদী ও পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে প্রচলিত ন্যক্কারজনক প্রথাকে দমন করার এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে খ্রীষ্টানদের মধ্যে সামান্য কারণে বিবেচনাহীন প্রবৃত্তি ও খামখেয়ালীর বশে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিরুৎসাহীত করার জন্য উদ্দিষ্ট হয়েছিল। এই প্রতিবন্ধকতার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর একটি সবচেয়ে সংবেদনশীল জাতিকে তাদের স্বভাবের সবচেয়ে শক্তিশালী অনুভূতি সম্মানবোধের উপর কাজ করে পৃথিবীর একটি সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করা (তুঃ সেল—'প্রিলিমিনারী' ডিসকোর্স পৃ. ১৩৪)। স্যার ডবলু. মূয়ির আরও বিস্মৃত হয়েছেন যে শিয়া পণ্ডিতদের অনেকেই স্ত্রী পুনঃ গ্রহণের পূর্বে তার তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহের বাধ্যবাধকতা বা যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। (তুঃ ম্যালকম—'হিস্ট্রী অব

কোরআনে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ উপদেশ, ব্যক্তিগত সমন্বয়ের মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার বারবার সুপারিশ আরবের আইন-প্রণেতার দৃষ্টিতে বিবাহের চরম পবিত্রতার নির্দেশক :

"যখন কোন স্ত্রীর মনে এমন আশঙ্কা দেখা দেবে যে তার স্বামী হয়ত খারাপ ব্যবহার করবে কিংবা অবহেলা করবে। তাহলে তাদের দু'জনার মধ্যে আপোষরফা করায় মোটেই গোনাহ নেই।[১] মিটমাট করে ফেলাই তো ভাল। মনের কাছে লোভটাইতো হাজির রয়েছে। তোমরা যদি ভাল ব্যবহার কর, সংযত হও, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সব খবরই রাখেন। তোমরা কখনও সব স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবে না। মন তোমাদের যাই চায় না কেন[২] কোনও দিকে তোমরা একেবারে ঝুঁকে পড়ো না, যাতে কাউকে এমন অবস্থায় ফেলে রাখবে যেন সে একদিকে ঝুলে রয়েছে। তোমরা যদি সংশোধন করো ও সংযত হও—তাহলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[৩]

আর এই সুরার একটি পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষিত হয়েছে : "তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় যে তাদের মধ্যে বিরোধ মনোভাব রয়েছে, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ, আর স্ত্রীর পরিবার থেকে আর একজন সালিশ নিযুক্ত কর। তারা যদি দু'জনার মধ্যে আপোষরফা করে দিতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিটমাট করার তওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুই জানেন, তিনি সব খবরই রাখেন।"[৪]

পারসিয়া' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১ এবং 'মাবসুত')। আমার দিক থেকে আমি বিশ্বাস করি যে "যখন তোমরা কোন স্ত্রীলোককে তালাক দাও এবং তাকে বিদায় দেওয়ার সময় আসে, বদান্যতার সঙ্গে তাকে বিদায় কর, জোর করে তাকে রেখো না যার ফলে তাদের প্রতি অসঙ্গত আচরণ হবে" পূর্ববর্তী আয়াতকে নাকচ করে যাতে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্তিতা প্রয়োজন।

১. আরবীতে এই শব্দটি "এটা হবে প্রশংসনীয়" ইত্যাদি।

২. এ যেসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপিত করে যাঁরা বলেন ইসলামের পরিণতি আইন বহুবিবাহ সমর্থন করে। এটা ঘোষিত হয়েছে যে সমব্যবহার মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই আমরা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করব যে আইনপ্রণেতার দৃষ্টিতে ছিল উচ্চতর নীতির মধ্যে নিম্নতর নীতিকে সংমিশ্রিত করা এবং যে প্রথা সমাজের বিকাশের এক পর্যায়ে অপরিহার্য ছিল তা চিন্তা ও নৈতিকতার পরবর্তী বিকাশে বিরোধী হ'য়ে দেখা দিয়েছিল তার অপসারণ।

৩. সু. ৪ আ. ১২৮, ১২৯।

৪. সু. ৪ আ. ৩৫।

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রতি যে পবিত্রতা সংশ্লিষ্ট হয়েছে তা অমুসলিমরা হয় অনুধাবন করেনি, নয় যথোপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করেনি। আসবাহ উন্ নাজায়ের বলেন, "বিবাহ সমাজ সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠান; মানুষকে মন্দ কার্য ও যৌন অশুচিতা থেকে রক্ষা করার জন্য এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।" "বিবাহ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান যতখানি এ এই জগতে 'ইবাদত' বা উপাসনা, কেননা এ মানবজাতিকে পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে।"…"মানবসন্তানদের মধ্যে ঐশী আদেশে এই অনুষ্ঠানের জন্ম।" "চুক্তি হিসেবে যখন বিবেচিত হয় তখন বিবাহ একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী সম্পর্ক। তাদের মধ্যে বৈধ মিলনে কোন বাধা নেই।"

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে চারটি বৈধ স্ত্রী ছাড়াও মুহম্মদ তাঁর শিষ্যদেরকে যত খুশি মহিলা ভৃত্য রাখতে অনুমতি দিয়েছেন। এ বিষয় সম্পর্কীয় বিধির উপর একটি সরল বিবৃতি সরাসরি দেখাবে যে এই ধারণা ইসলামের প্রকৃত নীতিসমূহের সঙ্গে কতখানি বিরোধ-পূর্ণ। "তোমাদের মধ্যে যাদের পূর্ণ সঙ্গতি নেই যা দিয়ে সম্ভ্রান্ত মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করবে, তারা নিজেদের মুসলিম বাঁদীদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করুক। …তোমাদের মধ্যে যার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মতো আশঙ্কা রয়েছে এ ব্যবস্থা তারই জন্য। তবে তোমরা যদি সংযমী হও তাতেই তোমাদের মঙ্গল হবে।" (৪:২৫)

এই ক্ষীণ সূত্র ধরে এবং মুসলিম প্রজাতন্ত্রের আদি উত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কতিপয় অস্থায়ী ও আকস্মিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমাদের আইন প্রণেতারা দাসী রাখার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এটা ধর্মগুরুর শিক্ষার পরিপন্থী ছিল, তা বিরোধী ধর্মতাত্ত্বিকদের প্রবল সমালোচনা তুলেছিল।

প্রভু ও দাসের মধ্যে অবৈধ যৌন মিলন আরব, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য প্রতিবেশী জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। প্রথমে হযরত এই প্রথা বর্জন করেননি কিন্তু তাঁর কার্যকালের শেষের দিকে তিনি সুস্পষ্টভাবে এই প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

"পবিত্র স্বভাবের মুসলিম নারী ও পবিত্র স্বভাবের যে সব মহিলা, যাদের কাছে তোমাদের আগে কিতাব দান করা হয়েছে, তাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হল। তবে যখন তোমরা তাদের মোহরানা

আদায় করবে। ঘর সংসার করার উদ্দেশ্যে—দেহের ক্ষুধা মেটানোর জন্য প্রকাশ্য অপকর্ম কিংবা গোপন অভিসারের জন্য নয়।”[১]

এই নির্দেশের প্রথমাংশের সঙ্গে খ্রীষ্টান যাজকতন্ত্রে সংরক্ষণের সঙ্গে তুলনা করুন ; এ একজন খ্রীষ্টানের সঙ্গে একজন অ-খ্রীষ্টানের বিবাহকে বৈধ কিংবা আইনসঙ্গত বলে স্বীকার করত না। কোন খ্রীষ্টানকে বিবাহ করার দুঃসাহসের জন্য “কাফির” (অবিশ্বাসী)-কে প্রায়ই জীবন্ত দগ্ধ করা হত। মানবসভ্যতায় মুহম্মদের নিয়ম একটি সুস্পষ্ট অগ্রগতি ছিল।

মুসলিম নারীর পক্ষে অ-মুসলিম পুরুষকে বিবাহ করার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের মধ্যবিন্দু হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা নীতির যৌক্তিকতা ও আদি প্রজাতন্ত্রের প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে মুসলমানেরা প্রাক্-ইসলামী যুগ—‘আইয়্যামে জাহেলিয়াত’ থেকে যেসব প্রথা গ্রহণ করেছিল যেগুলি বহু প্রাচীন প্রথার মতো টিকেছিল সেগুলি মুসলমান জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। সেগুলির মধ্যে নারীজাতির অবরোধ ব্যবস্থা অন্যতম। আদি কাল থেকেই অধিকাংশ জাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। অবরোধ প্রথা এথেন্সবাসীদের মধ্যে সুপরিচিত প্রথা ছিল ; এথেনীয় ‘হারেমে’র অধিবাসীদেরকে তখনকার পারসিক হারেমের অধিবাসীদের মতো কিংবা বর্তমান ভারতীয় পরিবারের মতো সন্দিগ্ধ চিত্তে সতর্কতার সঙ্গে প্রহারাধীন রাখা হত। প্রাচ্যের অংশের মতো নপুংসকরা নারীদের গোপনীয়তার প্রতি বিশ্বস্ত প্রহরার কাজ করত এবং এথেন্সের মহিলাদের প্রতি কড়া নজর রাখত। নারীদের অবরোধ স্বাভাবিকভাবেই ‘হেতাইরায়’ গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল এবং তারা এথেন্সের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, এটা বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা কর্তৃক উপস্থাপিত অসাধারণ ও প্রায় দুর্বোধ্য চিত্রের জন্য না হলে আমরা বলতাম যে, সভ্য জীবনের পথে অগ্রগতিসম্পন্ন প্রত্যেক সমাজে অপরিতৃপ্ত শ্রেণীর বিকাশ, যাদের অস্তিত্ব মানবতার প্রতি নিন্দা ও সভ্যতার প্রতি অবমাননার সমান, পুরুষের মনের উপর স্ত্রী-জাতির সমুন্নতকারী, শুচিশুদ্ধকারী ও মানবতার প্রতি করুণার উদ্রেককারী প্রভাবের অপসারণের জন্য। মানব-মন যখন নির্ভেজাল পরিচ্ছন্ন কোন

---

১. সু. ৫ আ. ৫।

কিছু দেখতে পায় না তখন সে ভেজাল বা অপরিচ্ছন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যাবিলোনীয়, এটরাসক্যান, এথেনীয়গণ এবং প্রাক-ইসলামী মক্কার অধিবাসীরা প্রাচীনকালে এই মতবাদের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। আধুনিক কালে যে সামাজিক দুষ্টক্ষত জাতিসমূহের হৃদপিণ্ড ব্যাপকভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে ও তাদের রক্ত দূষিত করছে তার কারণ ধর্মের ক্ষীণ ছদ্মবেশসহ খোদা-বিহীন জড়বাদের প্রসার, সে ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম হোক, ইসলামধর্ম হোক কিংবা অন্য কোন ধর্ম হোক। মুহম্মদ তাঁর প্রথম জীবনে দুঃখবেদনার সঙ্গে মক্কা-বাসীদের নীতিভ্রষ্টতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তা নির্মূল করার জন্য যুগ ও জাতির উপযোগী সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। মি. বসওয়ার্থ স্মিথের বর্ণনাত্মক ভাষা প্রয়োগ করে বলা যায় "প্রথমে এই কঠোর আইনের সাহায্যে এবং পরে এই আইন কর্তৃক উদ্দীপিত প্রবল নৈতিক আবেগের বলে তিনি আজকের দিন পর্যন্ত এবং অনেকাংশে যা কোথাও হয়নি, মুসলমান দেশসমূহকে মুক্ত করতে সফলকাম হয়েছেন"—যেখানে বিদেশী প্রভাবের বাড়াবাড়ি অত্যধিক নয়—"সেসব পেশাদার সমাজভ্রষ্টদের থেকে যারা তাদের দুঃখময় জীবন নির্বাহ করে এবং একটি স্বীকৃত শ্রেণী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব, তারা যে শ্রেণীর অংশ সেই শ্রেণীর প্রত্যেকের কাছেই স্থায়ী গ্লানির বিষয়।"

নারীজাতির অবরোধমূলক ব্যবস্থা অস্থির ও অমার্জিত সম্প্রদায়-সমূহের সামাজিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা বহন করে। আর যে দেশে সংস্কৃতি ও নৈতিক ধারণার বৈচিত্র্য অনেক, সেখানে মোলায়েম ধরনের অবরোধ প্রথা সম্পূর্ণ নিন্দনীয় নয়। বর্তমানে এই প্রথা কম-বেশী কঠোরভাবে মুসলিমপ্রভাব থেকে দূরবর্তী জাতিসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। কোরিয়ায় নারী অবরোধ অসঙ্গত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। চীন এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিশ উপনিবেশ যা ইউরোপীয় সামাজিক বিধানের অধীন নয়। সেখানে 'পর্দা' প্রথা এখন প্রচলিত রয়েছে। ইসলামের নবী পারসিক ও প্রাচ্যের সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন দেখতে পেয়েছিলেন; তিনি এর সুবিধাগুলি লক্ষ্য করে-ছিলেন এবং সম্ভবত জাতির বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক নৈতিক শৈথিল্যের দরুন তিনি নারীজাতির প্রতি পর্দাব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন। তিনি নারীজাতির জন্য পর্দাপ্রথার বর্তমান অনমনীয়রূপ অনুমোদন করেছিলেন কিংবা তিনি নারীজাতির অবরোধের অনুমতি দিয়েছিলেন এরূপ অনুমান করা তদীয় সংস্কারসমূহের মনোভাবের সম্পূর্ণ

বিরোধী। নারীজাতির অবরোধ নতুন ধর্মমতের অংশ কোরআন এই মর্মে কোন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে না।

"হে নবী! আপনি শুনুন: আপনি আপনার স্ত্রী কন্যা আর মোমিন মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন যেন নিজেদের ঘোমটা টেনে নিচু করে নেয় যাতে তাদেরকে চিনতে পারা যায়, তাহলে তাদেরকে আর পীড়া দেওয়া হবে না। আল্লাহ তো বড় ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[১]

"আপনি মুমিন স্ত্রীলোকদের বলে দিন—তারা যেন নিজেদের চোখ নীচের দিকে ঝুকিয়ে রাখে ও গোপন অঙ্গের হিফাজত করতে থাকে আর নিজেদের সাজসজ্জা যেন প্রকাশ না করে—তবে কিনা যতটুকু প্রকাশ্য অবস্থায় থাকে তা ব্যতীত। আর নিজেদের গলায় ওড়না ব্যবহার করবে।"[২]

যে সামাজিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি আল্লাহর নির্দেশে শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন—প্রজ্ঞাসম্মত ও করুণাব্যঞ্জক আইন-সমূহ যার উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতির মধ্যে শোভনতার বিকাশ সাধন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণের অগ্রগতি, অবমাননা থেকে নিষ্কৃতি[৩] সেই নির্দেশনা সহজেই অনুধাবন করা যায়।[৪] কাজেই এটা অনুমান করা ভ্রমাত্মক যে আইনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা প্রথাটি চির-স্থায়িত্বের দিকে টানে। নারীদের গোপনীয়তার প্রতি আইনদাতার

---

১. সু. ৩৩ আ ৫৯।　　২. সু. ২৪ আ. ৩১।

৩. 'হেদায়া'র অনুবাদক হামিল্টন 'অবমাননা অধ্যায়ে'র প্রাথমিক আলোচনায় বলেছেন, "বিষয়টি বহু চটুল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে এবং অবশ্যই তা 'স্বামীত্ব ও শালিনতা' আলোচ্য সূচীর আলোকে বিবেচিত হওয়া চাই, এতে নারীর সতীত্বের প্রতি বিবেচনা প্রসূত মনোযোগ প্রদর্শিত হয়েছে, এমন কি চিন্তার ক্ষেত্রেও যাতে তা এড়িয়ে যাওয়া না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। যা হোক এটা উল্লেখযোগ্য যে, কতিপয় লেখক সেভাবে দাবী করেছেন, এটা তেমনি সম্পূর্ণ অবরোধ। বিচ্ছিন্নতার দিকে যায় না। বাস্তবিক অবরোধ। বিচ্ছিন্নতা 'ঈর্ষা বা অহঙ্কারের ফল এবং আইন অধ্যাদেশের পরিণতি নয়—হেদায়ার এই অংশে ও অন্যান্য অংশে যেরূপ বর্তমান। মুসলিম-দেশ-সমূহে এই প্রথা সার্বজনীনভাবে অনুসৃত হয় না। মার্সডেন্ তাঁর 'ট্র্যাভেলস' গ্রন্থে বলেছেন, "জাভাতে যেসব মুসলমান বসতি স্থাপন করেছে তারা এই প্রথা পালন করেনি; জাভার মুসলিম নারীরা তাদের ডাচ ভগিনীদের মতোই স্বাধীনতা ভোগ করে।

৪. যারা ইউরোপভাবসমৃদ্ধ মিশরে ও লেভান্টে ভ্রমণ করেছেন তাঁরা বুঝবেন যে সে সময়ে এই ধরনের নির্দেশ কতই না অপরিহার্য ছিল।

অনুমোদনের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রতিবন্ধকতা বা অবরোধ থেকে উল্লেখযোগ্য মুক্তি সর্বদা উপভোগ করত। আবু বকরের কন্যা আয়েশা, খাদিজার মৃত্যুর পর মুহম্মদের সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছিল, আলীর তিনি বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিখ্যাত উটের যুদ্ধে তিনি তাঁর নিজের সেনাদলের পরিচালনা করেছিলেন। হযরতের কন্যা ফাতিমা খেলাফতের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আলোচনায় প্রায়ই অংশ গ্রহণ করতেন। মুহম্মদের পৌত্রী, হোসাইনের কন্যা জয়নব কারবালার হত্যাকাণ্ডের পরে উমাইয়াদের কবল থেকে তাঁর তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর অপ্রতিরোধ্য মনোভাব নরপিশাচ আব্দুল্লাহ বিন জিয়াদ ও নির্দয় ইয়াজিদকে সমভাবে হতবাক করেছিল।

নৈতিকতার অধঃপতন প্রাক্ইসলামী আরবদের এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সমাজের ভিত্তিকে সমূলে বিনাশ করেছিল এবং তার আশু সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। নারীদের গোপনীয়তা সম্পর্কীয় হযরতের পরামর্শ নিঃসন্দেহে নীতিহীনতার জোয়ার প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহু স্বামীত্বের ছদ্মবেশী প্রথা যা তখন পর্যন্ত পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ভন হ্যামারের মতে "হারেম হল পবিত্র স্থান; অপরিচিতদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, এজন্য নয় যে রমণী জাতি অবিশ্বাস্য, বরং প্রথা ও সমাজব্যবস্থা যে পবিত্রতা তাদের প্রতি আরোপ করেছে সেজন্য। সমগ্র উচ্চ এশিয়া ও ইউরোপে (মুসলিম সমাজে) যে মাত্রায় নারীজাতির প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে তা এমন একটি ব্যাপার যা বিশদভাবে প্রমাণসক্ষম।"

নারীত্বের আদর্শীকরণ যাবতীয় উচ্চতম স্বভাবের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জাতীয় অহঙ্কার ও ধর্মান্ধতা আধুনিক খ্রীষ্টান জাহানে সংস্কৃতিবান শ্রেণীর মধ্যে নারীজাতির সামাজিক সমুন্নতি সম্পর্কে দু'টি ভিন্ন মতবাদের জন্ম দিয়েছে। একটি মতবাদ কুমারী মেরীর পূজায়, অপর মতবাদ মধ্যযুগীয় শৌর্য প্রদর্শনে একে আরোপিত করে—টিউটনিক প্রথা এই মতবাদদ্বয়ের প্রসূতি বলে প্রতিপন্ন। খ্রীষ্টধর্মে নারীজাতি সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। প্রথম যুগে যখন উঁচু-নীচু, শিক্ষিত-মূর্খ, সকল মানুষের ধর্ম ছিল যিশু-মাতার পূজা, তখন ধর্মযাজকেরা লিঙ্গের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ধর্মযাজকেরা সবাই নারীজাতির অপরাধ, তাদের মন্দ

প্রবণতা, তাদের অবোধ্য বিদ্বেষ সম্পর্কে পর্যাপ্ত লিখেছেন। টারটুলিন তাঁর লিখিত একখানি গ্রন্থে জনসাধারণের অনুভূতিকে রূপ দিয়েছেন যেখানে তিনি নারীজাতিকে "শয়তানের দ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের মোহর উন্মুক্তকারী ঐশী আইনের প্রত্যাখ্যানকারী, খোদার প্রতিবিম্ব—মানুষের ধ্বংসকারী" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপর একজন বিশেষজ্ঞ বিদ্রোহাত্মক ঔদাসীন্য নিয়ে ঘোষণা করেছেন "তিনি নারীদের মধ্যে সতীত্বের অনুসন্ধান করেছেন কিন্তু পাননি।" ক্রাইসস্টম উচ্চ মার্গের একজন সাধুপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। লেকী বলেছেন" তিনি ধর্মযাজকদের সাধারণ অভিমতের ব্যাখ্যা করেছেন—তিনি নারীজাতিকে একটি অনিবার্য অমঙ্গল, একটি স্বাভাবিক প্রলোভন, একটি কাম্য অনর্থ, একটি পারিবারিক বিপদ, একটি মারাত্মক আকর্ষণ, একটি চিত্রিত পাপ বলে ঘোষণা করেছেন।" গোঁড়া ধর্মমত একেবারে নীচতম কাজ ছাড়া সর্ববিধ ধর্মীয় অনুশীলন থেকে নারীদেরকে বাদ দিয়েছিল। তারা সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল; জনসাধারণের মধ্যে, ভোজসভায় কিংবা সান্ধ্য আমন্ত্রণ সভায় তাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাদেরকে "বিভিন্নভাবে থাকতে" নীরবতা পালন করতে তাদের স্বামীর প্রতি আনুগত্য দেখাতে, সূতা কাটা, বয়ন ও রন্ধনের কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদি তারা কোন সময়ে বাড়ীর বাইরে বের হত তবে তাদেরকে আপাদমস্তক আবৃত হয়ে বের হতে হত। যখন মেরীর উপাসনা সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল তখন খ্রীষ্টধর্মে এ-ই ছিল নারীর অবস্থা। পরবর্তীকালে এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের উৎখাত এবং ইউরোপে আধুনিক সমাজের উদ্ভবের মধ্যবর্তী সময়ে, যে যুগকে "লুণ্ঠন, মিথ্যা, জুলুম, লালসা ও নির্যাতনের যুগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে", খ্রীষ্টধর্ম সন্ন্যাসিনীদের জন্য মঠ স্থাপন করে কোন কোন দিক দিয়ে নারীজাতির অবস্থার উন্নতি বিধানে যত্নবান হয়েছিল। এই বিতর্কমূলক উন্নতি এমন একটি যুগের উপযোগী ছিল যখন নারীহরণ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছিল, এবং লাম্পট্য এক বর্ণনাতীত অবস্থায় পৌঁছেছিল; কিন্তু মঠ যে সর্বদা সদাচরণের স্থান ছিল কিংবা কৌমার্যের অনুশীলন যৌনশূচিতার নিশ্চয়াত্মক রক্ষাকবচ ছিল এমন নয়। আর্চবিশপ রিগড়ের যাজকীয় পরিদর্শন বই বিশ্বাসের যুগের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কালের নৈতিকতা ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাব সামাজিক অবস্থার মধ্যে কিংবা নারীজাতির মর্যাদা সম্পর্কে আইনজীবীদের ধারণার মধ্যে কোনরূপ

রদবদল ঘটাতে সমর্থ হয়নি। যিশুখ্রীষ্ট নারীজাতির সঙ্গে মানুষের মতো আচরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুসারীরা তাদেরকে ন্যায়বিচার মঞ্জুর করেননি।

যে অপর মতবাদটির প্রতি আমরা মনোযোগী হয়েছি তা ইউরোপের ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রচলিত। তারা মধ্যযুগের প্রত্যেক ঐতিহাসিক পুরুষকে এক একজন বেয়ার্ড বা ক্রিচটন হিসেবে প্রতিবেদিত করে। মধ্যযুগের শৌর্যবীর্যের যুগ অষ্টম শতাব্দীর সূচনা থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে সাধারণত মনে করা হয়—এমন একটি কাল, যা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, স্পেনে মুসলমানদের রাজত্বের প্রায় সমকালীন এই সময়ে কবিতা ও কল্পনাধর্মী উপন্যাস সামাজিক অবস্থাকে আলোকোজ্জ্বল আভায় রঞ্জিত করলেও নারীজাতি প্রায়ই নির্যাতনের শিকার হত। বল প্রয়োগ ও প্রতারণা ছিল খ্রীষ্টান মধ্যযুগীয় শৌর্যের সোনালী যুগের প্রভেদাত্মক বৈশিষ্ট্য। প্রতীচ্য প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত রোনাল্ড ও আর্থার ছিল পৌরাণিক কথা। মধ্যযুগীয় শৌর্যবীর্যের ব্যাপারটি স্ক্যান্দিনেভিয়ার জঙ্গল বা জার্মানির অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের ফল নয়;—প্রেরিতত্ত্ব ও মধ্যযুগীয় শৌর্য বা শিভালরি সমভাবে মরুভূমির সন্ততি। মরুভূমি থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন মুসা, যিশু ও মুহম্মদ; আন্তার, হামজা ও আলী।

শহর ও পল্লীতে বসবাসকারী আরবদের মধ্যে যারা সিরীয়, পারসিক ও রোমানদের মধ্যে প্রচলিত শিথিল নৈতিকতা গ্রহণ করেছিল নারীজাতির অবস্থা আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি তেমনি চরম অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁছেছিল। যাযাবর আরবদের মধ্যে কিছু কিছু লোক বহুল পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করত এবং তাদের গোত্রসমূহের সৌভাগ্যের উপর অত্যধিক প্রভাব প্রয়োগ করত। পেরন বলেছেন, "গ্রীকদের মধ্যে যেমন ছিল তারা তেমনি দুর্দশার অধীন ছিল না।" তারা যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করত এবং বীরত্বের পথে তাদের অনুপ্রাণিত করত; অশ্বারোহী সৈন্যরা ভগিনী, স্ত্রী বা তাদের প্রেমিকাদের গান গাইতে গাইতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত। তাদের ভালবাসার পুরস্কার ছিল তাদের পরাক্রমের সর্বোচ্চ মূল্য। সাহসিকতা ও উদারতা ছিল পুরুষের মহোত্তম গুণ এবং যৌনশুচিতা ছিল নারীর মহোত্তম গুণ। কোন গোত্রের একজন মহিলাকে অবমাননা করলে উপদ্বীপের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠত। যে "অবমাননাজাত যুদ্ধ" চল্লিশ

বছর পর্যন্ত চলেছিল এবং যে যুদ্ধ হযরত বন্ধ করেছিলেন তা শুরু হয়েছিল ওকাজ মেলায় এক তরুণীর অপমানকে কেন্দ্র করে।

মুহম্মদ এই অনিয়মিত প্রথাকে একটি চিরস্থায়ী ধর্মমতে রূপ দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাদেশের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যুগের রুক্ষ ও যাজকীয় সরলতা প্রতিফলিত হয়েছে এমন বহু নির্দেশ সহ তার নিয়মাবলী এমন বীর্যবান মনোভাবের সূচনা করেছে যা পূর্ববর্তী ধর্মগুরুদের শিক্ষার মধ্যে মেলে না। খ্রীষ্টধর্মের মতো ইসলাম বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন যুগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন; সর্বোপরি সত্যকার শৌর্য প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে যত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত গঠনমূলক ধর্মের অন্য কোন রূপ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ততখানি নয়।

ইসলামে বীর, 'হিল্‌ফুল ফুজুল'-এর প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত শিষ্য খোদার শত্রুর বিরুদ্ধে বল্লম ও তরবারী নিয়ে যেমন যুদ্ধ করার জন্য সদা প্রস্তুত সে দুর্বল ও মজলুমের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যও তেমনি যুদ্ধ করার জন্য সদা প্রস্তুত। ইরাকের প্রান্তরে হোক নতুবা দেশের নিকটবর্তী কোন স্থানে হোক দুঃখ-দুর্দশার ক্রন্দনরব কোনদিন অন্যায়-ত্রাস বীরকে অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যে উপস্থিত হতে বিফল করেনি। তার কার্যাবলী পৌরাণিক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল এবং তাবু থেকে প্রাসাদে বাহিত হয়েছিল—এসব পরবর্তী যুগসমূহের পরাক্রমকে প্রভাবিত করেছে। খলিফা তাঁর সান্ধ্যভোজের সভায় যখন শুনলেন যে একজন আরব কুমারীকে রোমানরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে তখনি তিনি তাঁর ভোজনপাত্র রেখে চেঁচিয়ে উঠলেন "কেন আব্দুল মালিক আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে না?"—তিনি শপথ নিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত কুমারীকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মদ্য বা পানি কিছুই স্পর্শ করবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি রোমান বন্দীশালার দিকে সৈন্য পরিচালনা করলেন এবং কুমারীকে উদ্ধার করে তিনি প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত হলেন। একজন মুগল সম্রাট[১] অপ্রতিরোধ্য শত্রুর চাপের মুখে সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, এমন সময়ে একজন বিদেশী রাণীর ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হস্তের বলয় পেয়ে এবং তার বিপদে সাহায্যের

১. সম্রাট হুমায়ুন আফগানদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে কাবুলের পথে যাত্রা করেন। তখন তিনি যোধপুরের রাণীর 'রাখী' পান এবং তৎক্ষণাৎ তার সাহায্যে অগ্রসর হন। আমি মুসলমানদের শিভালরীর মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এর শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

আহ্বানে তিনি পশ্চাদদিকে সৈন্য পরিচালনা করলেন, তার শত্রুকে পরাজিত করলেন। অতঃপর তাঁর অভিযান পুনরায় শুরু করলেন।

এলনার আন্তারকে "শৌর্যের পিতা" বলেছেন। আলী তার চরম উৎকর্ষের সর্বোচ্চ আদর্শ—তিনি বীরত্ব, সাহসিকতা ও উদারতার প্রমূর্ত দৃষ্টান্ত। তিনি নির্ভেজাল, শান্ত ও সুশিক্ষিত, নির্ভীক ও অনিন্দনীয়—তিনি চরিত্রের বীরোচিত গাম্ভীর্য-ব্যাঞ্জক মহোত্তম উদাহরণ জগতসমক্ষে স্থাপন করেছেন। তাঁর মনোভঙ্গী নেতার মনোভঙ্গীর নির্ভেজাল প্রতি-ফলন। এঁর মনোভঙ্গী সমগ্র মুসলিম জাহানকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং পরবর্তী যুগসমূহের প্রাণবন্তকারী বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছিল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বর্বর ইউরোপকে মুসলিম প্রাচ্যের সংস্পর্শে এনেছিল এবং মুসলমানদের জাঁকজমক ও শিষ্টাচারের প্রতি তার দৃষ্টি উন্মোচিত করে-ছিল; বিশেষ করে মুসলিম আন্দালুসিয়ার যে প্রভাব প্রতিবেশী খ্রীষ্টীয় প্রদেশসমূহে পড়েছিল তা-ই ইউরোপে শিভালরীর / মধ্যযুগীয় শৌর্যের জন্ম দিয়েছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের গীতিকবিরা ও জার্মানীর গায়করা যারা যুদ্ধ চলাকালে প্রেম ও সম্মানের গীত গাইত তারাই কর্দোভা, গ্রানাদা ও মালাগার রোমান্স-লেখকদের অব্যবহিত শিষ্য। পেট্রাক ও বুক্কাকিও, এমন কি ট্যাসো ও চশার ইসলামী উৎস মূল থেকে তাঁদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের বর্বর তাতারদের অভ্যাস ও চিন্তা বিশুদ্ধ শৌর্যের মধ্যে একটা স্থূল চরিত্র এনেছিল।

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে প্রাচ্যে আরবজাতির সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রায় পূর্ব পর্যন্ত নারীরা আজকের আধুনিক সমাজের মতোই সমুন্নত মর্যাদা লাভ করত। হারুন-অর্-রশীদের স্ত্রী জোবাইদা সে যুগের ইতিহাসে এক সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন; তিনি তাঁর গুণাবলী ও কার্যাবলীর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের জন্য একটি সম্মানিত নাম রেখে গেছেন। একজন মদিনাবাসী—ফারুকের স্ত্রী হুমাইদা—যিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নাবালক পুত্রের একমাত্র অভিভাবিকা ছিলেন—তাঁর পুত্রকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন যে, ছেলেটি সে যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আইনজীবী হয়েছিল।[১] সুখাইনা বা সখিনা হোসাইনের[২] কন্যা

---

১. ফারুক সাতাশ বছর ধরে খোরাসানে যুদ্ধরত ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম রাবিব অর রাস।

২. হোসাইন পারস্যের শেষ সাসানীয় নৃপতি ইয়াজদের্জাদের অন্যতম কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

ও হযরত আলীর পৌত্রী—তিনি সে যুগের সর্বাপেক্ষা মেধাসম্পন্না, সর্বাপেক্ষা গুণান্বিতা ও সর্বাপেক্ষা বিদুষী রমণী ছিলেন—পেরন তাঁকে "রমণীকুল শিরোমণি, অনন্যা সুন্দরী, অপরিসীম দয়াময়ী ও সর্বগুণসম্পন্না" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি নিজে উচ্চ পর্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন, আর পণ্ডিত ও সৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রতি মূল্য আরোপ করতেন। হযরতের পরিবারের মহিলারা তাদের বিদ্যাবত্তা, গুণাবলী ও চরিত্রবলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খলিফা মামুনের স্ত্রী বুরান, উম্মুল ফজল—মামুনের ভগিনী যিনি আলী পরিবারের অষ্টম ইমামকে বিবাহ করেছিলেন, উম্মুল হাবিব—মামুনের কন্যা—সকলেই তাদের পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হিঁযরী পঞ্চম শতাব্দীতে শয়খা শুহদা, যিনি 'ফখরুন্নেসা' (নারীকুলের গৌরব) উপাধি পেয়েছিলেন, বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশাল জনসমাবেশে সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র ও কাব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত পণ্ডিত-দের (উলেমা) সমপর্যায়ে আসীন হয়েছিলেন। এই বিদুষী মহিলা যদি সেণ্ট সিরিলের সহধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতেন তবে তাঁর ভাগ্যে কি ঘটত তা হিপাটিয়ার দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে বিচার করা যায়। সম্ভবতঃ অত্যোৎসাহী খ্রীষ্টানরা তাঁকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করত না। তবে নিশ্চিতরূপে তাঁকে ডাইনি হিসেবে পুড়িয়ে মারত। 'জাত-উল-হেম্মা—যার বিকৃত রূপ জেম্মা—"সিংহ-হৃদয়"—বহু যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বা-পেক্ষা সাহসী নাইটদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছেন।[১]

আরবের নবী নারীজাতির পদমর্যাদার উন্নতি বিধান করেছিলেন একথা সব পক্ষপাতহীন লেখকই তা স্বীকার করেছেন, যদিও ধর্মান্ধ তার্কিকরা বলে থাকেন যে ইসলামী ব্যবস্থা নারীজাতির অবস্থাকে অবনমিত করেছে। এর চেয়ে অধিকতর মিথ্যা অপবাদ হযরতের বিরুদ্ধে আরোপিত হয়নি। পূর্ববর্তী সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়ে সর্বাপেক্ষা অনুকূল, বংশীয় ও জলবায়ুর অবস্থার অধীনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল পরিবেশ খ্রীষ্টান জগতের অধিকাংশ দেশে পুরুষদের চেয়ে নারীদেরকে উচ্চতর সামাজিক আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, জন্ম দিয়েছে শালীনতার নীতি যা অন্ততঃপক্ষে দৃশ্যতঃ নারীদেরকে উচ্চতর সামাজিক সম্মান দিয়েছে। কিন্তু খ্রীষ্টান

১. ইসলামে যেসব বিখ্যাত রমণী জন্মেছিলেন তাদের বিষয়ে পূর্ণ বিবরণের জন্য 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরী' মে সংখ্যা, ১৮৯৯ এবং দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্স (ম্যাকমিলান) দেখুন।

জগতের সর্বাপেক্ষা অগ্রগতিসম্পন্ন সমাজেও তাদের আইনগত মর্যাদা কি ? সাম্প্রাতিক কালের পূর্বেও এমন কি ইংলণ্ডেও কোন বিবাহিত স্ত্রী তার স্বামীর থেকে স্বতন্ত্রভাবে কোন অধিকার লাভ করত না। যদি মুসলিম ভগিনীরা আর এক শত বছরের মধ্যে তাদের ইউরোপীয় ভগিনীদের সামাজিক মর্যাদা লাভ না করে তখনি জীবনব্যবস্থা ও জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা যেতে পারে। কিন্তু হযরত এমন এক দেশে, যেখানে কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করা একটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত, এমন এক যুগে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন যখন কোন দেশ, কোন ব্যবস্থা, কোন গোষ্ঠী, কুমারী বা বিবাহিত মাতা বা সহধর্মিনী—কোন নারীকেই কোন অধিকার প্রদান করেনি। এই অধিকার সেদিন বিংশ শতাব্দীতে মাত্র সভ্য জাতিসমূহ অনিচ্ছাসত্ত্বে ও চাপের মুখে অনুমোদন করেছে, হযরতের এই পদক্ষেপ গ্রহণ মানব-জাতির কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে। যদি মুহম্মদ অধিক কিছু নাও করতেন তবুও মানবজাতির কল্যাণকামী হিসেবে তাঁর দাবী অবিসংবাদিত থাকত। বর্তমানে আইনপ্রণেতাদের গ্রন্থে এই আইন যেভাবে রয়েছে তার অধীনেও মুসলিম মহিলাদের আইনগত মর্যাদা ইউরোপীয় মহিলাদের আইনগত মর্যাদার সঙ্গে অনুকূলভাবে তুলিত হতে পারে। আমরা এই বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা নারী সম্পর্কীয় মুসলিম জীবনবিধির শর্তাবলীর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেব। যতদিন পর্যন্ত নারী অবিবাহিত থাকে সে তার পিতৃগৃহে বাস করে; যতদিন পর্যন্ত সে সাবালিকা না হয় ততদিন পর্যন্ত সে কিছুটা তার পিতা কিংবা তার প্রতিনিধির অধীন। সে যখন সাবালিকা হয় তখন আইন তাকে একজন স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে তার প্রতি সব অধিকার আরোপ করে। সে তখন তার ভাইদের সঙ্গে পিতামাতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। যদিও উত্তরাধিকারের অনুপাত ভিন্ন, তবে এই পার্থক্য ভ্রাতা ও ভগিনীর আপেক্ষিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যে নারী আইনের অধিকারপ্রাপ্তা তার নিজের স্পষ্ট স্বীকৃতি ছাড়া তার বিবাহ হতে পারে না, "এমন কি সুলতানও তাকে বিবাহ দিতে পারেন না"।[১] বিবাহের পর তার ব্যক্তিগত সত্তা বিনষ্ট হয় না, সমাজের সদস্য হিসেবে তার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না।

---

১. অনেক শতাব্দীর পর মুসলীম আইনবেত্তারা মূল-নীতিটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, খ্রীষ্টান জগতের নৃপতি ও প্রধানগণ তাদের প্রজাদের সঙ্গে জোর করে মেয়েদের বিবাহ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর অনুকূলে বিবাহ পূর্ববর্তী ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য শর্ত। সে যদি তা করতে অপারগ হয় তবে আইন স্ত্রীর সামাজিক অবস্থা অনুসারে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মুসলিম বিবাহ একটি দেওয়ানী আইন, এতে কোন পুরোহিত, কোন উৎসবের প্রয়োজন হয় না। বিবাহ-চুক্তি পুরুষকে নারীর উপর আইন অনুমোদন করে না এমন কোন কর্তৃত্ব দেয় না কিংবা তার দ্রব্যসম্ভার ও বিষয়-সম্পত্তির উপর কোন অধিকার দেয় না। মাতা হিসেবে তার অধিকার বিচারকের ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করে না। তার নিজের পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন বিনষ্ট করার অধিকার কোন অমিতব্যয়ী স্বামীর নেই কিংবা কোন ইতর ব্যক্তির তাকে অসম্মান করারও কোন অধিকার নেই। আইনের অধিকার বলে সে তার স্বামী বা পিতার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে তার ব্যক্তিগত অধিকারের সীমানায় তার নিজের ও সম্পত্তির যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা করে। কোন বন্ধুর সাহায্য ব্যতিরেকে, স্বামীর নামের ছত্রছায়া ছাড়া সে তার অধমর্ণের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারপ্রার্থী হতে পারে। পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে গমনের পরও সে আইন মোতাবিক তার অধিকার প্রয়োগ করে থাকে। একজন মহিলা ও স্ত্রী হিসেবে সে যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তা "পরিবর্তনশীল" সৌজন্যের বলে নয়, আইনগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আইনের বলে নিশ্চিত। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মুসলিম মহিলার পদমর্যাদা অনেক ইউরোপীয় মহিলার পদমর্যাদার তুলনায় অধিকতর প্রতিকূল নয়, বরং অনেক দিক দিয়ে সে নিশ্চিত উত্তম পদমর্যাদার অধিকারিণী। তুলনামূলকভাবে তার স্থবিরত্ব সাধারণভাবে যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের সংস্কৃতির অভাবের ফলশ্রুতি, আইনবেত্তাদের আইনের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ফল নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলাম ও দাসপ্রথা

"আর তোমাদের দাস সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরতে দেবে।"—হযরত মুহম্মদ (দঃ)।

কোন কোন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে দাসপ্রথাকে যথার্থই বহুবিবাহ প্রথার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বহুবিবাহের মতো দাসপ্রথা সব জাতির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল এবং মনুষ্য-চিন্তার অগ্রগতি ও মানবজাতির মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা বোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্হিত হয়েছে। বহুবিবাহের মতো এই প্রথা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ক্রমবিকাশের বিশেষ পর্যায়ে প্রবলভাবে চিহ্নিত আবেগ ও অহঙ্কারের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। প্রথম থেকেই এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে অন্তর্নিহিত অবিচার।

প্রাথমিক স্তরসমূহে যখন মানবজাতি মানুষের পারস্পারিক অধিকার ও কর্তব্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌছায়নি, যখন আইন বহুর জন্য ব্যক্তি বিশেষ বা কয়েকজন ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যখন শক্তিশালী ব্যক্তির ইচ্ছাই ছিল জীবনের নীতি ও আচরণের নির্দেশিকা, তখন মানবজাতির মধ্যে স্বভাবজাত অনিবার্য সামাজিক, দৈহিক বা মানসিক অসাম্য অবিচ্ছেদ্যভাবে দাসপ্রথার রূপ নিয়েছে এবং একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছে।[১] শক্তিবানদের নিকট দুর্বলদের এই পরিপূর্ণ অধীনতা মানুষের উপর স্থাপিত পৌরাণিক অভিসম্পাত এড়াতে সাহায্য করেছে—"কবরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোরা তোদের ঘর্মসিক্ত পরিশ্রমলব্ধ আহার্য গ্রহণ করবি" এবং মনোমত পেশায় এরূপে অর্জিত বিরতিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করেছে। "এনসিয়েন্ট ল'-এর গ্রন্থকার বলেছেন, "নিজের আরাম আয়াসের জন্য অন্য ব্যক্তির দৈহিক শক্তির ব্যবহারের সরল ইচ্ছা নিঃসন্দেহে দাসপ্রথার ভিত্তি এবং তা মনুষ্যস্বভাবের মতোই পুরাতন।"[২]

---

১. তুঃ 'ম্যাকিসম দ্য চয়িমুল দ্যজ ক্রইসয়িড্‌স স্যুর ল্যা এটাট দ্যজ পিউপলস দ্য লা ইউরোপ' প্যারিস, ১৮০৯।

২. মেইন, 'এনসিয়েন্ট ল' পৃ. ১০৪।

দাসপ্রথার প্রচলন মানুষের অস্তিত্বের সমকালীন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে এর নিদর্শন মেলে। সমাজের বর্বর অবস্থায় এর বীজ বিকশিত হয়েছিল এবং যখন জড়বাদীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল তখনও এর সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল।

যাদের আইন-সংক্রান্ত ও সামাজিক প্রথাসমূহ আধুনিক জীবনচর্চা ও সামাজিক প্রথাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে সেই ইহুদী, গ্রীক, রোমান ও প্রাচীন জার্মান জাতি[১] ভূমিদাস ও গৃহ-ভৃত্য উভয় ধরনের দাস প্রথাকে স্বীকার করেছিল ও চালু করেছিল।

জাতি হিসেবে প্রারম্ভকাল থেকেই হিব্রুদের মধ্যে দু' ধরনের দাস-প্রথা চালু ছিল। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিংবা ঋণ পরিশোধের জন্য যেসব ইসরাইলীদেরকে দাসে পরিণত করা হত তাদের অবস্থা বিদেশী দাসদের অবস্থার চেয়ে উত্তম ছিল। ইসরাইলী বংশোদ্ভূত দাসগণ ছয় বছর সেবার পর ইচ্ছা করলে মুক্তি নিতে পারত। কিন্তু যাদেরকে ইসরাইলীরা কঠিন যুদ্ধের মাধ্যমে কিংবা লুণ্ঠনের জন্য অতর্কিত আক্রমণ করে বা ক্রয় করে সম্পূর্ণরূপে দাসে পরিণত করেছে সেই বিদেশী দাসগণ সম্পূর্ণরূপে এই ব্যবস্থার আওতা-বহির্ভূত ছিল—এই ব্যবস্থা জাতীয় পক্ষপাতিত্ব ও বিশিষ্ট বিচ্ছিন্নতার মনোভাবসম্পন্ন।[২] এসব দাস-দাসীদের ভাগ্য ছিল অপ্রশমিত দুঃখ-কষ্টের ; ভূমিদাস বা গৃহভৃত্য ছিল যুগপৎ ঘৃণিত ও অবহেলিত। তারা তাদের হৃদয়হীন—মনিবদের চিরস্থায়ী একঘেয়েমির জীবন নির্বাহ করত।

জীবনব্যবস্থা ও ধর্মমত হিসেবে খ্রীষ্টধর্ম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ তোলেনি, কোন নিয়ম বলবৎ করেনি, অনিষ্ট প্রশমনের জন্য কোন নীতি জনমনে মুদ্রিত করেনি। দাসদের অবাধ্যতা[৩] সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য এবং মনিবদের প্রতি তাদের ভৃত্যদেরকে ন্যায্য পাওনা প্রদানের সাধারণ উপদেশ ছাড়া খ্রীষ্টানদের ঐতিহ্যের বর্ণিত যিশুর শিক্ষার মধ্যে দাসপ্রথার নিন্দা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন উক্তি নেই। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্ম মালিকের ইচ্ছার প্রতি ভৃত্যের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নির্দেশ করে। এ

---

১. সিজার ('দ্য বেল গল', লিব ৬), ট্যাসিটাস ('দ্য মরিবাস জার্মান', ক্যাপ, ২৫.২৫) এবং ক্যাথিয়ার (দ্য স্ট্যার্ট সারভর অ্যাপুড জার্ম, লিব ১)—সবই জার্মান-দাস-প্রথার চরম কঠোরতার প্রমাণ দেয়।

২. লেভ ২৫, ৪৪, ৪৬।

৩. তুঃ মিল্ম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮।

দাসপ্রথাকে সাম্রাজ্যের স্বীকৃত প্রথা হিসেবে পেয়েছিল এবং এর অনিষ্টকর প্রভাবের নিরসন ক্রমিক অপসারণ কিংবা দাসদের ভাগ্যের উন্নয়নের চেষ্টা না করেই একে অবলম্বন করেছিল। দেওয়ানী আইনের আওতায় দাসরা ছিল অস্থাবর সম্পত্তি। খ্রীষ্টান রাজত্বে তাদের ভাগ্যের কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। আদিকাল থেকে দাসপ্রথা রোমানদের মধ্যে জমজমাট ছিল। কিন্তু যে ক্রমিক বিবর্তন দ্বাদশ টেবিলের প্রাচীন আইনসমূহকে হার্ডিয়ানের ব্যাপক সংহিতায় উন্নীত করেছিল তা দাসদের অবস্থার উন্নয়নে কয়েকটি পদক্ষেপ চালু করতে ব্যর্থ হয়নি। সম্রাটদের মানবতা বা জ্ঞানবত্তা পুরাতন আইনসমূহের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করা সত্ত্বেও দাসগণ সম্পূর্ণ-রূপে প্রভুর ইচ্ছার অধীন ছিল। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাজার হাজার দাস থাকত এবং সামান্য কারণে তাদের উপর অত্যাচার ও বেত্রাঘাত করা হত।

ইউরোপে যিশুর ধর্মের প্রবর্তন শুধু পুরোহিততন্ত্রের প্রেক্ষিতেই দাসত্বকে প্রভাবিত করেছিল। কেবল সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করলেই একজন দাস মুক্ত হতে পারত, তবে সে তিন বছরের পূর্বে মুক্তি দাবী করতে পারত না। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে দাসপ্রথা পৌত্তলিক রাজত্বে যেমন অধিক পরিমাণে ও বিভিন্নভাবে প্রচলিত ছিল তেমনি চালু ছিল। একজন খ্রীষ্টান সম্রাটের অধীনে সংগৃহীত 'দি ডাইজেষ্ট' দাস প্রথাকে প্রাকৃতিক নিয়মের একটি উপাদান বলে ঘোষণা করেছিল এবং বিধি পেশা অনুযায়ী দাসদের বেতন বেধে দিয়েছিল। দাসদের মধ্যে বিবাহ আইনসম্মত ছিল না এবং দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হত।[১] এর ফল ছিল উপপত্নী প্রথার অবাধ প্রচলন, আর যাজকসম্প্রদায় এটা স্বীকার করত ও এর অনুশীলন করত।[২]

প্রাচীন জগতের সর্বাপেক্ষা অগ্রগতিসম্পন্ন আইনব্যবস্থায় এরূপ ছিল দাসদের অবস্থা। এই আইনসমূহে চোদ্দ শ' বছরের জ্ঞানবত্তা প্রতি-ফলিত হয়েছে এবং তাদের বিকাশের শেষের দিকে পৃথিবীর একজন মহান নৈতিক শিক্ষকের শিক্ষার কতিপয় প্রশাখা তাতে গজিয়েছে মাত্র।

---

১. একটি শাস্তি এই ছিল : যদি কোন স্বাধীন নারী কোন দাসকে বিবাহ করত তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এবং দাসটিকে পুড়িয়ে মারা হত। তুঃ মিল্ক-ম্যানের এ বিষয়ের উপর তাঁর গ্রন্থ "ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি"।

২. তুঃ মিল্কম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯ ; আরও কেঞ্চ কনকুবিনা।

রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর পাশ্চাত্য ও উত্তর বর্বর জাতির প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তিগত দাসপ্রথা ছাড়াও রোমানদের নিকট অজ্ঞাত রাষ্ট্রীয় দাসপ্রথা এই নতুন ঔপনিবেশিক রাজ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়েছিল। প্রজা ও ভৃত্যদের উপর প্রভুদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার নৈতিক অধঃপতন ও অধোগতির বীভৎস চিত্র হাজির করেছিল।[১] রোমান-দের মতো বর্বরদের সংহিতা দাসপ্রথাকে মানবজাতির সাধারণ অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করত; যদি দাসদেরকে কোন আশ্রয় প্রদান করা হত তবে তা প্রধানত প্রভুর সম্পত্তি হিসেবেই করা হত। রাষ্ট্র-ছাড়া প্রভুই তাদের জীবনমরণের উপর ক্ষমতাশীল ছিল।

খ্রীষ্টধর্ম দাসপ্রথা দূরীকরণে কিংবা এই প্রথার অনিষ্টকর প্রভাব প্রশমিত করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। গির্জা স্বয়ং দাস রাখত এবং পরিষ্কার ভাষায় এই অনিষ্টকর প্রথার বৈধ্যতা স্বীকার করত। গির্জার প্রভাবে ইউরোপের উচ্চরাজকর্মচারীরা দাসপ্রথার সমর্থন করত এবং দারিদ্র্য ও চৌর্যবৃত্তির বৃদ্ধি রোধের ক্ষেত্রে এর উপকারিতার উপর জোর প্রদান করত।[২] একই প্রভাবাধীনে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ রাজ্যসমূহের উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন খ্রীষ্টানগণ তাদের রক্ষিত হতভাগ্য জীব দাসদের উপর নিষ্ঠুরতম অমানুষিক অত্যাচার করত—দাসদের মধ্যে অনেকে তাদের আত্মীয়-স্বজন। তারা তাদের মধ্যে দাসপ্রথা চালু রাখার জন্য রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। একটি নিকৃষ্ট জাতির রক্তে সামান্যতম নিদর্শন যতই অদৃশ্য হোক না কেন তা তাদেরকে দাসপ্রথার তীব্র শাস্তির অধীনে আনয়ন করেছিল। শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টান তার নিগ্রো-দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে বৈধ বলে স্বীকার করত না। তার সঙ্গে সে কখনও বৈধ যৌনমিলন উপভোগ করত না। তার অবৈধ সন্তানের মাতা ও তার বংশধরগণ, তার যত দূরের হোক

---

১. তুঃ দ্য চয়িস্থল, এবং স্টিফেনের 'কমেণ্টারিজ অন দি লজ অব ইংলণ্ড' বুক ২, অংশ ১, অধ্যায় ২—এই বিস্তৃত অধ্যায়টি এই বিষয়ের উপর দেখুন। একটি বেদনাদায়ক ও বিরক্তিকর স্থবিধা যা প্রভুদের ছিল তা ব্রিটেনের 'কুলিয়েজ' প্রথা নামে অভিহিত ছিল। পরে এটা জরিমানায় রূপান্তরিত হয়। সঠিকভাবে অনুমিত হয়েছে যে এই প্রথা উত্তরাধিকার আইনের জন্ম দেয় যা ইংলণ্ডের কতিপয় জেলায় প্রচলিত ছিল এবং স্বায়ত্তশাসিত ইংরেজ নামে পরিচিত ছিল।

২. পুফেনডর্ফ, 'ল অব নেচার এণ্ড নেশান্স' বুক. ৬, সি. ৩, এস. ১০; উলরিকাস পুবেরাস, 'প্রিলেক্ট জুর সিভিটাস', ১.১, টিট্. ৪, এস. ৬; পথিয়ার 'দ্য স্ট্যাট্যু ার ভরাম' এবং গ্রটিরাস, 'দ্য জুর বেল. ১.১, সি. ৫, এস. ২৭।

না কেন, যে কোন সময়ে তার বৈধ সন্তান তাদেরকে বিক্রি করতে পারত। আল্লাহর সম্মুখে মানুষ যে সমান, সে বিষয়ে শিক্ষাগুরুর শিক্ষার মনোভঙ্গী খ্রীষ্টানগণ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলাম বংশ বা বর্ণের পার্থক্য স্বীকার করে না। শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ, নাগরিক বা সেনানী, শাসক বা শাসিত সবাই পরিপূর্ণভাবে সমান শুধু নীতিগতভাবে নয়, বাস্তব আচরণেও। মাঠে ময়দানে বা অতিথি আপ্যায়নের কক্ষে, তাবুতে কিংবা প্রাসাদে, মসজিদে কিংবা বাজারে সকলে শর্তবিহীনভাবে ও কোন বিদ্বেষ না রেখেই মেলামেশা করে থাকে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী ও একজন শ্রদ্ধেয় সাহাবী ছিলেন একজন নিগ্রো দাস। একজন শ্বেতাঙ্গ খ্রীষ্টানের কাছে তার একজন কৃষ্ণাঙ্গ সমধর্মী স্বর্গরাজ্যে তার সমকক্ষ হতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই এই দুনিয়ায় নয়—সম্ভবত যিশুর রাজত্বে সে সমকক্ষ হতে পারে তবে খ্রীষ্টধর্মের রাজত্বে নয়। আইন তাকে বাধ্য করতে পারে, বৃহত্তর মানবসমাজ রক্তস্রোতের ভেতর দিয়ে তার কৃষ্ণাঙ্গ ভাইকে সামাজিক অধিকার দিতে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু বংশ ও বর্ণের অহঙ্কার কোন সাম্যের স্বীকৃতি দেয় না, এমন কি আল্লাহর গৃহেও কঠোর ব্যবধান পালিত হয়ে থাকে।

ইসলামের শিক্ষা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানল। যদি এই প্রথা পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে ও মানবমনের সহজাত ভ্রান্তির মধ্যে গভীর শিকড় বিস্তার না করত, তবে যেসব লোক এর অনুশীলন করত তাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

এটা ন্যায়সঙ্গতভাবেই বিতর্কিত হয়েছে যে ইসলামের আইন, নীতি ও শিক্ষাসমূহ বিশ বছরের অধিককাল ধরে ঘোষিত হয়েছে, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রত্যাশিত যে বহু প্রাক্‌-ইসলামী প্রথা, যা শেষপর্যন্ত অপসারিত হয়েছে তা প্রথমে হয় মৌনভাবে অনুমোদিত হয়েছে নতুবা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে।[১] এর একটি শ্রেণীতে রয়েছে দাসপ্রথার প্রচলন। মুহম্মদ যেসব লোকদের মধ্যে জন্মেছিলেন তাদের সম্পর্কের অন্তঃস্থলে অনিষ্ট মিশে গিয়েছিল। এর দূরীকরণ সুবিবেচিত ও করুণাসিক্ত আইনের বিরামবিহীন প্রয়োগের মাধ্যমেই অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল, সকল দাসের আকস্মিক ও পরিপূর্ণ মুক্তির ভেতর দিয়ে সম্ভব ছিল না। এটা

১. 'তাহজীবুল্‌ আহলাক', (১৫ই রজব, ১২৮৮) পৃ. ১১৮।

নৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছিল অসম্ভব। তদনুসারে দাসদের ক্রমিক মুক্তির উন্নয়ন ও তা সম্পাদনার্থে অসংখ্য নঞর্থক ও সদর্থক শর্ত প্রবর্তিত হয়েছিল। এর বিপরীত কোন নীতি অনুসরণ করলে তা ডেকে আনত শিশু প্রজাতন্ত্রের সমূহ অধঃপতন।

আল্লাহর নামে দাসদেরকে মুক্তিদানের জন্য হযরত পুনঃ পুনঃ তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, "আল্লাহর নিকট এর চেয়ে অধিকতর গ্রহণীয় কোন কাজ নেই।" তিনি আইন করলেন যে কর্তব্যকর্মে অবহেলা ও কতিপয় অপরাধের শাস্তি হল দাসের মুক্তি। তিনি আদেশ করলেন যে দাস তার মজুরীর অর্থ দিয়ে তার স্বাধীনতা ক্রয় করতে পারবে। যদি এই হতভাগ্য জীবের বর্তমান নিয়োগের ক্ষেত্রে তেমন কোন উপার্জন না থাকে এবং মুক্তির পণ অর্জন করার জন্য সে যদি অন্য কোন নিয়োগকারীর অধীনে যেতে চায়, তবে সেই মর্মে চুক্তির ভিত্তিতে তাকে অনুমিত দিতে হবে।[১] তিনি আরও আইন করলেন যে বায়তুল মাল থেকে মুক্তির জন্য দাসকে অর্থ আগাম দিতে হবে। কতিপয় আকস্মিক ঘটনার ক্ষেত্রে আইন জারি হল যে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া, এমন কি প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে মুক্তি দিতে হবে। যে চুক্তি বা ঐক্যমতের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আবিষ্কৃত হত সেখানে দাসের সর্বাধিক অনুকূলে তা লিপিবদ্ধ হত। প্রভুর দিক থেকে সামান্যতম প্রতিজ্ঞাকেও দাসের মুক্তির জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। তিনি "স্বজন প্রতিবেশী, সাথী ভ্রমণকারী ও যাত্রীদের" দাবীর সঙ্গে দাসদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের কর্তব্যকে একই পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। তিনি দাসদের অবাধ মুক্তির এবং সেই সঙ্গে "খোদা তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার কিয়দংশ" তাদেরকে দান করার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং দাস-দেরকে যৌন সম্ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করাকে নিষিদ্ধ করে-ছিলেন আর ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি ঐশী করুণার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এক-জন দাসকে মুক্ত করা একজন বিশ্বাসীকে অজ্ঞাতবশত হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত, কতিপয় অসত্যকে অবলম্বন করারও প্রায়শ্চিত্ত। মুহম্মদের শিক্ষার অভি-প্রায় "চিরস্থায়ী দাসত্ব" বা বর্ণবিভাগকে অসম্ভব করেছিল ; ইংরেজদের জীবনব্যবস্থায় দাসপ্রথা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা ইসলামের আইন-প্রণয়নে কোন পদমর্যাদার ক্ষেত্রে ব্যবহার "ভাষার অপপ্রয়োগ" মাত্র।

---

১. কোরআন, সূ. ২৪, আ. ৩৩ ইত্যাদি।

হযরত আদেশ করেছেন যে একজন পলাতক ইসলামী রাষ্ট্রে পালিয়ে আসলে তাকে তৎক্ষণাৎ নাগরিক অধিকার প্রদান করতে হবে; কোন দাসীর সন্তান হলে সে তার পিতার অবস্থা অনুসরণ করবে এবং প্রভুর মৃত্যুর পর সে স্বাধীনতা লাভ করবে; দাসগণ তাদের মুক্তির জন্য প্রভুর সমীপে চুক্তি করতে সমর্থ আর জাকাতের একাংশ তাদের জন্য ব্যয়িত হবে। সঙ্গত ও উপযুক্ত কাজের অতিরিক্ত কাজ করানো থেকে প্রভুর প্রতি নিষিদ্ধ। দাস ও দাসীদেরকে অপমানজনক নামে কখনও না ডাকতে প্রভুদেরকে তিনি আদেশ দিয়েছেন—"ওগো আমার তরুণ" কিংবা "ওগো আমার তরুণী" এরূপ অধিকতর স্নেহসিক্ত নামে তাদেরকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইহাও নির্দেশিত হয়েছে যে সব দাসদাসীকে প্রভু ও প্রভুপত্নী যা আহার করবে ও পরিধান করবে তা-ই আহার করতে দিতে হবে ও পরিধান করতে দিতে হবে। সর্বোপরি, ইহাও নির্দেশিত হয়েছে কোন ক্রমেই মাতাকে তার সন্তান থেকে, ভ্রাতাকে অন্য ভ্রাতা থেকে, পিতাকে পুত্র থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে, একজন আত্মীয়কে অপর আত্মীয় থেকে পৃথক করা চলবে না।[১]

তখন যারা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাদের জন্য নির্ধারিত নৈতিক নিয়মসমূহে আরব্য শিক্ষাগুরু অন্যান্য ধর্মমতে[২] প্রায়ই যে ধরনের একপেশে পন্থায় দাস ও প্রভুর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হত সেরূপ কোন নির্দেশ করেননি।[৩] মনুষ্য স্বভাবের গভীরতর ও অধিকতর সত্য জ্ঞান ছিল বলে তিনি দেখেছিলেন যে সবলের প্রতি দুর্বলের, আর দুর্বলের প্রতি সবলের কর্তব্যবিধি লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ইসলামে দাসদের প্রতি কোন কলঙ্ক আরোপিত হয় না। এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার, দেওয়ানী আইন ও যাজকীয় খ্রীষ্টধর্মে যেমন "প্রকৃতির উপাদান" হিসেবে চিহ্নিত তেমন নয়। জায়েদ দাস ছিলেন ও হযরত তাকে মুক্ত করেছিলেন। তাকে প্রায়ই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করা হত, নির্দ্বিধায়

---

১. এই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না কারণ এইসব বিষয় স্বীকৃত সত্য। তবে আমি কৌতূহলী পাঠকদেরকে 'মিশকাত', 'সহীহ বোখারী' ও 'বিহারুল আনওয়ার'—এই গ্রন্থ তিনটি দেখতে অনুরোধ করি। শেষ গ্রন্থখানিতে হযরতের অব্যবহিত বংশধরদের অনুশীলিত উদারতা ও বদান্যতার মহত্তম কীর্তিস্তম্ভ বিধৃত।

২. কল. ৩.২২; ১টিম ৬.১।

৩. কল. ৩.২২; ১টিম ৬.১।

অনেক মহান কাপ্তেন তার অধীনে যুদ্ধ করেছেন। তার পুত্র ওসামা আবু বকর কর্তৃক গ্রীকদের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানের নেতৃত্বের সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। কুতুবউদ্দীন দিল্লীর প্রথম সুলতান, কাজেই ভারতবর্ষের মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একজন দাস। ইসলামে যে দাসত্ব অনুমোদিত তার সঙ্গে খ্রীষ্টান-জগতে প্রচলিত দাসত্বের কোন মিল নেই, অবশ্যি বর্তমান সময়ের পূর্ব পর্যন্ত কিংবা আমেরিকায় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পবিত্র যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত, যখন এই প্রথার অবসান ঘটে।

ইসলামে আজ যে দাস কাল সে প্রধান উজির। সে কোন দুর্নাম ছাড়াই সে তার প্রভুর কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারে এবং পরিবারের প্রধান হতে পারে। দাস রাজ্য শাসন করেছে। গজনীর মাহমুদের পিতা ছিলেন একজন দাস। খ্রীষ্টধর্ম কি এ ধরনের কোন রেকর্ড দেখাতে পারে? দাসদের প্রতি আচরণের এ ধরনের কোন স্পষ্ট ও মানবিক বিবরণ কি খ্রীষ্টধর্ম তার সমগ্র ইতিহাসের পাতায় দেখাতে পারে?

আমরা যা বলেছি তা থেকে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে আইনপ্রণেতা এই প্রথা স্বভাবত অচিরস্থায়ী এবং তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে ধারণার অগ্রগতি ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবে এর বিলুপ্তি ঘটবে। কোরআন দাস সম্পর্কে সর্বদা বলে যে "যাদেরকে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অর্জন করেছে" এতে নির্দেশিত হয় যে দাসদাসী উপার্জনের উপায়মাত্র। বাস্তবিক কোরআন এক দাসত্ব মাত্র স্বীকার করে—'জিহাদে শারাই'—বৈধ যুদ্ধের মাধ্যমে বন্দীদের দাসত্ব। সকল বর্বর জাতির মধ্যে একমাত্র স্বার্থপর উদ্দেশ্যের জন্য[১] বন্দীদের রক্ষা করা হত, তাদের বিক্রীত অর্থে বা তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তি বা জাতির সম্পদ বৃদ্ধির জন্য।[২] প্রাচীনকালের অন্যান্য জাতির মতো প্রাক্-ইসলামী যুগের আরবগণ যুদ্ধ-

১. তুলনীয় মিলম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ান' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭। প্রাচীন বিচারকেরা বন্দীদের হত্যা করার পূর্ববর্তী অধিকারের উপর তাদেরকে দাসে পরিণত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে তারা আলবারিকাস জেন্টিলিস, (ড জুর. ক্যাপ. ড সার্ভিচিউড), গ্রটিয়াস ও পুফেনডর্ফকে অনুসরণ করেন। বাস্তবিক মনটেস্ক সর্বপ্রথম যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করার পৌরাণিক অধিকার অস্বীকার করেন যতক্ষণ না কোন অপরিহার্য প্রয়োজন উপস্থিত হয় কিংবা আত্মরক্ষার কারণ দেখা দেয়। 'দি স্পিরিট অব লজ' গ্রন্থের রচয়িতা এটা অস্বীকার করেন, কেননা গির্জার দাসত্ব থেকে সে মুক্ত।

২. তুলনীয় মিলম্যানের 'হিস্ট্রী অব্ দি জিউজ', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮।

বন্দীদের বাঁচিয়ে রাখত তাদের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের জন্য। মুহম্মদ তাঁর জাতির মধ্যে এই প্রথা বিরাজমান দেখতে পেয়েছিলেন। কোন মতবাদ খাড়া না করে কিংবা অস্পষ্ট মামুলী মন্তব্য না করে তিনি তাদের নির্দেশনার জন্য কঠোর নিয়ম নির্ধারিত করেন, তিনি বার বার নির্দেশ করেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দীগণ প্রদানের মাধ্যমে কিংবা পরিশ্রমের মজুরীর সাহায্যে মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত বৈধ যুদ্ধে প্রাপ্ত বন্দীদেরকে দাসদাসী হিসেবে রাখা যেতে পারে। কিন্তু যখন এসব ব্যবস্থা ব্যর্থ হত তখন দাসদাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের কঠিন দায়িত্বসহ মুসলমানদের পবিত্র অনুভূতির প্রতি আবেদন করা হত। দাসত্বের চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনে এ প্রায়ই যথেষ্ট পরিমাণে সফল হত। যে দাস-চুরি ও দাসব্যবসা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল শক্তিশালী খ্রীষ্টধর্ম[১] ও যাকে ইহুদীধর্ম পবিত্রকরণ করেছিল ইসলাম তাকে সম্পূর্ণরূপে গর্হিত ও নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিল। যে দাস-ব্যবসায় লিপ্ত তাকে মানবজাতি থেকে বিচ্যুত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। দাস-মুক্তি[২] ধর্মের একটি মহৎ কাজ বলে বিঘোষিত হয়েছিল। কোন মুসলমানকে দাসে পরিণত করার বিরুদ্ধে কঠোরতম ভাষায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। বহু সংখ্যক তথাকথিত মুসলমানের স্থায়ী দুর্নামের কলঙ্ক নিয়ে অবশ্যই বলতে হবে যে আক্ষরিক নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কিংবা পালনের চেষ্টা করতে গিয়ে তারা শিক্ষাগুরুর নির্দেশের মনোভঙ্গীই হারিয়ে ফেলেছে এবং প্রত্যক্ষভাবে হযরতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ক্রয় ও অন্য উপায়ের বলে দাসপ্রথা চালু রাখতে অনুমোদন দিয়েছিল। কোরআনিক আইন অনুসারে দাস সংরক্ষণ অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে যে বৈধ যুদ্ধ তার উপর নির্ভরশীল। আর এর অনুমতি ছিল বন্দীদের নিরাপত্তা ও রক্ষার নিশ্চয়তা। পার্শ্ববর্তী গোত্র ও জাতিসমূহ থেকে যে যুদ্ধ-বিরতির মধ্যে মুসলমানেরা নিয়োজিত হয়েছিল তার ফলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটত—ভাবী দাস-সংগ্রহের সমাপ্তি এবং যারা দাস অবস্থায় রয়েছে

---

১. ক্রমওয়েল কর্তৃক ড্রয়েডা ধ্বংসের পর এবং আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমন করার পর ইংরেজ প্রোটেস্ট্যাণ্ট আইরিশ নরনারীদেরকে ভার্জিনিয়া, পেনসিলভিনিয়া ও অন্যান্য স্থানের ঔপনেবেশিকদের নিকট বিক্রি করেছিল। মনমাউথের বিদ্রোহের পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

২. ইমাম জাফর আস্ সাদিক (বিহারুল আনোয়ার) থেকে একটি সহীহ ও পরিচিত হাদিস অনুসারে।

তাদের মুক্তি আসত। যা'হোক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নৈতিকতাবর্জিত জাতিসমূহ ও উত্তরের দুর্ধর্ষ জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসার ফলে অথবা অনিষ্টকর প্রথাটি সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে গভীর শিকড় গেড়েছিল বলে খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের মতো বহু মুসলমান দাসপ্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং এখনও কিছুটা দিয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ধর্ষ টার্কম্যান যারা দাস-চুরিতে গৌরববোধ করত তারা আর বর্বর গুয়াকোদের চেয়ে কোনরূপে ইসলামের প্রতিনিধি নয়, যারা দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াত।[১] বহু-বিবাহ প্রথার মতো দাসপ্রথা মানবজাতির বিকাশের কোন-না-কোন স্তরে, অন্ততঃ যে জাতি সভ্য বলে নিজেদেরকে দাবী করে তাদের মধ্যে, যে প্রয়োজন তাদেরকে এই প্রথা চালু করতে প্ররোচিত করেছিল তা দাসপ্রথা অতিক্রম করে গিয়েছে এবং তা শীঘ্রই হোক কিংবা বিলম্বেই হোক অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কাজেই দেখা যাবে যে, যেভাবে বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব নিয়ে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে ইসলাম দাসপ্রথাকে "পবিত্র করেনি", বরং সংকীর্ণতম সীমার মধ্যে তার অর্জনের উপায়কে সীমাবদ্ধ করে প্রত্যেক দিক দিয়ে

---

১. হযরতের আদেশসমূহের আক্ষরিক অর্থ লঙ্ঘন না করার জন্য টার্কম্যান (স্বয়ং অন্ধ সুন্নী) তাদের বন্দীদেরকে (সে সুন্নী বা শিয়া যাই হোক না কেন) বিরুদ্ধবাদী হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করত। আর আফ্রিকার আরবরা তাদের হত্যাকারী 'রাজ্জিয়াস'দেরকে পৌত্তলিক নিগ্রোদের উপর 'জিহাদ' বলত। একজন সুপরিচিত আফ্রিকান পরিব্রাজক, মি. টমসন 'দি লণ্ডন টাইমস' ১৮৮৭-র ১৪ই নভেম্বরের একটি চিঠিতে পূর্ব আফ্রিকায় দাস প্রথার উপর লেখেন: "আমি নির্দ্বিধায় জোরের সঙ্গে সত্য ঘোষণা করছি, আপনার সংবাদদাতাদের চেয়ে পূর্ব মধ্য আফ্রিকার ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, যদি দাস ব্যবসায় এখানে সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকে তবে তা এই কারণে যে এসব অঞ্চলে ইসলাম প্রবর্তিত হয়নি এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ এই যে ইসলামধর্মের বিস্তার মানে দাসব্যবসার সহগামী নির্বাসন। "শান্তিপূর্ণ ও নিরহঙ্কার কর্মকর্তাদের" সম্পর্কে তাঁর বিবরণ, যার মাধ্যমে ইসলাম পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্যসুদানে বিস্তার লাভ করেছিল তা প্রত্যেক পাঠকের মনোযোগ দাবী করে। তিনি বলেন, "আমরা এখানে ইসলামকে একটা জীবন্ত সক্রিয় শক্তি, হিসেবে দেখতে পাই, তার আদিম উত্তাপ ও শক্তি নিয়ে উপস্থিত দেখতে পাই, তা প্রাথমিক পর্যায়ের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ করেছিল।"

তার বিলোপ ও অপসারণের আয়োজন করেছে। ইসলাম খামখেয়ালীর সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানের প্রয়াস পাইনি। ইসলাম সর্বাপেক্ষা জোরালো ভাষায় মানবজাতির স্বাভাবিক সাম্যের কথা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু ফলাফলের দিকে তাকিয়ে সমুদয় দাসদাসীদের মুক্ত করেনি! যদি করত তবে তা অনিষ্টের কারণ হত, কারণ জগৎ তখন মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিমূলক স্বাধীনতার জন্য পূর্ণতা লাভ করেনি।

মুহম্মদ স্পষ্টভাবে মনুষ্যদেহের অঙ্গহানি করা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং পারসিক ও বাইজান্টাইনদের মধ্যে যে প্রথা জমজমাট হয়ে উঠেছিল তা কঠোর ভাষায় তার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দাস ক্রয়-বিক্রয় অজ্ঞাত ছিল। তাঁদের আমলে কোন দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে বলে কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বলপূর্বক ক্ষমতাদখলকারী উমাইয়া রাজবংশের সিংহাসন অধিকার করার পর মুসলমানদের ভেতর একটা পরিবর্তন আসল। মোয়াবিয়া মুসলমান নৃপতিদের মধ্যে প্রথম যিনি মুসলিম জগতে ক্রয়ের মাধ্যমে দাস-অর্জন চালু করেন। আর তিনিই প্রথম যিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রহরার জন্য বাইজানটাইনদের মতো খোজা (নপুংসক) নিয়োগ করেন। আব্বাসিয়া আমলের প্রথমদিকে শিয়া ইমাম জাফর আসসাদিক দাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেন।

এখন সময় এসেছে যখন মনুষ্যসমাজ সাধারণভাবে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তাদের বুলন্দ আওয়াজ তুলতে পারেন, সে যে আকারে বা যে ছদ্মবেশেই হাজির হোক না কেন। তাদের মহান নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে মুসলমানদের নিজের ইতিহাস থেকে মসীলিপ্ত পত্রটি মুছে দেওয়া উচিত—যে পত্রটি তাঁর নিয়মসমূহের মনোভাব লঙ্ঘন না করলে কখনো লিখিত হত না, যদিও বিরোধী ধর্মমতসমূহের বিশেষজ্ঞদের বীভৎস নির্ঘণ্টের পাশাপাশি তা যতই উজ্জ্বল দেখাক না কেন। যে কণ্ঠস্বর একদিন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দিয়েছিল আজ চোদ্দ শ বছরের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব ও বিস্তার থেকে অর্জিত সতেজ ও সবল কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হওয়ার দিন এসেছে। দাসপ্রথা তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নিন্দিত ও তাদের আইন কর্তৃক অননুমোদিত—একথা ঘোষণা করে মুসলমানদের প্রতিপন্ন করতে হবে যে তাদের মহানবীর স্মৃতির উপর নিক্ষিপ্ত কলঙ্ক মিথ্যা।

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামের রাজনৈতিক মর্মবাণী

"আশ্রিত জিম্মিদের রক্ত মুসলমানদের রক্তের সদৃশ।"

—হযরত আলী (কঃ)

অদ্যাবধি আমরা আরবের নবীর শিক্ষাকে মাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গী।—মানুষের আচরণ-বিধি এবং মানুষের স্রষ্টার প্রতি ও তার স্ব-শ্রেণীর জীবের প্রতি তার কর্তব্যের নির্দেশনা থেকে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সমষ্টিগত মানুষের উপর, জাতিসমূহের উপর, শুধু ব্যষ্টির উপর নয়, সংক্ষেপে মানুষজাতির সমষ্টিগত নিয়তির উপর ইসলামের প্রভাব পরীক্ষা করতে চাই।

দীনহীনদের কাছে স্বর্গরাজ্যের সুসংবাদ নিয়ে নাজারাতের পয়গাম্বরের আগমনকাল থেকে সাতশ বছর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁর কার্যকাল আরম্ভ হতে না হতে একটি সুন্দর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন এক অনির্বচনীয় নিঃসঙ্গতা জগতের সব সাম্রাজ্য ও রাজ্যের উপর চেপে বসেছে এবং দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত খোদার বান্দারা অঙ্গীকৃত মুক্তির আশায় সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

প্রাচ্যের মতো প্রতীচ্যের জনগণের অবস্থাও ছিল বর্ণনাতীত। তাদের কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এসব ধনী ও শক্তিশালী কিংবা যাজকশ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া ছিল। সবল ও দুর্বল, ধনী ও দরিদ্র, উঁচু ও নীচু সকলের জন্য একই আইন বলবৎ ছিল না। সাসানিয়াদের আমলে পুরোহিত ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা—'দেহকান'রা—সব ক্ষমতা ও প্রভাব উপভোগ করত, আর দেশের সম্পদ তাদের কুক্ষিগত হয়েছিল। কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা আইনহীন জুলুমের ফলে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে ধর্মযাজক ও খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি, বারাঙ্গনা এবং সিজার ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পাপের অন্যান্য নামহীন সাহায্যকারীরা ধনসম্পত্তি ও প্রতিপত্তির সুখী মালিক ছিল। জনগণ চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কালাতিপাত করত। বর্বরদের রাজত্বে বাস্তবিক সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে বেশীর ভাগ লোক ছিল দাস।

ভূমিদাসত্ব বা গোলামি ছিল কৃষকদের সাধারণ পদমর্যাদা। প্রথমে ভূমিদাস ও গৃহভৃত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। পরিবার এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসহ উভয় শ্রেণীর দাস ভূস্বামীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; মালিক স্বাধীন ইচ্ছা ও খেয়ালখুশি অনুযায়ী তাদের সঙ্গে আচরণ করতে পারতেন।[১] পরবর্তীকালে ভূমিদাস বা দাস হয় জমিদারের খাসখামারের সঙ্গে যুক্ত হত এবং যে জমির অন্তর্ভুক্ত থাকত তার সঙ্গেই ক্রীত-বিক্রীত হত নতুবা ভূস্বামীর সঙ্গে যুক্ত হত এবং একজন মালিকের নিকট থেকে অপর একজন মালিকের নিকট হস্তান্তরযোগ্য ছিল। প্রভুর বিনা অনুমতিতে তারা তাকে পরিত্যাগ করতে পারত না; যদি তারা পলায়ন করত কিংবা অপহৃত হত তবে তার স্বত্ব দাবী করা যেত এবং পশু ও স্থাবর সম্পত্তির মতো তাদেরকে পুনরায় লাভ করা যেত। বাস্তবিকপক্ষে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবারের পরিপোষণের জন্য জমির সামান্য অংশই তারা রাখতে পারত এবং তাও তাদের প্রভুর মর্জির উপর নির্ভর করত, যখন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে জমিচ্যুত করতে পারতেন। ভৃত্য জমি বা অস্থাবর কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না; যদি সে তেমন কোন সম্পত্তি ক্রয় করত তবে তার প্রভু তার সম্পত্তি উচ্ছেদ করে নিজের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন।

ভূমিদাস ও গৃহভৃত্য উভয় শ্রেণীর দাসদের গলায় লোহার বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হত—এটাই ছিল তাদের প্রতীক। দাসদেরকে দলে দলে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হত, শূকরের পালের মতো খাওয়ান হত, এবং শূকরের পালের চেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যে শয়নের ব্যবস্থা করা হত—হাতকড়া ও পায়ে বেড়ী দিয়ে এবং গলার বেড়ীর ভিতর দিয়ে একটি মাত্র শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়ে বহু দাসকে একসঙ্গে শুতে দেওয়া হত। এই দাসব্যবসায়ীরা হাতে ভারী বহুল গ্রন্থিযুক্ত চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত আর অবসন্ন ও ক্লান্ত দাসদের "উৎসাহিত করত"। এই চাবুক প্রায়ই সপাং-সপাং চলত এবং তার ফলে দাসদের শরীর থেকে মাংস খসে পড়ত। নরনারী-শিশুদের, দেশের বিভিন্ন স্থানে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো হত, তাদের গায়ে থাকত ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, গোড়ালিতে ঘা হয়ে যেত এবং পদতল যেত ফেটে। কোন হতভাগ্য বেচারা যদি অবসন্ন হয়ে ভূতলশায়ী হত তবে তার উপর চলত চাবুক যতক্ষণ না তার গায়ের চামড়া

---

১. গির্জা তার দাসদেরকে দীর্ঘকাল রাখত। স্যার টমাস স্মিথ তাঁর 'কমনওয়েলথ' গ্রন্থে যাজক সম্প্রদায়ের কপটতার কথা বলছেন।

উঠে যেত এবং তারা মৃতবৎ হয়ে পড়ত। মিডল প্যাসেজের বিভীষিকা, দাসমুক্তির যুদ্ধের পূর্বে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ রাজ্যসমূহের হতভাগ্য নিগ্রোদের দুর্দশা, সৌদানি দাস অপহরণকারীদের নির্মম নির্যাতন খ্রীষ্টান জগতে দাসদের উপর অনুষ্ঠিত নির্মম অত্যাচার সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। যখন ইসলাম প্রথম প্রচারিত হয়েছিল তখন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা চলেছিল।[১] এমন কি খ্রীষ্টধর্মের প্রায় দু'হাজার বছরের শাসনাধীনে খ্রীষ্টানগণ অসহায় নারীদেরকে পিটিয়ে মারত এবং সভ্যজগতের একটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য বাস্তব বা কাল্পনিক রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তাদেরকে জেলখানায় শাস্তি দিত।[২]

তথাকথিত স্বাধীন লোকদের অবস্থা কোন দিক দিয়েই সাধারণ দাসদের অবস্থার চেয়ে উত্তম ছিল না। যদি তারা তাদের জমি পরিত্যাগ করতে চাইত তবে জমিদারের নিকট তাদের জরিমানা দিতে হত। আবার যদি তারা কোন জমি ক্রয় করতে চাইত তবে তাদেরকে অনুরূপভাবে জরিমানা দিতে হত। বড় ধরনের শুল্ক না দিলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তি লাভ করতে পারত না। তাদের প্রভুদেরকে অংশ প্রদান না করলে তারা তাদের শস্য ভাঙ্গাতে কিংবা রুটি তৈরী করতে পারত না। গির্জা তার দশমাংশ, রাজা তার বিংশতিতম অংশ, পারিষদবর্গ তাদের ক্ষুদ্রাংশ নেওয়ার পূর্বে তারা তাদের শস্য সংগ্রহ করতে পারত না। প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাদের গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারত না এবং তারা চিরস্থায়ীভাবে তাদের প্রভুর অবৈতনিক কাজ সম্পাদন করতে চুক্তিবদ্ধ ছিল। যদি প্রভুর পুত্র বা কন্যার বিবাহ হত তবে তাদেরকে ব্যয়ের অংশ বহন করতে হত। কিন্তু যখন কোন স্বাধীন ব্যক্তির কন্যার বিবাহ হত তবে প্রথমে তাকে কুখ্যাত প্রকাশ্য বলাৎকারের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হত; এমন কি খ্রীষ্টের খাদেম বিশপ যদি জমিদারির মালিক হত তবে সেও এই বর্বরতার নির্মম সুযোগ মওকুফ করত না। বর্বরতার হতভাগ্য শিকার এসব বেচারাদের পক্ষে মৃত্যুও সান্ত্বনার বিষয় ছিল না। জীবন্ত অবস্থায় তারা মানুষের অমানুষিকতার অধীন ছিল, মৃত্যুর

---

১. সংসদীয় যুদ্ধে উভয় পক্ষ ঔপনেবিশিকদের নিকট তাদের প্রতিপক্ষের লোকজন-দেরকে বিক্রি করেছিল। ডিউক অব মনমাউথের বিদ্রোহ দমনের পর তাঁর শিষ্যদেরকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। উপনিবেশসমূহের "যাত্রী ফাদারদের" হাতে দাসদের এবং তাদের বংশধরদের প্রতি আচরণ অবর্ণনীয়।

২. এটা লেখা হয়েছিল রোলানফসের পতনের পূর্বে।

পর অনন্ত নরকবাসের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর আত্মহত্যাকারী ছিল অপরাধীদের মধ্যে অপবিত্রতম ; পবিত্র জমিতে তার দেহ সমাহিত হতে পারত না। গভীর রাত্রিতে তার দেহ পাচার করে অপবিত্র জমিনে অন্যের জন্য হুঁশিয়ারী সংকেত হিসেবে খোঁটাবিদ্ধ অবস্থায় কবর দেওয়া হত।

জনগণের উপর এই ধরনের ভয়াবহ দুর্দশা বিরাজমান ছিল। কিন্তু ব্যারনরা তাদের সভাকক্ষে, বিশপরা তাদের প্রাসাদে, পুরোহিতরা তাদের গির্জায় জনগণের দুর্দশার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করত না। ইউরোপ, আফ্রিকার উজ্জ্বলতম এলাকাতেও রাত্রির ঘোর অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল। প্রত্যেক জায়গায় সবলের ইচ্ছাই ছিল আইন ও অধিকারের মানদণ্ড। অবহেলিত ও অত্যাচারিতদের প্রতি ধর্মযাজকেরা কোন সাহায্য করত না। পশু শক্তির আইন থেকে মানবজাতির মুক্তি ছিল গির্জার শিক্ষার পরিপন্থী। সুগঠিত কর্তৃপক্ষের কাজে কোন ধরনের প্রতিরোধকে প্রথম যুগের খ্রীষ্টান পুরোহিতগণ মারাত্মক পাপ বলে গণ্য করত। শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শোষিতদেরকে সবলে রক্ষা করার জন্য মানবতার উপর কোন নির্যাতন, কোন জুলুম, কোন বলাৎকার অনুষ্ঠিত হয়নি। যিশুর শিষ্যরা তাদের সঙ্গেই রাখী বেঁধেছিল সেই ধনী ও বলশালী অত্যাচারীদের সঙ্গে, যাদেরকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। তারা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সংস্রব রক্ষা করত এবং জমিদার, ব্যারন ও যুবরাজদের মতো সকল সুযোগ সুবিধা উপভোগ করত।

ইহুদী, ধর্মত্যাগী কিংবা পৌত্তলিক—অ-খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টান-শাসনাধীনে আতঙ্কিত জীবন নির্বাহ করত। এটা শুধু সুযোগের ব্যাপার ছিল যে কখন তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা তাদেরকে দাসে পরিণত করা হবে। তাদের কোনই অধিকার ছিল না ; তারা শুধু দুঃখ-দুর্দশা ভোগের জন্যই জন্মেছিল। যদি একজন খ্রীষ্টান একজন অ-খ্রীষ্টানের সঙ্গে অবৈধ যৌন মিলনে মিলিত হত—তবে সেখানে আইনগত মিলন ছিল অসম্ভব—তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। ইহুদীরা খ্রীষ্টানদের সঙ্গে একই টেবিলে পানাহার করতে পারত না কিংবা খ্রীষ্টানদের মতো পোশাক পরিধান করতে পারত না। তাদের সন্তানদের দেহ থেকে বাহু বিচ্ছিন্ন করা হত : ব্যারন, বিশপ বা উন্মত্ত জনতার ইচ্ছাক্রমে তাদের দ্রব্যসম্ভার লুঠ হত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অবস্থা চলেছিল।

যতদিন না হিরা পর্বতের গুহা থেকে স্বাধীনতার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, যতদিন না তিনি মানবজাতির বাস্তব সাম্য ঘোষণা করেছিলেন,

যতদিন না তিনি শ্রেণীগত প্রত্যেকটি সুবিধা দূরীভূত করেছিলেন, শ্রমকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, ততদিন পর্যন্ত যে শৃঙ্খল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে বেঁধে রেখেছিল তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েনি। তাঁর পূর্বসূরিগণ যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন তিনি সেই একই মহান শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনিই তা কার্যকরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মদিনায় আগমনের পর ইহুদীদেরকে তিনি যে সনদ মঞ্জুর করেছিলেন এবং ইসলাম পরিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নজরানের খ্রীষ্টানদেরকে ও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহকে যে উল্লেখযোগ্য বাণী তিনি প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যে ইসলামের রাজনৈতিক চরিত্রের মর্মবাণী দেখতে পাওয়া যাবে। "এই দ্বিতীয় দলিলটি অ-মুসলিম প্রজাদের সঙ্গে আচরণের নিয়ামক নীতি প্রদান করে সব মুসলিম শাসকদেরকে। যদি কোন ক্ষেত্রে কোন শাসক এই নীতি থেকে দূরে সরে যেয়ে থাকেন তবে সেটা সেই শাসকের স্বভাবের জন্যই। যদি আমরা রাজনৈতিক প্রয়োজনকে পৃথকভাবে বিচার করি যা প্রায়ই ধর্মের নামে কথিত ও সম্পাদিত হয় তবে একথা বলতে হয় যে অন্য ধর্মের অনুসারীদের কাছে ইসলামের চেয়ে অধিকতর সহনশীল ধর্ম আর নেই।[১] "রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা" এখানে-ওখানে কিছুটা অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করলেও কিংবা কিছুটা বিশ্বাসের সমানুবর্তিতার উপর জোর দিলেও ইসলামের জীবনব্যবস্থা সর্বদা পরিপূর্ণ সহনশীলতা রক্ষা করেছে। খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের উপর তাদের ধর্মপালনের ব্যাপারে আইনগতভাবে কখনও উৎপীড়ন করা হয়নি কিংবা ধর্ম পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ জুলুম করা হয়নি। তাদেরকে যে বিশেষ কর দিতে হত সেটা সামরিক অবদানের পরিবর্তে এবং এটা যথোচিত যে যারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় উপভোগ করবে তারা জনগণের ব্যয়ভারের ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে কিছু অবদান রাখবে। পৌত্তলিকদের ব্যাপারে আইন তত্ত্বগতভাবে শক্ত হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা সমভাবে উদার ছিল। যদি কোন সময়ে কঠোরভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করা হয়ে থাকে তবে তার কারণ নিহিত ছিল শাসক কিংবা জনগণের মনোভাবের মধ্যে সেক্ষেত্র ধর্মীয় উপাদান শুধু ছল হিসেবে ব্যবহৃত হত।

ইসলামী রাষ্ট্রে অ-মুসলিম প্রজাগণ মারাত্মক সীমাবদ্ধতার অধীনে বসবাস করে—এই কালসিঞ্চিত ধারণার সমর্থনে শুধু ইসলামের পরবর্তী

১. তুলনীয় গোবিনিউ, "ল্যাজ রেলিজিয়নস এত ল্যাজ ফিলোসফিজ ডনস ল' এসিয়া সেন্ট্রালিস"।

আইনবেত্তা বা আইনজীবীদের সংকীর্ণ মতবাদেরই প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয় না। বরং কোরআনের কতিপয় আয়াতের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়, এটা দেখানোর জন্য যে হযরত অ-মুসলিমদেরকে[১] ভাল চোখে দেখেননি এবং তাদের ও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক উৎসাহিত করেননি।[২] এ বিষয়ে আলোচনাকালে আমরা অবশ্যই ভুলব না যে ঐ আয়াতগুলির অবতরণকালে ইসলাম জীবনমৃত্যু সংগ্রামের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল এবং মুসলমানদেরকে তাদের নতুন ধর্মমত থেকে ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করার জন্য পৌত্তলিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ বিশ্বাসঘাতকতামূলক উপায় অবলম্বন করেছিল। এমন সময়ে শিক্ষাগুরুর পক্ষে বিরোধী ধর্মমতসমূহের প্রতারণা-মূলক ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে শিষ্যদেরকে সাবধান করে দেওয়া অবশ্য করণীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুলনামূলক ইতিহাসের ছাত্র শত্রু ও বিরোধীদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তাঁর ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় তাঁকে দোষারোপ করতে পারে না। কিন্তু যখন আমরা অ-মুসলিম প্রজাদের প্রতি তাঁর সাধারণ আচরণের প্রতি দৃকপাত করি তখন আমরা দেখতে পাই যে তিনি উদার হৃদয়ে সহনশীলতা ও সহানুভূতি নিয়ে তাদের সঙ্গে আচরণ করেছেন।

কোন বিজেতা জাতি বা ধর্ম কি তার প্রজাদের জাতীয়তার ক্ষেত্রে হযরতের নিম্নোক্ত বিবৃতিতে যে নিশ্চয়তা দৃষ্ট হয় তদপেক্ষা অধিকতর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে? নজরানের খ্রীষ্টান ও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে আল্লাহর নিশ্চয়তা ও হযরতের অঙ্গীকার তাদের জীবন, তাদের ধর্ম ও তাদের সম্পত্তির প্রতি সম্প্রসারিত হল—যারা উপস্থিত আছে, যারা অনুপস্থিত রয়েছে সকলের জন্য, তাদের ধর্মপালন কিংবা তাদের উৎসব-সমূহের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না; আর তাদের অধিকার বা সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না; কোন বিশপ তার যাজকীয় অবস্থান থেকে বহিষ্কৃত হবে না; কোন সন্ন্যাসী তার মঠ থেকে, কোন পুরোহিত তার গির্জা থেকে বিতাড়িত হবে না; পূর্বের মতো তারা ছোটবড় সকল অধিকার ভোগ করতে থাকবে; কোন মূর্তি বা ক্রুশ ধ্বংস করা যাবে না; তারা অত্যাচার করতে পারবে না কিংবা অত্যাচারিত হবে না; আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ন্যায় তারা রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের

---

১. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলিম প্রজাদেরকে আহলুজ. জিম্মা' কিংবা 'জিম্মী' বলা হয়। জিম্মী অর্থাৎ নিরপত্তার শর্তের অধীনে বসবাসকারী।

২. সেলের 'এসেজ অন ইসলাম' দেখুন।

অধিকার নেবে না ; জমির আয়ের দশমাংশ তাদের নিকট থেকে আদায় করা হবে না কিংবা সেনাবাহিনীর সংরক্ষণের জন্য তাদের কোন ব্যয়ভার বহন করতে হবে না।"[১]

হিরা অধিগত হওয়ার পর এবং জনগণের আনুগত্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে খালিদ বিন ওয়ালিদ একটি ঘোষণা দিলেন যার বলে তিনি খ্রীষ্টানদের জান, মাল ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হল। তিনি ঘোষণা করলেন যে "তাদেরকে তাদের 'নাকা'[২] বাজানো থেকে এবং উৎসবে 'ক্রুশ' ব্যবহার থেকে বিরত করা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ[৩] বলেন, আর এই ঘোষণা খলিফা[৪] ও তাঁর পারিষদ[৫] কর্তৃক অনুমোদিত ও মঞ্জুর হয়েছিল।"

নতুন গির্জা বা মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে অ-মুসলিম প্রজাদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। যেখানে শুধু মুসলমানেরা বাস করত সেইসব এলাকাতে নীতিগতভাবে এই ধরনের নিয়ম চালু ছিল। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস[৬] বলেন, এত যে শহর বা এলাকাতে শুধুই মুসলমানের বাস সেখানে কোন গির্জা বা মন্দির তৈরী করা যেত না, কিন্তু যেসব জায়গায় পূর্ব থেকেই 'জিম্মীদের' বাস ছিল সেখানে আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের যে নিরাপত্তার চুক্তি তা অবশ্যই মেনে চলতাম।"[৭] বাস্তবে এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য হত। মামুনের সময়ে মুসলিম-সাম্রাজ্যে ইহুদীদের ও অগ্নি-উপাসকদের শত শত ধর্মমন্দির ছাড়াও খ্রীষ্টানদের এগার হাজার মন্দিরের কথা জানতে পারি। এই সুশিক্ষিত নৃপতিকে খ্রীষ্টানদের "চরম শত্রু" বলে অভিহিত করা হলেও তাঁর শাসনাধীনে সকল সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে,

১. কিংবা সেনাছাউনির কোন দায়িত্বও তাদের উপর বর্তাবে না ; 'ফতুহুল বুলদান' (বালাজুরী) পৃ. ৬৩ ; ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক 'কিতাবুল খারাজ'। মুয়্যির হযরতের এই নিরাপত্তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।—২য় খণ্ড, পৃ. ২২৯ ; পরিশিষ্ট দেখুন।
২. প্রাচ্য খ্রীষ্টান গির্জাসমূহে ঘণ্টার পরিবর্তে এক খণ্ড কাঠ ব্যবহৃত হয়।
৩. খলিফা হারুন অর রশীদের প্রধান কাজী বা বিচারক।
৪. আবু বকর।
৫. ওমর, ওসমান, আলী ও হযরতের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ কর্তৃক গঠিত। 'কিতাবুল খারাজ' দেখুন, পৃ. ৮৪।
৬. হযরতের চাচাত ভাই এবং একজন স্বীকৃত আইনজ্ঞ।
৭. 'কিতাবুল খারাজ', পৃ. ৮৮।

মুসলমান, ইহুদী, খ্রীষ্টান সেবীয় ও জরথুস্ত্রবাদীদের থেকে লোক নিয়ে এই পরামর্শ সভা গঠিত হত এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পদমর্যাদার স্তর অনুসারে খ্রীষ্টানদের অধিকার ও সুবিধাগুলি নিয়ন্ত্রিত ও নিশ্চিত হত।

ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে মিশর বিজয়ের পর খলিফা ওমর বিবেকানুমোদিত ভাবে খ্রীষ্টানদের গির্জায় উৎসর্গীত সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পুরাপুরি সংরক্ষিত রেখেছিলেন এবং পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক পুরোহিতদের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত ভাতা চালু রেখেছিলেন।[১]

আদিম মুসলমান সরকারের সহনশীলতার সর্বোত্তম স্বাক্ষর খ্রীষ্টানেরা স্বয়ং প্রদান করেছেন। তৃতীয় খলিফা ওসমানের শাসনামলে সার্ভের খ্রীষ্টান পেট্রিয়ার্ক ফার্সের বিশপ সিমীয়নকে নিম্নোক্ত ভাষায় আহ্বান করেছিলেন, "যে আরবদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছেন তারা খ্রীষ্টধর্মের উপর আক্রমণ করেন না, বরং তারা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে থাকেন, তারা আমাদের ঈশ্বর ও সাধুপুরুষদের সম্মান প্রদান করেন এবং আমাদের গির্জা ও মঠের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করেন।"

স্বেচ্ছাচারিতার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য এড়ানোর জন্য কোন মুসলমানকেই এমন কি ক্রয়ের মাধ্যমেও জিম্মীর সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করতে দেওয়া হত না। "ইমাম বা সুলতান কেউই 'জিম্মী'কে তার সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত করতে পারে না।"

আইনের দৃষ্টিতে মুসলমান ও 'জিম্মী' সম্পূর্ণরূপে সমান। খলিফা আলী বলেন, "তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ন্যায়।" কোন কোন সুসভ্য দেশসহ, বহু আধুনিক সরকার তাদের নমুনা হিসেবে মুসলমান-দের প্রশাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারেন। অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। ইসলামের আইনে, যদি কোন মুসলমান কোন 'জিম্মী'কে হত্যা করে তবে সেও অনুরূপ শাস্তির অধীন।[২]

---

১. 'মাকরিজী', পৃ. ৪৯২, ৪৯৯।

২. যৈলী তাঁর 'তাখ্‌রিখুল হেদায়া'তে দ্বিতীয় খলিফা ওমরের শাসনামলের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বকর বিন ওয়ালী নামক একজন মুসলমান হেরুত নামীয় একজন খ্রীষ্টানকে হত্যা করেছিল। খলিফা আদেশ করলেন "হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট সোপর্দ কর"। হেরুতের

অ-মুসলিম প্রজাদের কল্যাণসাধনের উৎকণ্ঠার দরুন কর্দোভার প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফাদের ন্যায় বাগদাদের খলিফাগণ জিম্মীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ চালু করে-ছিলেন। বাগদাদে এই বিভাগের নাম 'কাতিবুল যিমাজেহ্' এবং স্পেনে এর নাম 'কাতিবুজ্ জিমাম'।[১]

মুতাওয়াক্কল হুসাইনের স্মৃতিসৌধ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেখানে তীর্থযাত্রীদের যাতায়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি যেভাবে মুসলমান বুদ্ধিবাদীদেরকে রাষ্ট্রীয় কার্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং তাদেরকে নানান ধরনের অযোগ্যতার শিকারে পরিণত করেছিলেন তেমনিভাবে তিনি অ-মুসলিম প্রজাদেরকেও বঞ্চিত করেছিলেন। পরবর্তী আইন গ্রন্থসমূহে যা রচিত হয়েছিল যখন ইসলাম ও খ্রীষ্টানজগতের মধ্যে একদিকে জীবনের জন্য এবং অপরদিকে পাশবিক প্রভুত্বের জন্য লড়াই চলছিল তখন তাতে এ ধরনের দু' একটি অনুচ্ছেদ এসেছে যার কদর্থ করা হয়েছে যে ইসলামে জিম্মীরা অবহেলিত। কিন্তু শিক্ষাগুরু কিংবা অব্যবহিত অনুসারী অথবা উত্তরাধিকারিগণের প্রণীত বলবৎকৃত আইন-সমূহের মধ্যে এরূপ কোন বর্ণনা মেলে না। অবশ্য এর সঙ্গে এটা অবশ্যই সংযোজিত করতে হবে যে পরবর্তী আইনপ্রণেতাদের ধর্মান্ধ মতবাদ কখনো বাস্তবে অনুশীলিত হয়নি; জিম্মীগণ মুসলমানের উইলের তত্ত্বাবধায়ক হতে পারত—এই ঘটনা যে উদারতা ও সহনশীলতা নিয়ে অ-মুসলিমদের সঙ্গে আচরণ করা হত তার সাক্ষ্য বহন করে; তারা প্রায়ই মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রেক্টর নিযুক্ত হত, এবং যতদিন তারা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন না করত, ততদিন তারা মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে কাজ করত। যখন একজন সম্মানিত ও গুণবান অ-মুসলিম মারা যেত তখন মুসলমানেরা দলবদ্ধভাবে তার শেষকৃত্যে যোগদান করত।

মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনায় সুস্পষ্ট কারণে সামরিক নেতৃত্ব অ-মুসলিম-দের হস্তে ন্যস্ত করা হয়নি, কিন্তু উচ্চবেতন ও বিশ্বস্ততার অন্যান্য

উত্তরাধিকারী হুনাইনের নিকট অপরাধীকে সোপর্দ করা হল। হুনাইন তাকে হত্যা করল। তাখ্রিখুল হেদায়া, দিল্লী সংস্করণ, পৃ. ৩৩৮। অনুরূপ অপর একটি ঘটনা ওমর বিন আব্দুল আজিজের খেলাফত কালে বিবৃত হয়েছে।

১. জাল (*j*) সহযোগে 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন', পৃ. ৫৭৩।

চাকুরীতে মুসলমানদের মতো তাদেরও সমান প্রবেশাধিকার ছিল। এই সমতা শুধু নীতিগতভাবেই বিদ্যমান ছিল না, বরং হিযরী প্রথম শতাব্দী থেকে আমরা খ্রীষ্টান, ইহুদী ও মাজীদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে দেখি। আব্বাসীয় নৃপতিগণকে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়াই ধর্মের ভিত্তিতে প্রজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে দেখি না। পরবর্তী রাজবংশ যারা আব্বাসীয়দের স্থলে ক্ষমতা লাভ করেছিল তারাও বিবেকানুমোদিত ভাবে তাদের অনুসরণ করেছিলেন।

যদি ইসলামী দেশসমূহে অ-মুসলিমদের প্রতি আচরণের সঙ্গে ইউরোপীয় সরকারসমূহের অধীনে অ-খ্রীষ্টানদের আচরণের তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে মানবতা ও উদারতার পাল্লা ইসলামের অনুকূলে যাবে। দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের অধীনে হিন্দুরা সেনাধ্যক্ষ্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রদেশসমূহের শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করতেন এবং বাদশাহর উপদেষ্টা সভার সদস্য হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করতেন। এমন কি বর্তমানকালে একথা কি বলা যেতে পারে যে মিশ্রজাতি ও ধর্মশাসিত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যে ধর্মমত, বর্ণ বা বংশের পার্থক্য বিদূরিত হয়েছে ?

ইসলাম প্রায় পরিপূর্ণভাবেই মানবজাতির মধ্যে ঐশী একত্ব ও মানবীয় সমতার নীতি যা হযরত প্রচার করেছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর একত্বের কেন্দ্রীয় নীতি ও হযরতের পয়গাম স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে ততদিন ইসলাম মনুষ্য-বিবেকের বিস্তৃততম স্বাধীনতা প্রদান করেছে। ফলস্বরূপ যেখানে মুসলিম বীরেরা ইসলামের একত্ব ও সাম্যের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেখানে অবহেলিত জনগণ ও নির্যাতীত ধর্মচ্যুত ব্যক্তিবর্গ ভয়াবহ দাসত্বের অক্টোপাশ থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তির দূত হিসেবে ইসলামকে গণ্য করেছে। ইসলাম তাদের নিকট আইনের দৃষ্টিতে ব্যবহারিক সমতা এনে দিয়েছে এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত করে দিয়েছে।

কাদেসিয়ার যুদ্ধের ফলে পারস্য মুসলমানদের করতলগত হয়। এই যুদ্ধ অগণিত পারসিকদের মুক্তির সংকেত হিসেবে এসেছিল যেমন ইয়ারমুক ও আজনাদাইনের যুদ্ধ সিরীয়, গ্রীক ও মিশরীয়দের মুক্তির প্রতীক হিসেবে এসেছিল। জরথুস্ত্রবাদীরা ইহুদীদেরকে মাঝে মাঝে নৃশংসভাবে হত্যা করত এবং খ্রীষ্টানদেরকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিতাড়িত করত; এ সব ভাগ্যহত মানুষেরা হযরতের কর্তৃত্বাধীনে স্বস্তির

নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। হযরতের ধর্মনীতি ছিল বিশ্বভ্রাতৃত্ব। বিশ্বমানব মুসলমানদেরকে মুক্তিদাতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। যেখানে ইসলাম কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানে স্বার্থপর পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণীকে বাধা দিতে দেখা গিয়েছে। জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণী জরথুস্ত্রবাদীদের দ্বারা চিরনিগৃহীত হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এক চিরন্তন সত্যের স্বীকৃতি মাত্র মুসলিম বিজেতাদের সঙ্গে তাদেরকে এক কাতারে সন্নিবিষ্ট করেছে।

বিভিন্ন গোত্র ও জনপদের সামন্ত প্রধানেরা সুযোগ-সুবিধা, সম্মান ও আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার করেছে—গোবিনিউ বলেছেন, "মুসলমানদের অত্যাচার ও নির্যাতন বহুলাংশে অতিরঞ্জিত হয়েছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।"

আফ্রিকা ও স্পেন বিজয় একই ফলোৎপাদন করেছিল। এরিয়ান, পেলাজিয়ান এবং অন্যান্য ধর্মচ্যুত ব্যক্তিগণ অদ্যাবধি ধর্মান্ধতার ক্রোধ ও ও বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হয়েছিল—তারা আইনবর্জিত সেনাপত্য দ্বারা এবং ততোধিক আইনবর্জিত পৌরহিত্য দ্বারা নিদারুণভাবে নির্যাতীত হয়েছিল—এসব লোক ইসলামের ছায়াতলে এসে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। ভাগ্যের পরিহাস প্রাচীনদের মধ্যে নিয়তির প্রতি বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল; সেই ভাগ্যের পরিহাসক্রমে যে ইহুদীরা হযরতের প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের উপক্রম করেছিল তারাই মুসলমানদেরকে তাদের উত্তম রক্ষাকারী হিসেবে পেয়েছিল। "সমুদয় খ্রীষ্টান জাতি দ্বারা অপমানিত, লুণ্ঠিত ও ঘৃণিত হয়ে" তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছিল, অমানবিক আচরণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল, যা থেকে সমগ্র খ্রীষ্টানজাহান তাদেরকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছিল।

ইসলাম জাতিকে দিয়েছিল একটি জীবন বিধান যা সরলতার দিক দিয়ে প্রাচীন হলেও পার্থিব সভ্যতার অগ্রগতি অনুসারে সর্বোচ্চ বিকাশে সক্ষম ছিল। এ রাষ্ট্রকে দিয়েছিল একটি নমনীয় সংবিধান যা মানবীয় অধিকার ও দায়িত্বের সঠিক মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ রাজস্বকে সীমিত করেছিল, মানুষকে আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা দান করেছিল, এ স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতিসমূহকে পরিশুদ্ধ করেছিল। এ কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষকে আইনের অধীন করে শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছিল—এই আইন ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক বাধ্যতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উর্কুহার্ট বলেন, "এসব নীতির প্রত্যেকটির উৎকর্ষ

ও কর্মক্ষমতা (প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠাতাকে অমর করতে সক্ষম) সবকিছুকে মূল্যবান করে তুলেছিল, আর সবগুলি নীতি মিলিত হয়ে এই জীবন-ব্যবস্থাকে এমন শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল যা অন্যান্য রাজ-নৈতিক জীবনব্যবস্থাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। একজন মানুষের জীবনকালের মধ্যেই একটা বন্য, মূর্খ অকিঞ্চিৎকর জাতির হাতেই এই ব্যবস্থা রোমের রাজ্যসমূহের চেয়েও অধিক বিস্তৃত হয়েছিল। এ তার আদি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখলেও এ ছিল অপ্রতিরোধ্য।"[১]

আবু বকরের স্বল্প শাসনকাল প্রদেশের রীতি-সম্মত নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য মরুসন্তানদের শান্ত করার কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু ওমরের শাসনভার গ্রহণের সঙ্গে—যিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব—আদি মুসলিম শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্টজ্ঞাপক প্রজাহিতৈষী কার্যক্রমের বিনিদ্র তৎপরতা শুরু হয়েছিল।

প্রথম খলিফাদের আমলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সরকার ছিল জনগণের সরকার, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রধান সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে দেশশাসন করতেন। রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার সীমিত ছিল *প্রশাসনিক ও কার্যনির্বাহী* বিষয়সমূহে; যেমন, পুলিস নিয়ন্ত্রণ, সৈন্যবাহিনী পরিচালন, বৈদেশিক বিষয়সমূহের সম্পাদন, অর্থ-ব্যবস্থার বণ্টন ইত্যাদি। কিন্তু স্বীকৃত আইন লঙ্ঘন করে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।

বিচারবিভাগ সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল না। বিচারকদের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত; নিয়মিত বিচারসংস্থা কোন ব্যক্তিকে কঠোর দণ্ড দিলে প্রথম খলিফাগণ তা মওকুফ করতে পারতেন না। ধনী ও দরিদ্র, ক্ষমতাশালী ও দিনমজুর—সকলেই আইনের দৃষ্টিতে ছিল সমান।

যতই সময় এগিয়ে যায় জীবনব্যবস্থার কঠোরতাও শিথিল হয়ে আসে। কিন্তু তার রূপ সর্বদা সংরক্ষিত থাকে। এমন কি অন্যায়ভাবে সিংহাসন-দখলকারী উমাইয়াগণ বিনা অধিকারে, বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সরকার দখল করেছিল এবং ইসলামী শিক্ষা যে পৌত্তলিক অভিজাততন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়েছিল তারা ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতিনিধিত্ব করত। তবে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের আইনানুগ কার্যনির্বাহী প্রধানের ন্যায় তারা কমবেশী বাহ্যত আচরণ করত। পরবর্তী বংশসমূহের

---

১. উর্হার্ট, 'স্পিরিট অব দি ইস্ট' ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ২৮।

শাসকবৃন্দ যখন তাদের স্বেচ্ছাচারিতার সীমা অতিক্রম করত তখন বিচারক-মণ্ডলীর রায় তাদেরকে সংযত করত। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এ ছিল নৃপতিদের উপর সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ। প্রাথমিক পর্যায়ে হযরতের সাহাবীগণ রাষ্ট্রের পরামর্শ সভার প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে কাজ করতেন। "হযরতের সাহাবী" উপাধির প্রতি গুরুত্ব যেমন শহরে তেমনি তাবুতে ছিল প্রচণ্ড। যে শক্তিশালী প্রভাব তাঁরা বিস্তার করেছিলেন তা মুসলমানদের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'আসহাবে'র গুণ এর সঙ্গে পবিত্রতা ও মহত্ত্বের চরিত্র বহন করত। যখন এই উপাধিধারী কোন ব্যক্তি কর্মরত হতেন তখন জনগণ তাঁর পাশে এসে সমবেত হত এবং তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করত। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা হযরতের সঙ্গে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং আনসারগণ যাঁরা আনুগত্যের সাথে তাঁকে মদিনায় গ্রহণ করেছিলেন, আর বদর ও ওহোদে ধর্মের সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন; আর যাঁরা তাঁর দ্বারা কোন কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, দেখেছেন, কিংবা তাঁর কথা শুনেছেন। সর্বশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা যে কোন "সাহাবা"র অধীনে কাজ করেছেন এবং পরোক্ষভাবে হযরতের অত্যাশ্চর্য প্রভাবের মধ্যে এসেছেন।

ওমরের খেলাফতের সময়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল যা ইসলামে সকল মানুষের পরিপূর্ণ সাম্যভাব প্রদর্শন করে। ঘাসানিয়াদের নৃপতি জবালা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাসীদের নেতা আমিরুল মুমেনিনকে সম্মান প্রদর্শন করতে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। যখন তিনি কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন একজন সাধারণ মুসলমান পবিত্র কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করছিল। অকস্মাৎ তার একখানি হজ্জের বস্ত্র নৃপতির স্কন্ধদেশে নিপতিত হয়েছিল। জবালা ক্রোধান্বিত হয়ে পিছন ফিরে তাকে এমন ঘুষি মারেন যাতে তার দন্তসমূহ উৎপাটিত হয়। এই ঘটনার বাকী অংশ সিরিয়ার প্রেরিত মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ আবু উবাইদার প্রতি হযরত ওমরের অবিস্মরণীয় বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। খলিফা তাঁকে লিখেন, "বেচারা আমার নিকট আসেন এবং প্রতিকার চান। আমি জবালাকে ডেকে পাঠাই; যখন তিনি আমার সম্মুখে হাজির হন তখন আমি তাকে প্রশ্ন করি কেন তিনি একজন মুসলিম-ভাইকে অপমান করেছেন। তিনি উত্তর দেন যে লোকটি তাকে অপমান করেছে, আর যদি এই পবিত্র স্থানে না হয়ে অন্য কোথায় হত তবে তিনি তাকে ঐ স্থানেই হত্যা

করতেন। আমি উত্তর করলাম যে, তার কথা অপরাধের গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে ; যদি তিনি আহত লোকটির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেন তবে তাকে আইনের স্বাভাবিক শাস্তি পেতে হবে। জবালা জবাব দিল, 'আমি একজন নৃপতি এবং অপর ব্যক্তি একজন সাধারণ লোক।' 'নৃপতি বা সাধারণ লোক আপনি যাই হোন না কেন, উভয়েই মুসলমান এবং আইনের দৃষ্টিতে উভয়ই সমান।' তিনি পরদিন পর্যন্ত শাস্তি মুলতুবী রাখতে অনুরোধ করলেন এবং আহত লোকটির সম্মতিক্রমে আমি বিলম্বে সম্মতি দান করলাম। রাত্রিতে জবালা পলায়ন করলেন এবং এখন খ্রীষ্টান কুকুরের[১] সঙ্গে যোগদান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে তার উপর এবং তার মতো অন্যান্যদের উপর বিজয়ী করবেন··· ।"

ওমরের এই পত্রখানা আবু উবাইদা সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে পাঠ করলেন। এরূপ যোগাযোগ প্রথম খলিফাদের সময়ে প্রায়ই ঘটত। কোন ব্যক্তি শিবিরে কিংবা শহরে জনসাধারণের কাজ সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত থাকত না। প্রত্যেক শুক্রবারে জামাতের নামাজের পর আমিরুল মুমেনিন সমবেত জনতার নিকট দিনের গুরুত্বপূর্ণ মনোনয়ন ও ঘটনাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করতেন। প্রদেশসমূহের শাসনকর্তারাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। কেউই সাধারণ সভায় যোগদান থেকে বঞ্চিত হত না। এই ছিল গণতান্ত্রিক শাসনের সর্বোত্তম রূপ। ইসলামের নেতা বা আমিরুল মু'মেনিন কোন অলৌকিকতার অস্পষ্টতায় বিজড়িত থাকতেন না। তিনি রাষ্ট্রের শাসনের ব্যাপারে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকতেন। জনগণের কল্যাণে প্রাথমিক খলিফাদের কঠোর নিষ্ঠা এবং তাদের জীবনের কৃচ্ছ্র সরলতা ছিল হযরতের দৃষ্টান্তের কঠিন অনুসরণ। তারা হযরতের মতো মসজিদে ধর্মপ্রচার ও নামাজ আদায় করতেন ; গৃহে তারা দরিদ্র ও মজলুমদের আপ্যায়ন করতেন এবং নীচতম ব্যক্তিদের কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। পারিষদ ব্যতিরেকে, আড়ম্বর বা অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে তাঁরা তাঁদের চরিত্রবলে জনগণের হৃদয় শাসন করতেন। একজন মাত্র ভৃত্য সমভিব্যহারে খলিফা ওমর জেরুজালেমের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গমন করেছিলেন। আবু বকর তাঁর মৃত্যুকালে মাত্র এক প্রস্থ পোশাক, একটি উট ও একজন ভৃত্য তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে

---

১. প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানেরা বাইজাণ্টাইন সম্রাটদেরকে সাধারণতঃ এই উপাধিতে অভিহিত করত।

গিয়েছিলেন। প্রত্যেক শুক্রবারে আলী বায়তুল মাল থেকে যে ভাতা পেতেন তা বিপন্ন মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং জাতির সমক্ষে সাধারণ বিচারসভার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের নজীর স্থাপন করেছিলেন। যতদিন ইসলামিক প্রজাতন্ত্র টিকেছিল কোন খলিফাই ন্যায়বিচারের জন্য গঠিত আদালতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারতেন না কিংবা তার বিপরীতে কাজ করতে পারতেন না।[১]

স্বাভাবিকভাবেই বাহুবলে স্থাপিত কোন নতুন সরকারের পক্ষে অনতিবিলম্বে জাতির ভাবাবেগ সমন্বিত করা কঠিন। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আরবজাতি বিজিত জাতিসমূহকে সর্বাধিক প্রত্যয় ও অনুরাগ দান করেছিলেন। আবু উবাইদার সংযম ও শান্ত ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, সৈনাধ্যক্ষ ও প্রধানগণ খালিদের মতো দুর্ধর্ষ সৈন্যদের মার্জিত ও শান্ত করেছিলেন, এবং জনগণের দেওয়ানী অধিকারসমূহকে অক্ষুণ্ণ রেখে-ছিলেন। তাঁরা বিজিত জাতিসমূহকে পরিপূর্ণ ধর্মীয় সহনশীলতা দান করে-ছিলেন। তাদের আচরণ আধুনিক কালের বহু সভ্য সরকারকে দেওয়ানী ও ধর্মীয় স্বাধীনতার মহত্তম দৃষ্টান্ত দান করতে পেরেছেন। তাঁরা কোন স্ত্রীলোককে প্রহার করে হত্যা করেননি। তাঁরা নির্দোষ মহিলাদেরকে সাই-বেরিয়ার খনিতে নিক্ষিপ্ত করেননি এবং তাদের প্রহরীদের নিকট বলাৎকারের জন্য ছুঁড়ে দেননি। যেসব হিতকর সামাজিক প্রথা তাদের ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষে আসেনি সেগুলির ক্ষেত্রে বিরোধিতা না করার দূরদর্শিতা তাদের ছিল।

জনগণের কৃষিবিষয়ক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য ওমর যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা তাদের কল্যাণ ও স্বার্থের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর সতত উপস্থিত উৎকণ্ঠার নির্দেশক। জমির রাজস্ব, সমতা ও মধ্যপন্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের সর্বত্র পয়ঃপ্রণালী ও খাল কাটবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সামন্তব্যবস্থা যা কৃষকদের ন্যুব্জ করছিল তা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং শতাব্দী সঞ্চিত অধীনতা থেকে কৃষককুলকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আততায়ীর হস্তে এই স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যু নিঃসন্দেহে সরকারের বিরাট ক্ষতি। তাঁর কঠোর অথচ ন্যায়পরায়ণ চরিত্রশক্তি, তাঁর সাধারণবুদ্ধি ও মনুষ্যস্বভাবের জ্ঞান উমাইয়া-

---

১. আদালতের প্রথম রায় যা কার্যকর করা হয়নি তা হল মুয়াবিয়ার শাসন আমলে। তিনি সিংহাসন দখলকারী উমাইয়াদের প্রশংসায় কবিতা পাঠের জন্য যাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তাকে ক্ষমা করেছিলেন।

সন্তানদের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা দমনে ও সংযত রাখতে তাঁকে উল্লেখ-যোগ্যভাবে উপযোগী করেছিল। মৃত্যুশয্যায় ওমর ছয়জন নির্বাচকের উপর খেলাফতের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। আবু তালিবের পুত্রকে খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু উমাইয়াদের ষড়যন্ত্র এই প্রস্তাবের সঙ্গে এমন একটি শর্ত যোগ করেছিল যা তারা জানত আলী সমর্থন করবেন না। তাঁকে শুধু হযরতের আইন ও নজির অনুসারে সরকার পরিচালনা করলে চলবে না, অধিকন্তু তাঁর পূর্ব-বর্তী দু'জন খলিফার প্রতিষ্ঠিত নজির অনুসারেও সরকার পরিচালনা করতে হবে। স্বাধীনচেতা আলী তাঁর বিচারবুদ্ধিকে কোনরূপে শৃঙ্খলিত করতে রাজী ছিলেন না। কাজেই উমাইয়াগণ যেভাবে প্রত্যাশা করেছিল তেমনি তাদের জ্ঞাতি ওসমানকেই খেলাফত প্রদান করা হল। হযরতের উত্তরাধিকারত্বে এই শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানের অভিষেক শেষ পর্যন্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে শর্তবিহীন অমঙ্গলের কারণ হয়েছিল। তিনি সেই বংশের সদস্য ছিলেন যে বংশ সর্বদা হাশেমের বংশধরদের প্রতি বদ্ধমূল শত্রুতা পোষণ করত। তারা বিদ্বেষপূর্ণ শত্রুতার সঙ্গে হযরতের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল এবং তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। তারা শৈশবেই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য জোর প্রয়াস চালিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। নিজেদেরকে সম্মিলিত করে, মোজার বংশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে যে বংশের তারা ছিল প্রধান সদস্য, উমাইয়াগণ বিদ্বেষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল যে তাদের পূর্ব শক্তি ও আভিজাত্য বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মক্কা-বিজয়ের পর তারা নির্বন্ধকে গ্রহণ করেছিল সত্য, কিন্তু আব্দুল্লাহর পুত্র তাদের জন্য যে বিপর্যয় এনেছিলেন সেজন্য তারা হাশিম বংশকে বা ইসলামকে কখনো ক্ষমা করেনি। হযরত যতদিন পর্যন্ত বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের সামনে এসব বিশ্বাসঘাতকের দল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই স্বার্থের তাগিদে[১] এবং মুসলমানদের পার্থিব বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে কল্যাণ বহন করে এনেছিল তার আংশিক ভাগীদার হওয়ার লোভে নামমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা কোনদিন মুহম্মদ-ঘোষিত গণতন্ত্রের প্রতি শত্রুতা থেকে বিরত হয়নি। লম্পট, অবিবেকী ও নির্মম এবং অন্তরে পৌত্তলিক, তারা সাম্যের ধর্মের

১. সুতরাং তারা 'মুয়াল্লাফাতুল কুলুব' নামে অভিহিত হত।

প্রতি বিরক্ত বোধ করত—যে ধর্মনৈতিক কর্তব্য ও ব্যক্তিগত শালীনতার পালন পুরোপুরি দাবী করত। যে সরকারের প্রতি তারা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল তাকে ধ্বংস করার জন্য এবং যেসব লোকের উপর প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। হযরতের প্রথম দু'জন, উত্তরাধিকারী তাদের উচ্চাশাকে সীমার মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক অভিপ্রায় দমন করতে পেরেছিলেন। ওসমানের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে শুকুনি যেমন শিকারের গন্ধ পায় তেমনি তারা মদিনায় এসে জুটেছিল। তাঁর খেলাফত লাভ উমাইয়াদের সেই বিদ্বেষ প্রকাশের এবং সেই বদ্ধমূল লাম্পট্যের সংকেত ছিল যা ইসলামি জাহানের অন্তঃস্থলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং তার মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবনগুলি ধ্বংস করেছিল।

ওসমানের শাসনামলে তাঁর দু'জন পূর্বসূরীর নীতি ও প্রশাসনের সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণের জন্য তিনি অঙ্গীকৃত ছিলেন। হযরতের সাক্ষাৎ শিষ্য ও সঙ্গীদের মধ্য থেকে নিযুক্ত সকল পূর্ববর্তী শাসনকর্তা ও সেনাধ্যক্ষদেরকে অপসারিত করা হল। গুণ ও বিশ্বস্ত খেদমত সম্পূর্ণরূপে পদদলিত হল। বিশ্বাস ও বৈতনিক সব বিভাগ উমাইয়ারা দখল করল। যেসব লোক ইসলামের চরম শত্রুতা করেছিল তাদেরকে প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করা হল এবং তাদের অনুকূলে বায়তুলমাল বা টাকশাল উজাড় করা হল। আমরা মুহম্মদের ধর্মাবলম্বীদের বিভেদ আলোচনা কালে পরবর্তী ঘটনাসমূহ কিছুটা সবিস্তারে বর্ণনা করব। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, প্রশাসনের দুর্নীতি, সব পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের প্রতি সম্পূর্ণ অবমাননা, নিজ জ্ঞাতি-কুটম্বদের প্রতি বৃদ্ধ খলিফার স্বজনপোষণ এবং কোন অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত না-করা হযরতের বৃদ্ধ সাহাবা ও জনসাধারণের মধ্যে মারাত্মক অসন্তোষ সঞ্চার করেছিল। এসব বিদ্রোহে পর্যবসিত হয়েছিল, যার ফলে ওসমান প্রাণ হারান। ওসমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে জনগণ সর্বসম্মতিক্রমে আলীকে খলিফার শূন্য আসনে নির্বাচিত করল। যে বিদ্রোহ পরে দেখা দিয়েছিল তা ইতিহাসের বিষয়। ওল্‌সনার বলেন, "যদি আলীকে শান্তিতে শাসন পরিচালনা করতে দেওয়া হত তবে তাঁর গুণাবলী, তাঁর দৃঢ়তা এবং চরিত্রের বলিষ্ঠতা পুরাতন প্রজাতন্ত্র ও তার সরল কার্যপদ্ধতিকে চিরস্থায়ী করতে পারত।"[১]

---

১. ওল্‌সনার, 'ডুজ এফেক্ট্‌স ডু লা রিলিজিয়ান ডু মুহম্মদ'।

আততায়ীর খঞ্জর ইসলামের আশা নির্মূল করে দিল। মেজর অসবর্ণ বলেন, "তাঁর নিধনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যদীপ্ত হৃদয় ও সর্বোত্তম মুসলমান, যার বিবরণ ইসলামের ইতিহাসে শ্রদ্ধাভরে স্মরিত, বিশ্ব থেকে তিরোহিত হন।" সাত শ' বছর পূর্বে এই বিস্ময়কর ব্যক্তির প্রতি ঐশীত্ব আরোপ করা যেত; তেরশ' বছর পরেও তাঁর প্রতিভা ও মেধা, তাঁর গুণাবলী ও সাহসিকতা সভ্য জগতের প্রশংসা দাবী করে। শাসক হিসেবে তিনি তাঁর যুগের অগ্রগামী ছিলেন। সত্যের জন্য আপোষহীন অনুরাগ, কোমল ও দয়ার্দ্রহৃদয় আলী উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাসক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে ছিলেন প্রায় অনুপযোগী।

উমাইয়া রাজবংশের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের রাজনৈতিক মর্মবাণীর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রপ্রধান তখন জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রজাতন্ত্রের প্রধান নন, যিনি জনগণের কল্যাণের জন্য ও ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য শাসন করবেন, উমাইয়াদের সময় থেকে খলিফা তার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতেন: তার উপস্থিতিতে কিংবা তার থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে জনগণের আনুগত্য প্রকাশ তার নির্বাচনের বৈধতা প্রতিপন্ন করত। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের সুবিধা ব্যতিরেকে তাদের সম্মিলিত কুফল উৎপন্ন করত। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শুধু খলিফাগণ হযরতের সাহাবাদের সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ সভার সাহায্য লাভ করতেন না, এমনকি প্রাদেশিক গভর্ণরগণেরও উপদেষ্টা পরিষদ থাকত। উমাইয়া শাসন আমলে সরকার ছিল নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্র; মরুসন্তান আরবদের ও বিদ্বান বা পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের বাক্‌স্বাধীনতা ছিল এ ধরনের যে, প্রায়ই তারা কোরআনের একটি বাক্যাংশের কিংবা একটি আয়াতের সাহায্যে কিংবা কবির কবিতার মাধ্যমে সুলতানের মেজাজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারতেন। আব্বাসিয়া রাজবংশ প্রথম পাঁচজন খলিফার আমলেও সরকার ছিল কমবেশী স্বৈরতান্ত্রিক, যদিও বিভাগীয় মন্ত্রিগণ ও রাজবংশের প্রধান সদস্যগণকে নিয়ে অনন্নুমত উপদেষ্টাদের পরিষদ গঠিত হত। সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নিয়মিত উপদেষ্টা পরিষদ যা সুলতানের আনুগত্য লাভ করত তা মহান সুলতান মামুনের আমলেই প্রথম গঠিত হয়েছিল। বুয়াইদ, সামানিয়া, সেলজুক ও আইয়ুবিয়া সুলতানদের সকলেরই উপদেষ্টা পরিষদ ছিল যাতে কমবেশী জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকত।

প্রাথমিক পর্যায়ের আব্বাসীয় খলিফাদের একাধিপত্য ইসলামী জাতিসমূহের বুদ্ধিগত বিকাশ ও পার্থিব সমৃদ্ধিকে সহায়তা করেছিল। তাদের শাসনের প্রাণবন্ততা ও যে দৃঢ়তার সঙ্গে তারা সরকার পরিচালনা করেছিলেন তাতে ইংলণ্ডের টিউডর নৃপতিদের সঙ্গেই তাদের তুলনা করা চলে। আব্বাসিয়া খলিফাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরবর্তী রাজবংশগুলি গ্রহণ করেছিল। আর এই ব্যবস্থা বাগদাদের স্থাপয়িতা বাদশাহ মনসুরের প্রতিভার ফলশ্রুতি। কার্যকর কর্মবণ্টন ব্যবস্থা ও তার খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা নিখুঁত সুগঠিত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আব্বাসিয়াদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমপর্যায়ভুক্ত।

কয়েক শতাব্দীব্যাপী তাদের যে রাজত্বের স্থায়ী হয়েছিল তার শুরু থেকে তারা চেম্বর অব ফিন্যান্স এবং চ্যান্সেলরী অব স্টেট—দু'টি বিভাগ স্থাপন করেন—প্রথমটির উপর রাজ্যের কর আদায় ও ব্যয়বণ্টনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল আর দ্বিতীয়টির উপর ন্যস্ত ছিল নৃপতিদের আদেশ-সমূহের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব, আরও অধিকতর কর্মবণ্টনব্যবস্থার নিরিখে রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগ খোলা হয় যার মধ্যে নিম্নোক্ত বিভাগগুলি প্রধান 'দিওয়ানুল খারাজ' (রাজস্বের কেন্দ্রীয় অফিস) বা অর্থবিভাগ, 'দিওয়ানুদ্ দিয়া' (রাজকীয় সম্পত্তির অফিস), দিওয়ানুয্ যিমাম' (হিসাব-নিরীক্ষার অফিস), 'দিওয়ানুয্ যুন্দ' (সমর অফিস), 'দিওয়ানুল মাওয়ালী ওয়াল গিলমান' (মক্কেল ও দাসদের সংরক্ষণ-অফিস)—এখানে খলিফার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও দাসদের তালিকা রক্ষিত হত এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হত; 'দিওনুল বারিদ' (ডাক বিভাগ), 'দিওয়ানুয যিমাম আন্ নাফাকাত' (পরিবার সংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দ অফিস), 'দিওয়ানুর রাসায়েল' (পররাষ্ট্র দপ্তর), 'দিওয়ানুত্ তাওকিয়া' (আবেদন দপ্তর), 'দিওয়ানুন্ নজর ফিল মাজালিম' (অভিযোগ তদন্ত দপ্তর), 'দিওয়ানুয আহদাস ওয়াশ্‌শুর্তা (মিলিশিয়া ও পুলিসি দপ্তর) এবং 'দিওয়ানুল আতা' (চাঁদা দপ্তর), নিয়মিত সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য কর্মচারীর বেতনপ্রদানকারী বিভাগের সদৃশ দপ্তর। অ-মুসলিম প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজ বিশেষ বিভাগের হস্তে নিয়োজিত হয়েছিল—এই বিভাগের প্রধানকে বলা হত 'কাতিবুয্ যিহ্‌বাজে'।

প্রত্যেকটি সরকারী দপ্তর একজন পরিচালকের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হত

যাকে 'রইস' বা 'সদর' বলা হত এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারক যাঁরা করতেন তাঁদের বলা হত 'মুশরিক' বা 'নাজির'।[১]

এই সংগঠনের সঙ্গে আব্বাসীয় খলিফাগণ 'হাযিব' উপাধিধারী একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বিদেশের দূতদের পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং কাজীর বিচারের বিরুদ্ধে আবেদন শুনানির জন্য আদালত গঠন করতেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ প্রধানমন্ত্রী বা উজিরে আযমের দপ্তরও স্থাপন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কাজ ছিল সুলতানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ তার সম্মুখে উপস্থাপিত করা। তারা প্রাদেশিক শাসনকার্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতেন এবং প্রদেশের দেয় রাজস্ব নির্ধারিত করতেন। তারা বাগদাদ থেকে মক্কা পর্যন্ত পথিপার্শ্বে সরাইখানা, চৌবাচ্চা ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করেছিলেন, বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন এবং প্রত্যেক স্থানে ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরী করেছিলেন। হিজাজ ও ইয়েমেনের মধ্যে যাতায়াত সুগম করার জন্য ঘোড়া ও উট বদল করার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য প্রত্যেক শহরে সংবাদ-বাহক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের নথিপত্র দলিলদস্তাবেজ সংরক্ষণ করার জন্য তাঁরা রাজধানীতে একটি কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপন করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র দক্ষ পুলিসবাহিনী ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা একটি বণিকসভা বা সিন্ডিকেট অব্ মার্চেন্টস স্থাপন করেছিলেন, উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক লেনদেনের নির্দেশনা, বণিকদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি এবং প্রতারক দমন প্রত্যেক বাণিজ্যকেন্দ্রে একটি করে বণিক করপোরেশান ছিল এবং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহরের জন্য বণিক পরামর্শ সভা ছিল। তাঁরা বাজার তত্ত্বাবধায়কের অফিস—'মুহ্তেসিব'-এর দপ্তর স্থাপন করে-ছিলেন। বণিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুহ্তেসিবরা প্রত্যেকদিন বাজার পরিদর্শন করতেন। তাঁরা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতেন এবং মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির সংরক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান করতেন। কৃষিকার্যের উন্নয়নের জন্য কৃষককুলকে অগ্রিম প্রদান করা হত এবং জনগণের সমৃদ্ধি ও দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক শাসনকর্তা-দের সাময়িক বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হত। অনেক সুলতান তাদের

১. আব্বাসীয়া বংশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণের জন্য 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসিন' পৃ. ৪০২-৪৪৩ দেখুন।

জাকজমকের মধ্যেও গণপ্রজাতান্ত্রিক গুণের সাদৃশ্য রক্ষা করার প্রয়াস পেতেন। তাদের লিখিত গ্রন্থ, তাদের তৈরী ঝুড়ি বাজারে বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যেত তা থেকে খলিফাদের ব্যক্তিগত খরচ বহন করা হত। আলীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে তাদের নিষ্ঠুর আচরণের পাশে তাদের প্রজাদের কল্যাণ সাধনের উৎসাহকে সম্ভবত মহত্ত্বের নজির হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মামুন ও তাঁর দু'জন অব্যবহিত উত্তরাধিকারীর শাসনামলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল।

স্পেন ইসলামের রাজনৈতিক চরিত্র ও সমাজের সব রূপ ও অবস্থায় তার উপযোগিতা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অন্যতম দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে। এই ভূখণ্ড বর্বর বাহিনীর অধীনে ভয়ানকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। এই দুর্ধর্ষ বাহিনী যখন দেশের উপর অভিযান চালিয়েছিল তখন যেখানে যে প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল তা নির্মূল করে দিয়েছিল। রোমান শাসনের ধ্বংসাবশেষের উপর তারা যে রাজ্য স্থাপন করেছিল তা রাজনৈতিক বিকাশের সকল মূল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। তাদের প্রজাবৃন্দ সামন্তশাসনের ভারে ও তার ভয়াবহ ফলশ্রুতিতে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিল। বিরাট এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। ইসলামিক বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর সামন্ত বন্দীদশা থেকে জাতি ও দেশ মুক্তি লাভ করল। মরুভূমি ফলভারে আনত হল, সমৃদ্ধশালী নগর চারদিকে গড়ে উঠল এবং নৈরাজ্যের স্থলে আইন-শৃঙ্খলা ফিরে এল। সেখানের মাটিতে পদার্পণের অব্যবহিত পরে জাতি ও ধর্ম-নির্বিশেষে অধীন প্রজাদের জন্য সর্বাধিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে আরবগণ নির্দেশ জারি করলেন। সুভী, গথ, ভ্যাণ্ডাল, রোমান ও ইহুদী সকলেই মুসলমানদের সঙ্গে একই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা তাদের ধর্মের পরিপূর্ণ অনুশীলন এবং তাদের ভজনালয়ের স্বাধীন ব্যবহার এবং জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করল। বিশেষ সীমার মধ্যে তাদেরকে নিজেদের আইন দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হল। বেসামরিক অফিসে চাকুরী গ্রহণ ও সৈন্য বিভাগে কাজ করার জন্য তারা অনুমতি পেল। তাদের নারীদেরকে বিজয়ীদের সঙ্গে আন্তর্বিবাহের জন্য আমন্ত্রণ জানান হল। স্পেনে আরবদের আচরণ কি বিজিত জাতিসমূহের প্রতি বহু ইউরোপীয় জাতির, এমন কি আধুনিক কালের ইউরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্যে দণ্ডায়মান নয়? আরবদের শাসনকে ইংলণ্ডের নরম্যানদের শাসনের সঙ্গে কিংবা ধর্মযুদ্ধকালে সিরিয়ায় খ্রীষ্টানদের

শাসনের সঙ্গে তুলনা করলে সাধারণ বুদ্ধি ও মানবতার প্রতি অবমাননা করা হয়। কোন পার্থক্য ব্যতিরেকে সকল শ্রেণীর প্রতি সমান বিচারের অঙ্গীকার সংরক্ষণে আরবদের বিশ্বস্ততা তাদের জন্য জনগণের বিশ্বাস নিশ্চিত করেছিল। শুধু এসব বিশেষ ক্ষেত্রে নয় বরং মানসিক উদারতা ও আচরণের মনোজ্ঞতা এবং আতিথেয়তার সামাজিক অনুশীলনে সেকালের অন্যান্য জাতি থেকে তারা বিশিষ্টতা লাভ করেছিল।[১] ইহুদীরা খ্রীষ্টান পুরোহিতদের প্রভাবে বর্বরদের অধীনে চরম দুর্দশা ভোগ করেছিল এবং সরকার পরিবর্তনের ফলে তারা সর্বাধিক লাভবান হয়েছিল। উচ্চতম শ্রেণীর স্পেনিশ মহিলাগণ, তাদের মধ্যে ছিলেন পেলাগিয়াসের ভগিনী ও রজবিকের কন্যা মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যে মুসলমানদেরকে গোড়া জীন ম্যারিয়ানাগণ "ধর্মদ্রোহী" বলেছেন। বিচার-বিবেচনার স্বাধীনতাসহ পদমর্যাদানুযায়ী তারা যাবতীয় অধিকার ও সুবিধা ভোগ করত। যেসব জমির মালিককে রজবিকের নির্যাতন পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল মুসলমানেরা তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। দুঃখের বিষয় জনশূন্যতা এতই অধিক হয়েছিল যে এই পদক্ষেপ দেশে বাসিন্দা সরবরাহে কোন কাজে আসেনি। তদনুযায়ী তাঁরা উপদ্বীপটিতে বসবাস ইচ্ছুক বিদেশী কৃষকদেরকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ থেকে বহু পরিশ্রমী বসবাসকারী সমবেত হল। একসঙ্গে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ পঞ্চাশ হাজার ইহুদী আন্দালুসিয়ায় বসতি স্থাপন করল।

সাত শ' বছর ধরে মুসলমানেরা স্পেন শাসন করেছিলেন এবং আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বংশগত বিবাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও তাদের শাসনের হিতকারিতা সম্পর্কে তাদের শত্রুরা পর্যন্ত সাক্ষ্য দেন ও স্বীকার করেন। স্পেনে আরবদের অধিগত উচ্চ সংস্কৃতির কারণ হিসেবে কোন কোন সময়ে প্রধানত মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রায়শ অনুষ্ঠিত বৈবাহিক সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে স্পেনিশ মুসলমানদের বিকাশে ও যে বিস্ময়কর সভ্যতার তাঁরা জন্ম দিয়েছিলেন তার উদ্ভবে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল, যে সভ্যতার কাছে আধুনিক ইউরোপ শান্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঋণী।[২] যা স্পেনে ঘটেছিল তা অন্যত্রও ঘটেছিল। যেসব দেশে মুসলমানেরা গিয়েছেন সেখানেই

---

১. কণ্ডি, 'হিস্ট্রী অব দি স্পেনিশ মূর্স'।

২. রেনান, 'অ্যাভেরোজ এত. অ্যাভেরোইজম।

পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে ; স্বেচ্ছাচারিতার স্থলে আইনশৃঙ্খলা প্রত্যাবর্তন করেছে। আর শান্তি ও প্রাচুর্যে দেশ ভরে গেছে। যুদ্ধ যেমন কোন শ্রেণীর লোকদের বিশেষ অধিকার নয় মেহনতও তেমনি কোন শ্রেণীর লোকদের নিম্ন মর্যাদার লক্ষণ নয়। কৃষিকার্যের অনুশীলন অস্ত্রের অনুশীলনের মতোই সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিল।[১]

ইসলাম প্রজাদের প্রতি সুলতানের দায়িত্বের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে আর যেভাবে এ মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যে উন্নীত সাধন করে, যেভাবে শাসকের জুলুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করে তা সুলতান ও প্রজাদের পারস্পরিক অধিকারের উপর 'সাফীউদ্দীন' মুহম্মদ বিন আলী বিন তাবা তাবা যিনি সাধারণত ইবনুত্‌তিকতাকা নামে পরিচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে[২] দেখানো হয়েছে। এই গ্রন্থখানি ৭০১ হিজরীতে (১৩০১-২ খ্রী.) রচিত এবং মসুলের আমির 'ফখ্‌র উদ্‌দীন' ইসা বিন ইবরাহিমের নামে উৎসর্গীত।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রজাদের প্রতি নৃপতির কর্তব্যসমূহ, সরকারী কার্যাবলী ও অর্থশাস্ত্রের পরিচালন বিধি সম্পর্কে আলোচনা করে। একজন নৃপতির যে যে গুণ থাকা দরকার সে বিষয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন—জ্ঞানবত্তা, ন্যায়বিচার, জনগণের অভাব ও কামনাবাসনার জ্ঞান এবং আল্লাহ্ ভীতি ; এবং তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, এই শেষোক্ত গুণটি যাবতীয় কল্যাণের উৎস এবং সকল করুণার কুঞ্জী ; "কেননা যখন নৃপতি আল্লাহর উপস্থিতির বিষয়ে সচেতন হন, তখন আল্লাহর বান্দারা শান্তি ও নিরাপত্তার সুখ উপভোগ করে"। নৃপতির অবশ্যই করুণা গুণটি থাকা চাই এবং "এটি সব উত্তম গুণাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ"। তাকে অবশ্যই তার প্রজাদের কল্যাণ সাধন করার চিরজাগ্রত বাসনা থাকতে হবে এবং প্রজাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবশ্যই তাকে আলোচনা করতে হবে; কারণ হযরত তাঁর সাহাবাদের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতেন। আল্লাহ বলেছেন "প্রত্যেক বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন।"[৩] জনসাধারণের

---

১. ওল্‌সনার।

২. এই গ্রন্থখানি সাধারণত 'কিতাবই তারিখ উদ্ দুওয়াল'—বংশসমূহের ইতিহাস নামে পরিচিত কিন্তু এর পুরা নাম 'কিতাবুল ফখ্‌রি ফিল আদাব উল সুলতানিয়াত্‌ ওয়াদ্ দুওয়াল উল্ ইসলামিয়া'—"সুলতান ও ইসলামী রাজবংশসমূহের সম্পর্কীয় ফখ্‌রির গ্রন্থ" ডিরেনবুর্গ সং.।

৩. আল্ কোরআন।

কার্যাবলী পরিচালনায় নৃপতির দায়িত্ব জনগণের আয়-তত্ত্বাবধান, প্রজাদের জীবন ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, শান্তিশৃঙ্খলা সংরক্ষণ, দুষ্টের দমন, ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ; আর তিনি সর্বদা কথা রক্ষা করবেন। তারপর লেখক তাৎপর্যসহকারে বলেছেন, "প্রজাদের কর্তব্য আনুগত্য, কিন্তু কোন প্রজাই একজন অত্যাচারীর প্রতি আনুগত্য দেখাতে বাধ্য নয়"। ইবনে রুশদ (মহান অ্যাভেরোজ) বলেছেন, "সেই হল অত্যাচারী যে নিজের জন্য শাসন করে। তার জনগণের জন্য নয়।"

মুসলিম আইন ন্যায়বিচারের মৌল-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সরলতা ও যাথার্থ্যের জন্য বিশিষ্ট। কাজেই এই আইন যে আনুগত্যের দাবী করে তা কার্যকরী করা যেমন কঠিন নয় তেমনি তা মানবজাতির বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়। যে সবদেশে মুসলমানেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেসব দেশ সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা এবং সামন্তবাদী বিধির মারাত্মক কুফল থেকে মুক্ত।"[১] কোন বিশেষ সুবিধা, কোন শ্রেণীকে স্বীকার না করে তাদের আইনসমূহ দু'টি মহৎ ফল উৎপাদন করেছিল—বর্বরদের আইনসমূহের কৃত্রিম ভার থেকে দেশটিকে মুক্ত করেছিল এবং নাগরিকদের প্রতি অধিকারের পরিপূর্ণ সমতা নিশ্চিত করেছিল।"[২]

১. কর্সিকা, সার্ডেনিয়া, সিসিলি ও নিম্ন ইতালীতে আরবদের বিতাড়নের পর সামন্তবাদী ব্যবস্থা চালু করা হয়।

২. ওলসনার।

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামে রাজনৈতিক দল ও উপদলসমূহ

বাহাত্তর দলে ভাগ হয়ে সব
ছড়িয়ে পড়ল দশ দিশে
সত্য তারা দেখল না যে—
কল্পনায় সব রইল মিশে।
—হাফিজ

ধর্মের ইতিহাসের প্রত্যেক দার্শনিক ছাত্রদের কাছে এই অধ্যায়ের শিরোনাম দুঃখ না দিলেও বিস্ময়ের উদ্রেক করবে ; আর ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি নিবেদিত চিত্ত প্রত্যেক ইসলামপন্থীর কাছে তা দুঃখ লজ্জা উৎপন্ন করবে, আফসোস! মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধর্ম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও বিসম্বাদের অভিশাপ এড়াতে পারেনি ; যে ধর্ম বিচ্ছিন্নতাবাদী দুনিয়ায় শান্তি ও স্থৈর্য আনার জন্য এসেছিল তা ক্রুদ্ধ উন্মাদনা ও শক্তির লালসার আবর্তে পড়ে নিজেই টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়েছে। খ্রীষ্টধর্মে যে 'অমঙ্গলের জন্যে আমরা বিলাপ করি তা এসেছিল জীবনব্যবস্থার অপূর্ণতা, মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা থেকে ; আর ইসলামে যে অমঙ্গলের বর্ণনা আমরা করব তা এসেছে পার্থিব অগ্রগতির লোভ, নৈতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি অসহিষ্ণু ব্যক্তি ও শ্রেণীর বৈপ্লবাত্মক প্রবৃত্তি থেকে।

যে পার্থিব আন্দোলনের তিনি কারণ এবং যা আভ্যন্তরীণ বংশগত যুদ্ধ সত্ত্বেও তাঁর লোকদেরকে অভিযানের জোয়ারে জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল তার চেয়ে কোন কিছুই আরবের নবীর অসাধারণ প্রতিভা, বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় ঐক্য ও বিশ্বনাগরিকতার প্রতি তাঁর আহ্বানের হৃদয়গ্রাহিতাকে অধিকতর বিশদভাবে প্রদর্শন করতে পারে না। যে আরব অদ্যাবধি যুযুধান গোত্র ও বংশসমূহের আবাসস্থল, যেখানে প্রত্যেক গোত্র শতাব্দীব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত, সেই দেশ সহসা একটা সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। এ পর্যন্ত আরবদের যুদ্ধবিগ্রহ ও মৈত্রীবন্ধন, তাদের দোষগুণ, তাদের স্বাধীনতা-প্রীতি ও গোত্রীয় অনুভূতি যৌথ ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মেষপালক জাতি বাদশাহর জাতিতে পরিণত হল, অর্ধ-যাযাবর জাতি "বিশ্বজনীন ধর্ম ও আইনে"র প্রভুতে রূপান্তরিত হল। অভূতপূর্ব শক্তি ও স্বনিয়ন্ত্রিত নিষ্ঠা সহকারে তিনটি মহাদেশে স্থাপিত যাযাবর গোত্রসমূহের সমাবেশ ধর্মের পতাকা ধারণ করে তাকে প্রত্যেক জায়গায় সমুন্নত করেছে। "তোমাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে মানবজাতির কাছে করুণার বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য, ঐশী একত্ব ঘোষণা করার জন্য"—এই আহ্বান তাদের কাছে এসেছিল এবং তারা সব বাধা উল্লঙ্ঘন করে এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। বিশ্বাসের তীব্রতা, যা বিরোধী ধর্মমত ও বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়েও তাদেরকে সফল করেছিল, এই বিপ্লবের রহস্যকে ব্যাখ্যা করে।

সত্য চিরন্তন; মুহম্মদের পয়গাম নতুন ছিল না। এই পয়গাম আগেও এসেছিল, কিন্তু তা মানুষের হৃদয়ে পেঁাছেনি। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃতকে জীবিত করে তুলেছিল, মুমূর্ষুকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল এবং মানবজাতির প্রাণস্পন্দনকে যুগ যুগ সঞ্চিত শক্তির সঙ্গে স্পন্দমান করে তুলেছিল। এই শক্তিশালী আবেগের তাড়নায় আরবদের নিষ্ক্রমণ, এর বিশালতা ও সুদূরপ্রসারী ফল আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনায় রূপ লাভ করেছে। তাঁরা মানবজাতির শিক্ষাগুরু হিসেবে তাদের মরু-দুর্গ থেকে বের হয়েছিলেন। ত্রিশ বছরের মধ্যে—খোলাফায়ে রাশেদীনের জন্য সময়কালটির ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল—তাঁরা হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে আটলান্টিকের তীরভূমি পর্যন্ত তাদের পয়গাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক জাতির দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছেন। হযরতের মৃত্যু থেকে প্রজাতন্ত্রের ভরাডুবি পর্যন্ত, এই স্বল্পকালের মধ্যে তাঁরা এমন একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন যা তের শত বছরের বিস্তারলাভের পরে রোমান সাম্রাজ্য যত বড় হয়েছিল তাকেও হার মানিয়েছিল। ইবনুল আছির, তাবারী কিংবা আবুল ফেদার ইতিহাসের পাতা উল্টালে আপনারা এই প্রবাহের অগ্রগমনের ধারাবাহিক বিবরণ দেখতে পাবেন, দেখতে পাবেন যে, যে-দেশে তাঁরা গিয়েছেন সেই দেশকে তাঁরা সমৃদ্ধিশালী করেছেন এবং সেখানে যা কিছু কল্যাণকর পেয়েছেন তা সমন্বিত করেছেন।

যে কারণসমূহ হযরতের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আরবদেরকে একটি জাতিতে পরিণত হতে দেয়নি—সেই গোত্রীয় বিদ্বেষ, গোত্রে-গোত্রে বিভেদ—যার লক্ষণসমূহ এখনও মুসলিম-জাহানে দৃশ্যমান—শেষ পর্যন্ত শুধু প্রজাতন্ত্রেরই ধ্বংস সাধন করেনি, আরব সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটিয়েছে।

ভ্য ওহ্সন বলেছেন, "মুহম্মদের অনুসারীবৃন্দ যদি গুরুর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হতেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অবলম্বন করতেন তবে তাদের সাম্রাজ্য রোমানদের সাম্রাজ্যের চেয়ে বিশালতর ও অধিকতর স্থায়ী হত।" কিন্তু উমাইয়াদের লোভ, আরবদের অবাধ্যতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব, যা একটা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলে প্রকাশ পায়, প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানেরা তাদের শৌর্যবীর্য ও নিষ্ঠা-সহকারে যে বিশাল সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন তার ধ্বংস ডেকে এনেছিল। এ কারণে বিজয় নাগালের ভেতর এলেও তারা অভিযানে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে; তারা স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল কেননা তারা মরুভূমির পুরাতন বিদ্বেষ ভুলতে পারেনি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।

যদিও প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটেছিল, রাজমুকুট আরবদের থেকে হস্তান্তরিত হয়েছিল, তবুও ধর্ম মরেনি। এ ছিল যুগ যুগ সিঞ্চিত বিবর্তনের পরিণতি। এ মানুষের ধর্মীয় বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্দেশক; সাম্রাজ্য কিংবা মানুষের জীবনের উপর এর অস্তিত্ব বা বিকাশ নির্ভরশীল নয়। ধর্মের বিস্তার লাভ ও ফলবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্ম প্রয়োজন ও বুদ্ধিবৃত্তিক বোধশক্তি অনুসারে প্রত্যেক গোষ্ঠী ও প্রত্যেক যুগ তার শিক্ষা থেকে লাভবান হয়ে থাকে।

যিশুখ্রীষ্টের ধর্মানুসারীদের মতো মুহম্মদের অনুসারীরাও আভ্যন্তরীণ বিভেদ ও সংঘর্ষের ফলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক বিষয়-সমূহের উপর মতানৈক্য সসীম অস্তিত্বে যার কোন নিশ্চয়তা মিলতে পারে না এমন বিষয়ই সর্বদা মানুষের জ্ঞান-সীমার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলীর সাধারণ বিভেদ অপেক্ষা তীব্রতর তিক্ততা ও প্রচণ্ডতর শত্রুতার জন্ম দিয়েছে। যিশুখ্রীষ্টের প্রকৃতি সম্পর্কীয় বিবাদ লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে প্লাবিত করেছে; তেমনি ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রশ্নটিও সমপরিমাণ রক্তক্ষরণ না করলেও ইসলাম-জগতে একই পরিমাণ গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। রোমের ধর্মীয় নেতাদের অভ্রান্ততা যেমন খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি নাড়া দিয়েছিল, ইসলামে জাতি ও ধর্মনেতাদের অভ্রান্ততা তেমনি বহু মূল্যবান প্রাণের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

মুহম্মদের উম্মতদের মধ্যে অধিকাংশ বিভেদ ঘটেছে প্রধানতঃ রাজ-নৈতিক ও বংশগত কারণে—পুরাতন গোত্রগত কলহ এবং প্রবল হিংসা-বিদ্বেষ যা হাশেমের বংশধরদের বিরুদ্ধে অন্যান্য কোরাইশদেরকে উদ্দীপিত

করেছিল। সাধারণতঃ অনুমান করা হয়ে থাকে যে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ব্যবস্থাপনায় হযরত কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যাননি; কিন্তু এ ঘটনার ভ্রমাত্মক উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেননা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য রয়েছে যে হযরত বহুবার তাঁর প্রতিনিধিত্বের জন্য আলীর প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য হল "বিদায় হজ" সমাপ্তির পর মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে খুম নামক স্থানে বিশ্রাম করার সময় সমবেত সঙ্গীসাথীদের উদ্দেশে যে কথা বলেছিলেন তাতে তাঁর উত্তরাধিকারী সম্পর্কিত অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না। তিনি বলেছিলেন, "মুসার নিকট হারুন যেমন আমার নিকট আলীও তেমন। হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তুমি তার বন্ধুদের বন্ধু হও ও শত্রুদের শত্রু হও; যারা তার সাহায্যকারী হয় তুমি তাকে সাহায্য কর এবং যারা তার সঙ্গে প্রতারণা করে তাদেরকে তুমি নিরাশ কর।"[১] অপরপক্ষে হযরতের অসুস্থতাকালে নামাজে ইমামতি করার জন্য মনোনয়ন ভিন্ন নির্বাচনের ইঙ্গিতে করতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পরই নির্বাচনের প্রশ্নটি আলোচনা ও মীমাংসার জন্য উঠল, যখন ইসলামে নেতা নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। হাশেমীয়রা দাবী করেছিল যে আলীর ওপরই খেলাফতের দায়িত্ব নিয়োগ ও উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায়। অন্যান্য কোরাইশরা নির্বাচনের মাধ্যমে মীমাংসার জন্য জিদ ধরল। যখন মুহম্মদের আত্মীয়-স্বজনরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিয়োজিত ছিলেন তখন কোরাইশ ও কিছু সংখ্যক আনসারদের ভোটে আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হন। অবিলম্বে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এই দ্রুত পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে উদার এবং ধর্মানুরাগী, ধর্মগুরুর শিষ্যদের মধ্যে সামান্যতম বিবাদ এড়ানোর ব্যাপারে বিবেকবান ও উৎকণ্ঠিত আলী তৎক্ষণাৎ আবু বকরের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন। তিন-তিন বার তিনি প্রত্যাখ্যাত হলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে নির্বাচকমণ্ডলীর রায় গ্রহণ করলেন। তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের জন্য কখনও দাঁড়াননি, আর

১. ইবনে খাল্লিকান ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩। ইবনে খাল্লিকান বলেন, "খুম মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম এবং আত্‌ তুহ্‌ফার নিকটবর্তী। এই উপত্যকায় একটি পুকুর আছে যার নিকটবর্তী স্থানে হযরত প্রার্থনা করেছিলেন। এটা ঘটেছিল ১৮ই জুলহিজ-এ, কেননা ইবনে খাল্লিকান বলেন যে ঐ মাসের ১৮ই তারিখে ঈদুল গাদির গাদিরের বাৎসরিক ভোজোৎসব। গাদির-ই-খুম ও ঈদুল্‌ গাদির একই।

তাঁর সমর্থকদের অনুভূতি যাই হোক না কেন, তিনি প্রথম দুই খলিফাকে প্রজাতন্ত্রের শাসন ব্যাপারে তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান থেকে কখনও বিরত থাকেননি এবং তাঁরাও তাঁদের দিক থেকে ধর্মগুরুর শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও ব্যাখ্যাকে সম্মান দিয়েছেন। আমরা পূর্বেই খেলাফত পদে ওসমানের উন্নীত হওয়ার সঙ্গে জড়িত অবস্থার উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা ধর্মানুসারীদের মধ্যে শোচনীয় বিভেদ—যা এতদিন পর্যন্ত মুসলিম জাহানকে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছে তার ইতিহাস ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর খেলাফতে সমাসীন হওয়ার পর যেসব ঘটনা ঘটেছিল তার সন্ধান করব। আবু বকরের বুদ্ধিমত্তা কিংবা ওমরের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তি বা নৈতিক যোগসূত্রিতা কোনটাই ওসমানের ছিল না। অমায়িকতা ও সহজ-ভালমানুষী স্বভাব তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করেছিল। সম্মানিত খলিফা তাঁর লোভাতুর আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন, প্রদেশসমূহ অন্যায়ের প্রতি-কারের জন্য আর্তনাদ করত, মুসলিম জনসাধারণ বিষণ্ণভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল—এইসব ছিল সে সময়ের শিক্ষাপ্রদ অথচ করুণ চিত্র। ভোজী প্রতারিত রাষ্ট্রপ্রধানের চরিত্র সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। "ওসমানের চরিত্র খলিফা-পদে তাঁর নির্বাচনকে সমর্থন করে না। এটা সত্য যে তিনি সম্পদশালী ও দানশীল ছিলেন, আর্থিক সাহায্যের দ্বারা তিনি মুহম্মদ ও ইসলাম ধর্মকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি উপাসনা করতেন আর প্রায়ই রোজা রাখতেন এবং তিনি একজন সদাশয় ও কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। যা'হোক তিনি প্রাণবন্ত লোক ছিলেন না, এবং বার্ধক্য দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এতই ভীরু ছিলেন যে মিম্বরে উঠলে ভাষণ কোত্থেকে আরম্ভ করতে হবে তা বুঝতে পারতেন না। বৃদ্ধ লোকটির পক্ষে এটা দুঃখের কারণ ছিল যে তাঁর মধ্যে স্বজন-প্রীতি ছিল প্রবল ; যে স্বজনেরা মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিশ বছর ধরে মুহম্মদের প্রতি অপমান ও নির্যাতন চালিয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাঁর চাচা হিশাম, বিশেষ করে হিশামের পুত্র মারওয়ান, ওসমানকে নামমাত্র খলিফা স্বীকার করে এবং সর্বাপেক্ষা আপোষমূলক যাবতীয় পদক্ষেপের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে যে বিষয়ে তিনি প্রায়ই অনবহিত থাকতেন না, বস্তুত দেশশাসন করত। এই দুটি লোকের ধর্মনিষ্ঠা, বিশেষ করে পিতা হিশামের ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ ছিল। যখন মক্কা বিজিত হয়েছিল তখনি হিশাম

ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রের গোপন তথ্য ফাঁস করার জন্য তাকে হীন-পদস্থ করা হয়েছিল ও নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আবু বকর ও ওমর (হযরত কর্তৃক) জারিকৃত আদেশ অটুট রেখেছিলেন। পক্ষান্তরে, ওসমান তাকে শুধু নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনেননি বরং তার উপস্থিতির পর তাকে বায়তুল মাল থেকে একশত হাজার রৌপ্যমুদ্রা এবং একখণ্ড খাস জমি প্রদান করেছিলেন। তিনি মারওয়ানকে তাঁর সচিব ও উজির বানিয়েছিলেন, আর তার সঙ্গে নিজের একটি কন্যাকে বিবাহ দিয়ে এবং আফ্রিকার বিজয়লব্ধ সম্পদ দিয়ে তাকে সম্পদশালী করেছিলেন।"…যে আবু সুফিয়ান ও হিন্দা ওহোদের যুদ্ধে দুর্ধর্ষতার[১] সঙ্গে মুহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের পুত্র মোয়াবিয়াকে সিরিয়ার শাসনকর্তাপদে পাকা-পোক্ত ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন; তাঁর দুধ-ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ বিন সুর্রাহকে মিশরের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। একদা এই আব্দুল্লাহ হযরতের সচিব ছিলেন। যখন হযরত প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ করার জন্য বলতেন তখন তিনি শব্দ পরিবর্তন করে তার অর্থ অস্বাভাবিক করে তুলতেন। যখন তাঁর জালিয়াতি ধরা পড়ল তখন তিনি পলায়ন করলেন এবং পুনঃপৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বৃদ্ধ খলিফার সহোদর ভাই অলিদকে কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করা হল। তার পিতা প্রায়ই হযরতের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত এবং একদা গলায় ফাঁস দিয়ে তাঁকে মারার উপক্রম করেছিল। এক সমাজভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ, এক পাঁড় মদ্যপ তার জীবন ছিল মুসলমানদের কাছে গ্লানির বিষয়। সে ফজরের নামাজের সময় মদ্যপান জনিত উন্মত্ততা নিয়ে অসহায় অবস্থায় মসজিদে উপস্থিত হত, নামাজের ইমামতি করার সময় মাটিতে পড়ে যেত; পাশের লোকেরা তাকে দাঁড় করিয়ে দিলে সে মদ্যপের অসংলগ্ন ও তোতলা কণ্ঠে আরও মদ চেয়ে সবাইকে মর্মাহত করত। এসব লোকই খলিফার অনুগ্রহভাজন হয়েছিল। বুভুক্ষু জোঁকের মতো তারা প্রদেশের উপর চেপে বসেছিল এবং নির্দয় জুলুমের মাধ্যমে অর্থসম্পদ স্তূপীকৃত করত। সাম্রাজ্যের সকল স্থান থেকে মদিনায় অভিযোগ রাশিকৃত হতে লাগল। অভিযোগসমূহ নিন্দা ও কঠোর হুঁশিয়ারীর মাধ্যমে নাকচ করা হত।[২] খলিফা আবু বকরের পুত্র মুহম্মদের নেতৃত্বে বার হাজার লোকের একটি প্রতিনিধিদল ওসমানের

---

১. ডোজী, 'হিস্ট্রী অজ মুসলমানস ডান্স ল্য এস পান' ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।
২. ইবনুল আসির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।

সমীপে জনগণের অভিযোগ পেশ করে তার প্রতিকার কামনায় মদিনায় আগমন করল। ন্যায় বিচারের জন্য জোর দাবীর মুখে খলিফা হযরতের দৌহিত্রের মধ্যস্থতার আশ্রয় নিলেন, যাঁর পরামর্শ তিনি এ পর্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন। তাদের অভিযোগ প্রতিকৃত হবে এই অঙ্গীকার প্রদান করে আলী প্রতিনিধিদলকে তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে রাজি করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে এবং মদিনার থেকে একদিনের কাছাকাছি পথে ওসমানের সচিবের লেখা একটা চিঠি তাদের হস্তগত হল, যে চিঠিতে খলিফার নিজের মোহরসহ বিবেকহীন মো'য়াবিয়ার প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে প্রতিনিধিদলকে যেন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ হয়ে তারা মদিনায় ফিরে এল, বৃদ্ধ খলিফার গৃহে প্রবেশ করল ও তাঁকে হত্যা করল। উমাইয়াগণ দীর্ঘদিন ধরে যার প্রত্যাশা করছিল, ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার একটা সুযোগ—এর গণতন্ত্র, সমান অধিকার এবং এর নৈতিকতার কঠোর নিয়মসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ, তাঁর মৃত্যু সেই সুযোগ করে দিল। যে মদনী প্রভুত্বকে তারা তীব্রভাবে ঘৃণা করত তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ওজর এই ঘটনা মক্কাবাসী ও তাদের মিত্রদেরকে দিল। প্রথমে বিবেকবর্জিত স্বজনদের হাতের ক্রীড়নক না হওয়ার জন্য জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ দিয়ে এবং চূড়ান্ত সংকটের সময়ে নিজেকে ক্রোধান্বিত যোদ্ধাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, সম্মানিত অথচ বিভ্রান্ত খলিফার জন্য বিবেচনার আবেদন জানিয়ে তিনি ওসমানকে রক্ষা করার প্রভূত প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ওসমানকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি তাঁর দুটি পুত্রকে প্রায় উৎসর্গ করতে বসেছিলেন। ওসমানের মৃত্যুর পর জনগণের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। হযরতের ওফাতের পর থেকে যদিও তিনি রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সভায় যোগদান করতে ব্যর্থ হননি, তথাপি তিনি সবসময়ে শ্রদ্ধান্বিত, গাম্ভীর্য ও মহৎ স্বাধীন মনোভাব বজায় রেখেছিলেন। তাঁর অবসর সময়ে তিনি অধ্যয়ন ও পারিবারিক জীবনের শান্তিপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অনাড়ম্বরভাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, তাঁর চেয়ে উত্তম যে কোন ব্যক্তির অনুকূলে তিনি রাষ্ট্র প্রধানের পদে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত আছেন।

সেডিলট বলেছেন, "যদি প্রথম থেকেই (আলীর অনুকূলে) বংশগত উত্তরাধিকারের নীতি স্বীকৃত হত তবে যে মারাত্মক বিপর্যয় মুসলমানের রক্তে ইসলামকে আচ্ছন্ন করেছিল তা হয়ত প্রতিরোধ করা সম্ভব হত।...

ফাতিমার স্বামী হযরতের আইনানুগ উত্তরাধিকারী হিসেবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমেও, উত্তরাধিকারত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। এটা ভাবা যেতে পারে যে, তাঁর নির্ভেজাল ও মহত্ত্বব্যঞ্জক গৌরবের সামনে সবাই অবনমিত হত। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না। জুবায়ের ও তালহা আশা করেছিলেন যে জনগণ তাদের মধ্যে একজনকে খলিফার পদে নির্বাচিত করবে, কিন্তু তাদের উচ্চাশার ক্ষেত্রে নিরাশ হল, এবং নতুন খলিফার অধীনে বসরা ও কুফার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তারাই প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আবু বকরের কন্যা আয়েশা প্রথম নির্বাচনগুলিতে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি জুবায়ের ও তালহাকে সাহায্য করেছিলেন। এই সম্মানিত মহিলা সর্বদা খাদিজার জামাতার প্রতি বদ্ধমূল বিরাগ পোষণ করতেন এবং এখন এই অনুভূতি চূড়ান্ত বিদ্বেষে পরিণত হল। তিনি ছিলেন এই বিদ্রোহের আত্মা এবং তিনি নিজেই উষ্ট্রপৃষ্ঠে বিদ্রোহী সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। রক্তপাতের প্রতি বীতরাগ খলিফা তাঁর চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে পাঠালেন ধর্মীয় আনুগত্যের মাধ্যমে যুদ্ধের সালিশ বর্জন করার জন্য বিদ্রোহীদের অনুরোধ করতে। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। জোবায়ের এবং তালহা খোরাইবা নামক স্থানে যুদ্ধ করল, পরাস্ত ও নিহত হল।[১] আয়েশা বন্দী হলেন। ভদ্রতা ও বিবেচনার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আচরণ করা হল এবং সসম্মানে তাঁকে মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই বিদ্রোহ দমন করতে-না-করতে আলী জানতে পারলেন যে সিরিয়ায় মোয়াবিয়া বিদ্রোহী হয়েছে। আবু সুফিয়ানের পুত্র, তার অনেক জ্ঞাতির মতো যাদেরকে ওসমান প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন, খলিফা কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রা ও সিরিয়ার সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে এক বৃহৎ অশ্বারোহী সেনাদল গড়ে তুললেন। আলীর অনেক পরামর্শদাতা তাঁকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত হওয়ার পূর্ব অবধি পরলোকগত খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণরদের বরখাস্ত না করতে উপদেশ দিলেন। "ইসলামের বেয়ার্ড—নির্ভীক ও নিন্দাতীত বীর"[২] কোন ধরনের কপটতার আশ্রয় গ্রহণ বা অন্যায়ের সঙ্গে

---

১. এই যুদ্ধ "উষ্ট্রের যুদ্ধ" নামে পরিচিত কারণ এই যুদ্ধে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আয়েশা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং যেখানে যোদ্ধদ্বয় নিহত হয়েছিলেন সেই স্থানটিকে 'ওয়াদিস্ সাবা'—"সিংহের উপত্যকা" বলা হয়।

২. এই উপাধিগুলি মেজর ওসবর্ণ আলীর প্রতি আরোপ করেছেন।

আপোষ করতে অস্বীকার করলেন। ওসমান যাদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং যারা নগ্নভাবে জনস্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদেরকে অফিস থেকে বরখাস্তের রাজাজ্ঞা প্রচারিত হল। মোয়াবিয়া অবিলম্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সিফ্ফিনের ময়দানে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে সে হেরে গেল। শেষ দিন মালিক আল্ আশ্তারের অপ্রতিরোধ্য চাপের মুখে যখন তার সৈন্যবাহিনী খড়কুটার মতো ভেসে যাচ্ছিল তখন সে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে তার সৈন্যদের বাঁচানোর জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করল। সে তার কতিপয় সৈন্যকে বল্লমের মাথায় কোরআন ঝুলিয়ে মুসলমান বাহিনীর সামনে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে যেতে আদেশ করল। "বিশ্বাসীদের রক্তপাত বন্ধ হোক; যদি সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে কে গ্রীকদের বিরুদ্ধে সীমান্ত রক্ষা করবে, যদি ইরাকের সৈন্যবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে কে তুর্কী ও পারসিকদের বিরুদ্ধে সীমান্ত রক্ষা করবে? আল্লাহর পাক্ কালাম আমাদের বিবাদের মীমাংসা করে দিক।" খলিফা এই পরম শত্রু ও তার সঙ্গী ষড়যন্ত্রকারী আমর বিন আসের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি তাদের কৌশল বুঝতে পারলেন এবং এই প্রতারণার প্রতি তাঁর লোকদের উন্মোচিত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনীর এক বৃহদাংশ আর যুদ্ধ করতে রাজি হল না এবং সালিশের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য দাবী জানাল। আবু সুফিয়ানের পুত্র কোরআনকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচবার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে—খলিফার এই আশ্বাস বাণীর উত্তরে এই অবাধ্য একগুঁয়ে মনোভাব খোলা স্বপক্ষ ত্যাগের হুমকি দিল।[১] মালিক আল্ আশ্তারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে পাঠান হল, যুদ্ধ থামল এবং বিজয়ের ফল যা অর্জিত হয়েছিল তার অপূরণীয় ক্ষতি হল।[২] সালিশের ব্যবস্থা করা হল। বিজয়ের মুহূর্তে যেসব ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁকে তরবারী কোষবদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল তারাই তাঁর বিচার-বিবেচনা-ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবু মুসা আল্ আশারীকে মুহম্মদ পরিবারের সালিশ নিযুক্ত করতে বাধ্য করেছিল। এই লোকটি গোপনে আলী বিরোধী ছিল। সে তার দাম্ভিকতা ও ধর্মীয় অহমিকার জন্য একাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল এবং মোয়াবিয়ার প্রতিনিধি, ধূর্ত ও অবিবেকী আমর বিন আসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে

---

১. শাহবিস্তানী, ১ম অংশ, পৃ. ৮৫।

২. প্রাগুক্ত।

থাকার মতো বুদ্ধি তার ছিল না। শীঘ্রই সে আমর বিন আসের খপ্পরে পড়ে গেল। আমর আবু মুসাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করল যে মুসলমান-দের কল্যাণার্থে (খলিফার পদ থেকে) আলীকে এবং (গভর্ণরের পদ থেকে) মোয়াবিয়াকে অপসারণ এবং রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অন্য ব্যক্তির মনোনয়ন অপরিহার্য। প্রতারণা সফল হল; আবু মুসা মিম্বরে উঠে ভাব-গম্ভীরভাবে আলীর অপসারণের কথা ঘোষণা করল। এই ঘোষণার পর সে মিম্বর থেকে এই ভাব নিয়ে অবতরণ করল যে সে একটা বড় ভাল কাজ করে ফেলেছে। অতঃপর আলীর প্রতিনিধি আবু মুসার শূন্য মিম্বরে সহাস্য বদনে আরোহণ করল এবং ঘোষণা করল যে সে আলীর অপসারণ অনুমোদন করল আর সেখানে মোয়াবিয়াকে নিযুক্ত করল। বেচারা আবু মুসা বজ্রাহতের মতো বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ল। এই বিশ্বাসঘাতকতা খুবই সুস্পষ্ট ছিল এবং ফাতেমীয়গণ এই সিদ্ধান্ত বৈধ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল।[১] এটা ঘটেছিল 'তুমাতুল্‌ যান্‌দালে'। উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ফাতেমীয়দের অতিশয় ক্রোধান্বিত করে তুলল এবং পরস্পরের প্রতি চির-বিদ্বেষের অঙ্গীকার নিয়ে উভয়দল পৃথক হয়ে পড়ল। অল্পকাল পরেই কুফার মসজিদে নামাজরত অবস্থায় আলী আততায়ীর হস্তে নিহত হন।[২] তাঁর শাহাদৎ আবু সুফিয়ানের পুত্রকে সিরিয়া ও হিযাযে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। আলীর মৃত্যুর পর, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান খলিফার পদে সমাসীন হন। আয়াস ও শান্তিপ্রিয় হাসান দ্রুত তাঁর বংশের শত্রুদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে নিবদ্ধ হন। কিন্তু উমাইয়াদের শত্রুতা সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করল,

---

১. যেসব লোক খালিফাকে সালিশ করতে বাধ্য করেছিল তারাই পরে তা প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের সালিশের দাবীকে সমর্থন করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তারাই মূল "খাওয়ারিজ" (বিদ্রোহী)—এরাই ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে প্রভূত অনিষ্টের কারণ হয়েছিল।

২. বীরধর্মী উদারতা নিয়ে খলিফা আলী এমন কি তাঁর বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে সর্বদা তাঁর সেনাবাহিনীকে শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে, পলাতকদের ছেড়ে দিতে, বন্দীদের প্রতি সম্মান দেখাতে এবং কখনও নারীদের প্রতি অসম্মান না করতে উপদেশ দিয়েছেন। মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যে হত্যা-কারীকে তরবারীর এক কোপে কেটে ফেলতে এবং তার প্রতি যেন অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা দেওয়া না হয়।

এবং কয়েক মাস যেতে না যেতেই তিনি বিষপ্রয়োগে নিহত হন। হিন্দার পুত্রের ভাগ্য এখন ঊর্ধ্বগামী, আর আবু সুফিয়ানের মক্কার সুলতান হওয়ার উচ্চাশা মোয়াবিয়া দ্বারা ব্যাপকতর পরিধিতে পরিপূর্ণ হল। এরূপে হযরতের সর্বাপেক্ষা দুই ক্ষমাহীন শত্রুর পুত্র ইতিহাসে লিপিবদ্ধ, নিয়তির সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর খেয়ালে খলিফার পদে উপবিষ্ট হল। পাছে মোয়াবিয়ার চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন পক্ষপাত-প্রসূত বলে বিবেচিত হয়, কাজেই আমরা একজন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দেব, যাকে কোনদিকে পক্ষপাতিত্বের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। ওসবোর্ণ বলেন, "বিচক্ষণ, বিবেকবর্জিত ও নির্মম উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা তার নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এমন অপরাধ নেই যা করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারণ করার জন্য হত্যাই ছিল তার চিরাচরিত রীতি। হযরতের দৌহিত্রকে তিনি বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। আলীর বীর সহকারী মালিক আল্ আশতারকে অনুরূপভাবে হত্যা করা হয়েছিল। তার পুত্র ইয়াযিদের উত্তরাধিকারত্ব নিরাপদ করার জন্য মোয়াবিয়া আলীর একমাত্র জীবিত পুত্র হুসাইনের সঙ্গে তার প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করতে দ্বিধা করেননি। তথাপি এই ধীরমস্তিষ্ক, হিসেবী, নাস্তিক, ইসলামী এলাকার উপর রাজত্ব করেছিলেন এবং প্রায় ১২০ বছর কাল তাঁর বংশধরদের হাতে রাজদণ্ড অক্ষুণ্ণ ছিল। এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা যে দু'টি অবস্থার মধ্যে পাওয়া যায় তা আমি একাধিকবার উল্লেখ করেছি। একটি হল যে প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মুসলমান মনে করেন যে তিনি সমুদয় পার্থিব ব্যাপার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে তার ধর্মকে প্রকাশ করেছেন, অপরটি হল আরবদের গোত্রগত মনোভাব। এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজেতা আরবগণ তাদের মর্যাদার স্তর পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেনি। মহত্ত্ব তাদের উপর চেপে বসেছিল, কিন্তু তাদের জাঁকজমকের মধ্যে, তাদের পূর্ববর্তী শক্তি ও তীব্রতার মধ্যে তারা মরুভূমির উন্মাদনা, বিরোধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈর্ষাবিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছিল। তারা শুধু পুনরায় ব্যাপকতর পরিসরে সংগ্রাম করেছিল 'ইসলামের সম্মুখে আরবদের যুদ্ধসমূহ'।"

মোয়াবিয়ার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিক যুগের অভিজাততন্ত্র ইসলামের গণতান্ত্রিক নিয়মের পরিবর্তন ঘটাল। সহগামী নীতিহীনতাসহ পৌত্তলিকবাদ পুনরুজ্জীবিত হল এবং উমাইয়া গভর্ণর ও সিরীয় সেনাবাহিনীর পিছু পিছু পাপ ও অ-নৈতিকতা সর্বত্র অনুসরণ করল। হিযায ও ইরাক অন্যায় দখলকারী শাসনাধীনে আর্তনাদ করতে লাগল, কিন্তু

এতই বজ্রমুষ্টিতে তিনি ইসলামের টুটি চেপে ধরেছিলেন যে সে অব্যাহতি কোন পথ পেল না। যে অর্থসম্পদ তিনি নির্মমভাবে প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করেছিলেন তা তিনি অশ্বারোহী সৈন্যের পিছনে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতে লাগলেন, যারা এর বিনিময়ে তাকে জনগণের বিরক্তি দমন করতে সাহায্য করেছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাদের ডাকলেন এবং তার পুত্র ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করলেন, যাকে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেছিলেন। এভাবেই ইয়াজিদ খলিফার পদে বরিত হন। মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর উমাইয়া পরিবারের লম্পট পুত্র পিতা কর্তৃক প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি মোয়াবিয়ার মতো নির্মম ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন, কিন্তু তার পিতার ন্যায় নির্মমতাকে আইনের ছদ্মবেশে চালানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর অধঃপতিত চরিত্র করুণা বা ন্যায়পরায়ণতা জানত না। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে তিনি আনন্দ আহরণ করতেন সেজন্য তিনি হত্যা ও নির্যাতনের আশ্রয় নিতেন। তিনি সবচেয়ে অশ্লীল পাপে আসক্ত ছিলেন। তাঁর প্রিয় সঙ্গীসাথীরা ছিল সর্বাপেক্ষা নষ্ট নরনারী। এ হেন ব্যক্তি ছিলেন খলিফা—বিশ্বাসীদের নেতা। আলীর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন বংশগতভাবে তাঁর পিতার বীরধর্মী প্রকৃতি ও গুণাবলী লাভ করেছিলেন। কনস্তানতিনোপল অবরোধে তিনি খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে সসম্মানে কাজ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে আলীর বংশগতির অধিকার এবং হযরতের দৌহিত্রের পবিত্র চারিত্রিক গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। মোয়াবিয়া ও হাসানের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে তাঁর খেলাফতের অধিকার সংরক্ষিত হয়। হুসাইন কোনদিনই দামেস্কের অত্যাচারী বাদশাহকে খলিফা বলে স্বীকার করেননি, যার চারিত্রিক দোষসমূহকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। যখন কুফার মুসলমানেরা উমাইয়া শাসনের অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, তখন তিনি ইরাকীদের মুক্তির আবেদনে সাড়া দেওয়া কর্তব্য মনে করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়তা লাভ করলেন যে সমস্ত ইরাকী জনগণ অত্যাচারী শাসককে সিংহাসন থেকে অপসারণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যখন তিনি হাজির হবেন। তখনি তারা তাঁর পাশে এসে দণ্ডায়মান হবে। তিনি সপরিবারে কুফা গমনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ভ্রাতা আব্বাস কতিপয় অনুগত অনুসারী এবং সাহসহীন নারী ও শিশু অনুচরবর্গ সমভিব্যহারে তিনি

আরবের মরুভূমি নিরুপদ্রবে অতিক্রম করলেন। কিন্তু যখন তিনি ইরাকের সীমান্তে উপনীত হলেন তিনি দেশের নিঃসঙ্গ ও বিরোধী দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হলেন। উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সামরিক প্রস্তুতি আঁচ করে তিনি ইফ্রেতিস নদীর পশ্চিম তীরের নিকটবর্তী কারবালা নামক স্থানে তাঁর ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে তাঁবু গাড়লেন। এই স্থানে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল তা করুণ রসের দিক দিয়ে অনতিক্রম্য। বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্পর্কে হুসাইনের ধারণা সত্য প্রমাণিত হল। পাশবিক ও হিংস্র ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের অধীনে উমাইয়া সেনাবাহিনী তাঁর পথ রোধ করল। অনেকদিন ধরে তারা তাঁর তাঁবু ঘিরে রাখল, তারা আলীর পুত্রের তরবারীর আওতার মধ্যে আসবার সাহস করল না, ফলে তারা তাইগ্রিস নদীর জল অবরোধ করল। অভাগা শহীদদলের দুঃখ-দুর্দশা ছিল ভয়ানক দুর্বিষহ। শত্রু-প্রধানের সঙ্গে আলোচনায় হুসাইন তিনটি সম্মান-জনক শর্তের মনোনয়ন দেন: তিনি মদিনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি পাবেন, কিংবা তুর্কীদের বিরুদ্ধে সামনের ব্যূহতে স্থাপিত হবেন কিংবা নিরাপদে এজিদের সমীপে নীত হবেন।[১] কিন্তু অত্যাচারী উমাইয়া বাদশাহর নির্দেশাবলী ছিল কঠোর ও অনমনীয়—হুসাইন বা তাঁর দল-বলকে কোন দয়া দেখানো হবে না, উমাইয়াদের ন্যায়বিচারের নীতি অনুযায়ী তাদেরকে বিচারের জন্য অপরাধী হিসেবে 'খলিফা'র সামনে নীত হবে। শেষ সম্বল হিসেবে হুসাইন নারী ও শিশুদের উপর যুদ্ধ না করতে অত্যাচারীদের প্রতি আহবান জানালেন, এবং তাঁকে হত্যা করে এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে বললেন, কিন্তু তাদের মনে করুণার উদ্রেক হল না। তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে সুযোগ মতো পালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন; তারা সর্বসম্মতিক্রমে তাদের প্রিয় নেতাকে পরিত্যাগ করতে কিংবা দীর্ঘায়ু হতে অস্বীকার করল। শত্রু-প্রধানদের একজন হযরতের দৌহিত্রের

১. 'রৌযাত-উস্-সাফা' গ্রন্থের রচয়িতা উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা করার পর আরও বর্ণনা করেন যে হুসাইনের একজন সেবক কারবালার হত্যাকাণ্ড থেকে পলায়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি অস্বীকার করেছেন যে তিনি যত-দূর জানেন হুসাইন (রাঃ) উমাইয়া নেতাদের কাছে কোন প্রস্তাব দেননি। এটা সম্ভবপর যে এই অস্বীকৃতির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে হুসাইন শত্রুদের নিকট কোন শর্ত প্রস্তাব করে নিজেকে অবনমিত করেননি। আমার মনে হয় যে, তিনি উমাইয়াদের কাছে শর্ত আরোপ করেছিলেন তাতে তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পাপভীতি দ্বারা আতঙ্কিত হয়ে তার ত্রিশজন সঙ্গীসহ "অনিবার্য মৃত্যুর অংশীদারত্বের দাবী"তে এজিদের দল পরিত্যাগ করলেন। প্রত্যেকটি একক যুদ্ধে ফাতেমীয়দের শৌর্যবীর্য ছিল অজেয়। কিন্তু শত্রু-দের তীর নিরাপদ দূরত্ব থেকে তাদেরকে ঘায়েল করতে লাগল। হযরতের দৌহিত্র ব্যতীত প্রতিরোধকারীদের সকলেই একে একে শত্রু হস্তে প্রাণ উৎসর্গ করলেন। আহত ও মুমূর্ষ অবস্থায় তিনি শেষবারের ন্যায় পানি পান করার জন্য নদীতীরে গমন করলেন; তারা তীরের সাহায্যে সেখান থেকে তাঁকে বিতাড়িত করল। যেই তিনি পুনরায় তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে তুলে নিয়েছেন অমনি তীর গিয়ে লাগল তাঁর গায়ে। আহত পিতা আল্লাহর উদ্দেশে প্রণতি জানালেন। একাকী ও অবসন্ন শরীর নিয়ে আর তিনি তাঁর নির্মম শত্রুদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে না পেরে তাঁবুর দরওয়াজায় বসে পড়লেন। একজন স্ত্রীলোক তাঁকে এক পেয়ালা পানি দিলেন তাঁর প্রচণ্ড পিপাসা নিবারণের জন্য; যেই তিনি পান করার জন্য পানি ওষ্ঠের কাছে তুলেছেন অমনি একটি তীর এসে লাগল তাঁর মুখে এবং তাঁর কোলেই তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুবরণ করল। তিনি আকাশের দিকে তাঁর হস্ত উত্তোলন করলেন—হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি জীবিত ও মৃত সকলের জন্য অন্তিম প্রার্থনা করলেন। তারপর শেষবারের মতো তিনি উমাইয়াদের মধ্যে গিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন এবং উমাইয়াগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। রক্তক্ষরণজনিত মূর্ছার ফলে তিনি ভূতলশায়ী হলেন এবং খুনি শকুনির দল মুমূর্ষ বীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাঁর শিরোশ্ছেদন করল, দেহের উপর দিয়ে মাড়িয়ে গেল এবং হিন্দার পুরাতন বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে মৃতদেহটির ওপর নির্যাতন চালাল। তারা কুফার দুর্গে শহীদের শির নিয়ে গেল এবং পাশবিক উবাইদুল্লাহ ছিন্ন শিরের মুখে বেত্রাঘাত করল। একজন বৃদ্ধ মুসলমান আবেগভরে বলেছিলেন, "হায়! এই মুখে আমি আল্লাহর রসুলকে চুম্বন করতে দেখেছি। গিবন বলেন, "সেই সুদূর যুগে ও আবহাওয়ায় হুসাইনের মৃত্যু বিয়োগান্ত দৃশ্য কঠিনতম পাঠকদের অন্তরেও সমবেদনা সঞ্চার করবে।" হুসাইনের শাহাদৎ-বার্ষিকী উপলক্ষে আলী ও তাঁর সন্তানদের জন্য তাঁর সমর্থকবৃন্দ প্রতি বছর যে বেদনা ও ক্রোধের উন্মত্ততা প্রকাশ করে তার প্রতি সমবেদনা দেখাতে না পারলেও তা এখন আমাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ।

এভাবেই পতন ঘটল সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের এবং তাঁর

সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের বৃদ্ধ ও যুবক সকল পুরুষ সদস্যদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল—বেঁচে রইল রুগ্ন শিশুপুত্র যাকে হুসাইনের ভগিনী যয়নব (যেনোবিয়া) পাইকারী হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলেন। তারও নাম ছিল আলী এবং পরবর্তী জীবনে তিনি মহান নাম যয়নুল আবেদীন "ধার্মিকদের অলঙ্কার" নাম ধারণ করেছিলেন। তিনি হুসাইনের ঔরসে ও পারস্যের শেষ সাসানিয়া নৃপতির ইয়াযদেজার্দের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মুহম্মদের বংশধারা তার মাধ্যমে চিরস্থায়ী হয়েছিল। মায়ের দিক দিয়ে তিনি ইরানের সিংহাসনে সাসানিয়া বংশের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার ছিলেন।

হুসাইন ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের বিয়োগান্ত ভাগ্য ইসলামে ত্রাসের শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে অনুভূতির যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা ঘটনাক্রমে ধর্মের মুক্তির কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। দামেস্কের উমাইয়া রাজদরবার থেকে প্রবাহিত নীতিহীনতার স্রোতও বন্ধ করেছিল। এ মুসলিম জনতাকে অবহিত করেছিল যে শিক্ষাগুরু কি করেছিলেন এবং তাঁর শত্রুদের সন্তান-সন্ততি ইসলামের কি ক্ষতি সাধন করছে। একশ বছর ধরে উমাইয়াগণ তরবারী ও বিষ-প্রয়োগের অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল। তারা মদিনা লুণ্ঠন করেছিল এবং দূরদেশে আনসারদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নির্বাসিত করেছিল। যে শহর পৌত্তলিকদের নির্যাতন থেকে হযরতকে আশ্রয় দিয়েছিল। যে শহরকে তিনি অত্যধিক ভালবাসতেন, যার পবিত্র মাটিতে তিনি পদচারণা করেছিলেন এবং যার প্রতি ইঞ্চি মৃত্তিকা পবিত্র কার্যক্রমের দ্বারা পূত পবিত্র হয়েছিল, তাকে অন্যায়ভাবে অপবিত্র করা হয়েছিল, যে সব লোক প্রয়োজনের সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং ধর্মের তোরণ নির্মাণে সাহায্য করেছিল তাদেরকে সর্বাধিক বীভৎস ও নাক্কারজনক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হয়েছিল যার জুড়ি মেলে শুধু রোম-লুণ্ঠনে ফ্রান্সের কনস্টবলের সৈন্যদের ও জর্জ ফ্রাণ্ডসবার্গের একইরূপ হিংস্র লুথারান্সদের নির্যাতনে। পুরুষদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছিল, নারীদের সতীত্ব নষ্ট করা হয়েছিল এবং শিশুদেরকে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। মসজিদকে আস্তাবলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল; মন্দির ও পবিত্র স্থানসমূহ স্বর্ণালঙ্কারের জন্য ধ্বংস করা হয়েছিল। সমগ্র উমাইয়া শাসনকালে পবিত্র নগরী বন্য প্রাণীর চারণক্ষেত্রে পরিণত

হয়েছিল।[১] আর একবার মক্কার পৌত্তলিকতা বিজয়ী হল। ডোজী বলেন, "ইসলামের পক্ষে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নির্মম, ভয়ানক ও বীভৎস।" ইসলামের বিজয়কালে যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দেখানো হয়েছিল মক্কাবাসী ও উমাইয়ারা এমনিভাবেই তার প্রতিদান দিয়েছিল। উমাইয়াগণ অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জন্ম দিয়েছিল যাঁরা তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা ও গুণের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ওমর বিন আব্দুল আযিয। আরবদের মার্কাস অরেলিয়াস—একজন ধর্মপরায়ণ নৃপতি, একজন সদাশয় শাসক ও একজন ধর্মভীরু মুসলমান যিনি দ্বিতীয় খলিফা মহান ওমরের আদর্শে তাঁর জীবন গড়ে তুলেছিলেন। বাদ-বাকীদের মধ্যে ছিল নির্লজ্জ পৌত্তলিকতা, যারা তাদের স্বীকৃত ধর্মের নিয়মাবলী ও আচরণের অবহেলায় আনন্দ উপভোগ করত।

উমাইয়ারা খেলাফত জবরদখল না করলে 'আহলুল্ বাইয়াত'[২] খেলাফতে আলীর উত্তরাধিকারের সমর্থকগণ এবং জনগণের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতা নির্বাচনের অধিকারের সমর্থকগণের মধ্যে মতপার্থক্য কখনও ধর্মানুসারীদের মধ্যে দলীয় বিভেদ সৃষ্টি করত না এবং আলীর খেলাফত লাভের পর একটা আপোষমীমাংসা বা সমন্বয় ঘটত। উমাইয়াদের জুলুম ও বিশ্বাসঘাতকতা এটাকে অসম্ভব করে তুলেছিল। তারা বহুবিধ অপরাধ ও অপরিসীম রক্তের স্রোতের উপর দিয়ে সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েছিল। খেলাফতের কার্যকালের বৈধতার সাদৃশ্য দেখানো তাদের পক্ষে ছিল অপরিহার্য। নির্বাচনের বলে—তাদের অশ্বারোহী সৈন্য ও পৌত্তলিক সমর্থকদের নির্বাচনের বলে তারা নিজেদেরকে 'আমিরুল মু'মনীন' বলে দাবী করত। মদিনা লুণ্ঠন এবং মুহম্মদের পরিবারের লোকজন ও মুহাজির ও আনসারদের ধ্বংস ও বিতাড়নের পর খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে নজীর আওড়ানো এবং সেটা ব্যর্থ হলে, হাদিস বানানো তাদের পক্ষে ছিল সহজ। তাছাড়া উপাধি ধারণ করা ও তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না, কঠিন ছিল তাদের জন্য যারা জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তাদের খলিফা নির্বাচন সমর্থন করত। যেসব শক্তিমান মনীষীরা প্রজাতন্ত্রের সৌধ রচনা করেছিলেন হয় তাঁরা মৃত্যুবরণ

---

১. আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান আদেশ জারি করে মদিনায় হযরতের রওজা শরীফ জিয়ারত তীর্থযাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

২. ফাতেমা ও আলী (রাঃ) এবং তাঁদের বংশধরদের আহলুল বাইয়াত বলা হয়।

করেছিলেন নতুবা তাঁদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল ; তাদের সন্তান-সন্ততিগণ হয় পলাতক নয় দাস ; তাঁদেরই অধিকার ছিল কৌশলে অধিকৃত উপাধি গ্রহণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার। যারা উমাইয়াদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তারাও উমাইয়াদের নীতি অবলম্বন করেছিল। যে প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে বণী উমাইয়ারা বণী ফাতিমীয়দের প্রতি আচরণ করেছিল সেই একই মনোভাব নিয়ে বণী আব্বাসীয়রা মুহম্মদের বংশধরদের প্রতি আচরণ করেছিল। খেলাফতের উত্তরাধিকারত্বে তাদের কোন দাবী ছিল না ; ফাতিমার বংশধরদের প্রতি জনগণের ভালবাসাকে তারা উচ্চাসনে ওঠার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিল ; যখন তারা তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করল, তখন তারা ফাতেমীয়দেরকে তীব্রতর নির্যাতনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করল। তাদের খলিফা উপাধি ধারণও আধা-নির্বাচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই উমাইয়াদের মতো যারা তাদের দাবীর আইনানুগতার প্রশ্ন তুলেছিল কিংবা পরিষ্কার ভাষায় মুহম্মদের অনুসরণে ইমামতের যথোপযুক্ত নির্বাচনের নীতি তুলে ধরে তাদেরকে অনুসন্ধান করেছিল। প্রতিটি মতপার্থক্য কঠোরভাবে অবদমিত হয়েছিল, এমনকি বাদশাহদের প্রতিকূল কোন মতামত প্রকাশ করলে বিচারকদেরকে শাস্তি দেওয়া হত।[১] যে পরিস্থিতি আব্বাসিয়াদের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত উদ্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল তা যদি আমরা মনে না রাখি তবে আমরা এই অভ্যুত্থানকে অসাধারণ বলে বিবেচনা করার প্রবণতা দেখাতে পারি। উমাইয়াগণ ফাতেমীয়দের উপর বীভৎস নির্যাতন চালিয়েছিল এবং তারা যে সুমহান ধৈর্যসহকারে তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অন্যায় সহ্য করেছিল তা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সার্বজনীন ভীতির জন্ম দিয়েছিল এবং তাদের অনুসারী ও শিষ্যদের দৃষ্টিতে নির্যাতীতদেরকে অলৌকিক জ্যোতিতে ভূষিত করেছিল। নির্যাতন যতই প্রচণ্ড হোক না কেন তা সব সময়েই তার লক্ষ্যার্জনে ব্যর্থ হয়ে থাকে ; বা কোন সম্প্রদায়ে বা সমষ্টিকে মুছে দেওয়ার পরিবর্তে তা একে নতুন খাতে প্রবাহিত করে এবং অধিকতর প্রাণশক্তি দান করে। খ্রীষ্টধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেও যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদ ও নির্যাতনের বেদনা "যে বস্তুর জন্য সহ্য করা হয়েছিল তাকে অধিকতর পার্থিব ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত করেছে। ফাতিমার সন্তান-সন্ততি—সেই সব সিদ্ধপুরুষ যারা মানুষের

১. সুন্নী মযহাবের তৃতীয় স্তম্ভ, ইমাম মালিক ইবনে আনাসকে এই ধরনের অপরাধের জন্য জনসমক্ষে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

নির্যাতনের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রজ্ঞা ও ধর্মের অনুশীলন করেছিলেন—যাদের হাতে ছিল না অস্ত্র, ধনসম্পদ ও জনবল—তাদের অনুসারীদের মনের উপর অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে শাসন চালিয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীর প্রভু, প্রাসাদবাসী খলিফার চেয়ে জনগণের অধিকতর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উমাইয়াদের পাপের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছিল এবং জনগণ তাদের মনোবেদনায় চীৎকার করে বলেছিল : হায় খোদা! আর কতদিন? দিকে দিকে ভুয়া-খলিফাদের পাপাচার ও দুঃশাসনের ফলে জনমনে আকুল বাসনা জেগেছে যে মুহম্মদের বংশধরদেরকে তাদের অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারা সতৃষ্ণ নয়নে ইমামের জন্য প্রতীক্ষা করছিল, কিন্তু এসব সাধু-সজ্জনেরা জগৎ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন, এ জগৎ যেন তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল না। একের পর এক অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণকারী[১] সশস্ত্র বিদ্রোহ করছিল এবং তাদের সিরীয় শত্রুবাহিনীর সম্মুখে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ছিল। জনগণ বিশ্বাসীদের ঐশী-নিযুক্ত ইমামের জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তারা বলপ্রয়োগকে নিন্দা করত। কি করতে হবে? পরিবারের প্রধানের পরামর্শের অনুমোদনের বিপরীতে মুহম্মদ-পরিবারের বেশ কয়েকজন তরুণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ধর্মীয় উদ্দীপনার জন্য আত্মত্যাগ করেছিল। এই সংকট-ময় মুহূর্তে, এই অস্থিরতার সময়ে যখন জনগণ মুহম্মদের পরিবার থেকে কোন সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছিল, ঠিক সেই সময়ে বণী আব্বাস রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। বণী আব্বাসগণ হযরতের চাচা আব্বাসের বংশধর। আব্বাস ইসলামের অগ্রগতির গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন; তিনি মুহম্মদের সঙ্গে ছিলেন যখন মদিনাবাসীদের নিকট থেকে "নারীদের অঙ্গীকার" গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু চরিত্রের বা নীতির দুর্বলতার জন্য মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক হযরত সর্বদা তাঁর সাথে সর্বাধিক মমতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করতেন। আবু বকর, ওমর ও ওসমানও হযরতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। তাঁকে ভ্রমণ করতে দেখলে তাঁরা দণ্ডায়মান হতেন এবং প্রায়ই তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত যেতেন।[২] তিনি ৩২ হিজরীতে ইনতিকাল

---

১. শোলায়মান ইবনে মুর্‌দ, আল্ মুখতার এবং ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লিব।
২. আব্বাসকে ইসলামের ইতিহাসের 'জন অব গাউন্ট' বলা যেতে পারে।

করেন—কারো কারো মতে আরও দুই বছর পর—তিনি চার পুত্র রেখে যান—আব্দুল্লাহ (আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস), ফযল, ওবায়দুল্লাহ ও কায়সান। আব্দুল্লাহ ইতিহাসে ও হাদীসে ইবনে আব্বাস নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি হিযরী সালের তিন বছর পূর্বে ৬১৯ খ্রীস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী তাঁকে কোরআন ও আইন-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেন। জ্ঞানী হিসেবে এবং কোরআন ও খলিফাদের দের সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি এতই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে দেশের সব জায়গা থেকে জনগণ তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য ভিড় জমাত। তিনি সপ্তাহে একদিন কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে, এক দিন আইন সম্পর্কে, একদিন ব্যাকরণ সম্পর্কে, একদিন আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে এবং আর একদিন কবিতা সম্পর্কে বক্তৃতা দান করতেন। তিনি প্রাক্-ইসলামী আরবী সাহিত্য ও আরবদের ইতিহাসের পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্য কোরআনের কঠিন ও দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রাচীন কবিদের থেকে উদ্ধৃতি দিতেন, তিনি একথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন : "যদি তোমরা কোরআনের অনুধাবনে কোন জটিলতার সম্মুখীন হও, তবে আরব্য কবিতার মধ্যে তার সমাধান অনুসন্ধান করো, কেননা এগুলো আরবজাতির লিখিত বিবরণ।"[১] আলীর প্রতি ইবনে আব্বাস ও তাঁর ভাইদের দৃঢ় ও অপরি-বর্তনীয় ভক্তি-শ্রদ্ধা সুবিদিত। চার ভাই-ই "উষ্ট্রের যুদ্ধে" ও সিফ্‌ফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে আব্বাস পণ্ডিতের তুলনায় কম দক্ষ সেনানী ছিলেন না। তিনি আলীর অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করে-ছিলেন। তিনি প্রায়ই খলিফার দূত হিসেবে কাজ করেছিলেন। যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী সৈন্যরা তাঁর ও মোয়াবিয়ার মধ্যে বিবাদ মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল তখন মুহম্মদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আলী তাঁকেই মনোনীত করতে ইচ্ছা করে-ছিলেন।[২] ইবনে আব্বাস সত্তর বছর বয়সে ৬৭ হিযরীতে হুসাইনের মৃত্যুর পর ভগ্নহৃদয়ে তায়েফে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র, আলী—যাঁর নাম মহান খলিফার নামানুসারে রাখা হয়েছিল—ফাতিমার সন্তান-সন্ততিদের

১. একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিভাবে তিনি ব্যাপক জ্ঞান লাভ করে-ছিলেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : "অনিসন্ধিৎসু ভাষা এবং বুদ্ধিদীপ্ত মনের সাহায্যে।"

২. শাহরিস্তানী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের ক্ষেত্রে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ১১৭ হিযরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র মুহম্মদ পরিবারের প্রধান হন।

এসময়ে পারস্য, ইরাক ও হিযায বণী উমাইয়াদের হাতে চরম নির্যাতন ভোগ করেছিল এবং সেই ঘৃণিত বংশকে নির্মূল করার জন্য গোপন সংস্থার মাধ্যমে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বণী আব্বাসগণ উমাইয়া শাসন খতম করার জন্য সর্বাপেক্ষা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল—তারা প্রথমে ফাতেমীয়-দেরকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার অকপট আগ্রহে, পরে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করেছিল। আলী ইবনে আব্দুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি নিজেই খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি খুব শক্তিমান ও অপরিসীম উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি প্রথমে ফাতেমীয়দের জন্য কাজ করেছিলেন, পরে ধীরে ধীরে নিজের বংশের প্রতিষ্ঠার জন্য কৌশলে কাজ করছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের ইমাম হওয়ার দাবী প্রতিপন্ন করার জন্য একটি নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করলেন যে কারবালায় হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের পর ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রধানের পদ তাঁর জীবিত পুত্র আলীর (জয়নুল আবেদীনের) উপর বর্তায়নি, বর্তাল মুহম্মদ ইবনে আল্ হানাফিয়ার ওপর—অন্য মায়ের গর্ভে আলীর ঔরসে এই পুত্রের জন্ম—ফাতিমার মৃত্যুর পর আলী হানিফা গোত্রের এই রমণীকে বিবাহ করেছিলেন; আর তার মৃত্যুর পর খেলাফত তার পুত্র হাশিমের ওপর বর্তে ছিল। যিনি আব্বাসিয়া বংশের মুহম্মদকে তা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত করেন। কোন কোন মহলে এই গল্প বিশ্বাস অর্জন করেছিল, কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টি হযরতের বংশধরদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং আব্বা-সিয়াদের মিশনারীগণ বা রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা স্বীকার করত যে তারা 'আহলে বাইয়াতে'র জন্য কাজ করছেন। অদ্যাবধি আব্বাসিয়াগণ ফাতেমীয়দের প্রতি গভীর আনুগত্য স্বীকার করত এবং মুহম্মদের বংশধর-দের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তাদের সব আন্দোলন ও পরিকল্পনা, একথা প্রচার করত। 'আহলে বাইয়াতে'র প্রতিনিধি ও সমর্থকগণ তাদের স্বীকৃতির পশ্চাতে যে প্রতারণা রয়েছে তাতে সন্দেহ না করে মুহম্মদ বিন আলী ও তাঁর দলের প্রতি অনুগ্রহ ও আশ্রয় বিস্তৃত করেছিল যা তাঁর কাজকে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন হিসেবে জনমনে মুদ্রিত করেছিল। ফাতেমীয়দের প্রতি পারসিকদের অনুরাগের কারণ

ঐতিহাসিক ও জাতীয় যোগাযোগ। ইয়ায্দেজার্দের কন্যার মাধ্যমে ফাতেমীয়রা ইরানের সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন। ইসলামের প্রচারের প্রারম্ভে আলী পারস্যের মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ও সৌহার্দ পোষণ করতেন, হযরতের একজন প্রখ্যাত সাহাবী সলমন ফার্সী দীর্ঘকাল ধরে খলিফা আলীর সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর আলী তাঁর পুরস্কারের অর্থ বন্দীদের মুক্তির জন্য ব্যয় করতেন এবং তাঁর পরামর্শের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ প্রজাদের ভার লাঘব করার জন্য খলিফা ওমরকে উৎসাহিত করতেন। তাঁর বংশধরদের প্রতি পারসিকদের অনুরাগ সুস্পষ্ট। মুহম্মদ বিন আলী আরব জুলুমকারীদের ঘৃণ্য শাসন থেকে পারসিকদের আসন্ন মুক্তির কথা তাদের নিকট প্রচার করে তাদেরকে প্রতারিত করেছিল। খোরাসান, ফার্স ও ইরানের অন্যান্য প্রদেশে বসবাসকারী ইয়েমেনী যারা আহলে বাইয়াতের প্রতি সমভাবে অনুরক্ত ছিল এবং যাদের পুরাতন শত্রু মোযারের বংশধরদের প্রতি শত্রুতা সম্প্রতি অনেক ক্ষতির মাধ্যমে প্রজ্বলিত হয়েছিল তাদের নিকট তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, মুহম্মদের বংশের ইমামদের অনুকূলেই তিনি কাজ করছেন। তিনি সে যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সেনাপতি এবং অদ্যাবধি আলীর বংশধরদের অনুগত পক্ষভুক্ত আবু মুসলিমকে স্বপক্ষে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১২৫ হিযরীতে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র ইবরাহিম, আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস (উপনাম 'সাফ্ফাহ্') আব্দুল্লাহ আবু জাফর (উপনাম 'আল্ মনসুর')-কে একের পর অন্যকে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যান।

খোরাসানে ইয়েমেনী ও মোযারীয়দের মধ্যে অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে যে মারাত্মক সংঘর্ষ বেধেছিল তা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত খনিতে আলোকসম্পাতের সংকেত হিসেবে কাজ করেছিল। আবু মুসলিম প্রদেশের প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে তার দলভুক্ত লোকদেরকে অবিলম্বে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়ানোর নির্দেশ দিল। বিঘোষিত কারণ হল অন্যায় দখলকারী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে "আহলুল বাইয়াতে"র অধিকার প্রতিষ্ঠা, অল্পকাল পূর্বে ইমাম আলী জয়নুল আবেদীনের পৌত্র, ইয়াহহিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ; তিনি নিহত হন এবং মারওয়ানের আদেশে তার দেহ ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবু মুসলিম তরুণ প্রধানের দেহাবশেষ সসম্মানে সমাহিত করার আদেশ দেন। তার অনুসারীবৃন্দ তাদের শোক ও ইয়াহহিয়া হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্পের

প্রতীক হিসেবে কালো বস্ত্র ধারণ করেন। সেদিন থেকে কালো রঙ আব্বাসিয়াদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক প্রতীকে পরিণত হয়। যখন অন্যায় দখলকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য জনগণকে আহ্বান করা হয়েছিল তখন জনতা কালো বস্ত্র পরিধান করে মিলন-স্থানে দলে দলে সমবেত হতে লাগল—এই ঘটনা বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও শক্তির নির্দেশ করেছিল। ১২৭ হিযরীতে ২৫শে রমযান রাত্রিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং পর্বত সমূহের উপর বহ্ন্যুৎসবের মাধ্যমে জনগণকে আহ্বান করা হয়েছিল; বিশাল জনতা চতুর্দিক হতে মার্ভে এসে ভেঙে পড়ল যেখানে আবু মুসলিম তখন অবস্থান করছিলেন। আব্বাসিয়াদের প্রধান হিসেবে ইবরাহিম মুহম্মদবিন আলীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন—মারওয়ান কর্তৃক বন্দী হয়ে তিনি নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি কৌশলে তার দ্বিতীয় ভ্রাতা আবুল আব্বাসকে তার পিতার উইল অনুযায়ী কর্তৃত্ব হস্তান্তরের দলিলটি পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবু মুসলিম সত্বর নিজেকে সমগ্র খোরাসানের অধিকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ইরাকের দিকে তার বিজয়ী বাহিনীর অভিযান পরিচালিত করেছিলেন। আন্দোলনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তখনও কিছুই প্রকাশিত হয়নি। 'আহলুল্ বাইয়াত' হল সংক্ষিপ্ত বাক্য যা সকল শ্রেণীর মানুষকে কালো পতাকার তলে সমবেত করেছিল। কুফা তখনি আত্মসমর্পণ করেছিল। আবু মুসলিমের সহকারী, হাসান ইবনে কাহতাবা তার সেনাবাহিনীর পুরোভাগে শহরে প্রবেশ করেছিলেন এবং অবিলম্বে তার সঙ্গে যোগদান করলেন আবু সালমা যার ইবনে সোলায়মান আল্ খাল্লাল "যিনি" 'রৌযাতুস্ সাফা'র লেখক বলেছেন, "মুহম্মদের বংশধরদের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়েছিলেন।" দৃশতঃ এই লোকটি পরিবারের প্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন। আব্বাসিয়া সেনাধ্যক্ষ খুব সহানুভূতির সঙ্গে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। "তিনি তাকে চুম্বন করে সম্মানিত আসনে বসিয়েছিলেন,"[১] এবং বলেছিলেন যে আবু মুসলিমের আদেশই তাকে সব ব্যাপারে মেনে চলতে হবে। আবু সালমার দাম্ভিকতা মিথ্যা আশায় তুষ্ট করা হয়েছিল; এ পর্যন্ত তিনি আব্বাসিয়াদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত ছিলেন, আবুসালমা ও হাসান ইবনে কাহতাবার যুগ্মনামে পরের দিন কুফাবাসীদেরকে জামে মসজিদে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘোষণা

---

১. 'রৌযাতুস্ সাফা' : ইবনুল আসির, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১২।

প্রচার করলেন। জনগণ নতুন ঘোষণা শোনার আশায় মসজিদে এসে হাজির হল। তখনও চক্রান্ত ঘনীভূত হয়ে উঠেনি, হাসান ও অন্যান্য আব্বাসিয়া সমর্থকগণ বিবেচনা করলেন যে এখনও তাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার সময় আসেনি। ইত্যবসরে আবুল আব্বাস তাঁর ভ্রাতা আবু জাফরসহ উমাইয়া-প্রহরা এড়িয়ে কুফায় এসে হাজির হয়েছেন এবং নাটকের পরবর্তী অঙ্কের জন্য অপেক্ষা করছেন। আবু সালমা তখনও তাঁর প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে গেছেন। তিনি গোপনে ইমাম জাফর আস্ সাদিকের নিকট সংবাদ পাঠালেন এবং এসে তার অধিকার দখল করতে অনুরোধ জানালেন। ইরাকী বার্তার প্রকৃতি ইমামের জানা ছিল,তাই পত্র-খানা বন্ধ অবস্থায় পুড়িয়ে ফেললেন। কিন্তু আবু সালমা পত্রের কোন উত্তর পৌঁছানোর পূর্বেই আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, তখনও তিনি বাহ্যত 'আহলুল বাইয়াতে'র নামে কাজ করলেও সেখানকার বাসিন্দাদের সকলকেই পরদিন শুক্রবারে খলিফা নির্বাচনের জন্য সমবেত হতে আদেশ দিলেন। সেদিন কুফা অদ্ভুত দৃশ্য ধারণ করল। বিশাল জনতা বনী আব্বাস কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্র পরিধান করে বহু-প্রতীক্ষিত ঘোষণা শোনার জন্য 'মাসজিতুল জামে' গিয়ে হাজির হতে লাগল। যথাসময়ে আবু সালমা অদ্ভুত জমকাল পোশাকে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। আবুল আব্বাসের দলভুক্ত কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া আর কেউই জানত না যে, কিভাবে তিনি আব্বাসীয়দের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিক্রি করতে এসেছেন। তিনি তাঁর প্রভুদের স্বার্থের চেয়ে তাঁর প্রধানকেই অধিক পছন্দ করতেন। নামাজে ইমামতি করার পর তিনি সমবেত জনতাকে সম্মেলনের লক্ষ্য বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন—আবু মুসলিম ধর্মের সংরক্ষক এবং বংশের অধিকারের সমর্থক, তিনি উমাইয়াদেরকে তাদের অবিচারের শীর্ষদেশ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন; এখন প্রয়োজন একজন ইমাম ও খলিফা নির্বাচন করা। আবুল আব্বাসের মতো ধর্মনিষ্ঠা ও ক্ষমতা এবং খলিফার জন্য অপরিহার্য যাবতীয় গুণের অধিকারী বিখ্যাত ব্যক্তি আর কেউ নেই; তিনি নির্বাচনের জন্য বিশ্বাসীদের নিকট নিজেকে প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এ পর্যন্ত আবু সালমা আব্বাসীয়গণ জনগণের মনোভাব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তারা এ ব্যাপারে শঙ্কিত ছিল যে কুফার অধিবাসিগণও আলীর বংশধরদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকে সম্মতির সঙ্গে নাও দেখতে পারে, কিন্তু ইরাকীদের সুবিদিত চপলতা এবার প্রমাণিত হল। তারা বার বার ফাতেমীয়দের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করার

উদ্যোগ নিয়েছে এবং যাদের সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে কিংবা যাদের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানিয়েছে তাদের সঙ্গে প্রায়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ক্ষণিকের পরিবর্তনশীল খেয়ালের বশীভূত হয়ে প্রায়ই সত্যের সংরক্ষক সেজেছে তেমনি বিশ্বাসঘাতক বনেছে। কারবালার হত্যাকাণ্ডের পর তারা এতই মর্মাহত হয়েছিল যে বিশ হাজার ইরাকী হুসাইনের মাযারে এক বিনিদ্র রজনী যাপন করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং ইয়াযিদের বিশাল অশ্বারোহী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সবলে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাদের অনুশোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এসব চপলমতি ও দাঙ্গাবাজ, 'অবিশ্বাসী ও অ-নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে বাস্তবিক "আল্লাহর অভিশাপ", একমাত্র হাজ্জাজ বিন ইউসুফই ঠিক রেখেছিলেন। এখন আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসেবে প্রস্তাব সম্পর্কে আবু সালমার কথা উচ্চারিত হতে না হতেই সম্মতিসূচক উচ্চনাদী 'আল্লাহ আকবর'[১] ধ্বনিতে তারা ফেটে পড়ল, আবুল আব্বাসকে গুপ্ত অবস্থান থেকে আনার জন্য একজন দূতকে দ্রুত প্রেরণ করা হল। যখন তিনি উপস্থিত হলেন তখন জনতার মধ্যে তাঁর সঙ্গে করমর্দন ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য উন্মত্ত জনতা সামনের দিকে ধাবিত হতে লাগল। নির্বাচন সমাপ্ত হল। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। এভাবেই তিনি মুসলমানদের ইমাম ও খলিফা হয়ে গেলেন।[২] এরূপে ফাতেমীয়দের জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে আব্বাসীয়গণ খেলাফত দখল করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা ফাতেমীয়দেরকে উল্টো প্রতিদান দিয়েছিলেন। পার্থিব ক্ষমতার লোভ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট উচ্চাশা। মানুষের ভাবাবেগের অন্যান্য প্রকাশের তুলনায় এ মানবজাতির অনেক বেশী ক্ষতি সাধন করেছে। অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে যে কোন উপায় অবলম্বনের জন্য দ্বিধা করে না ; এ এলোমেলোভাবে অপরাধ ও পুণ্যের প্রয়োগ করে—একটি নিজের অভি-প্রায়ের ছদ্মবেশ ধারণের জন্য অপরটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য। এ এমনকি ধর্মকে নিজের সেবায় ব্যবহার করে। ধর্মের ছদ্মবেশে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানব-জাতির জন্য বিভীষিকাময় অনর্থ ঘটিয়েছে। রোমের পোপ তাদের পার্থিব ক্ষমতা নিরন্তর অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সভ্যজগৎকে রক্তের বন্যায় প্লাবিত করেছে। ইসলামের খলিফাগণ—আব্বাসীয়, মিশরীয় ফাতেমীয় ও

---

১. 'আল্লাহ আকবর'—আল্লাহ মহান।
২. পূর্ণ বিবরণের জন্য 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্স' (ম্যাকমিলান)।

উমাইয়াগণ তাদের চাটুকারদের তৈরী দাবীর উপর ভিত্তি করে লোভের বশবর্তী হয়ে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং প্রজাদের অবিভক্ত আনুগত্য সংরক্ষণের কামনায় ইসলামের বুকে সম-পরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়েছে ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের আব্বাসীয় খলিফাগণ অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন ; তারা গভীর অন্তঃদৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। যে মুহূর্ত থেকে কুফাবাসীদের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের ভেতর দিয়ে তাঁরা খেলাফতে সমাসীন হয়েছিলেন তখন থেকেই তাঁরা তাঁদের হাতে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য ও জনগণের নির্বাচনের ঐশী অনুমোদন সম্পর্কীয় মতবাদের রূপ ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এ থেকে বংশগতভাবে খেলাফতের উত্তরাধিকার নীতি অস্বীকার করা এবং জনগণের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রায় ধর্মীয় ব্যাপার করে তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হল।

সাফ্ফার[১] রাজত্বকালে আবু মুসলিম কিছুটা সহানুভূতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু ফাতেমীয়দের প্রতি তার গোপন আকর্ষণ থাকার জন্য তাকে ঘৃণা ও সন্দেহ করা হত। সাফ্ফার উত্তরাধিকারীর অধীনে তাকে ধর্মত্যাগী বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং অপমানকর উপাধি 'জিন্দিক' হিসেবে কলঙ্কিত করা হয়[২] এবং হত্যা করা হয়। মুহম্মদ পরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পূত পবিত্র জীবন, যে আত্যন্তিক সম্মানের সঙ্গে জনগণ তাদের দেখতেন তা প্রায়ই আব্বাসীয়দের ঈর্ষার উদ্রেক করত এবং ফাতেমীয়দের সাময়িক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করত। হারুন অর রশীদ তাঁর সাম্রাজ্যের দুর্গ বার্মেকীদের ধ্বংস করেছিলেন এবং ফাতেমীয়-দের সঙ্গে শুধু ষড়যন্ত্রের সন্দেহের ভিত্তির উপর নির্ভর করেই এই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই অবস্থা চলেছিল আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ মহান খলিফা আবদুল্লাহ আল্ মামুনের পূর্বাবধি। তিনি খেলাফত লাভ করেই ফাতেমীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে-ছিলেন। তদনুযায়ী তিনি ফাতেমীয়দের অষ্টম ইমাম, আলী ইবনে মুসা,

---

১. আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ সাফ্ফা উপাধি পেয়েছিলেন—সাফ্ফা মানে "রক্ত-পিপাসু"—তার শত্রুদের বিরুদ্ধে অবাধ তরবারী ব্যবহার করার জন্য তিনি এই উপাধি পান। তার একজন উত্তরাধিকারী (মুতাযিদ বিল্লাহ) দ্বিতীয় সাফ্ফা উপাধি পেয়েছিলেন। প্রথম অটোম্যান সেলিম একই উপাধি পেয়েছিলেন।

২. একজন মাজী।

উপনাম রিজাকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং তদীয় ভগিনী উম্মুল ফযলকে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি আব্বাসীয়দের কালো রং বর্জন করে ফাতেমীয়দের নির্ধারিত রং সবুজ গ্রহণ করেছিলেন।[১] ক্রোধান্বিত আব্বাসীয়গণ আলী ইবনে মুসা আর রিজাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। ফাতেমীয়দের প্রতি তিনি যে সহনশীলতা দেখিয়েছিলেন তা তাঁর ছ'জন অব্যবহিত উত্তরাধিকারী (মুতাসিম ও ওয়াসিক)[২] বজায় রেখেছিলেন। মুতাওয়াক্কিলের সিংহাসন আরোহণ অভিনব ও প্রচণ্ড নির্যাতনের সংকেত দিয়েছিল, চরম নিষ্ঠুরতা ও পাপ-আচরণের বৎসরব্যাপী তার সমগ্র রাজত্বকাল চিহ্নিত করেছিল। মুন্তাসির তাঁর পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন। সিংহাসনে বসে প্রথমেই তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক আলী ও হুসাইনের বিধ্বস্ত সমাধিস্থান প্রত্যর্পণে এবং তাঁদের লাঞ্ছিত স্মৃতিসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। এই খলিফার বিচক্ষণতা তার উত্তরাধিকারীরা অনুসরণ করেছিলেন এবং তারপর থেকে শিয়াদের প্রতি কিছুটা সহিষ্ণুতা সম্প্রসারিত হয়েছিল। ৩৩৪ হিযরীতে (৯৪৫ খ্রী.) বুয়াইয়া বংশের মুয়িয উদ্দৌল্লা বাগদাদের প্রাসাদের মেয়র নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফাতেমীয়দের একজন উৎসাহী সাথী হিসেবে তিনি এক সময়ে আব্বাসীয় খলিফা মতিউল্লাহকে পদচ্যুত করতে পরিকল্পনা করেছিলেন এবং আলী পরিবারের একজন অল্পবয়স্ক বংশধরকে স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নীতির খাতিরে তা কার্যকরী করা হয়নি। মুয়িযউদ্দৌলা কারবালার প্রান্তরে হুসাইন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের শাহাদৎ বরণের স্মরণে 'ইয়াওম-ই-আশুরা'—শোক দিবস পালন আরম্ভ করেন। ৬৪৫ হিযরীতে (১২৪৭ খ্রী.) মুতাসিম বিল্লাহর অধীনে শিয়াদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন শুরু হয়। তার ফলে আরবজাতির সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তা পশ্চিম এশিয়াবাসীদেরকেও একই সঙ্গে গ্রাস করে। যেসব ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাকে ঘিরে রেখেছিল তাদের বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ পরামর্শের দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে সুন্নী মযহাবের এই নির্জীব খলিফা শিয়া সম্প্রদায়ের সকল পুরুষ সদস্যদেরকে হত্যা করেন। এক বিভীষিকাপূর্ণ আদেশ বলে যা আমাদের আলবীজেন ও হুগোনটদের কথা

---

১. ফাতেমীয়গণ হযরতের সবুজ রং তাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ; বণী উমাইয়ায় সাদা এবং বণী আব্বাসাগণ কালো রং।

২. মুতাসিম বিল্লাহ (মুহম্মদ) ও ওয়াসিক বিল্লাহ (হারুন)।

স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি গোঁড়াদেরকে শিয়াদের দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন করতে, বাড়ীঘর ধ্বংস করতে, শস্যক্ষেত্র নষ্ট করতে এবং তাদের নারী-শিশুদেরকে দাসে পরিণত করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এই বর্বরোচিত আচরণ বাগদাদের ভাগ্যহত নগরীর উপর চেঙ্গিসের পৌত্র প্রতিশোধ গ্রহণকারী হালাকুর আক্রমণ ডেকে এনেছিল। তিনদিন ধরে তার্তার-প্রধান নগরীটিকে লুটপাট ও হত্যার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় দিবসে আব্বাসীয় বংশের ৩৭তম খলিফাকে চরম অবমানিত অবস্থায় হত্যা করা হয়। এরূপে আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটে।[১]

মোয়াবিয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'আহলুল বাইয়াতে'র[২] সমর্থকগণ কোন বিশেষ নামকরণ গ্রহণ করেননি ; তারা বণী কেবল বণী হাশিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বণী ফাতিমা ও বণী আব্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না ; তারা পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন, মোয়াবিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর মুহম্মদের বংশের অনুসারীরা নিজেদেরকে শিয়া বলে অভিহিত করতে শুরু করেছিল এবং তাদের শত্রুরা হয় 'নওয়াসিব' (বিদ্রোহী) নয় 'খাওয়ারিজী' (দলত্যাগকারী) অভিহিত হতে থাকে।[৩] উমাইয়াগণ তাদেরকে 'আমওয়াই' (উমাইয়াদের

---

১. আব্বাসীয় বংশের একজন তরুণ মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে নামমাত্র খেলাফত চালিয়েছিলেন যতদিন না ওটোম্যান সম্রাট সেলিম তার অনুকূলে শেষ আব্বাসীয় খলিফা থেকে অস্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

২. 'আহলুল বাইয়াত' "(মুহম্মদের) বংশধরগণ"—এই উপাধি সচরাচর ফাতিমা ও আলী এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরকে দেওয়া হয়। এইনামে ইবনে খালদুন সর্বদা তাঁদেরকে তাঁদের অনুসারী ও শিষ্যদেরকে অভিহিত করেছেন—শিয়া বা মুহম্মদের বংশধরগণ। সানায়ী নিম্নের কবিতা-পঙতিতে সর্বসাধারণের অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন :

আল্লার কিতাব ও বংশ ছাড়া
রেখে যাননি রাসুল কিছু
কিয়ামত তক রইবে এ সব
চলবে তাদের পিছু পিছু।

৩. 'খাওয়ারিজী' নামকরণ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছিল 'দুমাতুল জন্দলে'র যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেসব সৈন্য হযরত আলীকে পরিত্যাগ করেছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দলগঠন করেছিল তাদেরকে বলা হয়ে থাকে। পরবর্তী কালে যারা ধ্বংসাত্মক মতবাদ গ্রহণ করেছিল তাদের বলা হয়।

সন্তান) বলে অভিহিত করত। তখন পর্যন্ত ‘আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল্ জামাত’ সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। মনসুর ও হারুনের শাসনাধীনে এই উপাধি প্রথম চালু হয়েছিল। দশম শতাব্দীতে আলী-পরিবারের একজন সদস্য আব্বাসীয়দের নিকট থেকে বলপূর্বক মিশর অধিকার করে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজবংশ মিশর ও সিরিয়ার উপর সালাদিনের পূর্ব পর্যন্ত সময়াবধি শাসন করেছিল। যে অভিসম্পাত বাগদাদ ও কায়রোর খলিফা পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করতেন, যে অসংখ্য জনশ্রুতি পরস্পরের দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং উভয় খলিফার মুফতিদের নিকট থেকে যেসব ‘ফাতওয়া’ এসেছে তাতে উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত ও তিক্ততা বাড়িয়ে তুলত। সালাদিন মিশরের ফাতেমীয় বংশের মূলোৎপাটন করে প্রাচ্য আফ্রিকায় সুন্নী মযহাবের প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। যা’হোক, বণী ফাতিমা গোত্রের বিভিন্ন শাখা দুটি মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বংশের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।[১] সাধক ইমামদের অনুসারী ‘ইসনা আশারিয়াগণ’[২] বল-প্রয়োগকে নিন্দা করতেন। মহান সাফায়ী নৃপতি ‘ইসনা আশারিয়া মতবাদকে পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করার পূর্ব পর্যন্ত তারা শুধু অধ্যাত্ম কর্তৃত্ব দাবী করতেন এবং পার্থিব আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। মুহম্মদের বংশধর একজন দার্শনিক ও সুফী তিনি মুহম্মদের বংশধরদের প্রতি সহানুভূতি ও ভক্তির মধ্যে জাতীয় জাগরণ ও সংহতি দেখতে পেতেন। তখন থেকে ইসনা আশারিয়া মতবাদ পারস্যের জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়।

দক্ষিণ ভারতের বাহমণী ও আদিলশাহী বংশ, যাদেরকে আওরঙ্গজেব মূলোৎপাটন করেছিলেন এবং মারাঠা দস্যুদের অভ্যুত্থানের পথ করে দিয়েছিলেন যাদের বাহমণী নৃপতিগণ কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন, ইমামদের মতবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ হল ফাতেমীয়দের রাজনৈতিক নিয়তি যা তাদের মতবাদসমূহের উপর প্রভাব মুদ্রিত করে দিয়েছে।

ইসলামের অধ্যাত্ম ও পার্থিব কর্তৃত্বে বণী আব্বাসদের অধিকার।

---

১. মিশরের ফাতেমীয় বংশ ছাড়া ফাতেমীয়দের অন্যান্য শাখা আমির, ইমাম, শরীফ ও খলিফা উপাধি ধারণ করে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতেন, যেমন বণী উখেদুর, বণী মুফা, মক্কার বণী কিতাদাহ, উত্তর ইয়েমেনে বণী তাবা তাবা, দক্ষিণ ইয়েমেনে বণী যিয়াদ এবং মরক্কোতে বণী ইদরিস।

২. ইসনা সে দিয়ে ث।

বাইয়াৎ বা নামমাত্র নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাফ্ফার সিংহাসনারোহণের সময় থেকেই আব্বাসীয় খলিফাগণ তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের অভিপ্রেত উত্তরাধিকারীদের প্রতি রাজ্যের প্রধানদের আনুগত্য লাভের ব্যাপারে স্বাধীনতা অবলম্বন করতেন। আর নির্বাচন-নীতির ক্ষেত্রে নজীর ও প্রাচীন দৃষ্টান্ত থেকে বৈধতা ও পবিত্রতা মুদ্রিত করা অপরিহার্য হয়েছিল। মিশরে ফাতেমীয়দের অভ্যুত্থান এবং বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে প্রাচ্যের রাজ্য বলপূর্বক অধিকারের নিরন্তর প্রয়াস, ফাতিমার বংশধরদের দাবী খণ্ডন করা এবং ইসলামের অধ্যাত্ম প্রধান হিসেবে আব্বাসীয় খলিফাদের স্বীকৃতিবিষয়ক গোঁড়া মতবাদের রূপ ও সামঞ্জস্য বিধান করা দ্বিগুণভাবে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।[১]

আব্বাসীয় রাজবংশের অধিকারের সমর্থনে হাদিসের অনুসন্ধানে ইরাক ও হিজাজের প্রত্যেক জায়গা তছনছ করা হল। আইনের বিশেষজ্ঞ-দেরকে পরিষ্কার ভাষায় গোঁড়া মতবাদের মূল-নীতিসমূহ প্রণয়ন করতে হয়েছিল; আর ধীরে ধীরে আব্বাসীয় স্বার্থের সংকীর্ণ ভিত্তির উপর সুন্নী মযহাবের বৃহৎ সৌধ গড়ে উঠেছিল। যেসব পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ সুন্নী মযহাবের জন্ম ও বিবর্তনে সাহায্য করেছিলেন তাদের সাফল্য এসেছিল বহুলাংশে। মিশরের ফাতেমীয়দের ম্যানেকীয় মতবাদের জন্য। তাদের মতবাদসমূহের প্রকৃতি শিয়া ও সুন্নী মুফতিদের শিক্ষার সঙ্গে প্রভেদাত্মক

---

১. আরস্লান আল্ বাসাসিরি আব্বাসীয় সেনাধ্যক্ষ হলেও মিশরীয় ফাতেমীয়দের সমর্থক ছিলেন। তিনি বাগদাদের তৎকালীন খলিফা আল্ কায়েম বা-আমর ইল্লাহকে শহর থেকে বিতাড়িত করেন এবং আমিরুল আরবের (পারস্যের ২য় খানির সদৃশ উপাধি) শরণাপন্ন হতে বাধ্য করেন। যতদিন না আল্প আরস্লানের পিতা ও সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তুগ্রিল তাকে পুনর্বাসিত করেন। সমগ্র এই কালে বাগদাদে ফাতেমীয় খলিফাদের নামে 'খোতবা' পাঠ করা হত। শুক্রবারে বিভিন্ন দেশের বড় মসজিদের মিম্বর থেকে যে উপদেশ বাণী উচ্চারিত হয় তাকে 'খোতবা' বলা হয়। আল্লাহর গুণ-কীর্তন ও একত্ব-বাদের ঘোষণা এবং হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর উপর তাঁর পরিবারবর্গ ও উত্তরাধিকারীদের উপর আল্লাহর করুণা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে খোতবার শুরু হয়। তারপর শাসনরত খলিফার এবং রাষ্ট্রের দেওয়ানী কার্যপরিচালনাকারী যুবরাজের জয় প্রার্থনা করা হয়। খোতবার মধ্যে নাম উচ্চারিত হওয়া এবং টাকা তৈরী করা—এই দুটি প্রধান সুযোগ খলিফার রয়েছে এবং তা তার বৈধতার বিশেষ লক্ষণ।

ছিল; হাসান সাব্বাহর ("পর্বতের বৃদ্ধ লোকটি") দৃষ্টান্তের অনুসরণে সেরা লোকদের নিধন, বেদাতের বিচ্ছিন্নতামূলক বৈশিষ্ট্য, যা প্রাচীন চ্যাল্ডীয়-মাজীবাদের প্রভাবে বিভিন্ন পন্থীদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল এবং যা সব শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা বিরোধী ছিল—জনসাধারণের মতে এসব এমন একটি ব্যবস্থাকে শক্তি দিয়েছিল যা ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় দুর্গ গড়ে তুলেছিল। শিয়া ইমামগণ মানী ও মাজদাকদের নমুনাবিরোধী অপবিত্র বা কমিউনিষ্টিক মতবাদসমূহকে প্রবলভাবে নিন্দা করেছিলেন; ইচ্ছা থাকলেও বেদাত দমনের কিংবা একানুবর্তিতা প্রচলনের ক্ষমতা তাদের ছিল না। আব্বাসীয় খলিফাদের পার্থিব ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত সুন্নী-বাদের যে উপায় ছিল এবং তা প্রয়োগ করেছিল। ফলে তারা জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেছিল। এ সব লোক খেলাফতের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিমূর্ত প্রশ্নের বিরোধ নিয়ে কোনরূপ মাথা ঘামাত না।

আব্বাসিয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ববধি 'আহলুল্ বাইয়াতে'র অধিকারের সমর্থক এবং জনগণের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতা-নির্বাচনের অধিকারের সমর্থকদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। হিজাজ ও মদিনার অধিবাসীগণ যখন নির্বাচন-নীতির উপর জেদ ধরেছিল তখন উমাইয়াগণ তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেছিল। তারা ফাতিমার বংশ-ধরদের প্রতি কৃত অন্যায়কে ঘৃণা করত। হুসাইনের শাহাদত বরণের পর ইসলামের অন্তর থেকে ভীতির চিৎকার নির্গত হয়েছিল এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনার জনগণ অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, আর সে কারণে তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 'আহলুল বাইয়াতে'র সমর্থকগণ ও প্রথম তিনজন খলিফার অনুসারীবৃন্দ ধর্মের জন্য ভীতিপ্রদ নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যখন দু' দলের বংশ-গত কারণে পার্থক্য অনিবার্য হয়ে পড়েছিল তখন উভয় দিকে পার্থক্যের উপাদানসমূহ হাতের কাছে এসে পড়েছিল। বর্তমানে তারা যে নমুনা ও পরিমাণগতভাবে পার্থক্য সংরক্ষণ করে চলেছে তার মতবাদগত ও আইনগত পার্থক্যসমূহ এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

মামুন ও তাঁর দু'জন অব্যবহিত উত্তরাধিকারীর সংস্কৃতিসম্পন্ন শাসন-কালে মানবিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ধারণা প্রভাবিত করেছিল। তখন সুন্নী মযহাবের বিকাশে ছেদ পড়েছিল। এই সময় ছাড়া সমগ্র আব্বাসীয় খেলাফত[১] সুন্নী মযহাবের

---

১. ৭৫০ খ্রী. থেকে ১২৫২ খ্রী.।

মতবাদসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র একসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল; খলিফা ছিলেন ইমাম—পার্থিব প্রধান ও আধ্যাত্মিক প্রধান। আইন ও ধর্মের বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন তাঁর ভৃত্য। তিনি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত করতেন। এ কারণে সুন্নী মযহাব সংহত হয়েছিল। যে সব সম্প্রদায়ে[১] এই মযহাব প্রথমত বিভক্ত হয়েছিল তা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানেও এ চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং বহু মত ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরস্পর পৃথক। তাদের এই পার্থক্য রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক, আর্মেনীয় ও সিরীয় গোঁড়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পক্ষান্তরে শিয়াবাদ নির্দেশ করে কিভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পর পৃথক হয়ে পড়েছে এবং কিভাবে "আইন ব্যাখ্যাতাগণ" কমপক্ষে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রীষ্টান জাহানের ধর্মযাজকের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে। যে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের মধ্যে এক শত আশিটি সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে তা শিয়াদের মধ্যে প্রায়ই একইরূপ ফলোৎপাদন করেছে। শিয়াবাদের মধ্যে মতপার্থক্য পার্থিব নিয়ামক শক্তির তরবারীর সাহায্যে একানুবর্তিতা-নীতি বলবৎকারী শক্তির অনুপস্থিতির জন্য।

এই সময় থেকে মুসলিম প্রজাতন্ত্রের ইমামত[২] বা আধ্যাত্মিক

---

২. ইমাম জাফর তুসীর ('দাবিস্তানে' উদ্ধৃত) মতানুযায়ী সুন্নীরা মূলত পঁয়ষট্টিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।

৩. 'ইমাম' শব্দটি অত্যন্ত সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিয়েছেন ডঃ পার্সি ব্যাজার: " 'ইমাম' শব্দটি যে আরবী মূল থেকে এসেছে তার অর্থ হল লক্ষ্য নিবদ্ধ করা অনুসরণ করা—এর থেকে উৎপন্ন শব্দের প্রায় সবগুলি একই ধারণার ইঙ্গিত বহন করে। কাজেই 'ইমাম' মুখ্যত বুঝায় আদর্শ স্থানীয় বা যার আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। এই অর্থে এ দেওয়ানী ও ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের নেতা হিসেবে মুহম্মদের প্রতি প্রযোজ্য। আর উভয় ক্ষমতায় হযরতের প্রতিনিধি হিসেবে খোলাফায়ে রাশেদীন বা বৈধ উত্তরাধিকারীদের প্রতি প্রযোজ্য। শুধু ধর্মীয় অর্থের দিক দিয়ে এ চারটি মযহাব—প্রধানের প্রতি প্রযোজ্য, যেমন হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। অধিকতর সংকীর্ণ অর্থে মসজিদের ইমামের প্রতিও প্রযোজ্য। যিনি প্রাত্যহিক জামাতের নামাজে নেতৃত্ব করেন; প্রখ্যাত পরহিযগারদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পন করা হয়, তবে নাজির বা স্থানীয় প্রধানের অধীনের তার চাকুরী ও বেতন নির্ভরশীল এবং তার দ্বারা চাকুরী থেকে অপসারিত হতে পারে।

নেতৃত্বের প্রশ্নই দু'টি সম্প্রদায়ের প্রধান সমর-ক্ষেত্রে রূপ লাভ করে।[১] শিয়ারা এই অভিমত পোষণ করেন যে মুহম্মদ যে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন তা আলী ও তাঁর বংশধরদের উপর বর্তেছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই জনগণের নেতা নির্বাচনের অধিকার প্রত্যাখ্যান করেন, যারা হযরতের বংশধরদের ন্যায্য দাবীকে বাতিল করে। সুতরাং শিয়াদের মতে ইমামত ঐশী নিয়োগের মাধ্যমে হযরতের বংশধরদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে। হযরতের বংশধর হওয়া ছাড়াও ইমামের আরও কতকগুলি গুণ

কোরআনে এই শব্দটি কিতাব বা কিতাবসমূহ বা কোন জাতির বিবরণী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা ধর্মগুরু অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। সে কারণ সম্ভবত মুসলমানেরা শেষোক্ত অর্থেই শব্দটি গ্রহণ করেছেন। "যখন আল্লাহ্ ইবরাহিমকে কতিপয় আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি সে সব সম্পাদন করেছিলেন। তিনি বল্লেন, "আমি তোমাকে তোমার জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করেছি।" "পুনরায় ইবরাহিম, ইছহাক ও ইয়াকুব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, আমরা তাঁদেরকে ইমাম নির্বাচিত করেছি যাতে তাঁরা আমাদের হুকুম অনুযায়ী অন্যদেরকে পরিচালিত করতে পারে।" পুনরায়, "আমরা মূসাকে কিতাব দান করেছিলাম, সুতরাং তাঁর নবুয়্যাত সম্পর্কে অবিশ্বাস করো না। আমরা বণী ইসরাইলদের পথ প্রদর্শনের জন্যই আর তাদের কাউকে কাউকে আমাদের হুকুম অনুযায়ী পথপ্রদর্শনের জন্য রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি।"—ব্যাজার —'ইমাম এণ্ড সাইদ অব ওমান' পরিশিষ্ট—ক।

১. মাসুদী বলেন, "ইমামতের প্রশ্নটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমর্থকদের মধ্যে, বিশেষ-ভাবে নিযুক্তি-মতবাদের সমর্থক এবং নির্বাচন-মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে বিতর্কের বিষয়। নিযুক্তি-মতবাদের সমর্থক হল 'আহলে ইমামিয়া, আলী ইবনে আবু তালিব ও ফাতিমার দিক থেকে তাঁর সন্তান-সন্ততির সমর্থক শিয়াদের একটি শাখা। তারা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ মানবজাতিকে কোন সময়েই এমন লোক ছাড়া রাখেন না, যিনি আল্লাহর ধর্মকে সংরক্ষণ করেন (এবং যিনি তাদের ইমাম হিসেবে কাজ করেন)। এরূপ লোক হয় প্রেরিত নয় তাদের প্রতিনিধি। নির্বাচন মতবাদের সমর্থক হল খাওয়ারিজদের একটি দল, মরজিয়া, আহলুস সুন্নাত (যারা হাদিস ও সর্বসাধারণ স্বীকৃত মতবাদ স্বীকার করেন), মুতাজিলা সম্প্রাদায়ের কিছু সংখ্যক লোক এবং যায়েদিয়াদের একটি দল। তারা বিশ্বাস করেন যে এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের ইচ্ছা যে মুসলমান জাতি তাদের মধ্য থেকে নির্বাচন করে তাকে ইমাম বানাবেন, কেননা এমন সময় রয়েছে যখন আল্লাহ তাঁর কোন প্রতিনিধি পাঠান না। শিয়ারা এরূপ ইমামদেরকে মর্যাদা দখলকারী বলে বিবেচনা করেন।

অবশ্যই থাকতে হবে—তাকে অবশ্যই নিষ্পাপ ও নির্ভেজাল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, আর সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতার দিক দিয়ে তাকে সকলের চেয়ে বিশিষ্ট হতে হবে। তাঁরা যুক্তি দেখান যে এটা সঙ্গত নয় কিংবা এ আল্লাহর অভিপ্রায়ও হতে পারে না যে, যে ব্যক্তির চরিত্র সন্দেহাতীত নয় তার পক্ষে মানুষের বিবেককে পরিচালিত করার ক্ষমতা নেই। মানুষের নির্বাচন যে অভ্রান্ত নয় তা মানবজাতির ইতিহাস প্রমাণ করেছে। মানুষ প্রায়ই মন্দতম ব্যক্তিকে তাদের নেতা মনোনীত করেছে। আল্লাহ মানুষের ধর্মীয় প্রয়োজনকে তার নিঃসহায় শক্তির কাছে কখনও ছেড়ে দিতে পারতেন না। যদি ইমামের প্রয়োজন হত তবে তিনি এমন ব্যক্তি হতেন যিনি অবশ্যই বিবেকের অনুমোদন লাভ করতেন। তদনুসারে তারা ঘোষণা করেন যে যদি ইমামের মনোনয়ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ডেকে আনে। ফলে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শন ঐশীনিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি ন্যস্ত হয়েছে।[১]

সুন্নীদের মতে ইমামত মুহম্মদের পরিবারেই সীমিত নয়। ইমামকে ন্যায়পরায়ণ, ধার্মিক, নিষ্পাপ হতে হবে কিংবা তার কালের সর্বোৎকৃষ্ট বা প্রখ্যাত লোক হতে হবে এমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। যতক্ষণ

---

১. ইবনে খালদুন বলেন, নৃপতির সৌন্দর্য কিংবা পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিংবা ব্যক্তিগত গুণাবলী কিছুই প্রজাদের উপকারে আসে না।······এই বিখ্যাত লেখক যার নিরীক্ষণের সূক্ষ্মতার সঙ্গে বহুমুখী পাণ্ডিত্য সমন্বিত হয়েছে আরও বলেন, 'প্রজাদের কল্যাণের জন্য নৃপতির অস্তিত্ব। নৃপতির প্রয়োজন এজন্য যে, মানুষকে একসঙ্গে বাস করতে হয়, আর যদি ঐক্য বিধানের জন্য কোন শক্তি না থাকে তবে সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পার্থিব শাসক শুধু মানুষের ঘোষিত হুকুম বলবৎ করেন, কিন্তু ঐশী অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত আইন প্রণেতার দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে—মানুষের নৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণ। খলিফা হযরতের প্রতিনিধি ও সহকারী। তিনি শুধু পার্থিব শাসক নন, তিনি আধ্যাত্মিক প্রধানও। খলিফাকে তাই ইমাম বলে অভিহিত করা হয়, তার মর্যাদা গণপ্রার্থনার জামাতে পরিচালকের অনুরূপ।"

ইবনে খালদুন আরও বলেন, "ইমামের প্রতিষ্ঠাতা বাধ্যতাবোধের ব্যাপার। প্রয়োজনীয় আইনসমূহ হযরতের সাহাবাদের সাধারণ সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইমাম অধ্যাত্মিক প্রধান, আর খলিফা বা সুলতান পার্থিব ক্ষমতার নির্দেশক।"

পর্যন্ত তিনি স্বাধীন, বয়োপ্রাপ্ত, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং রাষ্ট্রের সাধারণ কার্যাবলী পরিচালনায় সমর্থ, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। অন্য একটি মতবাদের বেলায় রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে যা ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলে বহন করেছে। তারা এই অভিমত পোষণ করেন যে, পাপ বা অত্যাচার ইমামের পদচ্যুতি[১] প্রতিপন্ন করে না, ইমামের দুর্নীতিপরায়ণতা বা মন্দ আচরণ কিংবা যারা ঐশী গণপ্রার্থনা পরিচালনা করেন তাদের দুর্নীতিপরায়ণতা বা মন্দ আচরণ বিশ্বাসীদের উপাসনা বাতিল করে না।[২] তারা এই অভিমত পোষণ করেন যে ইমামত অবিভাজ্য এবং একই সময়ে দু'জন ইমামের অস্তিত্ব অবৈধ। খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীরা যেমন একজন মাত্র পোপের আনুগত্য স্বীকার করতে পারে তেমনি মুসলিম জাহানও একজন বৈধ আইনানুগ খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতে পারে। তিনজন পোপ যেমন প্রায়ই ত্রয়ী সম্রাট বলে প্রতারণা করেছে তেমনি তিন জন আমিরুল মু'মেনীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রতারণা করেছে। এশিয়ায় উমাইয়া রাজবংশের পতনের পর এই বংশের একজন সদস্য স্পেনে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করেছিল, আর আব্বাসীয় বংশ তাইগ্রিস নদীর উভয়তীরে তাদের শাসন কায়েম রেখেছিল ; ফাতেমীয়গণ নীলনদী-অধ্যুষিত এলাকায় সুলতান তা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুই বা তিন জন সুলতান একই সঙ্গে ইসলামের প্রধান হিসেবে ক্ষমতাসীন হয়েছেন—এই ঘটনা একটি মতের

---

১. নিজেদের অত্যাচারের শাস্তি এড়ানোর জন্য অত্যাচারী সুলতানের আদেশে প্রচারিত এই মতবাদ সত্ত্বেও জনগণ এ কখনও সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেনি। উমাইয়া খলিফা অলিদ দুষ্কৃতির জন্য যার উপনাম হয়েছিল ফাসিক, তার শাসনামলে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে তাকে গদীচ্যুত করেছিল। অনুরূপভাবে যখন (আব্বাসীয় খলিফা) মুতাওয়াক্কিলের অবিচার অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তদীয় পুত্র সদাশয় মুনতাসির তাকে পদচ্যুত করেছিল। অটোম্যান তুর্কীদের ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, জনগণ পাপিষ্ঠ ও অযোগ্য নৃপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। অসুখী আব্দুল আযিযের বিরুদ্ধে ছিল শেষ বিদ্রোহ।

২. এই মতবাদের বিরুদ্ধে এখন সুন্নী মযহাবের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। 'গায়ির মুকাল্লিদিন' যাদের সম্পর্কে আমরা পরে বলব, এই অভিমত পোষণ করেন যে, যদি ইমাম ব্যক্তিগত জীবনে সৎ না হন তবে তার পরিচালনায় জামাতের নামাজ বাতিল হবে।

জন্ম দিয়েছে যে অবিভাজ্যতার নীতি একটি মাত্র দেশ এবং সেই একই দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য, কিংবা পরস্পর সংলগ্ন দুটি দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য ; কিন্তু যখন দেশসমূহ এত দূরে অবস্থিত যে একজন ইমামের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হতে পারে না, তখন দ্বিতীয় ইমাম নির্বাচন বৈধ। ইমাম সকল মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক ও শাসক ; এবং জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরও তাদের স্বার্থসংরক্ষণের অভিভাবক। মুসলমানদের অনুমোদনসাপেক্ষে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত। যেহেতু এই ক্ষমতা সমাজের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য, কাজেই মনোনয়ন জনগণের পছন্দের উপর নির্ভর করে।[১]

এটা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল যে নির্যাতন শিয়াদেরকে একতাবদ্ধ করবে। যদিও সকলে এই প্রশ্নে একমত যে ইসলামের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ক্ষমতা খেলাফত হযরতের বংশধরদের মধ্যে সীমিত, অনেকেই পরিবারের স্বীকৃত প্রধানদেরকে পরিত্যাগ করে দুরভিসন্ধি বা পক্ষপাত বশত বংশের অন্যান্যদের প্রতি, যুক্ত হয়ে পড়েছে। যখন স্বীকৃত ইমামগণ ও তাদের শিষ্যবৃন্দ পবিত্র নির্জনতার জীবন যাপন করতেন তখন অন্যান্যরা বৈদেশিক শত্রুতার অবসরে পারিবারিক কলহবিবাদের সুযোগ লাভ করত। তারা প্রচার করতেন, বিচারবিতর্কে লিপ্ত হতেন, দুর্দশা ভোগ করতেন।

শাহ্‌রিস্তানী শিয়াদের পাঁচটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন ; যেমন 'জায়েদিয়া', 'ইসমাইলিয়া', 'ইবনা আশারিয়া বা ইমামিয়া'। কায়সানিয়া এবং 'পালিয়া বা গুল্লাত'। বাস্তবিকপক্ষে, আমরা পরে দেখতে পাব যে কতিপয় সম্প্রদায় বিশেষভাবে তারা যে সব শাখায় বিভক্ত সেগুলির আলীর প্রতি অনুরাগের কমবেশী ছাড়া প্রকৃত শিয়া মতবাদের সঙ্গে কোন ঐক্য নেই। পক্ষান্তরে, এসব সম্প্রদায় ইসলামী উৎস ছাড়া অন্য উৎস থেকে জাত।

শাহ্‌রিস্তানী বলেন যে জায়েদিয়ারা হুসাইনের পুত্র জয়নুল আবেদীন বা দ্বিতীয় আলীর পুত্র জায়েদের অনুসারী। তারা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে ইমামত আলী থেকে প্রথম হাসানে পরে হুসাইনে বর্তেছিল, হুসাইন থেকে এ দ্বিতীয় আলী (জয়নুল আবেদীনে) এবং তাঁর থেকে এ জায়েদে বর্তেছিল—মুহম্মদ আল্ বকিরে নয়, যেমন 'ইসনা আশারিয়া'

---

১. ইবনে খালদুন ; এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১০ম অধ্যায় দেখুন।

সম্প্রদায় ও অধিকাংশ মুসলমানেরা মনে করেন। তাদের মতামত 'আহ্‌লে সুন্নাত' জামাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তারা এই অভিমত পোষণ করেন যে হযরতের বংশধরদের ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক প্রধান নির্বাচনের ক্ষমতা জনগণের আছে। তারা নির্বাচন নীতির সঙ্গে ইমামত হযরতের বংশধরদের মধ্যে সীমিত—এই নীতির সংমিশ্রণ ঘটান। তারা আরও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে সর্বোৎকৃষ্ট লোক থাকতেও অপেক্ষাকৃত কম উৎকৃষ্ট লোক নির্বাচন করা বৈধ। এই মতের ফলশ্রুতি হিসেবে তারা প্রথম তিন খলিফার খেলাফতের বৈধতা স্বীকার করেছিলেন, যাদের খেলাফতের ব্যাপারটি অন্যান্য শিয়ারা অস্বীকার করেছিল। তাদের মতে, যদিও আলী হযরতের সাহাবাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। হযরতের বংশধর হিসেবে ও গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে ইমামতের উপযুক্ত ছিলেন, তথাপি নীতির খাতিরে এবং হযরতের ওফাতের পর যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা প্রশমিত করতে, জনগণের মনের স্থৈর্য আনতে এবং গোত্র-সমূহের বিভেদসমূহ নিরসনে একজন পরিণত বয়সের লোককে খলিফার পদে বরণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এছাড়া, ধর্মের সংরক্ষণে আলী যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তাতে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে প্রতিহংসা গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল ছিল এবং যারা সম্প্রতি অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল ; এসব লোক আলীর মহত্ত্বের নিকট স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করেনি। তারা মনে করেন যে একই নীতি ওমরের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়েছে।[১] প্রথম দু'জন খলিফার ইমামতের স্বীকৃতির জন্য অন্যান্য শিয়ারা তাদেরকে 'রওয়াফিয' বা ভিন্নপন্থী নামে অভিহিত করেন। তাদের আর একটি মতবাদ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তারা যৌক্তিকতা দেখান যে ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, জ্ঞান ও পাপশূন্যতা—যে গুণগুলি শিয়ারা খলিফা পদের জন্য সঙ্গত মনে করেন —এ গুণগুলি ছাড়াও ইমামের সাহসিকতা ও অস্ত্রবলে ইমামতে তার অধিকার ঘোষণার শক্তি থাকা চাই। ইমাম মুহম্মদ আল বকির, যিনি তাঁর পিতা দ্বিতীয় আলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে বলপ্রয়োগ নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে জায়েদ তার ভাই থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং

১. শাহ্‌রিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

কুফার নিকটবর্তী স্থানে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া তাঁর উত্তরাধিকারী হন এবং তদীয় পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তিনি ইমাম জাফর আস্‌ সাদিকের পরামর্শ সত্ত্বেও অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হন। তিনি খোরাসানে তাঁর সমর্থকদেরকে একত্রিত করেছিলেন। কিন্তু হিশামের একজন সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

জায়েদিয়ারা বলেন, ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর ইমামত পরিবারের অপর সদস্য মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, উপনাম 'আন্‌নাফস-উস্‌ জাকিয়া' ("পবিত্র আত্মা)-র উপর বর্তেছিল। মুহম্মদ 'মাহদী' উপাধি ধারণ করে আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের বিরুদ্ধে হিযাযে বিদ্রোহ ঘোষণা করে-ছিলেন। তিনি মনসুরের ভাগিনেয় ঈসা কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। ইবরাহিম তাঁর ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হন এবং আব্বাসীয় খলিফাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রামে একইভাবে প্রাণ হারান। তাঁর অপর এক ভাই ঈসা বলপ্রয়োগে তাঁর অধিকার দাবী করলে মনসুর তাঁকে বন্দী করেন ও আজীবন কারারুদ্ধ করে রাখেন। এসব ঘটনা বর্ণনা করার পর শাহ্‌রিস্তানী আরও বলেন, "তাঁদের ভাগ্যে যা যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে জাফর আস্‌ সাদিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে পার্থিব রাজত্ব তাঁদের পরিবারের জন্য নয়, ইমামত আব্বাসীয়দের হাতের ক্রীড়নক হবে।"

জায়েদিয়া সম্প্রদায়ের একটি শাখার মতে ইমামত ইবরাহিম থেকে ইদরিসে বর্তেছিল। ইদরিস মাওরিতানিয়ার ইদরিসীয় বংশের এবং ফেজ শহরের প্রতিষ্ঠাতা। ইদরিসীয়দের পতনের পর জায়েদিয়া সম্প্রদায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও এই সম্প্রদায়ের লোক দেখতে পাওয়া যায়। জায়েদিয়াদের একটি শাখা দীর্ঘকাল ধরে তাবারিস্তানে শাসন কাজ চালিয়েছিল। এখনও উত্তর ইয়েমেনে জায়েদীয় ইমাম বর্তমান। শাহ্‌রিস্তানীর মতে জায়েদিয়া সম্প্রদায় চারটি শাখায় বিভক্ত; যেমন, জারুদিয়া, সোলায়মানিয়া, তাবারিয়া ও সালেহিয়া। জায়েদের পৌত্র থেকে ইমামতের সংক্রমণ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। জারুদিয়াগণ ঈসার ব্যাপারটি চেপে রেখে মুহম্মদ নাফসুস্‌ জাকিয়া'র দাবী সমর্থন ক'রেছিলেন। তারা মনসুরের শাসনাধীনে নিদারুণভাবে দুর্দশা ভোগ করেছিলেন। সোলায়-মানিয়া শাখা, প্রতিষ্ঠাতা সোলায়মান ইবনে জরিসের নামানুসারে

অভিহিত। তিনি ঘোষণা করেন যে ইমামত জনগণের রায়ের উপর নির্ভরশীল। ধর্মপরিচালনা, উপাস্য ও তাঁর একত্বের জ্ঞান এবং যেসব নিয়ম তিনি সরকার পরিচালনার জন্য তৈরী করেছেন সেসব ইমামতের জন্য অভিপ্রেত নয়। কারণ এসব প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত। ইমামত অন্যায়কারীর উপর শাস্তিবিধানকারী, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকারী ও রাষ্ট্রের সংরক্ষক পার্থিব সরকারের জন্য অভিপ্রেত। ইমামকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হতে হবে এমন নয়।..." "আহলুস্ সুন্নাতে'র একটি শাখা অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন, কারণ তারা বলেন যে ইমামের পক্ষে বিদ্বান বা গবেষক— 'মজতাহিজ' হতে হবে, তার প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন তিনি জ্ঞানী এবং তার সঙ্গে এমন ব্যক্তি আছেন যিনি আইন ব্যাখ্যা করতে পারেন।[১] 'সোলায়মানিয়া' ও সালেহিয়া' শাখাদ্বয় প্রথম দু'জন খলিফার স্বীকৃতির ব্যাপারে একমত ; সালেহিয়া শাখাভুক্ত লোকেরা এই মত পোষণ করেন যে আলী আবু বকর ওমরের অনুকূলে তাঁর নিজস্ব দাবী প্রত্যাহার করায় জনগণের পক্ষে তাঁদের ইমামত সম্পর্কে প্রশ্ন করার কিছুই ছিল না। কিন্তু ওসমান সম্পর্কে তারা সন্দিগ্ধ ছিল ; তারা বলেন, "যখন আমরা দেখি কিভাবে বণী উমাইয়াদের সমর্থনে তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করছেন তখন বুঝি তাঁর চরিত্র অন্যান্য সাহাবাদের থেকে স্বতন্ত্র।"

'ইসমাইলিয়া' (কোন কোন সময় 'সাবিয়ুন'[১] বলে কথিত) ইমাম জাফর আস্ সাদিকের এক পুত্র, ইসমাইল থেকে উদ্ভূত। তিনি তাঁর পিতার পূর্বে ইহলীলা সংবরণ করেন। তারা মনে করেন যে ইমাম জাফর আস্ সাদিকের মৃত্যুর পর ইমামত ইসমাইলের পুত্র, মুহম্মদ (উপনাম আল্ মাকতুম[২] গুপ্ত অপ্রকাশিত)-র উপর বর্তায়, জাফরের পুত্র মুসা

১. শাহ্‌রিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯, ১২০।

১. কারণ তারা মাত্র সাত জন ইমামে স্বীকার করতেন : (১) আলী, (২) হাসান, (৩) হুসাইন, (৪) আলী দ্বিতীয়, (৫) মুহম্মদ আল্ বকির, (৬) জাফর আস্ সাদিক এবং (৭) ইসমাইল।

২. মাকরিজী বলেন, তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিল আব্বাসীয়দের নির্যাতন বাঁচানোর জন্য। ইমাম জাফর আস্ সাদিকের জ্যৈষ্ঠপুত্র ইসমাইল অমায়িক ব্যবহার ও কর্মঠ স্বভাবের লোক ছিলেন। মাকরিজীর মতে, ইয়েমেনে কেতমায় ও আফ্রিকার প্রদেশসমূহের তাঁর বহু অনুসারী ছিল। শাহ্‌রিস্তানী বলেন, ইসমাইলের মার জীবদ্দশায় অন্য কোন স্ত্রী ছিল না, যেমন খাদিজা ও ফাতিমার জীবনকালে যথাক্রমে হযরত এবং আলীর অন্য স্ত্রী ছিল না।

আল্ কাজিমের উপর নয়, যেমন ইমনা আশারিয়া এবং সাধারণভাবে অন্যান্য মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন। ইসমাইলিয়াদের মতে, জাফর আল্ মুসাদ্দাক মুহম্মদ 'আল্ মাখতুমের' স্থলাভিষিক্ত হন, তাঁর পুত্র মুহম্মদ 'আল্ হাবিব' গুপ্ত ইমামদের শেষ সদস্য।

তদীয় পুত্র আবু মুহম্মদ আব্দুল্লাহ ফাতেমীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশ তিন শ' বছর ধরে উত্তর আফ্রিকা শাসন করেন। আব্বাসীয় খলিফা, মুতাজিদ বিল্লাহ সাফফাহ-২ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। সেগেল-মেসের কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি বারবেরিতে উপস্থিত হয়ে "ওবায়দুল্লাহ" ও "মাহদী" (অঙ্গীকৃত পথপ্রদর্শক) উপাধি ধারণ করেন। সর্বদিক থেকে শিষ্যগণ তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল এবং একজন সুফীর সহায়তায় তিনি আগলাবাইদদের উৎখাত করেন, যারা তখন বাগদাদের খলিফার নামে আফ্রিকার প্রদেশসমূহ শাসন করছিল। তিনি মৌরতানিয়া থেকে মিশরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। তাঁর একজন উত্তরাধিকারী (মাদ আবু তেসিম), আল্ মুয়িযলি দীন-ইল্লাহ (আল্লাহর দীনের সমুন্নতকারী) আব্বাসীয়দের থেকে মিশর ও সিরিয়ার একাংশ বলপূর্বক দখল করে নিয়েছিল। মুয়িয শত্রুদের উপর তাঁর বংশের বিজয়ের প্রতীক হিসেবে কায়রো নগরীর (কাহিরা, বিজয়ী শহর) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ওবায়দুল্লাহ আল্ মাহদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কায়রোর নিকটবর্তী মাহদিয়ে থেকে নতুন নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। এই সময়ে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা ছাড়াও সারদিনিয়া ও সিসিলি দ্বীপগুলি তাঁর রাজ্যসীমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তিনি কায়রো নগরীতে 'আল আযহার' মসজিদ (অত্যুজ্জ্বল মসজিদ), একটি বিরাট সাধারণ গ্রন্থাগার, বেশ কয়েকটি কলেজ নির্মাণ করে সুসজ্জিত করেছিলেন। এসব কলেজে শিক্ষার্থিগণ ব্যাকরণ, সাহিত্য, কোরআনের ব্যাখ্যা, আইনবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত ও ইতিহাসে পাঠ গ্রহণ করত। ঐতিহাসিক বলেন, "তাঁর রাজত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ন্যায়- বিচার ও সংযম।"[১]

---

১. মার্মেল। গোঁড়া জামালুদ্দীন বিন তুগ্রী বারদী (তাঁর মাওরাদুল লাতাফাত গ্রন্থে) বলেন, "যদিও মুয়িয এক ধর্মবিষয়ে ভিন্নপন্থী ছিলেন তথাপি তিনি ছিলেন জ্ঞানী, বিদ্বান, উদার ও তাঁর প্রজাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ।" ফাতেমীয় বংশের পূর্ণ বিবরণের জন্য 'এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন' দেখুন।

মিশরীয় ফাতেমীয়দের সম্পর্কে আমরা যে সব বিবরণ পেয়েছি তাদের প্রত্যেকটি বিরোধী উৎস থেকে পাওয়া গেছে। মুয়িযের সেনাধ্যক্ষ, জৌহর বাগদাদের খলিফার নিকট থেকে মিশরও সিরিয়া অধিকার করার পর থেকেই তুই খলিফার মধ্যে উপাধির বৈধতা নিয়ে নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছিল। মুহম্মদের বংশধর হিসেবে ফাতেমীয়দের দাবী জনগণের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়েছিল, আর এই ব্যাপারটি আব্বাসীয়দেরকে তাদের প্রতিপক্ষের বংশলতিকার যাথার্থ বিনাশের জন্য উদ্দীপিত করেছিল এবং তাদের গৃহীত মতবাদসমূহকে ইসলাম-বিরোধী বলে জগৎ সমক্ষে তুলে ধরেছিল। কাদির লিল্লাহর রাজত্বকালে সন্ত্রস্ত খলিফার অনুরোধে বাগদাদে আইন বিশারদদের একটি গোপন সম্মেলন বসেছিল ফাতেমীয়দের নিন্দনীয় করার জন্য যে তারা ফাতিমার প্রকৃত বংশধর নয়। ফাতেমীয়গণও প্রতিপক্ষের শক্তিশালী প্রতি-উত্তর দিয়েছিলেন কায়রোর নেতৃস্থানীয় আইনবিদদের, যাদের মধ্যে বহু মালেকী ও শাফেয়ী ছিলেন, স্বাক্ষরিত অভিসম্পাত পত্র পাঠিয়ে। যাহোক আব্বাসীয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক তাদের বৈধতার উপর আরোপিত সন্দেহ সত্ত্বেও মাকরিজী, ইবনে খালতুন ও আবুল ফেদার মত বড় বড় ঐতিহাসিকও ফাতেমীয়দের দাবী সমর্থন করেছেন।

মাকরিজী বিষয়টির উপর অত্যন্ত খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন এবং বণী আব্বাসদের সমর্থকদের মিথ্যাভাষণ ও জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন ওবায়তুল্লাহ আল্ মাহদী মুহম্মদের বংশধর নয়—আব্বাসীয়দের এই উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "তথ্যের কিছুটা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে উক্তিটি বানোয়াট। সে সময়ে আবু তালিবের পুত্র আলীর বংশধরগণ অসংখ্য এবং শিয়াগণ তাদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তাহলে সেটা কি যা তাদের সমর্থকদেরকে বংশধরদের পরিত্যাগ করে তাদের পরিবর্তে ইহুদী বংশোদ্ভূত মাজী-সন্তানকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্ররোচিত করত? সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া কোন ব্যক্তি এরূপ করত না, ওবায়তুল্লাহ আল্ মাহদী বংশগতভাবে ইহুদী বা মাজী—এই বিবরণ তুর্বলচেতা আব্বাসীয় যুবরাজদের কৌশল। তারা জানত না কিভাবে ফাতেমীয় প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তাদের রাজত্ব অবাধে ২৭০ বছর কাল স্থায়ী হয়েছিল এবং তারা আফ্রিকা, মিশর, সিরিয়া, দিয়ারবকত, (মক্কা ও মদিনার) পবিত্র শহরদ্বয় এবং ইয়েমেনের আব্বাসীয় রাজ্যসমূহ লুণ্ঠন করত। চল্লিশ সপ্তাহ ধরে বাগদাদে তাদের

নামে 'খুতবা' পাঠও করা হত। আব্বাসীয় সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারত না। জনগণের মনে ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা জন্মাতে পারত না বলেই তারা ফাতেমীয়দের বংশগতি সম্পর্কে নিন্দাবাদ প্রচার করত। আব্বাসীয় কর্মচারীও আমিরগণ ফাতেমীয়দের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না তাই প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় গ্রহণ করত। কাযীগণ কাদির বিল্লার অধীনে সম্মেলনের কার্যসূচীর প্রত্যায়ন করতেন। তারা খলিফার হুকুমে এবং জনশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতেন। তখন থেকে ঐতিহাসিকগণ উদাসীন-ভাবে ও নির্বিচারে আব্বাসীয়দের উদ্ভাবিত নিন্দাবাদের প্রচার চালাতেন। "প্রাচ্যবিদদের মধ্যে সমালোচনাধর্মী ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে প্রখ্যাত মনীষীর উক্তির চেয়ে স্পষ্টতর কিছুই হতে পারে না।[১]

সম্ভবতঃ মিশরীয় ফাতেমীয়দের স্বীকৃত মতবাদসমূহ একইভাবে মিথ্যা প্রতিবেদনের অধীন। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বললে চলে যে, তারা বহুলাংশে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুনের (উপনাম 'কাদ্দা') গুহ্য মতবাদসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। আর রাজনৈতিক প্রচারের জন্য তাঁর দীক্ষার মাত্রার সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

খ্রীষ্টান-জগতের সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, আনুষঙ্গিক দুর্দশাসহ ত্রিশ বছরের যুদ্ধ, হুগ নটদের ওপর নির্যাতন যাতে বংশগত উচ্চাভিলাষ ও ধর্মান্ধতা সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল—এসব পার্থিব ক্ষমতার লোভ থেকে যেসব অনিষ্ট উৎসারিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু ধারণা দান করে। ইসলামেও একই ঘটনা ঘটেছে। আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের মধ্যে এবং আব্বাসীয় ও ফাতেমীয়দের মধ্যে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, সে সবও একইরূপ দুর্ভাগ্যজনক ফলোৎপাদন করেছিল।

প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের প্রাচ্য প্রদেশসমূহ এ সময়ে বিভিন্ন

---

১. মাকারিজী ৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। জামালুদ্দীন আবুল মাহাসিন ইউসুফ বিন তাগ্রী বারদী তাঁর "মওজুমো যাহেরাতে ফি মুলুকে মেসরে ওয়াল কাহেবা" গ্রন্থে মাকরিজ সম্পর্কে এরূপ বলেন: "এই বছর ইহলীলা সংবরণ করেন বিদগ্ধ শেখ ও ইমাম, আইনজীবী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও হাদিসবেত্তা তাকিউদ্দীন আহম্মদ বিন আলী বিন আব্দুল কাদির বিন মুহম্মদ বিন ইবরাহিম বিন মুহম্মদ বিন তামিম বিন আব্দুস সামাদ।

ধরনের হিতকর মনোভাবের আবাসভূমি ছিল। এখানে ইসলামী জীবন-প্রবাহের পূর্বে শুধু মাজো-জরথুস্ত্রবাদেরই আগমন ঘটেনি, জন্মান্তরবাদ বিষ্ণুর অবতারত্ব এবং স্বর্গ থেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ ও 'গোপীদের' সঙ্গে তাঁর সহজ ও অবাধ মেলামেশার ধারণাসহ বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আগমন ঘটেছে। পরবর্তী সাসানিয়া সম্রাটদের আমলে বিপ্লবাত্মক অভিমত ও ধর্মবিপ্লব মন্দির ও প্রাসাদ উভয়কে কম্পিত করে-ছিল; তরবারী ও অগ্নিসংযোগের সাহায্যে কেস্‌রা আনাওশিরওয়ান যা নির্মূল করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তা সব নির্যাতন সত্ত্বেও টিকে ছিল। অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন আকারে ও আকৃতিতে ইসলামে পুনরার্বিভাবের জন্য তারা যথেষ্ট প্রাণশক্তি বজায় রেখেছিল।

আত্মার দেহান্তরবাদের সমর্থক, একটি ইন্দো-মাজী সম্প্রদায় 'রায়েন দি' ও কুখ্যাত মুকান্না[১] হাকিম বিন হাশিম প্রতিষ্ঠিত 'সাফিদযামাগণ'[২], এরা খোরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং খলিফা মাহদী তাদের দমন করেন। মুকান্না শিক্ষা দিতেন যে আল্লাহ মানুষের আকার ধারণ করেছেন যখন তিনি প্রথম মানুষকে সেজদা করার জন্য ফিরিশতাদেরকে হুকুম করেছিলেন। তখন থেকে ঐশী প্রকৃতি একজন প্রেরিতপুরুষ থেকে অন্য একজন প্রেরিতপুরুষের বর্তাতে বর্তাতে তার মধ্যে এসে হাজির হয়েছে।[৩]

একই সময়ে, যে মাযদাকবাদ সাধারণ অগ্নিসংযোগে খসরুর সাম্রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং মহান আনওশিরওয়ান কর্তৃক নির্মমভাবে পদদলিত হয়েছিল তাই আবার খলিফাদের শাসনামলে মাথা চাড়া দিয়েছিল। সর্প শুধু অর্ধমৃত হয়েছিল। বাবেক, উপনাম খুর্‌রামি (তার জন্মস্থান খুর্‌রাম থেকে) তার আদর্শ মাযদাকের মতো একইরূপ ধ্বংসাত্মক মতবাদসমূহ প্রচার করেছিলেন—নারী সমাজ ও দ্রব্যসম্ভার, এবং যাবতীয় মনুষ্য কর্মের

১. এ হল একজন প্রতারক যাকে মূর "খোরাসানের ছদ্মবেশী ধর্মনায়ক" হিসেবে অভিহিত করে বিখ্যাত করেছিলেন। তিনি মুকান্না বলে অভিহিত হতেন। হয় তাকে কুৎসিত ভাব গোপন করার জন্য নয় তো শিষ্যদেরকে অভেদ্যতার ভাবে মুগ্ধ করার জন্য তিনি সর্বদা মুখোশ পরতেন তাকে 'মাযেন দেহ-ই মাহ' (চন্দ্রের স্রষ্টা)ও বলা হত, কারণ কোন এক উপলক্ষে তিনি যাদুর সাহায্যে নাখসের নামক স্থানে চন্দ্রের আলোকের দীপালি দেখিয়েছিলেন।

২. এরূপ বলা হয় ইউরোপের টেবোরিডদের মতো শ্বেত পোশাক পরিধানের জন্য।

৩. ইবনে খালদুনের 'জেনারেল হিস্ট্রী 'কিতাবুল ইবার' ইত্যাদি ৩য় খণ্ড' পৃ. ২০৬।

প্রতি ঔদাসীন্য। মাত্র বিশ বছরের সময়সীমার মধ্যে তিনি সমগ্র খেলাফতকে হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস দ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে মুতাসিম বিল্লাহর শাসনকালে তিনি উৎখাত হন ও খলিফার সম্মুখে নিহত হন। এটা পুরাতন গল্পের পুনরাবৃত্তি। ইসলামকেও খ্রীষ্টধর্মের মতো একই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকে নবম শতাব্দীর শেষ অবধি খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে প্রাচীন ধর্মমতের সংঘাত চলেছিল, যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক বিশাল জনপদে আবির্ভূত হচ্ছিল যেখানে যিশুর ধর্ম প্রকাশ্যে ব্যক্ত হয়েছিল। এই সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর খ্রীষ্টান-জগতে নেমে এসেছিল এক সাংঘাতিক কালো যবনিকা; গোঁড়া মতবাদ শুধু বিপ্লবী মোনাটনিষ্টদের ম্যানিকীয় পলিশিয়ানদেরকে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়নি পরন্তু বুদ্ধিবাদী এরিয়ানদেরকেও ধ্বংস করতে সফল হয়েছিল। পুরোহিততন্ত্র ও গোঁড়া মতবাদ—পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য শব্দ—সংস্কার আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের চিন্তাকে বন্দী করে রেখেছিল। ইসলামকে একই পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু তার সংস্কার আন্দোলন সবে মাত্র শুরু হচ্ছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের কাছ থেকে এক চিরন্তন সত্যের সহজ স্বীকৃতি এবং কতিপয় নৈতিক কর্তব্যের অনুশীলন দাবী করেছিল। অন্যান্য দিক দিয়ে ইসলাম তাদেরকে দিয়েছিল বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ব্যাপকতম স্বাধীনতা। ঐশী একত্ববাদের নামে এই ধর্ম সকল ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরেছিল গণতান্ত্রিক সাম্যের অঙ্গীকার। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক ধর্মের নির্যাতীত বিরুদ্ধবাদীরা হযরতের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন, যিনি পুরোহিততন্ত্রের অক্টোপাশ থেকে মানুষের বিচারবুদ্ধির মুক্তি দিয়েছিলেন। "আবেস্তা ধর্মশাস্ত্রবিদ", জরথুস্ত্রবাদী স্বাধীন চিন্তাবিদ, ম্যানিকিয়াস, খ্রীষ্টান, ইহুদী ও মাজী—সকলেই নতুন জীবনব্যবস্থার আবির্ভাবকে খোশ আমদেদ জানিয়েছিল, যা ধর্মীয় ঐক্যের স্বপ্ন সার্থক করে তুলেছিল। যে সব নষ্টিক সম্প্রদায় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত যিশুর ধর্মকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল, তারা হয় মুহম্মদের ধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, না হয় তারা খলিফার বিশাল সহিষ্ণু শাসনের অধীনে গোঁড়া গ্রীক বা ক্যাথলিকদের দ্বারা উৎপীড়িত না হয়ে শান্তিতে বসবাস করেছিল। প্রথমোক্ত দল, যারা মুহম্মদের ধর্ম অবলম্বন করেছিল তারা তাদের আদিম ধারণাসমূহ সংরক্ষণ করেছিল এবং ইসলামে ডোমেটিক

সম্প্রদায়ের (যারা যিশুর দৈহিক রূপকে সাদৃশ্য মনে করত) জন্ম দিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

কোন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ, তারা যে জলবায়ুর মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখে, দেশটির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যার মধ্যে তারা বাস করে, প্রাচীন ধর্মমতসমূহের প্রভাব—এসব তাদের ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদসমূহকে রূপ দেয় ও রঞ্জিত করে তোলে। খ্রীষ্টান জগৎ ও ইসলাম জাহান উভয় সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। ইরান অজ্ঞেয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল; সেখান থেকে জোসেটিক ধারণা উৎসারিত হয়ে রোমান-জগতে প্রবেশ করেছিল এবং তা ইহুদীয় খ্রীষ্টানদের আদিম বিশ্বাসের উপর ঐশীত্বের ধারণা মুদ্রিত করে দিয়েছিল যা খ্রীষ্টানরা বিশ্বমানবের নিকট প্রচার করেছিল। ম্যানিকীয়বাদ কল্পনা ও দর্শনের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ এখানে খ্রীষ্টধর্মের ঋণ প্রভূত, কিন্তু স্বীকৃতি নেই বললেই চলে; এই মতবাদ জরথুস্ত্রবাদী ও খ্রীষ্টানদের নির্যাতন সত্ত্বেও টিকে ছিল, মরেনি। অদ্ভুত প্রতিভার সন্ততি, একটি জাতির চরিত্রের অভিব্যক্তি তা কি কখন মরে যেতে পারে? ধর্মতত্ত্ববিদেরা চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু তাকে কখনো নিধন করতে পারেন না। সুন্নী মযহাবের জনকদের রুগ্নতা ইরানে কল্পনাবিলাসী দর্শনের জন্ম দিয়েছিল। হযরত আলীর ব্যক্তিত্ব ম্যানিকীয়বাদের কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জনগণের মধ্যে এ জেসেটিক যিশুর স্থান দখল করেছিল। ঐশীত্বের প্রক্রিয়া আলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতিও ঐশীত্ব আরোপিত হয়েছিল। সুন্নীদের ন্যায় শিয়াবাদেরও দুটি দিক রয়েছে। একটি ছিল মুহম্মদের অব্যবহিত বংশধরদের বিশুদ্ধ, সরল শিয়াবাদ—এ সম্পর্কে আমরা শীঘ্রই আলোচনা করব। অপরটি হল ডসেটিক শিয়াবাদ যা যে জনগণের মধ্যে এ প্রচারিত হয়েছিল তাদের আদিম বিশ্বাস অনুযায়ী কল্পিত ও সংক্রেমিত। চরমভাবাপন্ন শিয়াবাদ ডসেটিক শিয়াবাদ থেকে পৃথক যেমন চরমভাবাপন্ন সুন্নীবাদ বা 'নওয়াসিববাদ' ডসেটিক শিয়াবাদ থেকে পৃথক। সংকীর্ণমনা একচেটিয়া ভাব কোন কোন ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মমতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয় কিংবা আথানাসীয় ধর্মমতের ভীতিপ্রদর্শন শুধু খ্রীষ্টধর্মের মধ্যেই সীমিত নয়। ইসলামেও (কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া বলা যেতে পারে) প্রত্যেক সম্প্রদায় নিন্দা করে যে পরলোকে অন্য সম্প্রদায়ের শাস্তি হবে তবে তা চিরকালের জন্য নয় (যেমন গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে থাকেন)—তা পর্যাপ্ত পরিমাণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে যাতে তারা তাদের বিভিন্ন ধর্মভাবের কুফল

অনুভব করতে পারবে। বিরোধী দলসমূহের মধ্যে পরস্পর একের বিরুদ্ধে অন্যের নরকাগ্নি ও গন্ধক নিক্ষেপের অভিসম্পাত সত্ত্বেও দার্শনিক শিক্ষার্থী ইসলামের সার্বজনীনতা নিরীক্ষণ করতে অসমর্থ হবে না।

সপ্তম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে কনস্তানতাইন সিলভ্যানাস পল সমর্থকদের ম্যানিকীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; তারা সেণ্ট পলের নামানুসারে তাদের সম্প্রদায়ের নামকরণ করেছিলেন এবং পলের শিষ্য হিসেবে নিজেদের প্রচার করতেন। পলসমর্থকরা ম্যানিকীয় উপাধি অস্বীকার করেন, কিন্তু তাদের মতবাদসমূহ মানীর শিক্ষাসমূহের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিল। মিলনার ব্যতীত সমুদয় খ্রীষ্টান লেখকগণ ম্যানিকীয়বাদ থেকে তাদের উৎপত্তি বলে মনে করেন। পল-সমর্থকগণ ইউরোপের সংস্কারমূলক ধর্মের প্রকৃত জন্মদাতা। প্রতিমূর্তি ও ধ্বংসাবশেষের প্রতি তাদের ঘৃণা সম্ভবত ইসলামী প্রভাবের প্রতিফলন। কুমারী মেরীর অসংযত উপাসনা ও সাধু-আরাধনার প্রতি বিতৃষ্ণায় এবং উপাসনার যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু পরিত্যাগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তারা ম্যানীর মতো বিশ্বাস করতেন যে, যিশুখ্রীষ্ট বিশুদ্ধ আত্মা —পৃথিবীতে যা শুধু দেহের সাদৃশ্য ধারণ করেছিল এবং তাঁর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া একটা ভ্রান্তিমাত্র। তারা জড়ের নিত্যতা সমর্থন করতেন—এক সক্রিয় সত্তার দ্বিতীয় নীতির উৎস, যিনি দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং পাপ ও মৃত্যুর চূড়ান্ত পরিণতি অবধি পার্থিব রাজত্ব শাসন করবেন। খ্রীষ্টানদের সুসমাচার ব্যাখ্যায় তারা উপমা-রূপকের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং ম্যানীর ন্যায় শব্দার্থের নিগূঢ় অর্থের অন্তঃদৃষ্টি দাবী করেছিলেন। অন্য একটি ধর্মমতের বাহ্য ও সুবিধাজনক স্বীকৃতি, যে মতবাদ আধুনিক পারস্যে 'কেত্বমান' বা 'তাকিয়ে'[১] হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা প্রশংসাই বলে বিবেচনা করা হত।

গ্রীক গির্জা বাইজাণ্টাইন আদালত পলের অনুসারীদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়েছিল। প্রায় দু'শ বছর ধরে তারা উত্তর আর্মেনিয়া ও কাপ্পাডোসিয়ায় ধর্মান্ধ ও বাইজান্টিয়ামের অত্যাচারী শাসকদের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিল; উভয় পক্ষই সর্বাপেক্ষা বিভীষিকাপূর্ণ জুলুম চালিয়েছিল।[২] অবশেষে তারা উচ্চতর শক্তির নিকট পরাভূত হয়।

---

১. বলবানের বিরুদ্ধে সবলের স্বাভাবিক সংরক্ষণ।

২. দ্বিতীয় থিয়োডোরা, ম্যানুয়েলের মায়ের আদেশে তরবারীর আঘাতে, শূলে, বা

যদিও তাদের দুর্গ ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাদের শহরসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছিল, তথাপি একটি সম্প্রদায় হিসেবে তারা টিকে ছিল। তারা তাদের মতবাদসমূহ বুলগেরীয়দের কাছে সংক্রমিত করেছিল, আর বুলগেরীয়গণ সব সময়েই গোঁড়া ধর্মমতের অসন্তুষ্টি অর্জন করেছিল। পলের অনুসারীরা এশিয়াতে নির্মূল হওয়ার পর চতুর্দশ শতকে সাউথ প্রেভেন্স ও সেভয়তে আবির্ভূত হয়েছিল। ঐসব দেশে তাদের যে নির্মম পরিণতি হয়েছিল তা ইউরোপীয় ইতিহাসের পাঠকের নিকট জ্ঞাত। অগ্নিদগ্ধ করে ও তরবারীর সাহায্যে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল—এমন কি স্ত্রীলোক ও শিশু ধ্বংসের হাত থেকে নিস্তার পায়নি, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা নির্মম নিয়তি এড়াতে সমর্থ হয়েছিল তাদেরকে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু পলের অনুসারীরা মরেনি; ইংলণ্ডেও একই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে লোলার্ড নামে পলের শিষ্যগণ এশিয়া, সেভয় ও প্রেভেন্সে তাদের পূর্বসূরীদের মতো দুর্দশা ভোগ করেছিল, হাসের নেতৃত্বে তারা আবার বোহেমিয়ায় পুনরাবির্ভূত হয়েছিল; পরিশেষে তারা লুথার ও কেলভিনের নেতৃত্বে তাদের গোঁড়া নির্যাতনকারীদের উপর বিজয়ী হয়েছিল। এ পর্যন্ত আমরা এই বিশেষ সম্প্রদায়ের নিয়তির অনুসরণ করেছি; যে ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন এ সময়ে ইসলাম-জাহানে অগ্রসর হচ্ছিল তার উপর তাদের আদিম আবাসভূমিতে কম বিস্তার করেনি।

প্রচণ্ড উন্মাদনার যুগে যখন পলের অনুসারী চাইরোসার বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ ধ্বংস করছিলেন এবং এসিয়া মাইনরের শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছিলেন তখন ফার্সের আহ্‌ওয়াজে একজন লোক বাস করতেন যিনি প্রতিভার বিশালতায়, অবগতির বৈচিত্র্যে ও জ্ঞানের গভীরতায় ম্যানীর সমকক্ষ ছিলেন এবং যিনি ধর্মের ইতিহাসে প্রায় সমান ভূমিকা পালন করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন আল্ কাদ্দাহকে তাঁর শত্রুরা জন্মসূত্রে মাজী বলে অভিহিত করেছে, আর তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে আলীর বংশধর বলে ঘোষণা করেছেন।[১]

আগুনে পুড়িয়ে হাজার হাজার পল সমর্থকদের ধ্বংস করা হয়েছিল বলে কথিত আছে।

১. কথিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন এক সময়ে ইমাম জাফর আস্ সাদিকের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

যাই হোক না কেন, এটা সুস্পষ্ট যে মুহম্মদের বংশধরদের অনুগত সমর্থক ছিলেন। তাঁর শিক্ষা থেকে দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তা বিবেচনা করে ইবনে খালদুনের[১] মতো ঐতিহাসিকের পক্ষেও লোকটি ও তাঁর মতবাদসমূহকে প্রতিকূল পূর্বধারণা ব্যতিরেকে দেখতে পারেননি। তারা মনে করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন প্রতারণামূলক উপায়ে ইসলামের সাম্রাজ্য ধ্বংস করার ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যেভাবে তাঁর আদর্শ ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে করেছিলেন। যতদিন জনগণের বিবেক ও পার্থিব শক্তি রাষ্ট্রের স্বপক্ষে রয়েছে ততদিন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি ম্যানীর মতো গোপনে কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন (তারা বলেন)। তদনুসারে রহস্যের আচরণে তাঁর ধর্মীয় ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন; আর সব সদর্থক ধর্ম ও কর্তৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর শিষ্যদেরকে পিথাগোরীয়দের মতো সাতটি দলে বিভক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। শেষ স্তর যাবতীয় ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতার উপর জোর দিয়েছিল—ক্রিয়ার প্রতি ঔদাসীন্য যা তাঁর মতে ইহজগতে কিংবা পরজগতে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হবে না। তিনি শিষ্য তালিকাভুক্ত করার জন্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কয়েকটি বা সব কয়টি স্তরে বাইয়াত করার জন্য দূত নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। ইসমাইলের পুত্রের প্রতারণা তাঁদের জন্য রাজনৈতিক মুখোস হিসেবে কাজ করেছিল। তারা প্রকাশ্যে তাঁর জন্য কাজ করছিল, আর গোপনে ও প্রকৃতপক্ষে ছিল অধর্মের প্রচারক।[২]

এই সম্প্রদায়ের মূল বাণীসমূহের যে বিবরণ[৩] শাহরিস্তানী প্রদান করেছেন তা দার্শনিকসুলভ মনোভাবসম্পন্ন; কিন্তু এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত 'দাবিস্তানে' প্রদত্ত মহসীন ফ্যানীর বিবরণ ঈষৎ গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত। সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করলে এটা বুঝা যায় যে, তারা এই মতকে সম্ভাব্যতাব ঊর্ধ্বে তুলেছেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন জড়বাদী খোদাবিশ্বাসী ছিলেন এবং মানীর ন্যায় তিনি সারগ্রাহী নিসর্গবাদ সৃষ্টি করার উচ্চাশা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—এই নিসর্গবাদ দর্শন ও সদর্থক ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিল এবং তাঁর দীক্ষা-

---

১. আরবীতে ইবনু খালদুন এবং ফার্সীতে ইবন-ই-খালদুন উচ্চারিত হবে।

২. নোয়ায়বী, 'জার্ণাল এসিয়াটিক' ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

৩. শাহরিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

দান সুফীদের মরমী স্তরসমূহের সদৃশ ছিল। মিরখণ্ড যা বলেছেন তা থেকে একথা স্পষ্ট যে মিশরীয় ফাতেমীয়গণ আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন থেকে তাদের অধিকাংশ মরমী মতবাদগুলি গ্রহণ করেছিলেন।[১]

আব্দুল্লাহ আহওয়াজ থেকে বসরায় যান, আর বসরা থেকে সিরিয়ায় এবং সালেমিতে বসতি স্থাপন করেন। ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি পলের অনুসারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের অনেক মতবাদ গ্রহণ করেন। বাইজানটাইনদের সঙ্গে পলের অনুসারীদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম এবং ধর্মান্তরিতকরণে তাদের সাফল্য তাঁকে তাঁর ধর্ম-পরিকল্পনায় নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে, তিনি আংশিকভাবে ম্যানী কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ ও মুসলিম মিষ্টিকদের মতবাদের উপর তাঁর মতবাদ রূপায়িত করেন। ম্যানিকীয় মতবাদ মূলতঃ পিথাগোরীয় দর্শন, জারভানবাদ ও খ্রীষ্টধর্মের সারবস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বখোদাবাদী মতবাদ। আব্দুল্লাহর অনুসারীগণ বাতেনী বা নিগূঢ়বাদী উপাধি লাভ করেছেন, কেননা তারা সদর্থক ধর্মের আদেশসমূহের ভেতর অন্তঃদৃষ্টি লাভ করেছেন বলে দাবী করেন—ম্যানিকীয়গণ ও পলের অনুসারীবৃন্দ যে দাবী করেছেন তার অনুরূপ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন জড়ের নিত্যতা স্বীকার করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে "আল্লাহ তাঁর প্রকাশ থেকে স্বতন্ত্র নন; তাঁর সম্পর্কে এটা নিরপেক্ষ বিশেষিত হতে পারে না যে, তিনি অস্তিত্বশীল বা অস্তিত্বহীন, সর্বশক্তিমান বা সর্বশক্তিশূন্য, কেননা তাঁর সম্পর্কে কোন গুণ আরোপ করা মানেই তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে সাদৃশ্য ধারণা করা; 'আমরই-ই ওয়াহিদ' (আদি সরল আদেশ) বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া কর্তৃক উদ্ভূত আদি কারণ যা অনন্তের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং যাকে 'আকল' বা প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়। এই নীতি 'নফস' বা আত্মা নামক একটি অধীনস্থ নীতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল মূলনীতির সঙ্গে যার সম্পর্ক সন্তান সম্পর্ক; এই নীতির আবশ্যকীয় গুণ হল 'জীবন'

---

১. একটি আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মিশরীয় ফাতেমীয়গণ ইসমাইলিয়াদের থেকে পৃথক ছিলেন। ইসমাইলিয়ারা মনে করতেন যে তাদের শেষ ইমাম, ইসমাইল অন্তর্হিত হয়েছেন এবং যখন "স্বর্গরাজ্য" প্রকাশিত হবে সেই সময়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন। আর মিশরীয় ফাতেমীয়গণ মনে করতেন যে ওবায়দুল্লাহ আল্‌ মাহদী ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন।

যেমন প্রজ্ঞার গুণ হল 'জ্ঞান'। এই দ্বিতীয় নীতিটি পূর্বাবস্থিত জড়কে রূপ দিয়েছিল যার বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয়তা, আর পরে দেশ, কাল, উপাদানসমূহ, গ্রহ, নক্ষত্র ও বিশ্বের অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করেছিল। আদি সৃষ্ট নীতির স্তরে উন্নীত হওয়ার নিরন্তর ইচ্ছার ফলে দ্বিতীয় নীতি জড়ের মধ্যে নিজেকে মনুষ্যজীবের আকারে প্রকাশিত করল; মানুষের সব আত্মার লক্ষ্য সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সৃষ্টিশীল নীতি বা জ্ঞানবত্তায় উন্নীত হওয়া; জড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য প্রেরিত পুরুষগণ সেই নীতির অভিব্যক্তি বা প্রমূর্ত প্রকাশ; প্রেরিত পুরুষগণকে তাই 'নাতিক' (প্রচারক) বলা হয়; তাঁরা গ্রহের মতো সপ্তসংখ্যক; আর জগতের অগ্রগতি চক্রবৎ এবং পরিশেষে পুনরুত্থান (কিয়ামতে কোবরা) সংঘটিত হবে। তখন সদর্থক ধর্ম ও আইনের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হবে, কেননা আকাশের গতি এবং ধর্মের নীতি-অবলম্বন মানবআত্মার পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য; আত্মার পরিপূর্ণতা হল প্রজ্ঞার বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হওয়া ও তার সঙ্গে সংযুক্তি বা সমন্বয়। এটা হল মহা পুনরুত্থান (কিয়ামতে কোবরা) যখন সমুদয় বস্তু, আকাশ, উপাদান ও জীব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে; পৃথিবী পরিবর্তিত হবে, আকাশসমূহ লিখিত গ্রন্থের ন্যায় বন্ধ থাকবে; অমঙ্গল থেকে মঙ্গল বিচ্ছিন্ন হবে, অবাধ্য জন থেকে অনুগত জন আলাদা হয়ে পড়বে; মঙ্গল বিশ্বআত্মার মধ্যে মিশে যাবে, অমঙ্গল অমঙ্গলের নীতির সঙ্গে সংযুক্ত হবে। (আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুনের মতে) গতির আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর, আর গতি বা ক্রিয়ার সমাপ্তি থেকে অনন্তের সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণতার স্তর;[১] আর ধর্ম ও আইনের যাবতীয় নীতির পরিসীমা আছে"…"প্রত্যেক অক্ষর ও শব্দের দু'টি করে অর্থ রয়েছে, কেননা প্রত্যেক প্রত্যাদেশের ব্যাখ্যা রয়েছে, প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুর অদৃশ্য জগতে প্রতিলিপি রয়েছে আর জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না, যায় পরামর্শের মাধ্যমে।" আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুনের শিষ্যগণ তাঁর মতবাদসমূহের আরও বিকাশ সাধন করেছিলেন—তারা ঘোষণা করেছিলেন যে পুনরুত্থান মানে ইমামের আবির্ভাব ও স্বর্গ-রাজ্যের প্রকাশ যখন সদর্থক ধর্মের ও ঐতিহ্যের অপসারণ ঘটবে; ধর্মে প্রতারণা অনুমোদনীয়; কোরআনের বাক্যসমূহের নিগূঢ় অর্থ রয়েছে, ধর্ম বাহ্য অনুষ্ঠানের ভেতর নিহিত নয়, নিহিত রয়েছে অন্তরের উপলব্ধিও

১. শাহ্‌রিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮, ১৪৯।

অনুভূতিতে ; যে বস্তু বা ক্রিয়া ক্ষতিকর নয় তা আইনসঙ্গত ; উপবাস বা রোজা মানে ইমামের গোপন-রহস্য সংরক্ষণ ছাড়া অন্য কিছু নয় ; ব্যভিচারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে শিষ্য ধর্মের রহস্য প্রকাশ করবে না ; যাকাত অর্থ নিষ্পাপ ইমামকে দশমাংশ প্রদান করা—এসব বহু ধর্মমত ও দর্শনের অদ্ভুত ও কাল্পনিক সংমিশ্রণ এবং প্রবণতার দিক দিয়ে আইন ও নৈতিকতার ধ্বংসকারক।

খ্রীষ্টান নষ্টিকবাদের আবাসভূমি সিরিয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন বসতি স্থাপন করেছিলেন ; সেখানে তিনি তাঁর মতবাদের আরও বিকাশ সাধন করেছিলেন। এখানে তিনি ইসলামের ইতিহাসের কুখ্যাত ব্যক্তি হামাদানকে, কারমাস বলেও অভিহিত, ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুনের অনুসারীরা দীক্ষাদানের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা পুরাতন ম্যানিকীয় পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে নব-দীক্ষিতকে প্রতারণামূলক প্রশ্ন ও দ্ব্যর্থবোধক উত্তর সহ সংশয়ের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, মোহসিন ফ্যানীর সংবাদদাতা বলেন "অনিষ্টকর বস্তুর মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করা হয় না, এটা শুধু সত্যের অন্বেষণকারীকে পূর্ণতার লক্ষ্যে চালিত করার জন্য।"[১] দীক্ষার প্রক্রিয়ার ইতরবিশেষ ঘটত শুধু যে ব্যক্তিকে তারা ধর্মান্তরিত করতে চাইত তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। আহ্বায়ক (দায়ী)[২] প্রথমে ইচ্ছুক দীক্ষাগ্রহণকারীর ধর্মের মৌন স্বীকৃতির পর তার মধ্যে সন্দেহ ও জটিলতা প্রবেশ করিয়ে ধীরে ধীরে তার মনের অব্যবস্থা সৃষ্টি করেন এবং পরিশেষে 'বাতেনী' ব্যবস্থা একমাত্র সমাধান হিসেবে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আহ্বায়ককে একজন শিয়াকে দীক্ষা দিতে হয় তাকে মুহম্মদের বংশধরদের অনুগত সমর্থক হিসেবে নিজেকে প্রতিবেদন করতে হবে। যে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় আচরণ তাদের ওপর করা হয়েছে—হুসাইনের শাহাদৎ ও কারবালার হত্যাকাণ্ড সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দেবেন। এভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পর তিনি নতুন গ্রহণক্ষম মনে বাতেনীদের গুহ্য মতবাদসমূহ ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট করান। যদি একজন ইহুদীকে দীক্ষা দিতে হয় তবে তিনি খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের উপর নিন্দাবাদ বর্ষণ করবেন, পরে তার দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর সঙ্গে মসীহের আগমন সম্পর্কে একমত হয়ে ধীরে

---

১. দাবিস্তান' পৃ. ৩৫৬।
২. যিনি আহ্বান করেন।

ধীরে তার মনে এই বিশ্বাস জন্মাবেন যে তার অঙ্গীকৃত মসীহ। 'ইসমাইলিয়া' ইমাম ছাড়া অন্য কেউ নয়। যদি সেই দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি একজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হন তবে তিনি ইহুদীদের একগুঁয়েমি ও মুসলমানদের অজ্ঞতা সম্পর্কে বাড়িয়ে বলবেন এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রধান বিষয়বস্তুর সঙ্গে একমত হবেন এবং সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করবেন যে এসব প্রতীকধর্মী এবং এসব এমন অর্থের দ্যোতনা করে যা একমাত্র বাতেনী ব্যবস্থাই সমাধান করতে পারে। শিক্ষানবিশের মন এ পর্যন্ত রূপান্তরিত হওয়ার পর তিনি অভিভাবনা দেবেন যে খ্রীষ্টানগণ ত্রাণকর্তার ধারণার অপব্যাখ্যা করছে এবং ইসমাইলিয়া ইমাম প্রকৃত ত্রাণকর্তা।[১] আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন সুস্পষ্ট ভাষায় 'তাকিয়ী' মতবাদ প্রণয়ন করেছিলেন—কোন বিদেশী ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশীলনের সঙ্গে বাহ্য সামঞ্জস্যবিধান। সমুদয় ম্যানেকীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা প্রচলিত ছিল, পলের অনুসারীগণ এর ব্যতিক্রম ছিল না। আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন আংশিকভাবে নির্যাতন এড়াতে এবং আংশিকভাবে দীক্ষার কাজ সহজ করার জন্য এর পুনরায় চালু করে-ছিলেন। 'তাকিয়ী' বলীর বিরুদ্ধে শক্তিহীন ও দুর্দশাভোগকারী স্বাভাবিক সংরক্ষণ। সব মানুষের শাহাদৎ বরণের শক্তি নেই এবং অধিকাংশ মানুষ যেখানে বাধা প্রদান করতে পারে না সেখানে নতি স্বীকার করে। আদি খ্রীষ্টানেরা 'তাকিয়ী' অনুশীলন করত। আব্বাসীয় খলিফাদের সাম্রাজ্যের সব দেশেই 'ইসমাইলিয়াগণ' বিশেষ কারণে তাদের ধর্মীয় মতামত গোপন রাখত, আর এই দীর্ঘ অনুশীলিত অভ্যাস তাদের দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের থেকে প্রকৃত শিয়ারা 'তাকিয়ী'র অনুশীলন ধার করেছিলেন। পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে একজন শিয়ার পক্ষে হজ সমাপন করতে হলে সুন্নী মযহাব অনুযায়ী কৃত্য সম্পাদন করতে হত। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মনিষ্ঠ শিয়ার পক্ষে পবিত্র ভজনালয় কাবা-সন্দর্শনের জন্য 'তাকিয়ী' অপরিহার্য ছিল। কিন্তু 'তাকিয়ী' যা "নির্যাতন ও ভয়ের স্বাভাবিক সন্ততি" তা পারসিকদের এমনি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা প্রয়োজন নেই এ ধরনের পরিস্থিতিতেও 'তাকিয়ী' অনুশীলন করত। যেমন আধুনিক প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টানরা ক্যাথলিক দেশসমূহেও রোমকদের প্রথার প্রতি কিছুটা সম্মান দেখান তেমন তারা কারও মনে অসন্তোষ না আসে বা কারও অনুভূতি আহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এর অনুশীলন করতেন।

---

১. ম্যানী বাস্তবিকপক্ষে ত্রাণকর্তা বলে দাবী করতেন।

হামাদান, কারমাস বলেও অভিহিত, তার গুরুর দল পরিত্যাগ করে নিজে একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। দীক্ষা দানের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন বলপ্রয়োগ অনুমোদন করেননি, কিন্তু কারমাস বল-প্রয়োগকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর বলে অভিহিত করেন। সম্ভবত চাইরোসারের মতো ধর্মান্ধদের নির্যাতনের ফলে তিনি এই পরিকল্পনায় চালিত হন। আল্-আহসা ও আল্-বাহরাইনে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খলিফার সেনাবাহিনীর দুর্বলতার জন্য তিনি বিজয়ী হন। এক বিশাল সমর্থকদল সংগ্রহ করে তিনি আল্-বাহরাইন থেকে বাহির হন, এবং পলের অনুসারী চাইরোসারের মতো ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তার অগ্রগতি চিহ্নিত করেন। কারমাসের সমর্থকগণ আল্-বাহরাইন ও আল্-আশার দুর্গ থেকে বাগদাদের খলিফার সঙ্গে প্রায় এক শ' বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চালিয়েছিলেন। তারা এমন কি মক্কা লুণ্ঠন করেন, এবং ইবরাহিমের প্রাচীন নিদর্শন 'হয্রে আসওয়াদ' সরিয়ে নিয়ে যান। এই অপবিত্রকরণে তারা তাদের পূর্বসূরী পলের অনুসারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, যারা এফিসাস লুণ্ঠন করেন, সেণ্ট জনের সমাধি-সৌধ ধ্বংস করেন ও তাঁর প্রধান গির্জাকে ঘোড়া ও খচ্চরের আস্তাবলে পরিণত করেন। পরিশেষে মুতাজিদ বিল্লাহ তাদের ধ্বংস সাধন করেন।

কারমাসের অনুসারীদের ধ্বংসের পর 'ইসমাইলিয়া মতবাদ' নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়; এর সমর্থকদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় এবং কীট-পতঙ্গের মতো তাদেরকে শিকার করা হয়। ওবায়দুল্লাহ আল্-মাহদী কর্তৃক আফ্রিকা থেকে আব্বাসীয়দের বিতাড়িত করার পূর্ব পর্যন্ত "ইসমাইলিয়া মতবাদ সবদিক দিয়ে আত্মগোপন করে।

মিশরের ফাতেমীয়গণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের প্রজাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন কর্তৃক প্রবর্তিত প্রচারণার রাজনৈতিক সুবিধা-গুলি উপেক্ষা করেননি। তারা তাদের নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আংশিক-ভাবে তাদের গুহ্য ও ম্যানেকীয়দের মতবাদসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। তারা কলেজ, সাধারণ পাঠাগার ও বিজ্ঞান শিক্ষাগার (দারুল্ হিকমত) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বইপুস্তক, গাণিতিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যাপ্তরূপে সুসজ্জিত করেছিলেন। অসংখ্য অধ্যাপক ও কর্মচারী তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই গ্রন্থাগারে প্রবেশের ও এর সম্পদ ব্যবহারের অধিকার ছিল

সকলের কাছে উন্মুক্ত ; আর বিনামূল্যে লেখার সরঞ্জামাদি দেওয়া হত।[১] খলিফা প্রায়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কসভা ডাকতেন, এতে বিভিন্ন একাডেমীর প্রফেসরবৃন্দ যুক্তিবিদ, গাণিতিক, আইনবিদ ও চিকিৎসাবিদ—বিভিন্ন অনুষদে বিভক্ত হয়ে, তাদের উপাধি-পরিধেয় 'খালা' পরিহিত হয়ে যোগদান করতেন। ইংরেজদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 'গাউন' আরবীয় 'খালা' বা 'কাফতানে'র মূল রূপকে এখনও রেখেছে।

সতর্কতার সহিত সুনিয়ন্ত্রিত কর আদায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত দু' শ সাতান্ন হাজার ডুকেট ছিল ইন্সিটিউটগুলির বার্ষিক রাজস্ব—অধ্যাপক, কর্মচারী, শিক্ষার ব্যবস্থা ও সাধারণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হত। এখানে অধ্যাপকগণ মনুষ্য-জ্ঞানের সকল শাখায় শিক্ষা-দান করতেন। কেন্দ্রীয় 'দারুল হিকমতে'র সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বৃহৎ "লজ" (ভবন)। এখানে 'ইসমাইলীয়' গূঢ় তত্ত্বে শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদেরকে ধর্মের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সপ্তাহে দু' দিন, প্রত্যেক সোমবার ও বুধবারে 'দা'য়ী-হেঁদ্ দুয়াত্'—লজের মহান অধ্যক্ষ সভা আহ্বান করতেন ; এই সভায় পুরুষ ও মহিলা, উভয়েই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে স্বতন্ত্র আসনে সমাসীন হতেন। এসব সম্মেলনের নাম ছিল 'মজলিস উল হিকমত' বা জ্ঞানের সম্মেলন। দীক্ষা দানের পূর্বে 'দা'য়ী-উজ্ দুয়াত' প্রধানতম গুরু, খলিফার সমীপে যেতেন, তাঁকে দীক্ষা গ্রহণেচ্ছুদেরকে যে শিক্ষা দেবেন তা পড়ে শোনাতেন এবং পাণ্ডুলিপির কভার-পৃষ্ঠায় তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করতেন।[২] বক্তৃতা শেষ হলে ছাত্ররা প্রধান ধর্মগুরুর হস্ত চুম্বন করত এবং ললাটের সাহায্যে সসম্মানে প্রধানতম গুরুর স্বাক্ষর স্পর্শ করত। এই লজে বিভিন্ন স্তরের গৃহীত দীক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন মাকরিজি তা পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের ভিত্তিতে স্থাপিত সভার এক মহামূল্য বিবরণ হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, কায়রোর লজ খ্রীষ্টান জাহানের নির্মিত সব লজের 'নমুনা হয়ে রয়েছে' আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন দীক্ষাদানের সাতটি স্তরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাত সংখ্যাটি পবিত্র : সাতটি গ্রহ, সপ্তাহের সাত দিন এবং সাতজন ইমাম। কায়রোতে মিশরীয় পুরোহিততন্ত্র পুরাতন মরমীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে ম্যানেকীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত হয়েছিল। তখন সংখ্যা নয়-য়ে

১. *মাকরিজী, ক্রেষ্টমাথি অ্যারাব (ছ সছি), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।*

২. মাক্কারি।

উন্নীত হয়েছিল।[১] প্রথম স্তর সবচেয়ে কঠিন ছিল, এই স্তরে নবদীক্ষিতদের মনকে রূপান্তরিত করতে ও তাকে সবচেয়ে পবিত্র অঙ্গীকার গ্রহণে অভিলাষিত করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত। যার মাধ্যমে সে অন্ধ-বিশ্বাস ও শর্তহীন আনুগত্য সহকারে নিজেকে গুপ্ত মতবাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলত। তারপর প্রাক্রিয়াটি যথেষ্ট সরল : নবদীক্ষিত ধীরে ধীরে সব তন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে ও এক অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার যন্ত্রে পরিণত হতে পরিচালিত হত।

---

১. দীক্ষার বিভিন্ন স্তরের অত্যন্ত ভাল বর্ণনা দিয়েছেন দ্য সসী, 'জার্নাল এসিয়াটিক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৮। প্রথম স্তরের দীক্ষা গ্রহণে নবদীক্ষিতকে প্ররোচিত করার জন্য 'দায়ী' বা আহ্বায়ক তার মনে সংশয় সৃষ্টি করেন। সদর্থক ধর্ম ও বুদ্ধির বিরোধ দেখান হয়, কিন্তু এটা বলা হয় যে দৃশ্যমান আক্ষরিক অর্থের পশ্চাতে গভীরতর অর্থ রয়েছে—এই অর্থ হচ্ছে শাঁস আর শব্দ হল তার উপরের আবরণ। অবাধ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষানবীশের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না। এই স্তর অতিক্রম করার পর তাকে দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এই স্তরে ঐশী নিযুক্ত ইমামদের স্বীকার করে নেওয়া হয়, যিনি সব জ্ঞানের উৎস। এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় স্তরে ইমামদের সংখ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়, যে সংখ্যা পবিত্র সপ্তসংখ্যা অতিক্রম করতে পারে না। কেননা আল্লাহ সাতটি আসমান, সাতটি জগৎ, সাতটি সমুদ্র, সাতটি গ্রহ, সাতটি রং, সংগীতের সাতটি স্বর, সাতটি ধাতু সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্য থেকে তিনি সাতজন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করেছেন : তাঁরা হলেন আলী, হাসান, হোসাইন, আলী ২য়, (জয়নুল আবেদীন), মুহম্মদ আল্ বাকির, জাফর আস্ সাদিক এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল সপ্তম ও শেষ ইমাম। চতুর্থ স্তরে তারা শিক্ষা দেন যে জগতের সূচনা থেকে সাতজন 'নাতিক' বা ভাষণদানকারী প্রত্যাদিষ্ট প্রচারক ছিলেন, তাঁরা লোগসে'র প্রমূর্ত রূপ, তাঁরা প্রত্যেকে আল্লাহর হুকুমে তাঁদের পূর্ববর্তী শিক্ষার পরিবর্তন সাধন করেছেন ; এঁদের প্রত্যেকের আবার সাতজন করে সহকারী ছিলেন—এই সাতজনের প্রত্যেকে একজন 'নাতিক' থেকে অন্য একজন 'নাতিকে'র আগমন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে যারা প্রকাশিত হননি তারাই 'সামিত' বা 'নীরব'। সাতজন 'নাতিক' হলেন আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা, মুহম্মদ ও ইসমাইল (জাফর আস্ সাদিকের পুত্র) 'ইমাম-ই-যমান' (সর্বকালের ইমাম)। তাঁদের সাতজন সহকর্মী হলেন সেথ, শেম, ইবরাহিমের পুত্র ইসমাইল, হারুন, সামীউন আলী এবং ইসমাইলের পুত্র মুহম্মদ। একজন

মাহদিয়ের ও পরবর্তীকালে কায়রোর সুবৃহৎ ভবনগুলি (গ্রাণ্ড লজেস) বিপুল ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রচারণার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। যে মতবাদসমূহের জ্ঞানের উপর তারা কাজ করত তা অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমিত ছিল। ইলিউসিসের রহস্যসমূহ, টেমপ্লারস, হাল্লুমিনেটি ও ফ্রান্সের বিপ্লবীদের গোপন নীতিসমূহের মতো তাদের মতবাদগুলি শুধু কুশলীদেরকেই সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হত : সামগ্রিকভাবে শুধু তাদেরকেই শিক্ষা দেওয়া হত যাদেরকে শত্রুর শক্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। জনসাধারণ ও অদীক্ষিত-দের জন্য রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল ইসলাম। আর ইসলামের নৈতিক নীতিসমূহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কঠোরতার সঙ্গে প্রতিপালিত হত। অধিকাংশ খলিফা, বিশেষভাবে আল্-মুয়িজ তাদের জীবননির্বাহে ও অনুশীলনে কঠোর ধার্মিক ও নৈতিক আইন প্রবর্তিত কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন।[১] আইন-বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রের অফিসারগণ ছিলেন নৈষ্ঠিক মুসল-

---

'নাতিকে'র সঙ্গে একজন 'সামিত' সংযুক্ত থাকার কারণ এই ছিল যে ধর্মগুরুদেরকে একজন স্বাধীন কর্মী দেওয়া, যার ফলে তারা যুগের একজন 'সামিত' প্রচারককে পছন্দমতো নির্বাচিত করতে পারেন। পঞ্চম স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, সাতজন 'সামিতে'র প্রত্যেকের সত্যধর্ম প্রচারের জন্য বারজন করে নকীব বা প্রতিনিধি থাকতেন ; কেননা সাতের পর 'বার' সংখ্যাটি সর্বোত্তম ; একারণে বারটি রাশি, বার মাস, ইসরাইলদের বারটি গোত্র ইত্যাদি রয়েছে। ষষ্ঠ স্তরে নবদীক্ষিতদের মধ্যে ম্যানিকীয় দর্শনের নীতিসমূহ ধীরে ধীরে প্রবেশ করান হয়। আর যখন সে এসব মতবাদের জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে প্রভাবিত হয় তখন সপ্তম স্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করে। এই স্তরে সে দর্শন থেকে মরমীবাদে উন্নীত হয়। তখন সে একজন 'আরিফে' পরিণত হয়। অষ্টম স্তরে সদর্থক ধর্মের প্রতিবন্ধকতা ঝেড়ে ফেলে ; তখন "আবরণ" উন্মোচিত হয়, এরপর থেকে "বিশুদ্ধের সঙ্গে বিশুদ্ধের মিলন" এই মতবাদগুলির প্রবণতা বর্ণনার চেয়ে উত্তমরূপে কল্পনার বিষয়।

১. মোহসীন ফানী বলেন, ষষ্ঠ ফাতেমীয় খলিফা, হাকিম-বি-আমর-ইল্লাহ যাকে ড্রুজরা (ইসমাইলিয়াদের একটি শাখা) এমনকি বর্তমান সময়েও ঐশী অবতার বলে বিবেচনা করে। তিনি "অপরাধের দানব" বলে চিত্রিত হয়েছেন। তার চরিত্রের অদ্ভুত বিরোধের সমন্বয় ঘটেছিল। মাকরিজী যথার্থই চিন্তা করেছেন যে তার মন সম্ভবত বিড়ম্বিত ছিল। কোন কোন সময়ে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন, আবার কোন কোন সময়ে তিনি জ্ঞানী ও দয়ালু নৃপতির মতো আচরণ করতেন। তার রাজত্বে তিনি জাতি ও ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য

মান। তথাপি এক গোপন সংস্থা একটি রহস্যাবৃত সূত্রে কাজ করায় সমাজের বন্ধন শ্লথ হয়ে পড়েছিল। গুপ্ত দূত সংগঠন স্থায়ীভাবে ফাতেমীয়-দের কর্তৃত্বকে শক্তিশালী না করে কিংবা তাদের পার্থিব ক্ষমতা সম্প্রসারিত না করে আব্বাসীয়দের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করেছিল।

হাসান বিন সাব্বাহ হিসায়্যারী, সাধারণভাবে হাসান বিন সাব্বাহ বলে পরিচিত এবং পাশ্চাত্যের ইতিহাসে "আততায়ী"[১] গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কুখ্যাত যদিও অনুসারীদের নিকট সাইয়েদেল বলে পরিচিত, তার শিষ্যদের থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে মিশরের ফাতেমীয়দেরকে প্রতীচ্যের ইসমাইলিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার শিষ্যদেরকে কখনও কখনও "প্রাচ্যের ইসমাইলিয়া" বা 'আলামুতিয়াস' বা 'মালাহিদা অব কুহিস্তান' (কুহিস্তানের অপবিত্র নিরীশ্বরবাদীগণ) বলা হয়ে থাকে।

হাসান ছিলেন একজন সুশিক্ষিত শিয়া পণ্ডিতের পুত্র যিনি বংশ-গতভাবে আরব ছিলেন—তাঁর নাম থেকে মনে হয়। তিনি পারস্যের ইখ শহরে বাস করতেন। তাঁকে সযত্নে সেকালের সব ধরনের শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কথিত আছে যে, তিনি একসময়ে নিজাম-উল্ মূলক

উঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি পথযাত্রীদের সংরক্ষণের জন্য কায়রোয় পথঘাট আলোকিত করার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি পুলিস মোতায়েন করে-ছিলেন; তিনি বলাৎকার বন্ধ করেছেন। হাকিম-বি-আমর-ইল্লাহর বিবরণের জন্য 'শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন' পৃ. ৬০২ দেখুন। উল্লেখযোগ্য সমঃপতন হিসেবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ভয়ংকর আইভান যাকে অনুরূপ দানব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার যুগের সাধারণ রুশগণ তাকে চরিত্র ও ক্ষমতার এক শক্তি হিসেবে মনে করত। ঘটনা এই গ্যালিয়াজো মেরিয়া স্টোরজা, সিসিলির নরম্যান প্রধান যিনি বন্দীর নাড়িভুঁড়ি বের করতেন, পোপস পল ও আলেকজাণ্ডার ৬ষ্ঠ ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড ও জন এবং অন্যান্য-দের নির্যাতন এই সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বিবেকবর্জিত শক্তির ক্ষেত্রে দেশ ও ধর্ম ভেদে তাদের দুষ্কর্মের মধ্যে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

১. *'সিলভেসটা'র দ্য সসী নামটি 'হাসকিশ' (ভারতীয় ভাঙ্গ') থেকে* উদ্ভূত বলে মনে করেন। কারণ হাসান সাব্বাহর অনুসারী ভাঙ্গ খেতেন। এই ব্যুৎপত্তি সাধারণভাবে গৃহীত। অধ্যাপক ব্রাউনের "লিটারারী হিস্ট্রী অব পারসিয়া ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪—৫ দ্রষ্টব্য। মোহসীন ফানীর মতে তাঁর জীবন ও মতবাদ সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির কলমে লেখা।

(পরবর্তীকালে যিনি প্রাচ্যের দু'জন বিখ্যাত সেলজুক সুলতান আল্‌প আরস্লান ও মালিক শাহের নামজাদা মন্ত্রী হয়েছিলেন) এবং বিখ্যাত মরমী কবি ওমর খৈয়ামের সতীর্থ ছিলেন। কিন্তু এই গল্প এখন আর সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না।[১] মালিক শাহের দরবারে নিরাশ হয়ে তিনি কায়রোর খলিফার দরবারে হাজির হন এবং কায়রোর লজে দীক্ষাগ্রহণ করেন। পারস্য তখন সুন্নী মযহাবের গোঁড়ামির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল; সেলজুক সুলতানগণ সর্বদা আশারিয়া মতবাদের সংকীর্ণ ঐতিহ্যের নিষ্ঠাবান সমর্থক ছিলেন। হাসান মিশর থেকে এশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আংশিকভাবে বলপ্রয়োগে ও আংশিকভাবে প্রতারণার সাহায্যে প্রাচীন পারস্যের প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গ 'আশামুত' বা ঈগলের বাসা[২] এবং উচ্চতর পারস্যের[৩] সবচেয়ে একটি অভেদ্য দুর্গের অধিকারী হয়েছিলেন, আর যে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি সেখানকার কর্তৃত্ব চালিয়েছিলেন এবং সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায়[৪] এবং প্রাচ্য ইউরোপে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, ছোরা দিয়ে তিনি তরবারীর মোকাবিলা করেছিলেন আর নির্যাতনের বদলা নিয়েছিলেন হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। তিনি নিজে একজন ধর্মের কঠোর অনুশীলনকারী ছিলেন এবং তাঁর শাসনসীমার মধ্যে তিনি মদ বা নৃত্য বা সংগীত—কোনটাই আমল দিতেন না। তাঁর গুহ্য মতবাদ প্রতীচ্যের ইস্‌মাইলিয়াদের গুহ্য মতবাদ থেকে পৃথক বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে শাহারিস্তানী ও মোহসিন ফানী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। উভয়েই কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তার কথা বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনা আমাদের অনুপ্রাণিত করে যে তারা 'ফিদায়ী'দের ছোরা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আশঙ্কিত ছিলেন না।[৫] তার মতবাদের মরমী দিক বাদ দিয়ে এ কথা বলা যেতে

১. প্রফেসর ই. জি. ব্রাউন, 'লিটারারী হিস্ট্রী অব পারসিয়া' ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-১৯৩।

২. ওয়াসাফ, কুল্লিয়াতোল্ মাওতে ইয়ানি আস্ আশিয়াতা আকাবাস্ত।

৩. কাথউইনের নিকটবর্তী।

৪. ওয়াসফ বলেন ;

৫. তাদের আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী সম্পর্কিত নিম্ন ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হবে। এই সুশিক্ষিত ইমাম তাঁর নিজ শহর 'রাজে' আইন-বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা করতেন। একদা তিনি তাঁর আচার্যের পদমর্যাদা বলে ইসমাইলিয়াদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 'ঈগল নেষ্টে' এ খবর পৌছল এবং অসতর্ক অধ্যাপককে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে

পারে যে, তিনি দীক্ষার চারটি স্তর স্বীকার করেছিলেন। যারা প্রথম তিনটি স্তর গ্রহণ করেছিল তাদের যথাক্রমে 'ফিদাই', 'রফিক' ও 'দায়ী'—সভ্য, সঙ্গী ও আহ্বায়ক—এটা হাসানের ব্যবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ টেম্পলারদের প্রতিষ্ঠানগত পরিভাষায়। হাসান এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রধানতম ধর্মগুরু, যদিও তিনি সর্বদা মিশরের ফাতেমীয় খলিফাদের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। আলামুতিয়া লজের চতুর্থ প্রধানতম ধর্মগুরু হাসান বিন মুহম্মদ তার লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেকে কায়রোর খলিফা মুনতাসিরবিল্লাহর পুত্র নিজারের দিক দিয়ে তাঁর বংশধর বলে দাবী করতেন। তিনি ধর্মের সকল অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পুনরুত্থান সমুপস্থিত; তার মধ্যে ইমামের অভিব্যক্তি ঘটেছে; স্বাধীনতা ও নৈতিক আইনের প্রতিবন্ধকতার মুক্তির[১] মধ্যে স্বর্গরাজ্য ঘোষিত হয়েছে। এই উন্মাদ বিপ্লবী আল্‌মুতিয়াদের ইতিহাসে "আলা যিকরিহী আল্ সালাম" (তার নামের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) নামে পরিচিত; এটা 'যিক্‌রুস্ সালাম' এই বিদ্রূপাত্মক বাক্যে অবনমিত হয়। এই সময় থেকে আলামুতের ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত দু'জন হাসানের শিষ্যবৃন্দ অসামরিক জনগণের সঙ্গে নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল—কোন পক্ষই কোনরূপ দয়া দেখাত না। বাস্তবিক পক্ষে তারা ছিল ইসলামের 'নিহিলিস্ট'। তাদের ছোরার তলে খ্রীষ্টান ও মুসলমান উভয়েই বলী হয়েছিল। হালাকু তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের পার্বত্য দুর্গসমূহ

একজন ফিদাইকে পাঠান হল। ফিদাই রাজে উপস্থিত হয়ে ইমাম পরিচালিত কলেজে ভর্তি হল। সে তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ গ্রহণের জন্য সাত মাস অপেক্ষা করল। অবশেষে সে একদিন ইমামের কক্ষে একাকী গেল এবং সে দ্বার রুদ্ধ করে ইমামকে ভূতলশায়ী করল এবং তাঁর গলায় ছোরা চালাতে উদ্যত হল। ভীত-সন্ত্রস্ত ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন আমাকে হত্যা করবে?" ফিদাই উত্তর দিল, "কারণ আপনি ইসমাইলিয়াদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।" তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি আর তাদেরকে কখনও তাচ্ছিল্য করবেন না। ফিদাই ইমামের অঙ্গীকার মেনে নিতে রাজী হল না যতক্ষণ ইমাম তাদের প্রধানতম গুরুর নিকট বৃত্তি গ্রহণ করতে সম্মত না হলেন। এভাবে নিমকের বদলায় তিনি নিজেকে আবদ্ধ করলেন।

১. ৫০৮ হিযরীতে হাসান বিন সাব্বাহ মৃত্যু বরণ করেন। হালাকুখাঁর মন্ত্রী ও 'জাহান কুশা' গ্রন্থের রচয়িতা যুয়ায়িনীর অনুসরণে ওয়াসাফ এসব ইসমাইলিয়াদের সম্পর্কে নিরতিশয় তিক্ত হলেও সঙ্গত বর্ণনা দিয়েছেন।

ধ্বংস করেন এবং পোকামাকড়ের ন্যায় খুঁজে খুঁজে তাদেরকে হত্যা করেন।[১]

ইসমাইলিয়াদের থেকে ক্রুসেডারগণ যে ধারণা লাভ করেছিল তা-ই ইউরোপে ধর্মীয় ও পার্থিব যাবতীয় গুপ্ত সংস্থা গঠনে পরিচালিত করেছিল। টেম্পলার ও হস্পিটালারদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইগ্নেটিয়াস লয়োলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যিশু-সমিতি—এগুলি এ ধরনের লোকদের দ্বারা গঠিত যাদের আত্মোৎসর্গের মনোভাব ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের সময়ে অনতিক্রান্ত; হিংস্র ডমিনিক্যান, মৃদুতর ফ্রান্সিসক্যান হয় কায়রো নয় আলামুতের প্রভাবজাত। নাইট্স টেম্পলারগণ প্রধানতম গুরু, প্রধানতম পুরোহিত, ধর্মীয় অনুরাগী, দীক্ষার স্তর-বিন্যাস ব্যবস্থাসহ প্রাচ্য ইসমাই-লিয়াদের সঙ্গে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রতীচ্য ইসমাইলিয়াদের ছোট ছোট দল ইয়েমেন, মিশর ও বারবেরিতে এখনও দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদেরকে সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক করতে পারা যায় না। ভারতের পশ্চিম-উপকূলীয় অঞ্চলে একটি বিরাট সম্প্রদায় বাস করে। তারা খোজা নামে অভিহিত। তারা মূল প্রাচ্য ইসমাইলিয়াদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। ইসমাইলিয়া 'দায়ী', পীর সদর উদ্‌দীন একাদশ বা দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ধর্ম থেকে তাদের ইসমাইলিয়া মতবাদে দীক্ষিত করেন। তাঁর শিক্ষা তাদের ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল, কেননা ইসমাইলিয়া মতবাদ-সমূহে প্রাচীন ধর্মমতের অংশ বিশেষ সংযোজিত হয়েছিল।[২]

'কায়সানিয়া' ও 'হাশিমিয়া' উভয় সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণরূপে রাজ-নৈতিক; এই দলগুলি মাজিবাদের রঙে রঞ্জিত। এসব দল এখন বিলুপ্ত এবং উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

---

১. আলমুতিয়াসদের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণের জন্য ভন হ্যামারের "হিস্ট্রি অব দি অ্যাসাসিন" দেখুন। এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন উড্। এমন কি খ্রীষ্টান নৃপতিগণ তাদের শত্রুদের হস্ত থেকে নিস্তার লাভের জন্য আলমতিয়া আততায়ীদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ইংলণ্ডের রিচার্ডের অধীনস্থ মণ্টফারাতের কনরাড্ একজন ফিদায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। একজন পোপ ফ্রেডারিক বারবারোসাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য একজন 'ফিদাই'কে নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি। অ্যাসাসিনদের আলমুত, রাদবার অন্যান্য দুর্গ ধ্বংস করার পর তাতারগণ নির্দয়ভাবে আলমুতিয়াদেরকে হত্যা করেন।

২. ইসমাইলিয়াদের সংখ্যা গিলগাটে ও হানজার পর্বতসমূহেও পাওয়া যায়।

'গালিয়া' বা 'গুলাত' (অতিরঞ্জনকারী দল)-কে ইবনে খালতুন ও শাহ্রিস্তানী শিয়াদের একটি সম্প্রদায় বলে মনে করেন। বাস্তবিক এই সম্প্রদায় নষ্টিকদের বংশধর। তাদের ইসলাম হল খ্রীষ্টের স্থানে মুহম্মদ বা আলীকে, প্রধানত আলীকে বদল / বিনিময় করা। তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের 'ডোসেটি' / 'নুসাইরিসা' আলীর ঐশীত্বে বিশ্বাসী, 'ইশ্কিয়া' 'নুমানিয়া' 'খিতাবিয়া' ও অন্যান্যরা—অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী —এরা মার্সিওনাইট, ভ্যালেনটিয়ান ও অন্যান্য ডসেটিক খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণাসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। এদের কোন কোন সম্প্রদায় খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদের স্থানে পঞ্চত্ববাদের সমর্থক। তারা বিশ্বাস করে যে মুহম্মদ, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন যুগ্মভাবে ঐশীত্বের প্রতিনিধি। এক ধরনের ডসেটিজম সুন্নীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। কুর্দিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে একজন সুন্নী তাপস[১] যিশু নষ্টিকদের মধ্যে যে স্থান দখল করেছিলেন ; প্রায় তেমনি স্থান দখল করেছিলেন জনসাধারণের বিশ্বাসে।

'রৌশেনিয়া' সম্প্রদায় খ্রীষ্টানদের মধ্যে যে ইলুমিনেটি সম্প্রদায় রয়েছে তাদেরই অবিকল প্রতিলিপি। ভারতবর্ষে আকবরের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে যে অন্ধকার, প্রলয়ঙ্করী ও রক্তপিচ্ছিল যুগ চলেছিল তখন আফগানিস্তানে এই সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বায়েজিদ[২] ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত আফগান। তিনি পর্যাপ্ত স্বভাবগত ক্ষমতা ও সূক্ষ্ম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয়। তরুণ বয়সে তিনি ইসমাইলিয়াদের নিকট থেকে ম্যানেকীয় মতবাদের প্রভাবে আসেন। এখনও ইসমাইলিয়াগণ খোরাসানের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করছেন। তিনি প্রথমে যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তা সূফীদের মতবাদ মূলতঃ পৃথক ছিল না ; তিনি যতই অগ্রসর হতে থাকেন ততই ইসলাম থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে পড়তে থাকেন। এই সম্প্রদায় সংখ্যায় ও

---

১. শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী। সুন্নী মযহাবে এমন সব লোকজন রয়েছেন যারা তাঁকে অতিরঞ্জিত সম্মান দেখিয়ে থাকেন যা প্রায় আরাধনার সামিল। তিনি 'গওস-ই-আযম', 'মাহবুবে সোবহানী' 'কুতুব-ই-রাব্বানী' ("মহান নেতা, আল্লাহর প্রিয়পাত্র, পবিত্রতার ধ্রুবজ্যোতি") উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন। ('গুল্দস্তাই কেরামত দেখুন) শাইখ আব্দুল কাদির ছিলেন একজন মরমী সাধক এবং বংশসূত্রে ফাতেমীয়। তিনি মরমীবাদী ও তাপস-দের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন।

২. পরে মিয়া রওশন বায়েজীদ নামে পরিচিত হন।

শক্তিতে বৃদ্ধি পাওয়ার পর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আকৃতি ধারণ করে এবং দ্রুততার সঙ্গে এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে প্রায় সমগ্র আফগানিস্তানকে কবলিত করে।

বায়েজীদ যে মতবাদসমূহ শিক্ষা দিয়েছিলেন তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মরমীবাদ ও সর্বখোদাবাদের ওপর তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। দূরদর্শী পাঠক তার শিক্ষা এবং ফকির সম্প্রদায়ের তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে অদ্ভুত ও কাল্পনিক সাদৃশ্য দেখতে ব্যর্থ হবে না। তিনি শিক্ষা দিতেন যে আল্লাহ সর্বব্যাপী, আর যাবতীয় অস্তিত্বশীল বস্তু তাঁর বিভিন্ন রূপ, পীর বা ধর্মীয় শিক্ষকগণ ঐশীত্বের মহান অভিব্যক্তি; ন্যায় ও অন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি ঐশী প্রতিনিধি পীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা , কাজেই আইনের অধ্যাদেশসমূহের মরমী অর্থ রয়েছে এবং ধর্মীয় পূর্ণতা অর্জনের জন্য একমাত্র উপায় হিসেবে প্রদত্ত; আইনের মরমী অর্থ একমাত্র ধর্মীয় অনুশীলন ও পীরের উপদেশ / নির্দেশের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এ হল ধর্মীয় পূর্ণতার উৎস—এই পূর্ণতা অর্জিত হলে আইনের বাহ্য অধ্যাদেশ আর বাধ্যতামূলক থাকে না ও বাস্তবিক নির্মূল হয়।

'বাতেনী', 'ইসমাইলিয়া' ও সমজাতীয় সম্প্রদায়গুলি সাধারণ মুসলমানদের থেকে পৃথক এদিক দিয়ে যে, তারা বিশ্বাসকে তাদের ধর্মের মূল বলে মনে করে। এদিক দিয়ে তারা খ্রীষ্টানজগতের সব সংস্কারবিদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। লুথারের মতো "বিশ্বাসের মাধ্যমে ধর্মের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে" তারা বিশ্বাসী। লুথার খুব জোরের সঙ্গে পোষকতা করেছেন যে "খ্রীষ্টে বিশ্বাস সব পাপীকে পরিত্রাণ করবে। সব শাখাদলসহ 'বাতেনী' ও ইস্‌মাইলিয়াগণ বিশ্বাস বা 'ঈমান'কে ঐশী ইমামের ওপর দৃঢ় নির্ভরতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ঈমানের অধিকারী থাকবে ততক্ষণ তার বাহ্য কার্যকলাপ অকিঞ্চিৎকর।

এবার আমরা প্রকৃত শিয়া, মুহম্মদ-বংশের ইমামদের অনুসারীদের কথা আলোচনা করব। তারা সাধারণতঃ 'ইসনা আশারিয়া' নামে পরিচিত; তাদের এই নামকরণ হওয়ার মূলে রয়েছে তারা বারোজন ইমামের নেতৃত্ব স্বীকার করেন। 'ইসনা আশারিয়াগণ' মনে করেন যে নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে 'ইমামত' অনুগমন করে:

১। খলিফা আলী, সাধারণত মুর্তাযা আসাদ উল্লাহ আল্‌ গালিব,

(মনোনীত, আল্লাহর সিংহ, বিজয়ী ; মৃত্যু ৪০ হিযরী ৬৬১ খ্রী.) নামে অভিহিত।

২। হাসান, মুযতাবা (অনুমোদিত) অভিহিত : (৪৪ হি. ৬৬৪ খ্রী.)।

৩। হোসাইন, শহীদে কারবালা (কারবালায় শহীদ): (৬০ হি. ৬৭৯ খ্রী.)।

৪। দ্বিতীয় আলী, পবিত্রতার জন্য জয়নুল আবেদীন (ধার্মিকদের অলঙ্কার) : (মৃত্যু ৯৪ হি. ৭১৩ খ্রী.)।

৫। মুহম্মদ আল্‌ বাকির (রহস্যের ব্যাখ্যাতা বা গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী)—তিনি ব্যাপক অধ্যয়ন ও ধর্মীয় নিষ্ঠার প্রতীক ছিলেন (জন্ম ৫৭ হি. ৬৭৬ খ্রী.—মৃত্যু ১১৩ হি. ৭৩১ খ্রী.)।

৬। জাফর আস্‌ সাদিক (সত্যবাদী) মুহম্মদ আল্‌ বাকিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ৮০ হিযরীতে (৬৯৯ খ্রী.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি সব মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চে। তাঁর পাণ্ডিত্য ও গুণাবলী, চরিত্রের ঊর্ধ্বগামী পবিত্রতা ও সত্যতা তদীয় বংশের শত্রুদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। তিনি ১৪৮ হিযরীতে (৭৬৫ খ্রী.) দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা আবুজাফর আল্‌ মনসুরের রাজত্বকালে পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

৭। জাফর আস সাদিকের পুত্র আবুল হাসান মুসা আল কাজিম তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ও "আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াসের" জন্য আল্‌ আব্দুস সালেহ (পবিত্র ভৃত্য / অনুগত) উপাধি লাভ করেছিলেন। ১২৯ হিযরীতে (৭৪৬-৭৪৭ খ্রী.) তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৮৩ হিজরীর ২৫শে রজব (১লা সেপ্টেম্বর, ৭৯৯ খ্রী.) তারিখে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন ; সেখানে হারুন অর রশীদ বেশ কয়েক বছরের জন্য তাঁকে অন্তরীণ রেখেছিলেন। কেননা হিযাযে ইমাম যে সম্মান পেয়েছিলেন তাতে খলিফা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। দ্য সসী বলেন যে, অন্তরীণ অবস্থায় হারুন অর রশীদের আদেশে মুসাকে হত্যা করা হয়। তাঁর দুঃখ-দুর্দশা এবং পূত ও উন্নত চরিত্র সকল শ্রেণীর লোকদের নিকট তাঁকে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল এবং তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল "ধৈর্যশীল" কাজিম উপাধি।

৮। আলী তৃতীয়—আবুল হাসান আলী যিনি তাঁর পূত চরিত্রের

জন্য 'আর রেজা' বা অনুগৃহীত উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, কবি ও প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক। তিনি ১৫৩ হিযরীতে (৭৭০ খ্রী.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২ হিযরীতে (৮১৭ খ্রী.) খোরাসানের তুস নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। উম্মুল ফযল নাম্নী মামুনের এক ভগিনীকে তিনি বিবাহ করেন।

৯। আবু জাফর মুহম্মদ ঐশ্বর্য ও উদারতার জন্য 'আল্-যাওয়াদ' ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য 'ত্বাকী' উপাধি লাভ করেন। তিনি মামুনের ভাগ্নে এবং তাঁর কন্যা উম্মুল হাবিবকে বিবাহ করেন। খলিফা মামুন ও তাঁর উত্তরাধিকারী মুতাসিম (জ. ১৯৫ হি. ৮১১ খ্রী.—মৃ. ২২০ হি. ৮৩৫ খ্রী.) তাঁকে সর্বাধিক সমীহ করতেন।

১০। আলী চতুর্থ—ওরফে 'নকী' (পবিত্র) (২৬০ হিযরী ৮৬৮ খ্রী.)-তে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

১১। আবু মুহম্মদ আল্-হাসান ইবনে আলী আল্ 'আসকারী', উপনাম 'আল হাদী'—পথ প্রদর্শক: তিনি মুতাওয়াক্কিলের নিরীক্ষণাধীন সার্মান রাআ-তে[১] অবস্থিত তাঁর বাড়ী যা 'আসকার' (তাঁবু) নামেও পরিচিত—তাতে বসবাস করতেন। তিনি স্মরণীয় ধর্মনিষ্ঠা ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন—তিনি কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ২৩১ হিজরীতে (৮৪৫-৮৪৬ খ্রী.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬০ হিযরীতে (৮৭৪ খ্রী.) মৃত্যুবরণ করেন। কথিত আছে মুতাওয়াক্কিল তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন।

১২। মুহম্মদ 'আল্-মাহদী' (২৬৫ হি. ৮৭৮/৮৭৯ খ্রী.): এই শেষ ইমাম শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী পাঁচ বছর বয়সে সার্মান রাআ'র এক গুহা থেকে অন্তর্হিত হন।[২] শিয়াদের বিশ্বাস, এখনও তিনি বেঁচে আছেন; বিশ্বজনীন খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ও মানবগোষ্ঠীর বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার জন্য তারা প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় তারা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। তাঁকে ইমাম 'গায়িব' (অনুপস্থিত ইমাম), ইমাম

---

১. বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে কয়েক দিনের দূরবর্তী একটি স্থান।
২. এই দুঃখজনক ঘটনার বিবরণের জন্য এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায় এবং 'এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন (ম্যাকমিলান), পৃ. ২৯৫ দেখুন।

'মুন্তাজির' (প্রত্যাশিত ইমাম) ও ইমাম 'কায়িম' (জীবন্ত ইমাম) বলা হয়।[১]

ইস্না আশারিয়া সম্প্রদায় এখন 'শিয়া' বা ইসমাইলিয়া বলে অভিহিত—এরা দুটি শাখায় বিভক্ত: 'উস্যুলি' এবং 'আকবারী' (মূল-নীতির অনুসারী ও ঐতিহ্যের অনুসারী)। ইমামত ও শেষ ইমামে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে 'মুজতাহিদ' যারা নিজেদেরকে ইমামের প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেন তাদের ব্যাখ্যার গুরুত্বের পরিমাণের ব্যাপারে তারা একমত নন। উস্যুলি শাখা ব্যাখ্যাতাদের পক্ষে ইমামের রায় নাকচ করার কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। উস্যুলিরা প্রতিপন্ন করেন যে আইন সুস্পষ্ট এবং এটা তাদের কর্তব্য যে প্রজ্ঞা ও মানবচিন্তার অগ্রগতির আলোকে তা গঠন করা এবং তাদের মতো ভ্রান্ত লোকদের নির্দেশ মোতাবেক তাদের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিচালিত না হওয়া, আর জগতকে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত না করা। তারা অভিমত পোষণ করেন যে খোদার প্রত্যাদেশের মধ্যে এমন জটিল শব্দ নেই যার ফলে ঐশী তাৎপর্য লুক্কায়িত থাকতে পারে। এসব বাণী আল্লাহর প্রেরিতপুরুষদের মাধ্যমে মানুষের নিকট তাদের অনুধাবন ও পালনের জন্য ব্যক্ত। সুতরাং প্রেরিতপুরুষদের মাধ্যমে প্রকাশিত ঐশী নির্দেশ অনুধাবনের জন্য কোন পুরোহিত বা আইনজ্ঞের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আকবারী শাখা মুজতাহিদদের ব্যাখ্যাকে দাসসুলভ মনোভাব নিয়ে পালন করে থাকে।

উস্যুলি মতবাদ অনুসারে হযরতের মৌলিক বাণীসমূহ প্রকৃতির দিক দিয়ে কোরআনিক অধ্যাদেশের পরিপূরক এবং তাদের অবশ্য পালনীয় গুণ কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে তাদের মিলের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং হযরতের যেসব বাণী কোরআনের মর্মবাণীর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সে সব বানোয়াট বলে বিবেচিত। নৈয়ায়িক নিয়মাবলী ও সুনির্দিষ্ট তথ্য-নির্ভর স্বীকৃত নীতিসমূহের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এই নিয়মাবলী মুতাজিলাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নমুনা লাভ করেছে: তারা পবিত্র হাদিস থেকে হযরতের সেসব কথিত বাণী পৃথক করেছিলেন যেগুলি তাঁর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, যা তাঁর পরিবারের দার্শনিক ও

১. ক্রাইষ্টাডেলফিয়াদের বিশ্বাসের সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয়, যাঁরা বিশ্বাস করেন যিশুখ্রীষ্ট স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পুনঃ আবির্ভূত হবেন।

আইনজ্ঞদের দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার সঙ্গে বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছিল।

উসলিগণ হাদিসসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন : (ক) সহীহ হাদিস, (খ) উত্তম হাদিস (হাদিসে হাসানা), (গ) শক্তিশালী হাদিস (হাদিসে মুসাকা) ও (ঘ) দুর্বল হাদিস (হাদিসে জইফ)। 'সহীহ হাদিস' হল এমন হাদিস যার সত্যতা চূড়ান্তভাবে নিষ্পাপ ইমাম পর্যন্ত বর্তায়, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ইমামের বর্ণনানুযায়ী, যাঁর চরিত্রের সততা সম্পর্কে হাদিসের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। হাদিসের সনদ বর্ণনার সাক্ষ্য সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতায় হওয়া চাই। 'হাদিসে হাসানা' সেই সব উত্তম হাদিস যার সনদের সাক্ষ্য প্রমাণ সহীহ হাদিসের ন্যায় নিষ্পাপ ইমাম পর্যন্ত পৌঁছায়। একজন মাননীয় ইমামের বর্ণনানুসারে যদিও ঐতিহাসিকগণ "বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ" বর্ণনাকারীর (সিকাহ আদিল) কথা বলেননি তথাপি তাকে প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী বলেছেন। 'হাদিসে মুসাক' বা শক্তিশালী হাদিস এমন হাদিস যা এমন লোকে বর্ণনা করেছেন, ঐতিহাসিকগণ যাদেরকে ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ" বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও তাদের কেউ কেউ বা সকলেই "ইমাম বা আলীর অনুসারী" নন। আর 'হাদিসে জইফ' বা দুর্বল হাদিস হল সেই সব হাদিস যা এর কোন শর্ত পূরণ করে না। প্রথম তিন প্রকার হাদিসই উস্যুলিগণ অনুমোদন করেন।

আর, হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার আগে দেখতে হবে যে তা 'নিয়মিত পারম্পর্যে' এসেছে কিনা। কোন হাদিসকে তখনি নিয়মিত পারম্পর্যে আগত বলে ধরা হবে যখন তা বহু লোকে এক নিয়মিত সময়সীমার মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং 'নিষ্পাপ' ইমামে পৌঁছেছে, এই শর্তসাপেক্ষে যে প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোকে তা বর্ণনা করেছেন যে একই সঙ্গে এতগুলি লোকের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। আর অনিয়মিত পারম্পর্যে আগত হাদিস হল সেগুলি যার বর্ণনাকারীগণ সংখ্যায় নগণ্য এবং পূর্বের মতো সাক্ষ্য-প্রমাণহীন। এধরনের হাদিস "হাদিসবিদদের বিশেষ পরিভাষায়, একজনের বর্ণনা" বলে কথিত।

উস্যুলিগণ আইন-প্রণয়ন ও হাদিসের গ্রহণ, প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে থাকেন। তারা 'মুজতাহিদের' ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজী নন, যদি তাদের বিচারবুদ্ধি ও বিবেক বলে যে

তাদের ব্যাখ্যা প্রত্যাদিষ্ট বা প্রাকৃতিক আইনের, ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী। 'আকাবরী' যেভাবে সমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে অসংখ্য হাদিস গ্রহণ করেন তার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। উস্থুলিগণ ইসলামের না হলেও অন্ততঃ শিয়াবাদের উদার মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

'দাবিস্তান' অনুসারে 'আখবারীগণ' সম্পূর্ণরূপে হাদিসের উপর নির্ভর করেন এবং ইজতিহাদের (ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা গবেষণার) প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন—এ থেকে তারা হাদিস সমর্থক বা 'আখবারী' নামে পরিচিত। কারণ তাদের বিবেচনায় ইজতিহাদ করা ইমামদের রেওয়াজের বিরোধী। তারা প্রচলিত সব হাদিসই সহীহ বলে মনে করেন যদি তাতে কোন ইমাম বা হযরতের নাম যুক্ত থাকে। হাদিস হলেই হল, এবং এতেই যে হাদিস তাদের কাছে সহীহ বলে পরিগণিত এবং কোন্ উৎস থেকে সে হাদিস এসেছে তা পরখ করার কোন প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেন না।[১] এটা বলার প্রয়োজন রাখে না যে এই সহজ নীতির অধীনে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে অসংখ্য হাদিস ও বাণী এসে মিশ্রিত হয়েছিল যা ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সংশ্রবহীন। জনগণের হৃদয় থেকে প্রাচীন ধর্মমত একেবারে মুছে যায়নি এবং এটা অসম্ভব ছিল যে জাতীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও তাতে প্রাচীন ধর্মমত নতুন ও অনুমোদিত পোশাকে প্রকাশ পাবে না। চরম আখবারী মতবাদ যে ইসলামের মহান বীরকে ওরমুজদ ও তার বংশধরদেরকে আমসাসপাণ্ডে পরিণত করেছে— এটা গোবিনিউ কিছুটা রুক্ষভাবে হলেও নিতান্ত অযৌক্তিকতার সঙ্গে অভিযোগ করেননি।

আখবারী মতবাদ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য জনপ্রিয় ধর্মমত। উস্থুলিদের মতবাদ সমাজের সবচেয়ে বুদ্ধিজীবী এবং যাজকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনুমোদন লাভ করেছিল। সাম্প্রতিককালে উস্থুলী মতবাদসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাদের অন্যতম হলেন সিরাজের অধিবাসী মোল্লা সাদরা[২] (মুহম্মদ ইবনে ইবরাহিম); তিনি সম্ভবত তাঁর কালের সবচেয়ে শক্তিমান পণ্ডিত ও

---

১. 'আদিল্লা-ই-কাতি' বা চূড়ান্ত সাক্ষ্য যাতে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না এবং ভাবনাচিন্তা-গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই।

২. মোল্লা সাদরা দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

তার্কিক। তিনি পারসিকদের মধ্যে দর্শন ও মানবকল্যাণমূলক বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনকারী। বুওয়াইহ্‌দের পতনের পর সাফেরীদের অভ্যুত্থান পর্যন্ত পারস্যদেশ দুর্যোগের মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি দর্শন ও বিজ্ঞানকে নির্বাসিত করেছিল। আভিসেনা (ইবনে সিনা)-র নাম ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল এবং তাঁর গ্রন্থসমূহ জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এই শতাব্দীগুলিতে ইসলামী পোশাকে অনেক মাজদেকী ঐতিহ্য অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। প্রকৃত ফাতেমীয় পণ্ডিতগণ নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং একদল ধর্মতত্ত্ববিদ জাতীয় দুর্যোগ ও কুসংস্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখেছিলেন। মোল্লা সদরাকে খ্রীষ্টানজাহানের-একগুঁয়ে পাদরীদের ন্যায় ধর্মতত্ত্ববিদদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে হয়েছিল এবং তারা তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামির রক্ষণশীলতার ওপর সামান্য আঁচড়ও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মোল্লা সাদরার ছিল প্রভূত অধ্যাবসায় ও বিচক্ষণতা। তিনি অনেক কষ্টে দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর একবার উস্থুলি মতবাদ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল। এর দার্শনিক প্রতিপক্ষ মুতাজিলা মতবাদ প্রশ্নাতীতভাবে ইসলামের সবচেয়ে বুদ্ধিবাদী ও উদারপন্থী দিক। উদারতা, মনুষ্য-চিন্তার সকল পর্যায়ের সঙ্গে সহানুভূতিশীলতা, মহান আশাবাদ ও ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে এই মতবাদ মুহম্মদের দার্শনিক বংশধরদের ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছে, যারা শিক্ষাগুরুর চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল।

অদ্যাবধি যে রাজনৈতিক দলাদলি শিয়াদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করেছিল তা তিরোহিত হচ্ছে। এ ছাড়া অবশিষ্ট সম্প্রদায় দ্রুত ইসনা আশারিয়াদের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পারস্য, আরব, পশ্চিম আফ্রিকা ও ভারতের শিয়াদের অধিকাংশ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইসনা আশারিয়া মতবাদ এরূপে শিয়া মতবাদের সঙ্গে একার্থক হয়ে পড়েছে।

আখবারীদের মতো সুন্নীরা হাদীসের উপর তাঁদের মতবাদসমূহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে আখবারীদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই যে, প্রকৃত বা সহীহ হাদিস হওয়ার জন্য তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পার হয়ে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক হতে হয়। এখানে তারা উস্থুলিদের নিকটবর্তী। তারা খলিফাদের ও বিশ্বাসী সাধারণের (ইজমাউল উম্মাতের) ঐক্যমতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তা কোরআনের বিধি-বিধানের সম্পূরক ও প্রামাণ্যের দিক দিয়ে প্রায় তার সমকক্ষ।

সুন্নীরা বিভিন্ন মত-পার্থক্যের জন্য পরস্পর বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এসব অপ্রধান গোষ্ঠীগত পার্থক্য অনেক সময় তাদের মধ্যে তীব্র রেষা-রেষি ও নির্যাতনের পথ করে দিত। যাহোক প্রধানতঃ তারা তাদের মতবাদ ও আইনের মৌলিক ভিত্তি সম্পর্কে একমত পোষণ করতে এবং চারটি অপরিবর্তিত উৎস থেকে তাদের মতবাদ গৃহীত হয়েছিল বলে তাঁরা মনে করতেন। এই চারটি উৎস হল: (ক) কোরআন, (খ) হযরতের সুন্নাত বা হাদিস, (গ) ইজমাতুল উম্মাত (মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্যমত) এবং (ঘ) কিয়াস (ব্যক্তিগত মীমাংসা)। হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হল (১) হযরতের সকল বাণী, উপদেশ ও মৌখিক আদেশ (কওল), (২) তাঁর কার্যাবলী ও প্রাত্যহিক অনুশীলন (ফে'ল) এবং (৩) তাঁর শিষ্যদের সম্পাদিত কোন কার্য সম্পর্কে তাঁর মৌন সম্মতি-নির্দেশক নীরবতা বা তাকরির। এসব সহকারী উৎস থেকে অনুমিত নিয়মগুলি প্রামাণ্যতার দিক দিয়ে প্রভূত পরিমাণে মত-পার্থক্যের সূচনা করে। যদি নিয়মগুলি বা হাদিসের আদেশসমূহ সর্বজনবিদিত ও সার্বিক নিন্দার বিষয় হয় তবে তা সম্পূর্ণরূপে সহীহ ও চূড়ান্ত হবে। 'আহাদিসে মুত্ওয়াতিরেহ'। যদি কোন হাদিস সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জানা থাকা সত্ত্বেও সার্বজনীন নিন্দার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে না তবে তাকে 'আহাদিসে মাশহুরা' বলে অভিহিত করা হয় এবং এই শ্রেণীর হাদিস মর্যাদার দিক দিয়ে 'আহাদিসে মুতাওয়াতিরেহ'-এর পরেই। আর 'আখবার-ই ওয়াহিদ' যার সত্যতা নির্ভর করে ব্যক্তির প্রমাণের উপর, তাদের নিকট তার কোন মূল্য নেই। কাজেই তাঁর সঙ্গে কথকদের বাস্তব সম্পর্কে নির্বিশেষে হযরতের সমসাময়িক লোক ও শিষ্যদের পরিবেশিত হাদিস প্রকৃত ও খাঁটি হাদিস